রবীন্দ্র-সাহিত্যের

নরনারী

রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী

প্রথম খণ্ড । উপন্যাস

গোপীমোহন সিংহরায়

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট । কলকাতা- ৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৭

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ ॥ মুদ্রক : কালী প্রেস, ৬৭ ও ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৯

পূর্বভাষ

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। পাঁচ খণ্ডে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির মধ্যে যে-সব নরনারীর একবারও উল্লেখ আছে এই খণ্ডে তাদের প্রত্যেকের আনুপূর্বিক পরিচয় সংকলিত হল। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে ছোটগল্পের চরিত্র। তৃতীয় খণ্ডে নাটকের এবং চতুর্থ খণ্ডে কবিতা ও অন্যান্য রচনার চরিত্রসমূহ। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাবৎ নরনারীর শ্রেণী ও ব্যক্তিচরিত্রের বিচার-বিশ্লেষণ অন্ত্য ও পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই গ্রন্থের প্রথম চার খণ্ড রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরিতাভিধান। সাহিত্যের রূপবিভাগ অনুযায়ী রবীন্দ্র-সৃষ্ট চরিত্রগুলির আদ্যন্ত পরিচয় খণ্ডে-খণ্ডে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত হয়েছে। এই পরিচয় সর্বতোভাবে মূলানুসারী, যথা-সম্ভব রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই চরিত্রগুলিকে বিবৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিবিধ ঘটনা ও ঘাতপ্রতিঘাত, চরিত্রের স্বকীয় উক্তি ও মানসধারার ক্রমপরিণাম বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 'পঞ্চভূত'-এর 'মনুষ্য' সন্দর্ভের এক স্থানে সমীর বলেছিল, 'তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে-একটি নিরেট মূর্তি দাঁড় করিয়াছ তাহাতে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য।' চেষ্টা করেছি যেন নিরেট মূর্তির বদলে ঐ 'মানুষটুকু' কিয়ৎপরিমাণেও প্রস্ফুট হয়ে ওঠে—আমার প্রযত্ন আভিধানিক হলেও যেন তারা একেবারে জীবনরসরিক্ত না হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার কবি। তাঁর মানসসন্ততিরা তাঁর ঐ নির্বিকল্প কবিপ্রসিদ্ধির আড়ালে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রায় দু-হাজারের মতো চরিত্র সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাদের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও রূপবৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করলে তাঁকে মনুষ্যচরিত্রের মহাকবি বলাই সমীচীন হয়। রবীন্দ্রনাথের এই পরিচয় যাতে স্বতঃউদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এই গ্রন্থের তা প্রাথমিক লক্ষ্য।

রবীন্দ্র-সাহিত্য অনন্তপার। সকল সাহিত্যরসিকই অনন্তপার রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই অমৃতসিন্ধুতে অবগাহন করবার কামনা করেন। কৌতূহলী বা গবেষক—যিনিই হোন, রবীন্দ্র-কৃত চরিত্রসমূহের প্রাথমিক পরিচয়টুকু যাতে অনায়াসে লাভ করতে পারেন, সাধারণ পাঠকও যাতে ঐ চরিত্র-চিত্রশালায় অবাধ প্রবেশ লাভ করতে পারেন, সে বিষয়ে সর্বদা অবহিত থেকেছি। বর্তমান গ্রন্থ সামান্যভাবেও যদি কারো সহায়ক হয় তবে নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করব।

বঙ্গবাসী কলেজের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রধান আচার্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য প্রাচীন আদর্শেই আমার গুরু। আমার জীবনের এক

গভীর সংকটকালে এই দায়িত্বভার দিয়ে তিনি আমার প্রাণকে জাগিয়ে রেখেছিলেন। আমার পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্নেহ এবং পল্লী-বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বর্গত প্রবোধকুমার ঘোষ মহাশয়ের প্রেরণা আমার জীবনে অন্তহীন ; এই গ্রন্থের প্রকাশকালে তাঁদের অপরিসীম করুণা স্মরণ করি।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে রবীন্দ্রনাথের শেষ সাতটি উপন্যাসের সাতটি পাণ্ডুলিপি-চিত্র বর্তমান খণ্ডে সংযোজিত হয়ে গ্রন্থের গৌরববৃদ্ধি করেছে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছে এজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রসদনের অবেক্ষক শ্রীযুক্ত শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সস্নেহ আনুকূল্য পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। বর্তমান খণ্ডের পাণ্ডুলিপি-রচনায় বারংবার পরিশ্রম করে বর্ধমান বার-লাইব্রেরির সুদক্ষ টাইপিস্ট শ্রী চণ্ডীচরণ সোম আমাকে প্রীতিপাশে আবদ্ধ করেছেন।

* * *

দ্বিতীয় সংস্করণ-এর নিবেদন

বর্তমান খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। প্রথম সংস্করণটি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্র-সাহিত্য-জিজ্ঞাসু রসিকসমাজে যে বিপুল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়, তা নিঃসন্দেহে তার বিষয়গৌরবেরই জন্য। কিন্তু গ্রন্থকারের শ্রমও তাতে সার্থকতা লাভ করায় আমি পাঠকসমাজের কাছে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় সংস্করণে এই খণ্ডের আদ্যন্ত পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করেছি। শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত এই সুযোগলাভের জন্য মুদ্রণকার্যে হস্তসাহায্যে অক্ষরবিন্যাসের প্রথাই শ্রেয় বোধ করেছি। তাই যান্ত্রিক লাইনোপ্রথায় মুদ্রিত প্রথম সংস্করণের মুদ্রণসৌকর্য রক্ষা করা গেল না—সেজন্য রুচিশীল পাঠকের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি।

'রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারী'র প্রস্তাবিত পাঁচ খণ্ডের চারটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের চোদ্দখানি উপন্যাসের প্রায় চারশত চরিত্র সংকলিত হয়। তৎপরে দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর শতাধিক গল্পের প্রায় আটশত, তৃতীয় খণ্ডে অর্ধ-শতাধিক নাট্যগ্রন্থের আটশত এবং চতুর্থ খণ্ডে অর্ধ-শতাধিক কাব্য ও দুটি সন্দর্ভগ্রন্থের প্রায় আটশত চরিত্রের পরিচয় সংকলিত হয়েছে। অতএব সূচনাপর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারীর সংখ্যার যে-ব্যাপ্তি আমাদের অনুমানে ছিল, প্রকৃত সংখ্যা সেই প্রাক্-ধারণাকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের নরনারীর সংখ্যা প্রায় তিন-সহস্র—এতখানি বিস্তৃতি রাজচক্রবর্তী বিশ্বকবিরই যোগ্য।

গোপীমোহন সিংহরায়

পরমারাধ্য পিতৃদেব

স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ সিংহরায়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

অক্ষয় ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের সহাধ্যায়ী যোগেনের বন্ধু। যোগেনের পিতা অন্নদাবাবু তাঁর কন্যা হেমনলিনীর পাত্র হিসাবে রমেশের কথা চিন্তা করছিলেন। অক্ষয় বেশি পাস করতে পারে নি—কিন্তু, চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষ্ণা রমেশের চেয়ে তার কম ছিল না। রমেশের বাপকে সে ব্রাহ্ম-পরিবারে রমেশের মেলামেশার কথা জানিয়ে দিলে। রমেশ দেশে গেলে আকস্মিক-ভাবে তার বিবাহ, স্ত্রীর মৃত্যু এবং ঘটনাক্রমে তার আশ্রিতা হল কমলা।

অন্নদাবাবু পেটের অসুখে নানারকম পিল ব্যবহার করতেন। অক্ষয় সেই পিলের প্রশংসা করে তাঁর মন পাবার চেষ্টা করত। হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে আবার রমেশের অভ্যাগমে সে চমকে উঠল। একদিন বেহালা মিলিয়ে অক্ষয় গাইলে বর্ষার গান; উৎসাহের আবেগে সুরের ভাষায় সে হেমনলিনীর প্রতি হৃদয়ানুরাগ প্রকাশের চেষ্টা করলে। কিন্তু সে-ভাষা কাজে লাগল অন্য দুজনের। অবশেষে অক্ষয় রমেশের বাসায় এসে বললে, 'আপনি এতদিনে এটুকু বুঝিয়াছেন, হেমনলিনীর ভালোমন্দের প্রতি আমি উদাসীন নহি।...তাঁহার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কী, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমার আছে।...এরূপ করিয়া আপনি বাহিরের লোকের জবাবদিহি হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন না'।

কমলা কলকাতার স্কুলে পড়ত। হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির হবার পরে অক্ষয় তার বোন শরতের কাছে শুনলে: কোনো-এক রমেশের স্ত্রী স্কুলে পড়ে। শুনে একদিন চায়ের টেবিলে রমেশকে পরিহাস করলে। নানা সমস্যায় রমেশকে বিবাহ পিছিয়ে দিতে হল। অন্নদাবাবুর কাছে দিন-পরিবর্তনের কথা শুনে অক্ষয় কিছুক্ষণ আড়ম্বর-সহকারে চিন্তা করে বললে, 'আপনারা যাহাকে একবার সৎপাত্র বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুটি চক্ষু বুজিয়া থাকেন।...আপনার মেয়ের কাছে রমেশবাবু একটা কারণ নিশ্চয়ই কী বলিয়াছেন।' হেমনলিনী তার এই অনধিকারচর্চায় অসন্তুষ্ট হলে সে পাংশু মুখে হাসি টেনে বললে, 'সংসারে বন্ধুর কাজটাতেই সবচেয়ে লাঞ্ছনা বেশি।' অক্ষয় নিজেকে দমন করতে জানত। কিন্তু অন্নদাবাবুও তার সন্দিগ্ধতার অভিযোগ করাতে উত্তরোত্তর আঘাতে সে উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'দেখুন অন্নদাবাবু, আমার অনেক দোষ আছে।...আমি সাধারণ দশ জনের মধ্যেই গণ্য—কিন্তু চিরদিন আমি আপনাদের প্রতি অনুরক্ত, আপনাদের অনুগত।...এইটুকুমাত্র অহংকার আমার আছে, আপনাদের কাছে কোনোদিন আমার কিছু লুকাইবার নাই। আপনাদের কাছে আমার সমস্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া আমি ভিক্ষা চাহিতে পারি,

কিন্তু সিঁদ কাটিয়া চুরি করা আমার স্বভাব নহে। এ-কথার কী অর্থ তাহা কালই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।'

পরদিন যোগেনকে নিয়ে সে গেল মেয়েদের স্কুলে—সেখান থেকে রমেশের বাসায়। রমেশকে যথোচিত প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফিরে এসে রমেশের স্ত্রীর অস্তিত্ব ঘোষণা করলে। হেমনলিনী হঠাৎ মূর্ছিত হওয়াতে একটা হাতপাখা নিয়ে সে প্রবল বেগে বাতাস করতে লাগল। হেমনলিনীর তবুও অবিশ্বাস দেখে তখনই প্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাকে ছুটতে হল রমেশের বাসায়। সেখানে না পেয়ে ব্যাগ-হাতে শিয়ালদহে—তৎপরে রেলওয়ে কর্মচারীর বাধা কাটিয়ে চলন্ত গাড়িতে উঠে গোয়ালন্দে পৌঁছল। অবশেষে সারাদিন সেখানে ছট্‌ফট্‌ করে কলকাতায় ফিরে এসে বললে, 'পালাইয়াছে, ধরিতে পারিলাম না।' হেমনলিনীর অভদ্রতায় যোগেন অধৈর্য। অক্ষয় বললে, 'যোগেন, তুমি আমার কেস আরও খারাপ করিয়া দিবে দেখিতেছি।...সময়ে ইহার প্রতিকার হইবে, জবরদস্তি করিতে গেলে সব মাটি হইয়া যাইবে।' অনাদর-অবমাননায় অক্ষয় অবিচলিত। সমস্ত লক্ষণ যখন প্রতিকূলে তখনও সে লেগে থাকতে জানত—মুখ গম্ভীর করে থাকত না।

একদিন যোগেনের আশ্বাসে অক্ষয় সাজসজ্জায় বিশেষ পারিপাট্য করে এল। হাতে রুপো-বাঁধানো ছড়ি, বুকে ঘড়ির চেন, বাঁ-হাতে কাগজে-মোড়া মরক্কো-বাঁধা টেনিসন। বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা : 'শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রতি অক্ষয়শ্রদ্ধার উপহার'। কিন্তু তখনও হেমনলিনীর বিরূপতায় যোগেন উত্তেজিত। অক্ষয় বললে, 'ভাই, তুমি মিথ্যা রাগ করিতেছ।...আমি নিশ্চয় বলিতেছি আমার প্রতি হেমনলিনীর মন কোনোদিন অনুকূল হইবে না।...আমি ছাড়া জগতে আর বিবাহযোগ্য যুবাপুরুষ নাই নাকি?...যেমন করিয়া হোক, একটি ভালো পাত্র যোগাড় করা চাই'।—এই বলে সে নলিনাক্ষ ডাক্তারের সন্ধান দিলে। যোগেন পরে অনুযোগ করলে : নলিনাক্ষ তো প্রায় সন্ন্যাসী। সে বললে, 'রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়। হেমনলিনী রমেশের ধ্যানে মগ্ন আছেন; সে ধ্যান সন্ন্যাসী নহিলে আমাদের মতো সহজ লোকে ভাঙাইতে পারিবে না।...তপস্বীর উপর মেয়েদের একটা বিশেষ টান আছে।' অতঃপর অন্নদাবাবুর গৃহে নলিনাক্ষর গতিবিধি অবারিত হলে সে কিছুকাল দূরে রইল।

রমেশ ছিল গাজিপুরে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর আশ্রয়ে। কমলা নিরুদ্দিষ্ট হবার পরে সে এল কলকাতায়। অন্নদাবাবু তখন হেমনলিনীর সঙ্গে কাশীতে। যোগেন তাদের বাড়িটা অক্ষয়কে দেখতে অনুরোধ করেছিল। অক্ষয় যে-কাজের ভার নিত তা পালন করতে শৈথিল্য করত না; কাজেই রমেশের আগমনবার্তা পেতে তার দেরি হল না। ভাবলে : ব্যাপারখানা কী—রমেশ কী করে আবার কলুটোলায় পা দিতে সাহস করে। কালবিলম্ব না করে তখনই সে ব্যাগ-হাতে গাজিপুরে ছুটল। গাজিপুরে চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হওয়াতে নিজেকে

রমেশের বন্ধু বলে পরিচয় দিলে। কমলার সন্ধানের তাঁকে চিন্তিত দেখে বললে : সে হয়তো কাশীতে থাকতে পারে—সেখানে তার আত্মীয় আছে। উদ্দেশ্য : চক্রবর্তীর সহায়তায় রমেশের বিবাহ সম্বন্ধে হেমনলিনীর বিশ্বাস-উৎপাদন। প্রামাণিক সাক্ষী হিসাবে তাই সে সঙ্গে নিলে চক্রবর্তীকে। কাশীতে অন্নদাবাবুর কাছে আদ্যোপান্ত গল্পটি নিজেই বিস্তৃত করে বললে—'অন্যায় করুন, আর ভুল করুন, রমেশবাবু এখন নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন, এ-সময়ে কি তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়া তাঁহার পুরাতন বন্ধুদের কর্তব্য নয় ?' দু-একদিন সে কাশীতে রইল ; কিন্তু তার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

অক্ষয় মুখুজ্জে ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার প্রাক্তন সভাপতি। কুমার-সভার শিকল কেটে পুরবালাকে বিবাহ করেন। অক্ষয় পুরো নব্য, শ্যালীগুলিকে পাস করিয়ে নব্য সমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। সেক্রেটারিয়েটে বড়ো-রকমের কাজ করতেন। অনেক রাজঘরের দূত বড়োসাহেবের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়ে দিতে বিপদে-আপদে তাঁর হাতেপায়ে এসে ধরত। এই-সমস্ত কারণে শ্বশুরবাড়িতে তাঁর পসার বেশি। শীতের ক'-মাস শাশুড়ির পীড়াপীড়িতে যখন কলকাতায় এসে থাকতেন—তখন তাঁর শ্যালী-সমিতিতে উৎসব।

ঝোঁকের মাথায় মুখে-মুখে দু-চার পঙ্‌ক্তি গান বানিয়ে অক্ষয় গেয়ে দিতে পারতেন। শ্যালীদের বিবাহ সম্বধে পুরবালা তাঁর ঔদাস্যের অনুযোগ করায় বললেন, 'মানব-চরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই।...তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না—এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।'—বলে যাত্রার অধিকারীর মতো হাত নেড়ে ঝিঁঝিটে গান ধরে দিলেন। কিন্তু স্ত্রীর ভাব কিছু উগ্র দেখে তাঁকে মনের কথা ফাঁস করতে হল : 'আমি তো তোমাকে বলেইছি...আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।...যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভরতি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।...সরাচাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে-গুমে সিদ্ধ হতে থাকে—প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন—দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এককালে ওই সভার সভাপতি ছিলুম !' পুরবালা সে-সম্বন্ধে আরও কৌতূহল প্রকাশ করায় বললেন, 'সে আর কী বলব! প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে, মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোল-শ গোপিনী, যদি-বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই—ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে

সাক্ষাৎ হল আর কি!' অতঃপর তার পরিণাম সম্বন্ধে পুরবালার প্রশ্ন।...'সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না।...তবে ইশারায় বলতে পারি, মা কালী দয়া করেছেন বটে!'—বলে তার চিবুক তুলে ধরে সকৌতুক স্নিগ্ধ প্রেমে নিরীক্ষণ করলেন।

বিধবা শ্যালী শৈলবালাকে অক্ষয় তাঁর সমবয়স্ক ভাইটির মতো দেখতেন—স্নেহের সঙ্গে সৌহার্দ্যে। ছদ্মবেশে কুমার-সভার মধ্যে গিয়ে তার বিপ্লব ঘটানোর প্রস্তাব। অক্ষয় নয়ন বিস্ফারিত করে উচ্চহাস্য করে উঠলেন: 'আহা কী আপসোস যে, তোমার দিদিকে বিয়ে করে সভ্য-নাম একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়েছি, নইলে দলবলে আমি-সুদ্ধ তো তোমার জালে জড়িয়ে চক্ষু বুজে মরে পড়ে থাকতুম। এমন সুখের ফাঁড়াও কাটে।' এদিকে কর্ত্রীঠাকুরানীর আগ্রহে দুটি কুলীনের ছেলে উপস্থিত। শৈলবালার অনুরোধে কোনো ছলে সে-দুটিকে বিদায় করা দরকার। পাত্র দুটির আগমনমাত্রেই বিসদৃশ বিজাতীয় সম্ভাষণ করে অক্ষয় গুড়গুড়ির নলটা এগিয়ে দিলেন। তৎপরে প্রশ্ন করলেন: মুর্গি কিংবা মটন, বিয়ার না শেরি? আগন্তুকদের উৎসাহিত করবার জন্য পিঠ চাপড়ে গানও ধরিয়ে দিলেন: 'কতকাল রবে বলো ভারত রে / শুধু ডাল-ভাত-জল পথ্য করে। ...দেশে অন্ন-জলের হল ঘোর অনটন, / ধর হুইস্কি-সোডা আর মুর্গি-মটন।' গান চলল সোৎসাহে। অক্ষয় যেন নিরীহ ভালোমানুষটি। অনতিপরেই অন্তঃপুর থেকে শাশুড়ির প্রশ্ন। গম্ভীরমুখে অক্ষয় বললেন, 'মা, সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি? তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে?' এর পরে আর পাত্র-দুটিকে বিদায় করতে অসুবিধা হল না।

মার সঙ্গে পুরবালাকে কাশী যেতে হল। আসন্ন বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় অক্ষয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'আর্তনাদবধ'-কাব্যের পরিকল্পনা ফাঁদলেন। পুরবালা একটা সত্যকার কাব্য লিখতে অনুরোধ করায় বললেন, 'তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে! / যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।' অতঃপর শৈলবালার অনুরোধে তাঁকে কৌশলে কুমার-সভাটিকে সেখানেই উৎপাটিত করে আনতে হল। বালকবেশী শৈলবালাকে দেখেই তিনি বললেন, 'আমি লিখে-পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।' বলা বাহুল্য, অক্ষয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে দেরি হল না। কুমার-সভার সভ্যযুগলের সেখানে এমন গতিবিধি আরম্ভ হল যে, পুরবালাকে মনের মতো একখানি চিঠি লেখাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল।

অখিল ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। যোগেন-কর্তৃক প্রহৃত এক কুৎসাকারী।

অখিল ।। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলালতার দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় বালক। সে পিতৃমাতৃহীন, এলার আশ্রিত। বয়স ষোলো-আঠারো। 'জেদালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কাঁচা শ্যামলা রং, চঞ্চল চোখ-দুটো জলজল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা, বুক বের করা ; শর্টের দুই-দিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলা-ওয়ালা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো-বা সে খেলার নৌকো কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়।' একটি বেঁটে জাতের বাঁদির তার সঙ্গী।

অখিল স্কুলের বোর্ডিঙে থেকে পড়ত। দলপতির আদেশে অতীন যেদিন এলাকে খুন করতে আসে—অখিল এসেছিল বোর্ডিঙ-পালিয়ে। সন্ধ্যাবেলায় দাড়িওআলা একজনকে পাঁচিল ডিঙোতে দেখে সে চুপি-চুপি এসে খবর দিলে এলাকে—তারপরে দরজা বন্ধ করে খুলে দাঁড়াল তার ছুরির মোটা-দিকের ফলাটা। অতীনের পরিচয় পেয়ে শেষে দরজা খুলে বললে, 'সেই দাড়িওআলা কোথায় ?' পরে অতীনের কথায় বাগানে দাড়ির খোঁজ করতে গেল। দলের লোক অতীনকে একটা চিরকুট পাঠালে। অখিল তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে সেটি এনে দিলে অতীনের হাতে। এলার অনুরোধেও লোকটাকে সে ঘরে ঢুকতে দিলে না ; অতীনের অনুরোধে রাজি হল না অন্য-কোথাও যেতে। এলা তাকে বুকের কাছে টেনে বললে, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্‌, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।'

সে-রাত্রেই দিদির সঙ্গে তার চিরকালের মতো শেষ দেখা।

অতীন্দ্র ।। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। অল্প-বয়সে ভালো করে কথা না-ফুটতেই কত উপমা কত অলংকার ফুটে উঠত অতীনের মুখে। বয়স হলে সাহিত্যলোকে প্রবেশ করে কাব্যলক্ষ্মীর সিংহাসনে সোনার স্তম্ভ রচনার স্বপ্ন দেখত। দেনার গর্তে-ভরা পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটা তখনও সে ছিল আঁকড়ে—দেহে-মনে ছিল শৌখিনতার ছাপ, দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো।

সেবার স্টিমারে মোকামাঘাটে অতীনের জীবনে বিপর্যয়। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, সে ফার্স্ট ক্লাস ডেকের আরোহী। হঠাৎ পশ্চাদ্‌বর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে তার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে দেশব্রতধারিণী এলার প্রশ্ন। গলার সুরে অতীনের সর্বশরীর চমকে উঠল : সেই সুর তার মনে এসে লাগল হঠাৎ-আলোর ছটার মতো—যেন আকাশ থেকে কোন্‌-এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল তার চিরদিনটাকে। অহংকার তার স্বভাবের প্রধান লক্ষণ; তবু সেই অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় রাগ করতে পারলে

না। মেয়েটি তাকে বিশেষভাবে পছন্দ না-করলে ধমক দিতে আসত না। মেয়েটির ক্ষিপ্রগমন শরীরটি গঙ্গার জলে রাঙা সন্ধ্যার পটভূমিকায় চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে গেল মনে। তার প্রেমের আকর্ষণে অতীন এসে পড়ল সন্ত্রাসবাদী দলের মধ্যে। এলার আদেশে কুলি-বস্তিতে বাসা নিয়ে গোয়ালঘরের আশেপাশে দাদা-খুড়ো সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টাও করলে। কিন্তু সুর মিলল না—এলার দলের রঙ ধরল না মনের উপর। তবু দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের ব্রত নিয়ে সে এলার মন পাবার চেষ্টার ত্রুটি করলে না। অবশেষে নিজের জন্মদিনের উৎসবে তার প্রেমের অভিষেক সম্পন্ন হল।

অতীন জাত সাহিত্যিক। দান্তের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল বিপ্লবে এবং অলৌকিক ঐশ্বর্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল বিয়াত্রিচে। কিন্তু সে-বিপ্লবের বীর্য আর গৌরব পেল না দেখতে। অসাধারণ উচ্চমনের ছেলেদের সে মনুষ্যত্ব খোয়াতে দেখলে। নিজেও এসে পড়ল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়। কিন্তু কর্মের শাসনকে অসম্মান করা তার আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ। নিষ্ঠুর শাস্তির জাল চারি-দিকে জড়িয়ে এলেও সে বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারল না। দলের নেতা ইন্দ্রনাথের কাছে এলার পণ কৌমার্যের। তাই তার স্বেচ্ছানীত উপহারের প্রত্যাশা ব্যর্থ হতে চলল। সেদিন দিনশেষে অতীন ঝড়ের বেগে এসে বসল এলার পায়ের কাছটিতে। বললে, 'কিসেব বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে।...অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ-পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ। যে-লোভ পবিত্র, যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।' এলা কর্তৃক দেশের হাতে সমর্পিত হবার যুক্তিতে অতীন উত্তেজিত : 'তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে?...দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী।...নারীকে কেন্দ্র করে যে মাধুর্যলোক বিস্তৃত... অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই—সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদেব দলের বানানো দেশে—অন্যের পক্ষে যাই হোক, আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা।...মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে।...মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তাহলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।...তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে-দিয়েই মনে-মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিত বা দুঃখমিত বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ... আমি চিরস্বতন্ত্র...কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি...আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।'

পুলিসের দৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য অতীনকে গঙ্গার ধারে একটা জঙ্গলাবৃত পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নিতে হল। আসবাবের মধ্যে কম্বলের উপরে একটা চাটাই, বালিশের বদলে বই-ভর্তি ক্যাম্বিসের থলি, লেখাপড়া করার জন্য একখানা প্যাক-বাক্স। দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতায় আবার এল স্থানান্তরের নির্দেশ। নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে অতীন তার জীবনের আসন্নপতনমুখী যবনিকার কথা চিন্তা করছিল। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল আলোকেন্দ্রে অকালে এসে পড়ল শেষ-অঙ্ক। হঠাৎ তখনই এলা এসে নিঃশেষ আত্মসমর্পণে ধরা দিলে। দলপতির আদেশ অমান্য করে সেখানে আসায় অতীন অসন্তুষ্ট। বলতে লাগল তার স্বধর্মচ্যুতির কথা : 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন…কুরুক্ষেত্রে চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকালচারাল ইকনমিক্‌স চর্চা করতে বলেন নি। ..নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য, গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে।…গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। ..সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। ..তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই।…দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশব-গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে। ..যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না। ..এ জীবনের নৌকোডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনও বাকি আছে। ..বলো, তুমি ভালোবেসেছ।' কিন্তু হঠাৎ তখনই হুইস্‌লের সংকেতে এলার বন্ধন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বেরিয়ে পড়তে হল।

অনিয়মে-উপবাসে দুরূহ কৃচ্ছ্রসাধনায় অতীনকে সর্বনেশে রোগে ধরল। উপবাসভঙ্গের অনুরোধে দলের সঙ্গে এক অনাথা বিধবাকে খুন করে অভিযুক্ত হল মকদ্দমায়। শেষে পুলিসের কাছে এলার অবমাননা ও দলের কথা ফাঁস হবার ভয়ে দলপতির নির্দেশে সন্ধ্যার অন্ধকারে অতীন খুন করতে এল এলাকে। ছাদের বন্ধ-দরজায় পিঠ দিয়ে বসে বুকের মধ্যে এলার হাত চেপে মৃত্যুর পটভূমিতে বিরাটের বাহুবেষ্টনে উভয়ের মিলিত-চিত্রটি ভেসে উঠল তার কবিকল্পনায় : 'Upwards/Towards the peaks,/Towards the stars, /Towards the vast silence!' এলা শেষ কটা-দিন তার সেবা করবার অধিকার চাইলে। অতীন বললে, 'শুশ্রূষা দিয়ে…কী করতে পার…স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। . সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।। পাণিগ্রহণ! এই হাত দিয়ে।…সমস্ত কালো-দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি।'

দলের লোক তার বিলম্ব দেখে দরজা ভাঙতে আরম্ভ করলে। এলা তার

উদ্দেশ্যের কথা শুনে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকামনা করলে তার হাতে। অতীন পাথরের মতো নিশ্চল—তাকে বিছানায় নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টায় ব্যর্থ হল। তখনই দূর থেকে ভেসে এল হুইস্‌লের সংকেত।

অখিল ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। সুরমার গৃহশিক্ষক।

অনাথবন্ধু ॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীদের পুরনো আমলের কর্মচারী।

অনাথবাবু ॥ 'গোরা' উপন্যাস। পরেশবাবুর এক পরিচিত।

অনাদি ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক রাজনৈতিক কর্মী। ছেলেমানুষ। এলার মনের জোর পরীক্ষার জন্য এক রাত্রে অনাদি ইন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রেরিত হয়। এলা ডাকাত ভেবে কবজি ভেঙে দিলেও সে যন্ত্রণায় হার মানে না।

অনুকূলবাবু ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। আশালতার জ্যাঠা। ভ্রাতৃবিয়োগের পরে ধনী অনুকূলবাবু অনাথা আশাকে নিজের কাছে রাখেন। আশার মাসি অন্নপূর্ণা তাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে চাইলে গৌরবলাঘবের ভয়ে রাজি হতেন না—এমন-কি দেখা-সাক্ষাৎ করতেও নয়। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সজাগ। কিন্তু আশার বিবাহের কথা উঠলে নিজের কন্যাদায়ের উল্লেখ করতেন।

অনুপকুমার ॥ 'করুণা' উপন্যাস। করুণার বাবা। অনুপকুমার বর্ধিষ্ণু জমিদার। অতিথিশালা নির্মাণ, দেবালয়-প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সৎকাজে ব্যাপৃত। স্বোপার্জিত অপরিমিত অর্থ ও দেশবিখ্যাত যশের অধিকারী। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের ছেলে নরেন্দ্রকে পুত্রস্নেহে পালন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে লেখাপড়ার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে মৃত্যুকালে তাকে তাঁর কন্যার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

অন্নদাপ্রসাদ ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। দামিনীর পিতা। পাটের ব্যবসায়ে তাঁর সমৃদ্ধির সময়ে অন্নদাপ্রসাদ শুধু কুল ভালো দেখে দরিদ্র শিবতোষের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন; এবং কলকাতায় বাড়ি, প্রচুর গহনাপত্র দিয়ে খাওয়া-পরার সংস্থানও করে দেন। এদিকে তাঁর ভরা-পালের ভাগ্যতরী হঠাৎ উলটো হাওয়ার ঝাপটায় কাত হয়ে পড়ল। শিবতোষের সংসারে যখন অপব্যয়, তখন ছোটো-ছোটো ছেলেদের নিয়ে অন্নদাপ্রসাদের দিন চলা দায় হল।

অন্নদাবাবু ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। হেমনলিনীর পিতা। হেমনলিনী শিশু-কালে মাতৃহীনা; সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মতো মেয়েটি তাঁর কোলে মানুষ। রমেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও অন্নদাবাবুর দিক থেকে হেমনলিনীর সঙ্গে তা র

বিবাহ-সম্বন্ধ না-হবার কারণ ছিল। বিলেতে ব্যারিস্টারি-অধ্যয়নরত একটি ছেলের প্রতি তাঁর লক্ষ। কিন্তু বিলেতপ্রত্যাগত ব্যারিস্টার এক ধনী-কন্যাকে বিবাহের উদ্‌যোগ করায় অন্নদাবাবু গেজেটে রমেশের পাশের খবর দেখে তাকে লিখলেন, 'তুমি কেমন আছ এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও সুখী করিবে।' একদিন সকন্যা চড়িভাতি থেকে ফেরার পথে রমেশকে দেখে তিনি গাড়িতে তুলে নিলেন। হেমনলিনীর সঙ্গে তার মেলামেশায় সমাজে পাঁচ-কথা আলোচনা হতে লাগল। অন্নদাবাবু বিশেষ প্রত্যাশার সঙ্গে রমেশের মুখের দিকে চাইতেন। প্রতিবছর পুজোর টিকিট বেরোলে তিনি জব্বলপুরে ভাগনীপতির কাছে বেড়াতে যেতেন। পরিপাক-শক্তির উন্নতির জন্য এ তাঁর সাম্বৎসরিক চেষ্টা। সে-বার রমেশকেও সঙ্গে নেওয়া স্থির হল। রমেশ সমাজের নিন্দার কথা শুনে বললে, 'অন্নদাবাবু, আপনি আমাকে আত্মীয়ের মতো…'। এই ইতস্তত ভাবে অন্নদাবাবু তার বক্তব্য সুগম করে দিলেন: 'তোমার মতো ছেলেকে ঘরের ছেলে করিতে পারা আমারই কি কম সৌভাগ্য!…দেখো-না, তোমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোক অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে, হেমনলিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে…কিন্তু বাপু, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না।'

বিবাহের দু-দিন আগে রমেশ আরও সময় চাইলে। অন্নদাবাবু বাতাহত কদলীবৃক্ষের মতো কেদারায় পড়ে বললেন, 'তুমি আমাকে অবাক করিলে। এ কি মকদ্দমা যে, তোমার সুবিধামতো তুমি দিন পিছাইয়া মুলতুবি করিতে থাকিবে?' পরে বললেন, 'রমেশ, বিবাহের পরে তুমি কোথায় প্র্যাকটিস করিবে…দেখো বাপু, সংসারে আমার এই একটিমাত্র মেয়ে—আমি সর্বদা উহার কাছে-কাছে না থাকিলে সেও সুখী হইবে না…তোমাকে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে।' রমেশের একটা অপরাধের অবকাশ পেয়ে তিনি বড়ো-বড়ো দাবিগুলো আদায় করে নিতে লাগলেন। দিন-পরিবর্তনের কারণ তিনি জানতে চাইলেন না; যা অগোচরে আছে বলপূর্বক তাকে আলোড়িত করতেও তাঁর আগ্রহ ছিল না। আলাপী লোক মাত্রকেই অন্নদাবাবু তাঁর ব্যবহৃত পিলজুলি দিতেন—অক্ষয়কেও দিতেন। সে এই দিন-পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'কারণ তো কিছুই বলিল না—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বিশেষ দরকার আছে।' পরদিন হেমনলিনীর দাদা যোগেন অক্ষয়ের সঙ্গে এসে জানালে: রমেশ বিবাহিত। অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, 'তবে তো আমাদের হেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না।' মূর্ছিতা ভূলুণ্ঠিতা কন্যাকে তিনি বুকের কাছে তুলে বললেন, 'মা, কী হইল মা! ওদের কথা তুমি কিছুই বিশ্বাস করিয়ো না—সব মিথ্যা।' আর অনিষ্ট-আশঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে তিনি মনে-মনে বললেন, 'মা, তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক…তোমাকে সুখী দেখিয়া, সুস্থ দেখিয়া, যাহাকে ভালোবাস তাহার ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর মতো প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া, আমি যেন তোমার মার কাছে

যাইতে পারি।' সারারাত্রি তাঁর নিদ্রা হল না। সকালে উঠে তাড়াতাড়ি হেমনলিনীকে নিয়ে চা খেতে গেলেন। যোগেন তখনও রমেশের কথা উত্থাপন করায় কন্যার অশ্রুসিক্ত মুখ বুকে চেপে বললেন, 'চলো হেম, আমরা উপরে যাই।'

একদিন অপরাহ্নে হেমনলিনীর সঙ্গে নিভৃতে চা খাবার আশায় অন্নদাবাবু তার সন্ধানে ছাদে এলেন। ধীরে-ধীরে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'হেম, এই সময়ে তোর মা যদি থাকিতেন! আমি তোর কোনো কাজেই লাগিলাম না।' হঠাৎ যোগেন সেখানে আসাতে হেমনলিনীর লজ্জানিবারণের জন্য তিনি চা খাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। বলা বাহুল্য, চায়ের পেয়ালার ধ্যানমূর্তি বার-বার তাঁকে প্রলুব্ধ করছিল এবং হেমনলিনীর অনুরোধে তখনই টেবিলের দিকে চললেন। যোগেন অক্ষয়ের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহের প্রস্তাব করায় অন্নদা চমকে উঠলেন : 'পাগল হইয়াছ যোগেন? অক্ষয়কে হেম বিবাহ করিবে!'

যোগেন হেমনলিনীকে বুঝিয়ে বলতে চাইলে ব্যস্ত হয়ে তিনি নিষেধ করলেন। যোগেনের অনুরোধে তাকে নিজেই বলতে গেলেন; কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না। পরদিন হেমনলিনী সকাল-সকাল চা খেতে ডাকলে তাঁর বুঝতে বাকি রইল না—অক্ষয়কে এড়ানোর জন্যই এই ব্যস্ততা। কন্যার সম্বন্ধে তাঁর বোধশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠছিল। তাড়াতাড়ি নিচে এসে চাকরকে বকাবকি করে তিনি চা খাওয়া শেষ করলেন। যোগেন আরও কিছুক্ষণ বসতে অনুরোধ করায় হঠাৎ তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন : 'তোমাদের কেবলই জবর্দস্তি।...আমি অনেক দিন নীরবে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু আর এরূপ চলিবে না। মা হেম, কাল হইতে উপরে আমার ঘরে তোতে-আমাতে চা খাইব।' চায়ের টেবিলে নিজের শান্ত ভাব নষ্ট হওয়াতে অন্নদাবাবুর মনে ক্ষোভ ছিল। যোগেন তাঁকে নলিনাক্ষের বক্তৃতায় নিয়ে যেতে চাইলে তখনই সম্মত হলেন। কয়েকদিনের মধ্যে নলিনাক্ষের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। কাশীযাত্রার প্রাক্কালে নলিনাক্ষ বিদায় নিতে এলে অন্নদাবাবু বললেন, 'এই কয়দিনে আমরা আপনার কাছে যে উপকার পাইয়াছি তাহার ঋণ কোনোকালে শোধ করিতে পারিব না।...আমি আশ্চর্য এই দেখিলাম, আমাদের একটা-কিছুর বড়োই প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সেটা যে কী আমরা জানিতাম না; ঠিক এমন সময়েই কোথা হইতে আপনাকে পাইলাম এবং দেখিলাম আপনাকে নহিলে আমাদের চলিত না।'

যখন শরীর ভালো ছিল, অন্নদাবাবু নানারকম বটিকা ব্যবহার করতেন। পরে নিজের অস্বাস্থ্য গোপন করারই চেষ্টা করতেন। সে-রাত্রে তাঁর শূলবেদনার মতো হল। ডাক্তার বায়ুপরিবর্তনের পরামর্শ দিলে হেমনলিনীকে সঙ্গে নিয়ে এলেন কাশীতে। প্রতিদিন অপরাহ্নে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি নলিনাক্ষের বাসায় আসতেন। নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরী একদিন নলিনাক্ষের সঙ্গে

হেমনলিনীর বিবাহ-প্রস্তাব করায় উৎফুল্ল হয়ে এসে তাঁকে সেই আনন্দ-সংবাদ জানালেন। কিন্তু হেমনলিনী এতে আপত্তি করায় একেবারে দমে গিয়ে স্ত্রী-প্রকৃতির অচিন্তনীয় রহস্য এবং হেমনলিনীর জননীর অভাব মনে-মনে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় হেমনলিনী জারকচূর্ণমিশ্রিত দুগ্ধ পান করাতে এলে বললেন, 'মা হেম, আমার বয়স হইয়াছে...দেখো মা, পৃথিবীতে একটা আশা চূর্ণ হইল বলিয়াই যে আর-সমস্ত দুর্মূল্য জিনিসকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে, এমন কোনো কথা নাই।'

হেমনলিনীর আশীর্বাদ সম্পন্ন হল। এমন সময়ে রমেশের সঙ্গে যোগেন এলে তিনি অসহিষ্ণুভাবে বিদায় করলেন। অনতিপরে রমেশের এক পত্রে জানা গেল : নলিনাক্ষের পরিণীতা কমলা তার আশ্রিত ছিল। সংসারের দুরূহতায় বিরক্ত অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন।

অন্নপূর্ণা ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের স্বামী-সন্তানহীনা কাকী। অন্নপূর্ণা তাঁর অনাথা বোনঝি আশাকে মহেন্দ্রের পত্নীরূপে নিজের কাছে এনে সুখী দেখতে ইচ্ছুক ছিলেন। মাতৃস্নেহসিক্ত মহেন্দ্রের বিবাহের প্রতি বিমুখতা তাঁর মনে হয় অস্বাভাবিক। সেদিন অন্নপূর্ণা যা বলেছিলেন তার মধ্যে স্নেহ ছাড়া কিছুই ছিল না—কিন্তু বড়ো-জা রাজলক্ষ্মীর ভর্ৎসনায় তাঁকে নীরবে অশ্রুপাত করতে হল। সারাদিন কিছুই স্পর্শ করেন নি। অপরাহ্ণে মহেন্দ্র কলেজ থেকে ফিরে প্রসাদ চাইলে অশ্রু গোপন করে নিজে খেয়ে তাকে খাওয়ালেন। মহেন্দ্র তার বন্ধু বিহারীর সঙ্গে আশার বিবাহের প্রস্তাব করায় বললেন, 'আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে।' পরে মহেন্দ্র নিজেই আশাকে পছন্দ করায় মার সঙ্গে তার বিরোধ উপস্থিত। বড়ো-জা রাজলক্ষ্মীকে অন্নপূর্ণা কিছুকাল ধৈর্য ধরে মৌন থাকতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের জিদ ও রাজলক্ষ্মীর অসহিষ্ণুতায় তাড়াতাড়ি সেই বিবাহ সম্পন্ন হল।

বিবাহের পরে অন্নপূর্ণা ইচ্ছা করেই দূরে সরে রইলেন। ঘরের কাজে আশাকে নিয়োজিত হতে দেখে মহেন্দ্র ক্ষুব্ধ হলে বললেন, 'মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।' তবু বড়ো-জার বাক্যবাণে বারংবার বিদ্ধ হয়ে তাঁকে বলতে হল, 'দিদি, তোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।' দুঃখ করে আশাকে বললেন, 'আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম।'

মহেন্দ্র-আশার মত্ততা ও রাজলক্ষ্মীর গঞ্জনায় ক্ষতবিক্ষত বিরত অন্নপূর্ণা অবশেষে তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের বাড়ি চলে গেলেন; কিন্তু তাদের জন্য সেখানেও তিষ্ঠোতে পারলেন না। রাজলক্ষ্মী বিহারীর সঙ্গে পিত্রালয়ে গেলে

তিনিও তীর্থযাত্রার পথে সেখানে এসে বললেন, 'দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও'ষে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী যাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আসিলাম। জ্ঞানে-অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ,' (বলতে-বলতে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল)—'সে ছেলেমানুষ, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক সে তোমার।' বিহারী তাঁকে ফেরাবার চেষ্টা করলে বললেন, 'আমাকে আর ফিরাইবার চেষ্টা করিস নে, বিহারি—তোরা সুখে থাক… আমি না-গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।' তাকে একজোড়া সোনার বালা দিয়ে বললেন, 'বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাখো—বউমা যখন আসিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।' বিদায়কালে একখানা কাগজ দিলেন রাজলক্ষ্মীর হাতে : 'শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মাসে-মাসে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়ো।'

কিছুকাল পরে উদ্‌ভ্রান্ত মহেন্দ্র তার মঙ্গলময়ী কাকিমার কাছে উপস্থিত। সংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে মহেন্দ্রকে দেখে স্নেহে আপ্লুত হলেন ; তেমনি ভয় হল : বুঝি আশাকে নিয়ে মার সঙ্গে আবার কোন বিরোধ ঘটেছে। শিশুকাল থেকে মহেন্দ্রের সকল সন্তাপে তিনিই সান্ত্বনা দিয়ে এসেছেন ; কিন্তু বিবাহের পর থেকে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা সংকটে কোনো সান্ত্বনা পর্যন্ত দিতে তিনি অক্ষম। মহেন্দ্র মার সম্বন্ধে কোন কথা তুলল না দেখে তাঁর আশঙ্কা অন্য পথে গেল—তবে কি আশার সম্বন্ধে তার টান ঢিলে হয়ে আসছে ? জিজ্ঞাসা করলেন : 'হাঁ রে মহিন, আমার মাথা খা, ঠিক করিয়া বল দেখি, চুনি কেমন আছে।…তোরা কি এখনো তেমনি ছেলেমানুষ আছিস, না কাজকর্মে-ঘরকন্নায় মন দিয়াছিস।' পরে বললেন, 'বিহারী কী করিতেছে।…সে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।' বিহারীর বিবাহের কোন উদ্‌যোগ নেই শুনে বিমর্ষ হয়ে ভাবতে লাগলেন : তবে কি আশার দিকে এখনো তার মন পড়ে আছে ?

মহেন্দ্র ফেরার পরে এল আশা। অন্নপূর্ণা শুনেছিলেন : বিধবা বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর আশ্রিত। তাই শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'হাঁ রে চুনি, তুই যে তোর সেই চোখের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে, তার মতন গুণবতী মেয়ে আর জগতে নাই ?…বাড়ির আর-সকলে তাহাকে কে কী বলে শুনি।—মহেন্দ্রের মত কী।' আশার কথায় তিনি আশ্বস্ত হলেন। বিহারীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে আশা গম্ভীর হয়ে রইল—মহেন্দ্র তার উপরে সন্তুষ্ট ছিল না। অন্নপূর্ণা ভাবতে লাগলেন, 'অমন সোনার ছেলে বিহারী, এরই মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে…আহা, আমার বিহারী যদি এমন-কিছু করিয়া থাকে…তবে সে তাহা অনেক দুঃখ পাইয়াই করিয়াছে।' অন্নপূর্ণার স্নেহ-সিংহাসনে

বিহারীই পুত্রের আদর্শরূপে বিরাজ করত। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি আহ্নিকে বসেছেন। সহসা বিহারীর আগমনে আশা চমকিত। অন্নপূর্ণা তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'বিহারী!' জননী যেমন গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করে—তেমনি তিনি কিছুই না জেনে তাকে অন্ধকারে বিসর্জন করলেন।

একদিন আশা প্রশ্ন করলে : মেসোমশায়কে কি তাঁর মনে পড়ে? অন্নপূর্ণা বিধবা হয়েছিলেন এগারো বছর বয়সে—স্বামীর মূর্তি তাঁর কাছে ছায়ার মতো। তবে তিনি কার কথা ভাবেন—আশার এই প্রশ্নে হাসলেন : 'আমার স্বামী এখন যাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।' কিন্তু স্বামী যদি সন্তুষ্ট না হন? অন্নপূর্ণা আশার মস্তক চুম্বন করে বললেন, 'চুনি...তোর এই মাসিও একদিন তোর বয়সে তোরই মতো সংসারের সঙ্গে মস্ত করিয়া দেনা-পাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বসিয়াছিল। তখন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন।...পদে-পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ্য হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমস্তই ব্যর্থ হইয়াছে...আজ দেখিতেছি আমার কিছুই নিষ্ফল হয় নাই।'

অনতিকাল পরে অন্নপূর্ণা রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতা এবং বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের অন্তর্ধানের সংবাদ পেলেন। অবিলম্বে কলকাতায় এসে তিনি রাজলক্ষ্মীর সেবার ভার নিলেন। পরে বালিতে এসে বিহারীকে নিয়ে গেলেন, এবং তারই সাহায্যে ফিরিয়ে আনলেন মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে। রাত্রে আশাকে নিজের ঘরে ডেকে বললেন, 'চুনি, যদি সুখী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিস নে। অন্যকে দোষী করিয়া যেটুকু সুখ, দোষ মনে রাখিবার দুঃখ তাহার চেয়ে ঢের বেশি।...যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে—আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস, তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি।...তুই যদি না ভুলিস, তবে অন্যকেও স্মরণ করাইয়া রাখিবি!...আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর, যেন সে কখনো তোর কোন অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার দ্বারা তোর অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই।...মাঝে-মাঝে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তখন তোর মনে কী হইবে, তাহা আমি জানি—সে সময়ে তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিস নে।'

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে আশাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি বিনোদিনীকে নিজের কাছে নিয়ে গেলেন।

অপূর্ব ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। আশালতার বাবা। অপূর্ব দরিদ্র ছিলেন।

অবনীশ দত্ত ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যলতার পিতা। কোনো

পাশ্চমী কলেজের অধ্যক্ষ। অবনীশের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়। মাতৃহীন মেয়ে লাবণ্যের মধ্যে সেই শখটির পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। লাবণ্যকে নিজের লাইব্রেরির চেয়েও ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল : জ্ঞানের চর্চায় মন নিরেট হয়ে উঠলে উড়ো-ভাবনার গ্যাস উঠতে পারে না ; লাবণ্য পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চিরদিন গাঁটবাঁধা হয়ে রইল। অবনীশের আর-একটি স্নেহের পাত্র ছিল শোভনলাল। ভবিষ্যতে সে নাম করতে পারবে এবং তার প্রধান কারিগরদের ফর্দে নিজের নামটাই সকলের ওপরে থাকবে—এই গর্ব ছিল মনে।

সহসা শোভনের বাপ অধ্যাপকের ঘরে ছেলেধরা-ফাঁদের আবিষ্কার করায় শোভনের আসা বন্ধ হল। অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই থাকলেও মনসিজের প্রভাব অলঙ্ঘনীয়। তিনি তখন সাতচল্লিশ। সেই নিরতিশয় দুর্বল বয়সে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ও পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে একটি বিধবা হৃদয়ে প্রবেশ করল। বিবাহে একমাত্র বাধা ছিল লাবণ্যের প্রতি স্নেহ। এতদিন পরে মনে পরিতাপ দেখা দিল যে, শোভনলালকে হয়তো তাঁর মেয়ে ভালোবাসত—শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসাই অস্বাভাবিক। তখন সাধারণভাবে বাপ-জাতের উপরেই রাগ হল। এমন সময় রিসর্চের জন্য শোভনের কয়েকটি বইয়ের প্রয়োজন জেনে তাকে আগের মতোই ডেকে পাঠালেন।

লাবণ্যের ক্রমাগত অনুরোধে অবনীশ বিবাহ করলেন। সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ তিনি মেয়ের জন্য স্বতন্ত্র রেখেছিলেন। কিন্তু লাবণ্য সে-টাকা নিতে অস্বীকৃত হলে তাঁর দুঃখের সীমা রইল না।

অবিনাশ ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার প্রধান শিষ্য। গোরার মুখ থেকে অবিনাশ যা শুনত তাই নিজের বুদ্ধির দ্বারা ছোটো এবং নিজের ভাষার দ্বারা বিকৃত করে প্রচার করত। গোরার পরম বন্ধু বিনয়ের প্রতি অবিনাশের একটা ঈর্ষার ভাব ছিল —তাই জো পেলেই তার সঙ্গে সে নির্বোধের মতো তর্ক করত। গোরা বিনয়ের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হলে মনে করত—তারই যুক্তি যেন গোরার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে। গোরা গ্রাম্য ভারতবর্ষের পরিচয়লাভের জন্য বেরোলে অবিনাশ সঙ্গ নিয়েছিল—কিন্তু তার নির্দয় উৎসাহের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে অসুস্থতার ছল করে কলকাতায় ফিরল। ব্রাহ্মসমাজের ললিতার সঙ্গে বিনয়ের কুৎসা কানে গেলে সে গোরার মা আনন্দময়ীকে খবর দিলে : ললিতার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির। ব্রাহ্মসমাজের যে-লোকের কাছে সংবাদ পেয়েছে, প্রমাণস্বরূপে তার বিশ্বস্ততার ব্যাখ্যাও করলে।

গোরা তখন জেলে। তার বেরোবার দিন ভারি-একটা অভিনন্দন করে অবিনাশ তাক লাগিয়ে দেবার প্ল্যান করছিল। সেই অপূর্ব ব্যাপারের সমস্ত

কৃতিত্ব নিজে নেবার জন্য বিনয়কেও মন্ত্রণার মধ্যে নেয় নি। খবরের কাগজের জন্য বিবরণ ঠিক করাও ছিল। গোরা বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ছেলের দল চিৎকারশব্দে গান জুড়ে দিলে। অবিনাশ শালের ভিতর থেকে বের করলে কলাপাতায়-মোড়া কুন্দফুলের মালা। অন্য-একজন সোনার-জলে ছাপানো কাগজ থেকে দম-দেওয়া আর্গিনের মতো মিহি সুরে কারামুক্তির অভিনন্দন পড়তে লাগল। গোরার বিরক্তি দেখে অবিনাশ ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'এই এক-মাস-কাল প্রতিমুহূর্ত তুষানলে আমাদের বুকের পাঁজর দগ্ধ হয়েছে।' গোরা গাড়িতে উঠে পড়লেও সে দমল না। পরদিন দলবলসহ তার বাড়ি এসে আরও উচ্ছ্বসিত বাক্যে পূর্বদিনের প্রত্যাখ্যান-ব্যাপার সকলের কাছে বর্ণনা করতে লাগল: 'গৌরমোহনবাবুর প্রতি আমার ভক্তি অনেক বেড়ে গেছে; এতদিন আমি জানতুম উনি অসামান্য লোক, কিন্তু কাল জানতে পেরেছি উনি মহাপুরুষ।' সহাস্যমুখে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে চেয়ে গোরার কথাগুলির চমৎকারিত্বে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে একেবারে গোরার পায়ের ধুলো নিতে উদ্যত। শেষে বললে, 'গৌরমোহনবাবু...আপনাকে নিয়ে একদিন আমরা সকলে মিলে আহার করব এই আমরা পরামর্শ করেছি—এটিতে আপনাকে সম্মতি দিতেই হবে।' গোরা তৎপূর্বে প্রায়শ্চিত্তের সংকল্প করায় দুই চক্ষু দীপ্ত করে বললে, 'এ কথা আমাদের কারও মনে উদয় হয় নি, কিন্তু হিন্দুধর্মের কোনো বিধান গৌরমোহনবাবুকে কিছুতে এড়াতে পারবে না।' স্থির হল: প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষেই সকলে মিলে আহার করবে—দলের লোক খরচা বহন করবে। অবিনাশ উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ছাঁদে হাত নেড়ে বলতে লাগল, 'বেদ-উদ্ধারের জন্যে আমাদের এই পুণ্যভূমিতে অবতার জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি হিন্দুধর্মকে উদ্ধার করবার জন্যেই আজ আমরা এই অবতারকে পেয়েছি।...বলো ভাই, গৌরমোহনের জয়।'

বিনয় ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের সংকল্প করায় অবিনাশ একেবারে ছুটে এসে গোরাকে সংবাদ দিলে। গোরার দাদা মহিম তখন বিনয়ের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে কন্যাদায়-মোচনের জন্য তাকেই ধরলেন। অবিনাশ আনন্দে নেচে উঠল—সে তার ভাগ্য, সে তার গৌরব। মহিম টাকাকড়ির কথা জিজ্ঞাসা করায় সে কানে হাত দিলে। কিন্তু তার বাপের কাছে গেলে তিনি এমনই আরম্ভ করলেন যে, মহিমেরই কানে হাত ওঠবার জো হল। দেখা গেল, সে-বিষয়ে অবিনাশ অত্যন্ত পিতৃভক্ত—পিতা হি পরমং তপঃ। এদিকে প্রায়শ্চিত্তের দিন স্থির করে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত অধ্যাপক-পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ পাঠানো হল। অবিনাশ দলের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করলে—সভায় সমস্ত পণ্ডিতদের দিয়ে গোরাকে 'হিন্দুধর্মপ্রদীপ' উপাধি দেওয়া হবে, এবং সংস্কৃত কয়েকটি শ্লোক লিখে সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নাম স্বাক্ষর করিয়ে, সোনার জলে ছাপিয়ে, চন্দনকাঠের

বাক্সের মধ্যে তাকে উপহার দেওয়া হবে।

গোরার পিতা কৃষ্ণদয়াল বললেন, 'তোমরাই বুঝি সকলে মিলে গোরাকে নাচিয়ে তুলেছ।' অবিনাশ বললে, 'বলেন কী, আপনার গোরাই তো আমাদের সকলকে নাচায়। বরঞ্চ সে নিজেই নাচে কম।' কৃষ্ণদয়ালকে প্রায়শ্চিত্তের বিপক্ষ দেখে সে ভাবলে : বুড়োর এ কী-রকম জেদ! ইতিহাসে বড়ো-বড়ো লোকের বাপেরা নিজের ছেলের মহত্ত্ব বুঝতে পারে নি—কৃষ্ণদয়াল সেই জাতেরই বাপ। অবিনাশ কৌশলী লোক ; যেখানে বাদ-প্রতিবাদ করে ফল নেই, এমন-কি মরাল-এফেক্টেরও সম্ভাবনা অল্প—সেখানে সে বৃথা বাক্যব্যয় করবার লোক নয়। কাজেই আপাতত নিষ্কৃতি পাবার জন্য বললে, 'বেশ তো মশায়, আপনার যদি মত না থাকে তো হবে না। তবে কিনা, উদ্‌যোগ-আয়োজন সমস্তই হয়েছে... তা নয় এক কাজ করা যাবে—গোরা থাকুন, সেদিন আমরাই প্রায়শ্চিত্ত করব—দেশের লোকের পাপের তো অভাব নেই।'

অবিনাশ ঘোষাল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ও কুমুদিনীর ছেলে।

অমরসিং ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের কথিত গল্পের চরিত্র।

অমরেশ ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিতের কাকা। জেলার সবচেয়ে বড়ো উকিল।

অমিত রায় ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে অমিট রয়, রে অথবা রায়ে। বি. এ.-র কোঠায় পা দেবার আগেই অমিত অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়—পরীক্ষা দিতে এবং না-দিতে-দিতে সেখানে সাত বছর কাটে। বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার ; তাঁর ইচ্ছা ছিল, একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রং পাকা করে ধরে। দেশে ফিরে অমিত প্রফেসারি, পরে ব্যারিস্টারি করত। পৈতৃক সম্পত্তির প্রাচুর্যে আয়ের জন্য গরজ ছিল না—বার-লাইব্রেরিতে বসে দাবা খেলত।

বেশে-ভূষায়-ব্যবহারে অমিতের নেশা স্টাইলে। 'দাড়িগোঁফ-কামানো... চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি-ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল...মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, একটু ঠুন করে ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে।' বেশভূষা পাঁচজন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করার জন্য। পরনে 'ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো... পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ-কাঁধ থেকে বোতাম ডান-দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা ; কোমরে...জড়ি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে...বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে

'শেষের কবিতা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি

ওর ট্যাঁকঘড়ি ; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওআলা মাদ্রাজি চাদর বাঁ-কাঁধ থেকে হাঁটু-অবধি ঝুলতে থাকে ; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্নৌ-টুপি, সাদার উপর সাদার কাজ-করা।' বন্ধুদের মতে : এই সাজ আলুথালু—ইংরেজি মতে ডিস্‌টিংগুইশ্‌ড।

'অমিতের দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা মনের জোরেই, একেবারে বেহিসাবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে'। পার্টিতে যায়, তাস খেলে, বাজিতে হারে ; যে-রমণীর গলা বেসুরো দ্বিতীয়বার তাকে গাইতে বলে ; বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কোন্ দোকানে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গে পক্ষপাতের সুর লাগায়, অথচ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিবাহের প্রসঙ্গ উঠলে বলে, 'মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী...আমি মনে-মনে যে-মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে।...সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।'

সাহিত্যেও অমিত স্টাইলের ভক্ত। বলত, 'ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী ...যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশান তাদেরই।...বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নিচে ব্যাবসাদার নাচওআলির দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই।...দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই-কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা...শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বেদস্তুর বলে জানত।' যা-কিছু সকলের অনুমোদিত অমিত তার বিপরীত। একদা বালিগঞ্জের সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের সম্বন্ধে সভাপতির অভিভাষণে সে বলে বসল : 'কবিমাত্রেরই উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা। পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ-কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই।...কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই। ...রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ড্‌সওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে।...ও যদি মানে-মানে নিজেই সরে না-পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন...কিছুকাল ভক্তরা দেবে মালাচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করবে, তারপরে আসবে তাকে বলি-দেবার পুণ্য দিন—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভ লগ্ন। আফ্রিকার চতুষ্পদ দেবতার

পূজোর প্রণালী এইরকমই।...ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ-বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে।...এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুত নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ...নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো...বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো, খোঁচাওআলা কোণওআলা গথিক-গীর্জের ছাঁদে...তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজ-মহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।' নমুনা-স্বরূপে একটা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে শোনালে নিবারণ চক্রবর্তীর রচনা—'আনিলাম / অপরিচিতের নাম / ধরণীতে, / পরিচিত জনতার সরণীতে। / আমি আগন্তুক, / আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।' একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী আগে থেকেই গড়ে তুলে সে পকেটে করে এনেছিল। সে-সম্বন্ধে বললে, 'সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা, বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত।... আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা-হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি-মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।'

গরমের সময় অমিতের বোনেরা গেল দার্জিলিঙে। অমিত গেল শিলঙ পাহাড়ে—কারণ, সেখানে কন্যাদায়ের বন্যা প্রবল নয়। ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর, তাই গল্পের বই ছুঁল না; লেখকের সঙ্গে মতান্তরের আশায় খুলে বসল সুনীতি চাটুজ্যের শব্দতত্ত্ব। সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে আষাঢ়ের অভ্যাগম হল। অমিত হাইলাণ্ডারি কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলা-ওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা আর সোলার টুপি চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ল গাড়ি হাঁকিয়ে। আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্য মোটর-দূতটাই প্রশস্ত। তার মনে-মনে সংকল্প, পরের বছরে মেঘদূত-বর্ণিত পথে যাত্রার। বাঁকের মুখে ব্রেক কষতে-কষতে হঠাৎ এসে পড়ল অন্য-একটা গাড়ির উপরে। গাড়ি থেকে নামল একটি মেয়ে—ড্রয়িংরুমে অন্য-পাঁচজনের মাঝখানে সে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। অমিত পাওনা শাস্তির অপেক্ষায় তার সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ি ফিরে এসে লিখলে তার লম্বা খাতাটিতে—'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি, / আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।... ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য, / হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত।' এতদিন অমিত যে-সুন্দরীদের দেখেছিল, লাবণ্যের সৌন্দর্য তাদের থেকে ভিন্নজাতের। অমিতের নিজের মধ্যে বুদ্ধি ছিল ক্ষমা ছিল না, বিচার ছিল

ধৈর্য ছিল না—তাই লাবণ্যের অবিচল শান্তির রূপে মুগ্ধ হল। লাবণ্য তখন যোগমায়ার কন্যা সুরমার গৃহশিক্ষয়িত্রী। অক্সফোর্ডে ডনের কাব্য ছিল অমিতের আলোচ্য বিষয়। সেখানে সেই কাব্য-সংগ্রহ দেখে লাবণ্যের মন তাকে স্পর্শ করলে। সে মিশুক মানুষ, সাহিত্যরসিক—এই খ্যাতির সুযোগে বাঁধা নিমন্ত্রণ পেল। আলাপের নির্দিষ্ট কালটুকু প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে সুরমার ভাই যতিশংকরের কাছে প্রতিশ্রুত হল ইংরেজি পড়াতে। প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়—অবশেষে ভদ্রতার অনুরোধে সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনটাও অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত।

সকালে সময়টা ঘড়ির ভদ্র-দাগটাতে পেঁছনোর অপেক্ষায় সে পথে এসে বসে থাকত। সেদিন পথে লাবণ্যকে দেখে ছুটতে-ছুটতে তার পাশে উপস্থিত : 'জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন।...যে-হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা ঊর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে।... কল্পনা করুন-না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে-বনে ধ্বনিত হল...ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট।... আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও।...আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম...For God's sake hold your tongue/and let me love !' অতঃপর লাবণ্যকে অনুরোধ করলে ঝরনাধারার পাশে নানা রঙের ছ্যাতলা-পড়া একটা পাথরে এসে বসতে—'দেখুন আর্য, আমাদের দেশের দুটো ভাষা—একটা সাধু, আর-একটা চলতি। কিন্তু এ-ছাড়া আরও একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল...এইরকম জায়গার জন্য।...সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়।...রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে, / যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ? ...করে নেব জয় / সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী ; / দৃপ্ত বলে লব টানি / শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে / নির্দয় আলোতে।'—বলতে-বলতে অসংকোচে ধরলে তার হাত চেপে।

যোগমায়ার কাছে নিজের ঘটকালি করতে এসে পাত্রের নামরূপবিদ্যা সম্বন্ধে কত হেঁয়ালি। যতিশংকর গতিক দেখে ছুটি চাইতে বললে, 'জরুরি কাজটাকে এক-কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমীতিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপুজায় বিলম্ব কোরো-না ভাই।' লাবণ্যকে বললে, 'মাসিমার মত পেয়েছি।...যদি আপত্তি না-কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।...তোমাকে ডাকব—বন্যা।...এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো...এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।' লাবণ্যের হাতখানি নিজের মুখে বুলিয়ে সে বলতে লাগল : 'আজ এই-ক্ষণে ঠিক এই-মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য

লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকেই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন।...বাইরে-বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে-করতে প্রদক্ষিণ করে চলে...হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লন্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই-আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এই-রকম।...আসলে সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা।'

অমিতের বাসার মেয়াদ শেষ হলে সে আশ্রয় নিলে যোগমায়ার বাড়ির কাছে একটা ভাঙা-বাড়িতে। একদা বর্ষণশেষে ঘরের মধ্যে অসংগত বৃষ্টিবিন্দুর প্রাদুর্ভাবে টেবিলের উপর খবরের কাগজ চাপিয়ে টেবিলের নিচে গুহা বানিয়ে সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছে। সে-সময়েই তার অস্তিত্বকে মনে হয়েছিল অর্থবহ—'জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলার শিলঙ পাহাড়ের মতো।' সহসা লাবণ্য-সহ যোগমায়ার আবির্ভাবে ব্যস্তসমস্তভাবে বললে, 'একি অন্যায়, মাসিমা।... শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার।...ম্যাথু আর্নল্ড্ কাব্যকে বলেছেন, ক্রিটিসিজ্‌ম্ অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই, লাইফ্‌স্ কমেন্টারি ইন ভার্স।...পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা রিক্ত হাতে চাস নে তারে ; / সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।' যোগমায়ার হাত থেকে লাবণ্যের হাতখানি পেয়ে অমিত প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। তারপরেই বকুনির মনসুন নামল—অমিতের ভাষায়, তার 'পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি'।

অঘ্রানে বিবাহ স্থির হল। অমিতের বিবাহোত্তর জীবনের খসড়া হল এই ঃ 'ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে।... দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই।...ললিতকলা-বিধিটা দাম্পত্যেরই।.. মনে যে-ছবিটা আছে, বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ডহারবারের ওই দিকটাতে। ছোটো-একটি স্টীম-লঞ্চ করে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়। ...বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয় ; কিন্তু এই শক্তটাই আমের আশ্রয়।......তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।...গঙ্গার ধার...ওরই দক্ষিণ-ধারে ছ্যাতলা-পড়া বাঁধানো ঘাট...সেই ঘাটে...আমাদের ছিপছিপে নৌকাখানি।...ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।...একটি দীপ আমার বাড়ির চূড়োয় বসিয়ে দেব। মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল।...অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না। ...নিমন্ত্রণচিঠি চাই।...কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।'

অবশেষে শিলঙ পাহাড়কে যুগল-প্রণাম জানাতে গিয়ে অমিত অন্তসূর্যের

আভায় লাবণ্যের মাথাটি টেনে নিলে বুকের মধ্যে। নিজের শেষ-কথাটি বললে রবি ঠাকুরের কবিতায়। পরে বললে নিবারণ চক্রবর্তীর জবানিতে : 'সুন্দরী তুমি শুকতারা / সুদূর শৈলশিখরান্তে, / শর্বরী যবে হবে সারা / দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।' পরদিন অমিতের কলকাতা যাওয়ার কথা—হঠাৎ সেখানে কেটি মিত্তিরের আবির্ভাব। অক্সফোর্ডে একদা তাকে আংটি-পরানোর স্মৃতি কখন তার মন থেকে গিয়েছিল খসে। লাবণ্যের কাছে এসে অমিত উদ্বেগ গোপন করতে পারল না। বিদায়কালে স্তব্ধ হয়ে বললে, 'বন্যা, ওই চেয়ে দেখো।...বাড়িটা কিনে নিয়েছি।...বিয়ের পরে ওই বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ, সব মিলিয়ে গেছে ওই বাড়িটার মধ্যে।' তার পরেই আবার ভেসে উঠল তার চোখে অন্তহীন সপ্তপদীগমনের স্বপ্ন। লাবণ্য বুঝেছিল : অমিতের মনের গড়নটা সাহিত্যিক। তার জমানো-কথা গলিয়ে নিতেই তাকে প্রয়োজন; ঘর বাঁধবার মানুষ সে নয়। লাবণ্যের অনুরোধেই অমিতকে তার দলের সঙ্গে যেতে হল বেড়াতে—মেয়াদ-অন্তে ফিরে এসে সে আর লাবণ্যের দেখা পেল না।

অতঃপর কেটি মিত্তিরের বর্ণ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়ে কখনো অমিত নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে বেড়াতে লাগল। নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটিকে শোনাতে লাগল রবি ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'। অমিত কলকাতায় এলে রাষ্ট্র হল : কেতকীর সঙ্গে তরে বিবাহ। একদা যতিশংকরের প্রশ্নে কুণ্ঠিত হয়ে সে বললে, 'খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।...যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।...যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান-দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ-দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।...কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল—প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।' যতির হাতেই সে লাবণ্যকে একটা চিঠি পাঠালে : 'হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে··তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ-কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে।...তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন। / অন্তরে অলক্ষ্যালোকে তোমার অন্তিম আগমন। ...জীবন আঁধার হল, সেই ক্ষণে পাইনু সন্ধান / সন্ধার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান। / বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে / পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।'

অমূল্যচরণ ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। সন্দীপের বালক-ভক্ত। অমূল্য তার বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। 'কাঁচ মুরলী বাঁশিটির মতো সরল এবং সরস'—সন্দীপের শেখানো-বুলি তার মূলমন্ত্র। স্বদেশী আন্দোলনে স্থানান্তরে এসে নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার প্রথম দৃষ্টিতেই তার হৃদয়ের শিখা উঠল জ্বলে। দেশের কাজে বিমলা স্বামীর টাকা চুরি করলে। সেই মোড়কগুলো দেখে অমূল্য কিছু ক্ষুণ্ণ হল ; কিন্তু বিমলার লজ্জা তখনই তার বুকে বিঁধল। পরে গিনিগুলো দেখে দীপ্তমুখে তার পায়ের ধুলো নিলে ; ছলছল চোখে বললে, 'এত টাকা তো আমাদের দরকার নেই সন্দীপবাবু। হিসেব করে দেখেছি, সাড়ে-তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।' বিমলার এই ঔদার্যে তার হৃদয়পাত্রটি স্নিগ্ধ সুধায় ভরে উঠল—দিদির মুখের দিকে চেয়ে দুই হাত জোড় করে বললে, 'বন্দেমাতরং'।

গিনিগুলো বিমলাকে ফেরত দেবার জন্য অমূল্য সন্দীপকে ধরে পড়ল। তার নানা ছলে-আশ্বাসে ফরমাশ খেটেও ব্যর্থ হল। শেষে সমস্ত রাত্রি পুকুরঘাটের চাতালে বসে জপতে লাগল, বন্দেমাতরম্। বিমলা তার গহনা বিক্রি করে ছ-হাজার টাকা আনতে অনুরোধ করায় বললে, 'না দিদি, না, গয়না বিক্রি-বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ-হাজার টাকা এনে দেব।...দেখো দিদি...বলতে পারি নে এ কী লজ্জা।...দেশের জন্যে মরতে ভয় করি নে, মারতে দয়া করি নে—এই শক্তি পেয়েছি ; কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারছি নে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত'। বিমলা তাকে মার কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করায় বললে, 'দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি।'

সে-রাত্রে অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, মুখের অর্ধেকে ছিল কালো মুখোশ। হঠাৎ বুল্‌স্-আই লণ্ঠনের আলো ফেললে চকুয়া কাছারির নায়েবের মুখে—পিস্তলের আওয়াজ করতেই সে গেল মূর্ছা। অমূল্য সিন্দুক খুলিয়ে ছ-হাজার টাকা নিয়ে কাছারির এক ঘোড়ায় চড়ে অদৃশ্য। পরদিন সন্দীপের কাছে এসে নোটের বিনিময়ে গিনিগুলো ফেরত চাইলে। কিন্তু গহনাগুলিও তার হস্তগত হওয়াতে শুষ্ক মুখ, উস্কখুস্ক চুল, চোখের কোণে কালি, সে বিমলার কাছে উপস্থিত : 'দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল, সন্দীপবাবু তা জানতেন, তাই উনি...'। বলতে-বলতে সে হিংস্র হয়ে উঠল : 'দেখুন সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করি নে'। বাক্স ফেরত পেয়ে সে বার করলে টাকার পুঁটলি। বিমলা দুঃখিত হল : সন্দীপও তার এমন ক্ষতি করতে পারে নি। অমূল্য উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই তো ওকে চিনতে পেরেছি।...দিদি, ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে।'

রাত্রে কাছারিতে আবার টাকা ফেরত দিতে গিয়ে অমূল্য ধরা পড়ল। পরদিন দারোগার সঙ্গে রাজবাড়িতে এসে বিমলার তৈরি পিঠে খেল সে। পরে তার পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে বললে, 'তোমার আদেশ পালন করে এসেছি দিদি, টাকা ফিরিয়ে দিয়েছি।...ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েছি।... সব খাই নি, কিছু রেখেছি—তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে বলে এইগুলি জমানো আছে।'

স্বদেশীর উৎপীড়নে মুসলমান প্রজাদের নারী-নির্যাতনের সংবাদে অমূল্য ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জনতার সমুদ্রে—তাতেই তার মৃত্যু।

অমূল্যধন॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাস চাটুজ্যের পূর্ব-সহাধ্যায়ী। অমূল্যধন অ্যাটর্নি-আপিসের আর্টিকল্‌ড্ হেডক্লার্ক। পুজোর ছুটিতে আত্মীয়তা দেখাতে এসে চশমাপরা যুবকটি বিপ্রদাসের অবস্থাটা আড়চোখে দেখে নিলে। সে ফিরল কলকাতায়—আর টাকা চেয়ে বসল বিপ্রদাসের মারোয়াড়ি মহাজন। অমূল্যধন জানালে, নূতন রাজা মধুসূদন খোশমেজাজে আছে, সুবিধামতো ধার পাওয়া সম্ভব। তাই পাওয়া গেল—এগারো লক্ষ টাকার গ্রন্থি পড়ল সাত-পার্সেন্ট সুদে।

আদিত্য॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। ফুলের ব্যবসায়ে আদিত্যর উন্নতি। ফুলের চাষে অভিজ্ঞতা তার মেসোমশায়ের কাছে; সেইখানেই মানুষ। আদিত্য সেখানেই মূলধনের টাকা পেয়েছিল এবং শোধ করেছিল যথাকালে। মেসোমশায়ের ভাইঝি সরলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাইয়ের মতো।

বিবাহের দশ বছর পরেও তার স্ত্রী নীরজার ভালোবাসা ছিল অম্লান। দুজনে একত্রে বাগানের কাজ করত—কাজের সঙ্গে মিলত লৌকিকতা। বন্ধুরা ঈর্ষান্বিত হয়ে আদিত্যকে বলত, 'লাকি ডগ।' স্ত্রীকে আদর করে সে বলত 'মালিনী', কখনো 'বনলক্ষ্মী'—আহারের সময়ে 'অন্নপূর্ণা', সন্ধ্যাবেলায় দিঘির ঘাটে পান নিয়ে এলে বলত, 'তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী'। সংসারের পরামর্শে নীরজা তার 'গৃহসচিব' বা 'হোম সেক্রেটারী'। আবেগের আতিশয্য হলে বলত, 'আমার রংমহলের সাকী।...সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারি দুধারে ফুল ফুটেছে রঙে-রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছে মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা।...আমার ভাগ্য-গুণে তুমি আজ-নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।' দশ বছর এই অবিমিশ্র সুখের পরে নীরজা শয্যাশায়িনী।

সকালে একটি করে বাছাই-করা ফুল আদিত্য রেখে যেত স্ত্রীর বিছানায়।

সেদিন বেলা তিনটেয় নিউ মার্কেট থেকে ফিরে এসে তার পা দুটি ঢেকে দিলে ল্যাবার্নাম ফুলের মঞ্জরীতে। মেঝের উপরে হাঁটু পেতে তার হাত চেপে বললে, 'আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।' তার পরে তার গলা জড়িয়ে চুমু খেয়ে বললে, 'তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।' বাগানের কাজে সরলার আবির্ভাবে নীরজার অসুস্থ মনে সন্দেহের ছায়া—তার অনুযোগ : আদিত্য তাকে বিয়ে করে নি বুঝি কবিত্বের জন্য। আদিত্য বললে, 'জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল-আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।' স্ত্রীর দিক থেকে বার-বার তার গোপন ভালোবাসার ইঙ্গিতে জড়িতস্খলভাবে চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বললে, 'নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে-দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে, তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না।'

কিন্তু এই সন্দেহের আঘাতে তার ছেলেবেলাকার প্রচ্ছন্ন ভালোবাসা জেগে উঠল। বিকেলে চা খেয়ে আদিত্য সরলাকে ডেকে নিত কাজে। 'শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি'। সেদিন আর কাজে মন দিতে না-পেরে সরলার পাশে চৌকি টেনে অস্থিরভাবে ক্যাটলগের পাতা ওলটাতে লাগল। একবার চকিত দৃষ্টিতে চাইলে তার মুখের দিকে; মনের কথা অপ্রকাশিতই রইল। শেষে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা নীরজার পক্ষে মর্মান্তিক বেদনার কারণ বুঝে পরলোকগত মেসোমশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আদিত্য সরলাকে স্থানান্তরে কাজে লাগাবার সংকল্প করলে। কিন্তু দিঘির ঘাটে তাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে তার মুখ দিয়ে বেরোল অন্য কথা—'আমরা দুজনে এ-সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব।...আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে।· তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।' ছেলেবেলার আলোচনায় হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে উঠল : 'কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা !...কী নিয়ে ঈর্ষা। তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়...অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে-অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। ···উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না।...তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম'।' সরলার অনুমতি নিয়ে সে পাঁচটি নাগকেশরের তোড়া পরিয়ে দিলে তার কাঁধের আঁচলে; তার মুখের

দিকে চেয়ে বললে, 'কী আশ্চর্য তুমি, সরি, কী আশ্চর্য !'

আদিত্য তার খুড়তুতো ভাই রমেনকে বললে, 'আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পরদা ফেলব উঠিয়ে।...তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না।' কিন্তু নীরজার জীবনান্তকালের কয়েকটি দিন দাক্ষিণ্যে ভরে দিতে সরলার অনুরোধ শুনে বললে, 'তুমি যা বলছ শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা।' সরলার স্বীকৃতিতে তার মুখটিতে সে অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার সীলমোহর অঙ্কিত করলে।

পরদিন দেশোদ্ধারের সভায় যোগ দিয়ে সরলা গেল জেলে। আদিত্য নীরজাকে শান্ত করবার জন্য বললে, 'সেরে ওঠ আগে তার পরে সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।' কিন্তু নীরজার মনে কেবলই বিদায়ের সুর ; জানতে চাইলে, তার মৃত্যুর পর আদিত্য তাকে কি মনে করবে ? আদিত্য স্বীকার করলে—কিন্তু এমন সুরে বলতে পারল না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

আনন্দ ঘোষাল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের বাবা। রজবপুরের আড়তদারদের মুহুরি। মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের সংসার। গৃহিণীদের হাতে শাঁখা-খাড়ু, পুরুষদের গলায় রক্ষামন্ত্রের পিতলের মাদুলি, বেলের আঠায় মাজা উপবীত। আনন্দ ঘোষাল মধুসূদনের সম্বন্ধে আশান্বিত। ঠেলে-ঠুলে গোটা-দুই-তিন পাস করাতে পারলেই সে ইস্কুলমাস্টারি থেকে মোক্তারি-ওকালতি পর্যন্ত ভদ্রলোকের মোক্ষতীর্থগুলোর যে-কোনো একটাতে গিয়ে ভিড়তে পারবে। অন্য তিনটে ছেলের কেউ-বা আড়তদারের, কেউ-বা তালুকদারের দপ্তরে কানে কলম গুঁজে বসে গেল। সর্বস্ব ব্যয় করে তিনি মধুকে পাঠালেন কলকাতায়।

আনন্দময়ী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার মা আনন্দময়ী। গড়ন পাতলা, আঁটোসাঁটো—আপাতদৃষ্টিতে বোধ হত বয়স চল্লিশেরও কম। মুখের বেড় অত্যন্ত সুকুমার ; নাক-ঠোঁট-চিবুক ও ললাটের রেখা যেন কুঁদে তৈরি। শরীর বাহুল্যবর্জিত ; মুখে একটি পরিষ্কার সতেজ বুদ্ধির ছাপ। রং শ্যামবর্ণ। পরনে শাড়ির সঙ্গে শেমিজ। ঘরদুয়ার মেজে-ঘসে ধুয়ে-মুছে রেঁধে-বেড়ে সেলাই করে তাঁর সময় ফুরোতে চাইত না।

কাশীবাসী সার্বভৌমের পিতৃহীনা পৌত্রী আনন্দময়ী। বিপত্নীক কৃষ্ণদয়ালের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় পশ্চিমে। আনন্দময়ী নিষ্ঠাবান ঘরের আচারপরায়ণা মেয়ে। কিন্তু স্বামীর প্রতিবন্ধকতায় অনেক চোখের জল ফেলে তাঁকে শিশুকালের সংস্কার ত্যাগ করতে হয়। সন্তান-লাভের জন্য আনন্দময়ী চেষ্টার ত্রুটি করেন নি—কত মাদুলি, কত মন্ত্র। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন : যেন

সাজিতে টগরফুল নিয়ে তিনি পুজো করতে বসেছেন—চোখ চেয়ে দেখলেন, সাজিতে ফুল নেই—ফুলের মতো ধবধবে একটি ছোটো ছেলে। তার দশ দিনের মধ্যেই গোরাকে পেলেন। তখন সিপাহিদের মিউটিনি—তাঁরা এটোয়াতে। চারিদিকে মারামারি-কাটাকাটি—রাত্দুপুরে এক মেম প্রাণের ভয়ে আশ্রয় চাইলে। আনন্দময়ী স্বামীকে ভাঁড়িয়ে তাকে রাখলেন লুকিয়ে। রাত্রেই গোরাকে প্রসব করে মেয়েটির মৃত্যু হল। এমন ছেলে পাওয়া কি গর্ভে পাওয়ার চেয়ে কম? আনন্দময়ী তাকে বুকে তুলে নিয়ে বুঝলেন: জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না; খৃীস্টান বলে, ছোটো জাত বলে কাউকে অবজ্ঞা করলে ঈশ্বর তাঁর ছেলেকেও কেড়ে নেবেন।

গোরার পাঁচ বছর বয়সে তাঁরা এলেন কলকাতায়। কৃষ্ণদয়ালের প্রথম-পক্ষের ছেলে মহিমের সঙ্গে গোরার প্রায়ই হাতাহাতি হবার উপক্রম হত। আনন্দময়ী উদ্বেগ বোধ করে গোরাকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করতেন। কৃষ্ণদয়াল শেষবয়সে আচারনিষ্ঠ হয়ে পৃথক মহলে অন্তরীণ। আনন্দময়ীর দাম্পত্য-সম্বন্ধকে বিন্ধ্যাচলের মতো বিভক্ত করে মাঝখানে ছিল গোরা। এই-কারণে গোরার প্রতি স্নেহ তাঁর নিতান্ত একলার ধন ছিল। এই পরিবারে গোরার অনধিকার-অবস্থানকে তিনি সব দিক থেকে হালকা করে রাখবার চেষ্টা করতেন। মহিমের বিবাহের সময় পাছে তাঁর খৃীস্টানি চালে কুটুম্বরা গোল করেন—গোরাকে নিয়ে তাই সরে গেলেন। সবাই তাঁকে খৃীস্টান বলে অবজ্ঞা করত। তিনি বলতেন, 'খৃীস্টান কি মানুষ নয়! তোমরাই যদি এত উঁচু জাত আর ভগবানের এত আদরের তবে তিনি একবার পাঠানের, একবার মোঘলের, একবার খৃীস্টানের পায়ে এমন করে তোমাদের মাথা মুড়িয়ে দিচ্ছেন কেন?' গোরার বাল্যবন্ধু বিনয়ও শিশুকাল থেকে তাঁর স্নেহরাজ্যের অংশীদার। এই-দুটি ছেলেই আনন্দময়ীর মাতৃস্নেহের পরিপূর্ণ অর্ঘ্য লাভ করত। কিন্তু শেষের দিকে গোরাও যখন আচারনিষ্ঠ হয়ে তাঁর হাতে খাওয়া বন্ধ করলে—তখন তাঁর আর কষ্টের সীমা রইল না। মায়ের আচারহীনতাই তার আপত্তির কারণ। চিন্তিত হয়ে আনন্দময়ী স্বামীর কাছে গিয়ে বললেন, 'দেখো, আমার মনে হয় গোরাকে সকল কথা বলে ফেলি, তার পরে অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে।'

ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুদের সঙ্গে বিনয়ের আলাপ থাকায় গোরা তিরস্কার করত। আনন্দময়ী বলতেন, 'দেখো, গোরা, একটি কথা বলি, রাগ কোরো না, ভগবান অনেক মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সকলের জন্যে কেবল একটিমাত্র পথ খুলে রাখেন নি। বিনয় তোমাকে প্রাণের মতো ভালোবাসে...বাবা গোরা...বিনয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস নে। আমার কাছে তোরা দুজনে দুটি ভাই—তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে আমি সইতে পারব না।' গোরার মনে মেয়েদের সম্বন্ধে চিরদিন একটা বিরুদ্ধভাব ছিল। বিনয়ের অনুরোধে একদিন

পরেশের গৃহে গিয়ে সেখান থেকে যখন সে ফিরে এল তিনি তার মুখ দেখে আশ্চর্য হলেন। পরদিন সে বেরিয়ে পড়ল ভ্রমণে। আনন্দময়ী নিজের কষ্ট হবে বলে কাউকে কিছু নিষেধ করতেন না—শুধু গোরার মনে কী বিপ্লব ঘটেছে তাই ভাবতে লাগলেন। অনতিকাল পরে তিনি তার পত্র পেলেন। পুলিসের সঙ্গে মারামারি করে সে তখন হাজতে। সমস্ত দুঃখকে ভগবানের ভৃগুপাদপদ্মের মতো বক্ষে ধারণ করতে সান্ত্বনা দিয়েছিল সে। আনন্দময়ী মহিমকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা করলেন ; স্বামীকে কিছু বলা অনাবশ্যক বোধ করলেন। গোরার সম্বন্ধে স্বামীর প্রতি তাঁর একটি মর্মান্তিক অভিমান ছিল। তখন তাঁর কাছে এসে উঠল বিনয়। আনন্দময়ী বিগলিতহৃদয়ে তার সঙ্গে ছেলেবেলার নানা গল্প করতেন। বিনয়ের কণ্ঠে হৃদয়ভারাক্রান্ত এক ক্লান্তির পরিচয় পেয়ে তিনি পরেশ-বাবুদের কথা, তাঁর মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। পরেশের মেজো মেয়ে ললিতার সম্বন্ধে বিনয়ের সংকোচ দেখে কৌশলে বিনয়ের সঙ্গে তার পরিচয়ের ইতিহাস সমস্ত জেনে নিলেন। গোরার বিবাহেরও জটিল সমস্যা পরেশবাবুর গৃহে মীমাংসা হতে পারে ভেবে তিনি তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আলাপের সংকল্প করলেন।

গোরার প্রতি প্রীতিবশতই বিনয় মহিমের কন্যাকে বিবাহে রাজি হয়। আনন্দময়ী আগে একবার বিনয়ের কাছে এই প্রস্তাব করেন—তখন তার মত ছিল না। তাই বললেন, 'এখনো বিবেচনা করে দেখবার সময় আছে ; তোমার বয়স হয়েছে বাবা—এতবড়ো একটা কাজ অশ্রদ্ধা করে কোরো না।' মহিম আবার তাগিদ দিতে থাকায় তিনি বললেন, 'শশিমুখীকে একটুকু বেলা থেকে বিনয় দেখে আসছে—ওকে বিয়ে করার কথা ওর মনে লাগছে না।' বিনয়কে আড়াল করে মহিমের রাগের ধাক্কাটা তিনি নিজেই গ্রহণ করলেন। সংসারের বিচারক্ষেত্রে আনন্দময়ী বরাবর আসামীশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের মর্মস্থানে যে-একটি সত্যগোপন তাঁকে সর্বদা পীড়া দিত, লোকনিন্দায় সেই পীড়া থেকে তিনি কতক পরিমাণে মুক্তি পেতেন। পরেশের আশ্রিতা বন্ধুকন্যা সুচরিতাকে নিয়ে ললিতা সেদিন উপস্থিত। আনন্দময়ী তাদের আদর করে বসালেন। তাঁর মুখে দুটি ক্রোড়দেবতার কাহিনী স্নেহরসে মধুর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল। গোরার জেলে যাওয়ার ব্যাপারে ললিতা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর রাগ করায় হেসে বললেন, 'মা… আমি তো গোরাকে জানি, সে যেটাকে ভালো বোঝে তার কাছে আইনকানুন কিছুই মানে না ; যদি না-মানে তবে যারা বিচারকর্তা তারা তো জেলে পাঠাবেই…গোরার কাজ গোরা করেছে—ওদের কর্তব্য ওরা করেছে—এতে যাদের দুঃখ পাবার তারা দুঃখ পাবেই।' গোরার প্রেরিত সযত্নরক্ষিত চিঠিখানি তিনি সুচরিতার হাতে দিয়ে আর-একবার পড়তে বললেন। সুচরিতা উচ্চৈঃস্বরে পড়লে। আনন্দে-বেদনায়-গর্বে আনন্দময়ীর মাতৃহৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠল।

ললিতা বললে, 'গোরবাবু যে এত শক্তি কোথা থেকে পেয়েছেন তা আপনাকে দেখে আজ বুঝতে পারলুম।' আনন্দময়ী বললেন, 'গোরা যদি আমার সাধারণ ছেলের মতো হত তা হলে আমি কোথা থেকে বল পেতুম! তা-হলে কি তার দুঃখ আমি এমন করে সহ্য করতে পারতুম!' ললিতা ও সুচরিতা বিদায় নেবার পরে তিনি বিনয়কে বললেন, 'সুচরিতার সঙ্গে যদি গোরার বিয়ে হতে পারে তো বড়ো খুশি হই।' ব্রাহ্মঘরে বিবাহ সম্বন্ধে বিনয়ের দ্বিধা। তিনি বললেন, 'বাবা, ব্রাহ্মই-বা কে, আর হিন্দুই-বা কে? মানুষের হৃদয়ের তো কোন জাত নেই,—সেইখানেই ভগবান সকলকে মেলান এবং নিজে এসেও মেলেন। তাঁকে ঠেলে দিয়ে মন্তর আর মতের উপরেই মেলাবার ভার দিলে চলে কি?'

সুচরিতার বিধবা মাসি হরিমোহিনীর সঙ্গে তিনি একদিন নিজেই দেখা করতে গেলেন। হরিমোহিনী তাঁর আচারহীনতায় বিস্মিত হলে বললেন, 'একদিন ভগবান আমার ঘরে হঠাৎ এমন করে দেখা দিলেন যে আমাকে আর সমাজে থাকতে দিলেন না। তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে নিয়েছেন, তখন আমি আর কাকে ভয় করি।'

ব্রাহ্মসমাজে ললিতার সঙ্গে নিজের কুৎসা রটায় বিনয় এই অশান্তির জন্য কুণ্ঠিত। আনন্দময়ী বললেন, 'যেখানে ভিতরে কোথাও একটা অন্যায় আছে সেখানে বাইরে শান্তি থাকাটা সকলের চেয়ে অমঙ্গল। ওঁদের সমাজে যদি অশান্তি জেগে থাকে তা হলে তোর অনুতাপ করবার কোনো দরকার দেখি নে, দেখবি তাতে ভালোই হবে। তোর নিজের ব্যবহারটা খাঁটি থাকলেই হল।' বিনয় তাড়াতাড়ি শশিমুখীকে বিবাহ করে সমস্ত চুকিয়ে ফেলতে চায়। তিনি হেসে বললেন, 'অর্থাৎ, শশীমুখীকে তোর ঘরের বউ না করে তোর ঘরের শিকল করতে চাস—শশীর কী সুখেরই কপাল!' পরে বিনয়ের বিবাহের গুজব শুনে বললেন, 'তোর যদি কিছুমাত্র পৌরুষ থাকে বিনু, তা হলে এই কাপুরুষতার হাত থেকে তুই অনায়াসেই ললিতাকে রক্ষা করতে পারিস।...তোদের বিবাহের গুজব যখন উঠে পড়েছে তখন নিশ্চয়ই সেটা সংগত বলেই উঠেছে।...তোর উচিত একবার পরেশবাবুর কাছে যাওয়া।' বিনয়ের সংকোচ দেখে তিনি নিজেই গেলেন সুচরিতার কাছে। বিনয় সমাজ ত্যাগ করবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?...দেখো, আমার বাড়িতে যে-নিয়ম চলে সে-নিয়মে আমি চলতে পারি নে···কিন্তু তাই বলে আমি কেন বলতে যাব, এ-ঘর আমার ঘর নয়, এ-সমাজ আমার সমাজ নয়।...তোমাদের ব্রাহ্মসমাজও কি মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলতে দেবে না?' ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নিতে বিনয়েরও মত দেখে বললেন, 'তোর যা বিশ্বাস তা নিয়ে কি তুই আমাদের সমাজে থাকতে পারিস নে?...সমাজের লোকে কষ্ট দেবে—তা, কষ্ট সহ্য করে

থাকতে পারবি নে...হিন্দুসমাজে যদি তিন-শো তেত্রিশ কোটি মত চলতে পারে তবে তোমার মতই-বা চলবে না কেন ?...সে হতে পারবে না।' সুচরিতাও তাঁকে সমর্থন করায় তিনি খুশি হয়ে বললেন, 'এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের রূপ-গুণ-স্বভাব কিছুই মেলে না, তবু সেজন্যে দুই-মানুষের মিলনে বাধে না —আর মত-বিশ্বাস নিয়েই-বা বাধবে কেন ? মা, তুমি আমায় বাঁচালে।'

আত্মীয়-বন্ধু সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মতো বিনয় কোনো-গতিকে বিবাহ সেরে নেবে, আনন্দময়ী তা সহ্য করতে পারলেন না। নিজের বসতবাড়ির উত্তর-অংশে তার বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন। কিন্তু গৃহ-প্রত্যাগত গোরার তাতে আপত্তি দেখে অশ্রু মুছে অনাত্র শুভকাজের অনুষ্ঠানের সংকল্প করলেন। উদ্‌যোগ-আয়োজন সম্পূর্ণ হলে সুচরিতাকে আনতে গিয়েও তার মাসির দ্বারা ভর্ৎসিত হলেন। পরে সুচরিতা এলে আনন্দময়ী তাকে বুকে চেপে ধরলেন। পরেশবাবু ললিতাকে নিয়ে এলে বললেন, 'ললিতার জন্যে আপনি কোনো চিন্তা মনে রাখবেন না।...বিনয়ের বউটিকে নিয়ে আমার কন্যার দুঃখ ঘুচবে অনেকদিন ধরে এই আশাপথ চেয়ে বসে ছিলুম ; তা অনেক দেরিতে যেমন ঈশ্বর আমার কামনা পূরণ করে দিলেন, তেমনি এমন মেয়ে দিলেন আর এমন আশ্চর্য রকম করে দিলেন যে, আমি আমার এমন ভাগ্য কখনো মনে চিন্তাও করতে পারতুম না।' নিবিড় স্নেহে আনন্দময়ী সুচরিতাকেও বুকে টেনে নিলেন। সুচরিতার মনটুকু তিনি এমন করে বুঝে নিলেন যে কিছুই না-বলে তাকে গভীর সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কৃষ্ণদয়াল হঠাৎ রক্তবমন শুরু করে মৃত্যু-আশঙ্কায় গোরার কাছে তার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন। আনন্দময়ী মুখ নত করে স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। গোরার মুখ দিয়ে বেরোল : 'মা, তুমি আমার মা নও ?' আনন্দময়ীর বুক ফেটে গেল ; তিনি অশ্রুহীন রোদনের কণ্ঠে বললেন, 'বাবা গোরা, তুই-যে আমার পুত্রহীনার পুত্র, তুই-যে গর্ভের ছেলের চেয়ে অনেক বেশি বাবা!' গোরা সমস্ত শুনে গমনোদ্যত হল। আনন্দময়ী বাইরে এসে তার হাত ধরে বললেন, 'বাবা, গোরা, আমার উপর তুই রাগ করিস নে—তা হলে আমি আর বাঁচব না!...বাপ, তোকে পাছে হারাই এই ভয়েই আমি এত পাপ করেছি। শেষে যদি তাই ঘটে, তুই যদি আজ আমাকে ছেড়ে যাস, তা হলে কাউকে দোষ দিতে পারব না, গোরা, কিন্তু সে আমার মৃত্যুদণ্ড হবে যে বাপ!'

কৃষ্ণদয়াল সুস্থ হলে গোরা পরেশবাবুর কাছে গিয়ে উদার ভারতীয়ত্বের মর্যাদায় সুচরিতাকে গ্রহণ করলে। সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরে সে দেখলে— আনন্দময়ী তাঁর ঘরের সামনে বারান্দায় নীরবে বসে আছেন। তাঁর পদতলে মাথাটি রেখে গোরা বললে, 'মা, তুমিই আমার মা।...তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

আন্দি ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক বৃদ্ধা আশ্রিতা।

আবদুল ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। প্রতাপাদিত্যের অনুচর। তাঁর পিতৃব্য বসন্ত রায়ের ঘাতক।

আশালতা (চুনি) ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। আশালতার ডাকনাম চুনি। শৈশবে সে পিতৃমাতৃহীনা ; ধনী জ্যাঠার অনুগ্রহ-পালিত। চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়সেও সে কুণ্ঠিতভাবে নবযৌবনারম্ভকে সংবৃত রেখেছিল। অনেক আঘাত-সংঘাতের পরে তার বিধবা মাসি অন্নপূর্ণার বড়ো-জা রাজলক্ষ্মীর বধূ হল।

আশা সজ্জিতসুন্দরদেহে, লজ্জিতসুন্দরমুখে আপন নূতন সংসারে পদার্পণ করলে। জগতে একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসছে বলে আশ্বাসে-আনন্দে তার সর্ব সংশয় দূর হয়ে গেল। অযত্নলালিতা অনাথার মস্তকে স্বামী মহেন্দ্র লক্ষ্মীর মুকুট পরিয়ে দিলেন। আশা দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করে সৌভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় স্বামীর পদপ্রান্তে স্থান অধিকার করলে। স্বামীর আদেশ শিরোধার্য করে সে প্রাণপণে বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করে গম্ভীরমুখে পুঁথিপত্রের উপর ঝুঁকে পড়া মুখস্থ করত। অপর-প্রান্তে অধ্যয়নরত মহেন্দ্র ছাত্রীকে ডেকে কটিদেশ বেষ্টন করে বলত, 'আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।' এইরূপ দোষারোপে শরতের একপসলার মতো কান্নার সৃষ্টি হত এবং তা বিলীন হত সোহাগের সূর্যালোকের উজ্জ্বল প্রসন্নতায়। মহেন্দ্রর পড়াশুনার ক্ষতিতে অন্নপূর্ণা ও বিহারীর তিরস্কারে আশা নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করত—কিন্তু ফল হত না। স্বামীর বন্ধু বিহারীর সঙ্গে একসময়ে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল বলে আশা তার প্রতি বিরূপ ছিল।

পরীক্ষায় মহেন্দ্রর ব্যর্থতায় অন্নপূর্ণা রাগ করে অন্যত্র চলে গেলেন। বর্ষণ-মুখরিত এক সায়াহ্নে আশাকে অব্যক্ত-কণ্ঠে কাঁদতে দেখে মহেন্দ্রও কাকির কাছে যেতে উদ্যত। অন্নপূর্ণা ফিরে এসে আশাকে ভর্ৎসনা করলেন। রাজলক্ষ্মী অভিমান করে আত্মীয়ের কাছে গেলে অন্নপূর্ণাও চলে গেলেন কাশীতে। আশা ভয় পেয়ে গেল। পরিত্যক্ত শূন্য গৃহস্থালির মধ্যে দাম্পত্যের নূতন প্রেমলীলা তার কাছে বিভীষিকা বোধ হল। একদিন সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত খোলা-ছাদের বারান্দায় রাশীকৃত বকুলফুল নিয়ে তারা কৃত্রিম কলহে ব্যাপৃত। প্রতিবেশীর পিঞ্জরের মধ্য থেকে পোষা কোকিল ডেকে উঠল—কিন্তু তাদের কোকিল সাড়া দিল না। খাঁচা নামিয়ে দেখা গেল : পাখি গেছে মরে। আশা ম্লানমুখে আঁচল শূন্য করে বললে, 'আর কেন। ছি-ছি। তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গে।'

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে এল তাঁর বাল্যসখীর বিধবা মেয়ে বিনোদিনী। আত্মীয়গৃহে বাল্যকাল থেকে পরের মতো লালিত হয়ে আশায় একপ্রকার কুণ্ঠিত ভাব ছিল। সর্ববিষয়ে বিনোদিনীর অনায়াস-প্রভুত্ব ও শাশুড়ির প্রশংসায় সে তার কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করলে। উভয়ের প্রণয়বীজ অচিরে পল্লবিত হয়ে উঠল। আশা 'গঙ্গাজল' 'বকুলফুল'—কিছু-একটা পাতাতে চাইলে; শেষে তার সঙ্গে সম্পর্ক হল—'চোখের বালি'। আশার পক্ষে সঙ্গিনীর বড়ো দরকার ছিল। বিনোদিনী-কর্তৃক অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে সে স্বামী-সম্মিলনে যেত; দেরি হলে বলত, 'এবার যাই ভাই চোখের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।' স্বামীকে সে চোখের বালির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ধরে পড়ল। বিনোদিনীর কুণ্ঠা দেখে তার রাগ—তার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করতেও আপত্তি! একদিন স্বামী কলেজ গেছে বলে কার্পেট বোনার ছলে তাকে উপরে আনলে; তার পরে তার গলা জড়িয়ে লুটিয়ে পড়ল হেসে। বিবাহের পর থেকে প্রেমের সংগীত একেবারে তারস্বরের নিখাদ থেকে শুরু করে পরস্পরের কাছে তারা নিঃশেষ হবার উপক্রম করেছিল। নেশার পরেই অবসাদ আসে; তা দূর করতে নূতন নেশার প্রয়োজন। আশা তার সন্ধান জানত না। বিনোদিনী তা-ই রঙিন পাত্র ভরে এনে দিলে—স্বামীকে প্রফুল্ল দেখে আরাম পেল আশা। বিহারী একদিন সতর্ক করতে এলে তার সম্বন্ধে স্বামীর কাছে রাগ প্রকাশ করলে।

বিনোদিনীর আকর্ষণে তৎকর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে মহেন্দ্র চলে গেল কলেজের বাসায়। আশা ভাবলে, 'নিজের নির্গুণতায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম? আমার তো মরা ভালো ছিল।' কখনো অন্দরে, কখনো বাইরের ঘরে সে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগল। স্বামীর চিঠি না পেয়ে সে বিনোদিনীর পরামর্শে তারই রচনামতো লিখলে—'প্রিয়তম!... যে-লতাকে ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। ...নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে...আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।' এমন সুন্দর করে সে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারত না। যে-ব্যথাটা তার মনে, তার ভাষাটি সখীর কাছে—এই ভেবে সে অন্তরঙ্গ সখীকে আশ্রয় করলে আরো বেশি আগ্রহের সঙ্গে।

মহেন্দ্র ফিরে এলে আশা লজ্জিত হয়ে সেই চিঠিগুলি ফেরত চাইলে। না পেয়ে ভাবলে, 'আমার শাস্তিস্বরূপ এ-চিঠিগুলি উনি রাখিলেন।' বিনোদিনীর কাছে স্বামীর আগমন-বার্তা নিয়ে সে আনন্দ করতে গেল না। বিনোদিনী বাড়ি যেতে উদ্যত হয়ে শেষে মহেন্দ্রের অনুরোধে নিরস্ত হল। স্বামীর কৃতকার্যতায় উৎফুল্ল আশা সখিকে আলিঙ্গন করে তিন-সত্য করালে। অনুতপ্ত মহেন্দ্র কাশী যেতে ইচ্ছুক হয়ে অনুরাগে তার মাসিমার আশীর্বাদের কথা বলতে লাগল। আশা এই স্নেহাবেগের মর্ম বুঝতে পারল না—তার হৃদয় বিগলিত হয়ে অশ্রু

পড়তে লাগল। মনে হল : এ তার জীবনে কিসের একটা সূচনা ; ভয়ব্যাকুলিত-চিত্তে স্বামীকে বাহুপাশে বন্ধ করে সে মনে-মনে মাসিমার পদধূলি মাথায় নিলে।

মহেন্দ্র ফিরে এলে তার হাতে মাসির দেওয়া স্নেহোপহার পেয়ে আশারও তাঁর পায়ের ধুলো নেবার ইচ্ছা হল। মনে তার ছিল দ্বিধা ; কিন্তু, স্বামীর সম্বন্ধে তার সন্দেহ ও বিহারীর প্রতি অনুরক্তির মিথ্যা অনুযোগে তাকে আরও কাশী আসতে হল। বিদায়কালে স্বামীকে দেখবার জন্য সে বিনোদিনীকে অনুরোধ করলে। বিহারী একদিন কাশীতে এলে আশা তাকে দেখে আর্তস্বরে বলে উঠল, 'মাসিমা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উঁহাকে এখনই যাইতে বলো। ...বিহারী-ঠাকুরপো এখানেও আসিয়াছেন।' রাত্রে সে স্বামীকে লিখলে, 'বিহারী-ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন।...তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।' কিন্তু অনেকদিন স্বামীর পত্র না পেয়ে তার মনে হল : ভালো করে চিঠি লিখতে পারে না বলেই স্বামী তাকে পত্র দেন না ! আহা, চোখের বালি যদি হাতের কাছে থাকত। একদিন সন্ধ্যারতির পরে সে অন্নপূর্ণার পায়ে হাত বুলিয়ে বললে, 'মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে-স্ত্রী মূর্খ, যাহার বুদ্ধি নাই···সে কী করিবে।' অন্নপূর্ণা বললেন, যথার্থ শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে স্বামিসেবা ও সংসারের কাজ করলে জগদীশ্বরের সেবা করা হয়। আশা বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত ভাবলে—ভালো করে কিছুই বুঝতে পারল না। তবু বিছানায় গড় হয়ে প্রণাম করে বললে, 'আমার স্বামীকে আমি যে-পূজা দিই ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো।' কলকাতায় ফিরে আশা লক্ষ্য করলে স্বামীর ভাবান্তর। কিন্তু কিছুই না বুঝে শুধু দোষারোপ করলে নিজেকেই : 'আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উঁহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম।' মহেন্দ্র যে বিনোদিনীকে ভালোবাসতে পারে—এ-সম্ভাবনা একবারও তার মনে এল না। অবশেষে একদিন স্বামীর পকেটে বিনোদিনীর একখানি চিঠি দেখে তার চোখের আলো গেল নিভে।

বিনোদিনী বিদায় নিয়ে গেল। মহেন্দ্রও তার সঙ্গে অন্তর্হিত। রাত্রে সে যখন ফিরে এল, আশা শয়নগৃহের দ্বারে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। রাজলক্ষ্মীর স্বহস্তরচিত প্রসাধন গ্রহণ করে সে উপরে এসে দেখলে : মহেন্দ্র চলে গেছে। পরদিন স্বামীকে দেখে আশা সংকোচে গেল মরে ; মনে হল, তার অঙ্গে বিনোদিনীর স্পর্শ, চোখে বিনোদিনীর মূর্তি, বিনোদিনীর বাসনা তাকে লিপ্ত করে আছে। মাসির উপদেশ, শাস্ত্রের অনুশাসন সমস্ত সত্ত্বেও দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে দেবতা বলে ভক্তি করতে পারল না ; বিনোদিনীর কলঙ্ক-পারাবারের মধ্যে সে তার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিলে। শাশুড়ির ভর্ৎসনায় তবু তাকে অপরাধীর মতো উপরে যেতে হল।

রাজলক্ষ্মী তখন অসুস্থ। পরদিন তাঁর তিরস্কারে স্বামীর কাছে যেতে বাধ্য হয়ে মহেন্দ্রকে তাঁরই অসুখের কথা বলে আশা তাঁকে দেখতে অনুরোধ করলে। রাজলক্ষ্মীর অসুখ বাড়তে লাগল। আশার মনে হল : মহেন্দ্রের মন এতই উদ্‌ভ্রান্ত যে, ভালোভাবে চিকিৎসা করছে না। সংসারের অটল-নির্ভর বিহারীকে সে-ই দূর করেছে—এই ভেবে তার পরিতাপের শেষ রইল না। স্বামীর কাছে বিহারীর কথা বলতে গিয়েও সে অপমানিত হল। আহত হয়ে বললে, 'ডাক্তারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার।' অতঃপর মহেন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হল। সেই নীরন্ধ্র-নিবিড় দুঃখের মধ্যে আশা তার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাসিমাকে স্মরণ করে লিখলে, 'মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই ; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই দুঃখিনীকে টানিয়া লও'। অন্নপূর্ণা পৌঁছলে বারবার তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে সে বলসঞ্চয় করলে। পরে বললে, 'মাসিমা, বিহারী ঠাকুরপোকে একবার আসিতে চিঠি লিখিয়া দাও।'

বিহারী এলে আশার আর সংকোচ রইল না। বিহারীর সঙ্গে গৃহাগত স্বামীকে মার ঘরে যেতে দেখে সে শঙ্কিত হল : 'এখন ও-ঘরে যাইয়ো না।···ডাক্তার বলিয়াছেন হঠাৎ মার মনে···কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।' আশার এই পরিবর্তনে মহেন্দ্র আশ্চর্য হয়ে গেল। রাজলক্ষ্মী ঘরে ডেকে স্বামীর সঙ্গে তার হাত মিলিয়ে দিলেন। আশা দুই-বন্ধুকে বসিয়ে পরিবেষণ করে খাওয়ালে। অন্নপূর্ণার নির্দেশে বিনোদিনীকে সে প্রাণপণে ক্ষমা করবার চেষ্টা করলে। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে বিনোদিনী অন্নপূর্ণার সঙ্গী হল। আশা জানত : সে মহেন্দ্রকে ভালোবাসে ; মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে অনিবার্য, নিজের হৃদয় থেকেই তা সে বুঝেছিল। তাই বিদায়কালে বিনোদিনীর কাছে এসে করুণার সঙ্গে বললে, 'দিদি, তুমি চলিলে ?'

ইন্দ্রজিৎ সিং ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের কথিত গল্পের চরিত্র।

ইন্দ্রনাথ ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা। কঠিন আকর্ষণ-শক্তি ইন্দ্রনাথের চেহারায়। 'মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো।···চুল অনতিপরিমাণে ছাঁটা···মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর···প্রশান্ত...কপাল, দৃষ্টিতে বুদ্ধির কঠিন তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব।' য়ুরোপে অনেকদিন কাটিয়ে সায়ান্সে খ্যাতিলাভ করেন। সেখানে একজন ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকের সঙ্গে পরিচয় ; দেশে ফিরে তাই সব কাজে বাধা পেতে লাগলেন। অযোগ্য উপর-ওয়ালার চক্রান্তে এমন জায়গায় বদলি হলেন যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবনের সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ রুদ্ধ। অগত্যা তিনি জার্মান ও ফরাসি ভাষা

শেখাবার এবং সেই-সঙ্গে কলেজের ছাত্রদের বটানি ও জিয়লজিতে সাহায্য করবার ক্লাস খুললেন। তলদেশ বেয়ে এক অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল।

দেশের ছাত্রদের মধ্যে ইন্দ্রনাথের আসন রাজচক্রবর্তীর মতো। একদা এক শহরে এলাকে দেখে তাঁর চমক লাগল। তাকে কলকাতার নারায়ণী স্কুলে কর্ত্রীপদ দিলেন। জানতেন : ভালোবাসার গুরুভারে ব্রত ভোলবার মেয়ে সে নয়। এলার কাছে ইন্দ্রনাথ কাজ চাইতেন না; এলার হাতে রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে আগুন জ্বালিয়ে তুলত। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে তাকে বেদিতে বসিয়েছিলেন। মেয়ে-পুরুষকে তিনি একত্র করেছিলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না···আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন নিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।' দলের মধ্যে উঁচু-দরের এক কর্মীকে ভালোবাসার জন্য উমাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে তিনি তফাত করবার ব্যবস্থা করেন। এলা তাঁর নিষ্ঠুরতার অভিযোগ করলে বলেন, 'মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং। ...মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন। ...জঞ্জাল ফেলার সব-চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।'

ছেলেদের সঙ্গে এলার সম্পর্ক গোপন রাখবার জন্য ইন্দ্রনাথ এলার গৃহে তাদের যাওয়া নিষিদ্ধ করেন। এলা কানাই গুপ্তর চায়ের দোকানে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করায় ছেলেদের অন্য-কাজে লাগিয়ে তিনি এলার জবানিতে কাগজে একটা প্রবন্ধ পাঠিয়ে দিলেন। সে যেন লিখেছে : ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে, বঙ্গনারীরা যেন তাদের মাথা ঠাণ্ডা করেন। এলা অতীনের সম্বন্ধে তার দুর্বলতার উল্লেখ করায় বললেন, 'তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো ?...তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।...আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই।···শুধু মা-মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ কোরো না সংসারপিঞ্জরের বেঁধে।' জিজ্ঞাসা করলেন : অতীন কখনো যদি সকলকে বিপদে ফেলে এলা তাকে নিজের হাতে মারতে পারবে কিনা। পরে এলার মতো সুন্দরী মেয়েকে দলের মধ্যে রাখার কারণ বোঝালেন কানাই গুপ্তকে : 'সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না···ওই যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে,—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।···প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে মানায় বলেই

আমি আছি...আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল···বসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। ···ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে।···ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্পার্সোন্যাল।···ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহাসাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল, আজ তারা ধুলোয় মিশিয়ে গেছে···আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে-করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে?' ইংরেজের উপরে তাঁর রাগ নেই—সমস্ত পশ্চিমি জাতের মধ্যে তারাই বড়ো। তিনি লড়াই করবেন রাস্তায় পাথর থাকলে যেমন হাতিয়ার চালায়, সেই অপ্রমত্ত বুদ্ধিতে; মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাবেন না।

কানাই গুপ্তের দোকানে পুলিসের দৃষ্টি পড়ায় ইন্দ্রনাথ ছেলেদের নানা স্থানে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। সকলের গতিবিধির উপরে ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি—বিপদের আভাসমাত্রেই পৌঁছত সাংকেতিক অক্ষরে লেখা তাঁর লাল রঙের চিঠি, নয়তো ভেসে আসত দূর থেকে হুইস্‌লের সংকেত।

ইন্দ্রাণী ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলালতার ফোর্থ-ইয়ারের এক সহপাঠিনী। চেহারার বহরে ইন্দ্রাণীর কিছু বাহুল্য ছিল—রংটাও উজ্জ্বল ছিল না। কলেজের সহপাঠীরা তাকে পিছন থেকে 'বড়ো এলাচ' বলে ডেকে ভালোমানুষের মতো আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। এলাকে বলত 'ছোটো এলাচ'। কখনো তাদের নামে বোর্ডে যা-তা লিখে রাখত।

ঈশান ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের পিতৃবন্ধু। নিঃস্ব অবস্থায় পত্নী ও শিশুকন্যা সুশীলাকে রেখে তাঁর মৃত্যু হয়।

উইল্‌কিন্‌স্‌ ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশের ইংরেজির এক অধ্যাপক। যেমন তাঁর পাণ্ডিত্য, ছাত্রদের প্রতি তেমনি অবজ্ঞা। এদেশী কলেজে সাহিত্য পড়ানো শিক্ষকতার কুলিমজুরি করা—উইল্‌কিন্‌সের এই ধারণা ছিল। মিল্টন্‌-শেক্সপীয়র পড়াবার ক্লাসেও ইংরেজি 'বিড়াল'-শব্দের প্রতিশব্দ বলে দিতেন। শচীশ তাঁর ক্লাসের রত্ন—নোট নেওয়া সম্বন্ধে তার মাপ ছিল। বলতেন, 'শচীশ, তোমাকে এই-ক্লাসে বসিতে হয় সে-লোকসান আমি পূরণ করিয়া দিব, তুমি আমার বাড়ি যাইয়ো, সেখানে তোমার মুখের স্বাদ ফিরাইতে পারিবে।' ছাত্রেরা

রাগ করে বলত : শচীশকে তিনি যে এত পছন্দ করেন, তার কারণ শচীশের গায়ের রং কটা, আর সে মন-ভোলাবার জন্য নাস্তিকতা ফলায়।

উদয়াদিত্য ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। পিতার আদেশে ষোলো বছর বয়সে উদয়াদিত্য হোসেনখালি পরগনার ভার পান। ছ-মাসের মধ্যেই খাজনা কমে গেল, প্রজারা আশীর্বাদ করতে লাগল—এতে তাঁর রাজ্যশাসনের অযোগ্যতাই প্রমাণিত হল। মধ্যে-মধ্যে তিনি এই পরীক্ষাশালা থেকে পালিয়ে যেতেন রায়গড়ে—পিতার পিতৃব্য বসন্ত রায়ের কাছে। সেখানে চারিদিকে উল্লাস, সদ্ভাব, শান্তি। গ্রামবাসীদের কুটিরে গিয়ে তিনি নিজের রাজ-পরিচয় ভুলে যেতেন।

উদয়াদিত্যের বয়স তখন আঠারো। একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বইছিল, চারদিকে সবুজ কুঞ্জবন—সেই বসন্তে রুক্মিণীকে দেখলেন। যুবরাজের মনে তখন মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলছিল ; এত প্রখর আলো যে কিছুই ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলেন না—চারদিকে জগৎ জ্যোতির্ময়। বিশ্বচরাচর একতন্ত্র হয়ে তাঁকে বিপথে নিয়ে গেল ; মুহূর্তস্থায়ী এক নিদারুণ সংঘাতে তাঁর ক্ষুদ্র হৃদয় ধূলিধূসরিত হল। উদয়াদিত্যের জীবনে সে-এক নিবিড় অন্ধকার। দাদামশায় স্নেহভরে ডেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। অবশেষে সুরমার সঙ্গে বিবাহ হলে তার স্নেহ-প্রেমে-নির্ভরতায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন আত্মবিশ্বাসে। এক-একদিন গভীর রাত্রে সুরমার কাছে সেই পুরানো কাহিনী খণ্ডে-খণ্ডে আলোচনা করতে তাঁর ভারি ভালো লাগত। আত্মীয়-স্বজনের অনেক উপেক্ষা তিনি সয়েছিলেন ; কিন্তু সুরমার প্রতি অনাদর সহ্য করতে পারতেন না।

বসন্ত রায়ের সম্বন্ধে পিতার চক্রান্তের কথা শুনে উদয়াদিত্য অশ্বারোহণে পথিমধ্যে তাঁর কাছে উপস্থিত। পরে রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত জামাতা রামচন্দ্র রায়ের এক অপরাধে তাঁর বধের আদেশ হলে তিনি অন্তঃপুরের প্রহরী সীতারাম ও ভাগবতকে বন্ধন করে কৌশলে তাঁকে গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে যশোহর থেকে বসন্ত রায় বহিষ্কৃত হলেন। উদয়াদিত্য বললেন, 'সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা-কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্য যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।... আমি নিজের কষ্টের জন্য ভাবি না সুরমা, কিন্তু দাদামহাশয়ের প্রাণে যে বড়ো বাজিবে।' জামাতার পলায়নে কর্মচ্যুত প্রহরীদের তিনি বৃত্তি দিতে লাগলেন। প্রতাপাদিত্য নিষেধ করলে বললেন, 'পিতা, আমার যাহা-কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহারের সময় আমার সম্মুখে আট-নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন...তবে সে অন্ন যে আমার বিষ।'

সুরমাও রাজরোষ থেকে রক্ষা পেল না। আকস্মিকভাবে একদিন তার মৃত্যু

হল। উদয়াদিত্য ব্যাকুল হয়ে তার মুখখানি তুলে ধরে বললেন, 'সুরমা, সুরমা, তুমি কোথায় যাইবে সুরমা। আমার আর কে রহিল?' তার পরে সারা রাত্রি তার নিষ্প্রাণ দেহ কোলে নিয়ে বসে রইলেন। যুবরাজের অর্ধেক প্রাণ, অর্ধেক বল অন্তর্হিত হল। শয়নকক্ষে যেতেন, যেন কী ভাবতেন—দেখতেন, কেউ নেই। ক্রমে তাঁর মনে এক অন্ধ ভয় উপস্থিত হল। একটি ছোটো মেয়েকে সুরমা বড়ো ভালোবাসত—সন্ধ্যাবেলায় তাকে কোলে নিয়ে উদয়াদিত্য ভাবতেন: সুরমা কি তার স্নেহের পুত্তলীকে দেখতে আসবে না? এমনসময়ে রুক্মিণী সেখানে এসে শৈশবের ভালোবাসার কথা উত্থাপন করলে। উদয়াদিত্য তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'ও-বিছানার কাছে তুমি যাইয়ো না। তুমি কি চাও, আমি এখনই দিতেছি।' রুক্মিণীর কথা-মতো তিনি তাকে স্বহস্তের আংটি খুলে দিলেন।

রুক্মিণীর এক অপচেষ্টায় উদয়াদিত্য কারারুদ্ধ হলেন। সঙ্গী হল তাঁর স্বামী-পরিত্যক্তা বোন বিভা। উদয়াদিত্য তাকে মহাভারত পড়ে শোনাতেন। এক-একবার প্রাণের মধ্যে হাহাকার করে উঠত। বলতেন, 'বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পলাইয়া যা। আমি শনিগ্রহ…তুই শ্বশুরবাড়ি যা।' এক রাত্রে এক প্রহরী তাঁকে কৌশলে মুক্ত করে আনলে। উদয়াদিত্য নদীতীরে বসন্ত রায়কে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু প্রহরী তাঁকে নৌকায় উঠতে অনুরোধ করায় চমকে উঠলেন: 'দাদামহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?…না দাদামহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।' শেষে বসন্ত রায়ের চোখের জলে তাঁর সমস্ত আপত্তিই গেল ভেসে।

কিন্তু রায়গড়ে উদয়াদিত্য আর আগের মতো আনন্দ পেলেন না। প্রজারা দূর-দূরান্ত থেকে দেখা করতে আসত। সেই স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যেও দাদামশায়ের সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাবনা গেল না। একদিন লুকিয়ে পালাবার সংকল্প করে প্রাসাদের বাইরে এসে যশোহরে চরের হাতে বন্দী হলেন। প্রতাপাদিত্যের আদেশে মুক্তিয়ার হত্যা করতে এসেছিল বসন্ত রায়কে। উদয়াদিত্য শুনে তার হাত ধরে বললেন, 'মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে, যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্ত রায়ের…আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চলো, আর বিলম্ব করিয়ো না।… মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি এক কালে সিংহাসন পাইব।…বৃদ্ধ নিরপরাধ পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না।' মুক্তিয়ারকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখে তিনি প্রাণপণে চিৎকার করে দাদামশায়কে সাবধান করে দিলেন।

বসন্ত রায়ের হত্যার পরে উদয়াদিত্য যশোহরের পথে খাদ্য স্পর্শ করলেন না। পিতার কাছে নীত হয়ে বললেন, 'আমি আপনার রাজ্য চাহি না। আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন, এই ভিক্ষা।…আমাকে পরিত্যাগ করুন,

আমি এখনই কাশী চলিয়া যাই। আর একটি ভিক্ষা—আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন। আমি সেখানে দাদামশায়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।' তৎপরে মন্দিরে গিয়ে শপথ করলেন : যশোহরের সূচ্যগ্রভূমিও যদি তিনি শাসন করেন—তবে দাদামশায়কে হত্যার সমস্ত পাপ তাঁরই।

উমা ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। সন্ত্রাসবাদী দলের এক সদস্যা। উমা তার সহকর্মী সুকুমারকে ভালোবাসত। কিন্তু দলপতি ভোগীলালের সঙ্গে তার বিবাহের উদ্‌যোগ করায় সে কান্নাকাটি করে অস্থির হল।

উমি ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। শৈলজার দু-বছরের শিশুকন্যা। কমলা গাজিপুরে এলে প্রথম-দর্শনেই উমি তাকে মাসি বলে সম্বোধন করলে। একটা বিশেষ বয়সের যে-কোনো মেয়েকে অপ্রিয় বোধ না-হলেই সে 'মাসি' বলে অভিহিত করত। শৈলজা-কমলার সখ্য গড়ে উঠলে তার চেষ্টা হল উভয়ের মনোযোগ নিজের দিকে সম্পূর্ণ একচেটে করে নেয়। উমা একদিন একটা পেন্‌সিল সংগ্রহ করে যেখানে-সেখানে আঁচড় কাটছিল, মনে করছিল—'পড়ছি।' কমলা তাকে আদরে উদ্‌বেজিত করে একজোড়া সোনার ব্রেসলেট পরিয়ে দিলে। উমা খুশি হয়ে সেই ঢলঢলে গহনা-জোড়া-সমেত দুটি হাত সন্তর্পণে তুলে ধরে সগর্বে মাকে দেখতে গেল। শৈলজা গহনা-দুটি ফেরত দিতে গেলে তার আর্তনাদ গগন ভেদ করে উঠল। কমলার দেওয়া গহনাগুলি না পেলে উমা দুধ খেতে চাইত না। কমলা গাজিপুর ত্যাগ করার পরে সে দু-হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলত, 'মাসি গ—গ গেছে।'

উমেশ ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। কমলার আশ্রিত এক কায়স্থ বালক। পশ্চিমের পথে রমেশ কমলার সঙ্গে তখন স্টিমারে। বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ সেই স্টিমারে কাশীতে মাতামহীর কাছে পালিয়ে যাচ্ছিল। কাশী পৌঁছবার খরচ ও বেতনের প্রলোভনে সে জল-তোলা বাসন-মাজা প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হল। কমলাকে বললে, 'মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ তবে আমি আর কোথাও যাই না।'

কমলা রমেশের কাছে টাকা আদায় করা আদৌ সহজ মনে করে না—এই-ধারণার বশবর্তী হয়ে উমেশ সংসার চালাবার গুটিকয়েক সহজ কৌশল উদ্ভাবন করলে। পরদিন তীরে নেমে কারও সম্মতির অপেক্ষা না-করেই সে গ্রামস্থ কারও চাল, কারও খেত থেকে বিবিধ তরিতরকারি চয়নে প্রবৃত্ত হল। জাহাজ ছেড়ে দিতে চাঙারি-মাথায় ছুটতে-ছুটতে সে জাহাজ থামাবার অনুনয় করলে। রমেশ জাহাজ থামিয়ে চুরির জন্য ভৎর্সনা করায় বললে, 'চুরি করিব কেন? খেতে

কত ছিল, আমি অল্প এই-কটি আনিয়াছি বৈ তো নয়, ইহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে ?' কমলাকে বললে, 'মা, এইগুলিকে আমাদের দেশে পিড়িং শাক বলে, ইহার চচ্চড়ি বড়ো সরেস হয় ।' শাক-বেগুন-কাঁচকলা সম্বন্ধে উমেশ একরকম নিশ্চিন্ত হয়েছিল—কিন্তু নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে মাছ সংগ্রহের উপায় স্থির করতে পারে নি। কমলা মাছের কথা উত্থাপন করায় বললে, 'সেটা তো মিনি-পয়সায় হইবার জো নাই ।···যদি বাবুকে বলিয়া কোনোমতে গণ্ডা-পাঁচেক পয়সা জোগাড় করিতে পার, তবে একটা বড়ো রুই আনিতে পারি।' কমলার কাছে টাকা পেয়ে সে মাছ এনে বললে, 'এক টাকার কমে কিছুতেই দিল না।...আস্ত টাকা একবার বাহির হইলে ফেরানো শক্ত।' বলা বাহুল্য, সেদিন তার ভোজনের উৎসাহ আশঙ্কাজনক হল। রাত্রে একসময়ে বাইরের ডেকে রোদনোচ্ছ্বসিত কমলাকে দেখে সে কারণ বুঝতে পারল না—পীড়িতচিত্তে সান্ত্বনার ভাষা না-পেয়ে বললে, 'মা, তুমি যে সেই টাকাটা দিয়াছিলে, তার থেকে সাত আনা বাঁচিয়াছে।'

গাজিপুরের বৃদ্ধ চক্রবর্তীর সঙ্গে তাদের আলাপ হল। কমলার স্নেহরাজ্যের সেই শরিককে উমেশের ভালো লাগল না। উমেশের সকালবেলাকার ঝুড়িটি নিয়ে প্রত্যহ কলরব উঠত; রমেশ উপস্থিত থাকলে চৌর্য সন্দেহ করত। কমলা বলত, তাকে পয়সা দিয়েছে। কিন্তু হিসাব চাইলে একবারের হিসাবের সঙ্গে অন্যবার মিলত না। উমেশ বলত, 'আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব তবে আমার এমন দশা হইবে কেন ? আমি তো গোমস্তা হইতে পারিতাম, কী বলেন দাদাঠাকুর ?'

রমেশ-কমলা গাজিপুরে নামল। উমেশও কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে তাদের সঙ্গে চলল। একদিন রমেশের অনুপস্থিতিতে সে যাত্রা শুনতে যেতে চাইলে এবং কমলার কাছ থেকে অনাবশ্যক পাঁচটি টাকা আর দু-জোড়া শাড়ি উপহার পেলে। ধুতির শুভ্রতা এবং উত্তরচ্ছদের অভাব সম্বন্ধে উমেশ সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। শাড়ির চওড়া পাড় দেখে কমলাকে প্রণাম করে সে হাস্যদমনের চেষ্টায় মুখখানাকে বিকৃত করে তুলল। সকালে চওড়া-পাড়ের বাহারে-ধুতি পরে ফিরে এসে কমলাকে না-দেখে সে চক্রবর্তীর বাড়িতে এসে সন্ধান করলে; তৎপরে গঙ্গাতীরে এসে জলের মধ্যে পড়ে পাগলের মতো হাতড়াতে লাগল—মুখ দিয়ে জল ফেলতে-ফেলতে বললে, 'আমি উঠিব না, আমি উঠিব না। মা গো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।' কিন্তু মাছের মতো সে সাঁতার দিতে পারত—জলে আত্মহত্যা করা তার পক্ষে কঠিন। শ্রান্ত হয়ে শেষে তীরের উপরে পড়ে সে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল।

কমলার সন্ধানে চক্রবর্তী কাশী স্টেশনে নেমে দেখলেন—উমেশও গাড়ি থেকে নামছে। অনেক চেষ্টায় তিনি তাকে গাজিপুরে পাঠালেন; কিন্তু সে গাজিপুরে টিকতে পারল না। একদিন চক্রবর্তী-গৃহিণীর বাজারের পয়সা নিয়ে

সে গঙ্গাপার হয়ে এল স্টেশনে। মোগলসরাইয়ের গাড়িতে কমলার দেখা পেয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তার মুখ ভরে উঠল হাসিতে। কমলার দেওয়া পাঁচটি টাকা তখনও তার সঙ্গে ছিল; তাতে কাশীর টিকিট কিনে তাকে চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে গেল। কমলা স্বামিগৃহে প্রতিষ্ঠিত হলে উমেশও সেখানে গিয়ে উঠল।

ঊর্মিমালা ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শর্মিলার বোন। ঊর্মিমালা প্রিয়জাতের মেয়ে। ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, সে বসন্ত ঋতু।—'গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণি-কোঠায়, যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে-ঝংকারে বেজে-বেজে ওঠে সর্বদেহে-মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।' ঊর্মি যতটা 'দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা ··· সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়ান্সে যেমন···সাহিত্যে তার চেয়ে বেশী··· ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে...অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না।...রেডিয়োতে কান পাতে...টেনিস খেলে, ব্যাডমিন্টন খেলায় ওস্তাদ।···তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো, একটু হাওয়াতেই দুলে ওঠে। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে শাড়িটাতে এখানে-ওখানে...টিল দিয়ে, আঁট করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়···গান ভালো গাইতে জানে না...সেতার বাজায়। সেই সংগীত দেখবার না শোনবার কে জানে।···কথা কবার বিষয়ের অভাব ঘটে না...হাসবার জন্যে সংগত কারণের ...সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, যেখানে থাকে...একলা ভরিয়ে রাখে।'

ঊর্মির স্বভাব তার দাদা হেমন্তেরই মতো প্রাণপরিপূর্ণ; সে-ই তার মনকে মুক্তি দিয়েছে। কেবল নীরদের কাছে সে অন্য মানুষ—'পালের নৌকোয় হাওয়া যায় বন্ধ হয়ে, গুণের টানে চলে নম্রমন্থর গমনে।' হেমন্তের অকালমৃত্যুতে পিতা রাজারামবাবুর অন্তিম ইচ্ছা ছিল: ডাক্তার নীরদকে বিবাহ করে সে নিয়োজিত হয় সেবাব্রতে। ঊর্মি স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—কিন্তু তার মন ছুটত হালকা সাহিত্যের বইয়ে, সালিভানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয়ে। নীরদ তিরস্কার করলে আশ্চর্য হয়ে ভাবত, 'এ-মানুষটার কী অসাধারণ অন্তরদৃষ্টি। শোকস্মৃতির প্রবলতা সত্যই তো কমে আসছে—আমি নিজে তো বুঝতে পারি নি। ধিক্, এত চাপল্য আমার চরিত্রে।' নীরদের শাসনে তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হল। এই অতিশাসন ঋণশোধের মতো—নীরদ যেন তার দায়িত্ব নিয়ে নিজের সাধনাকে ভারাক্রান্ত করেছে। তবুও এক-এক সময় দুর্বার হয়ে উঠত বেদনা: নীরদ তাকে চালনাই করে, এক-মুহূর্ত তার সাধনা করে না কেন। ঊর্মির কর্তব্যসাধন হয়ে পড়ত প্রাণহীন; অর্ধরাত্রে অনতিস্ফুট জ্যোৎস্নায় মনে হত, জীবনটা অবিচলিত কঠিন কৃপণ। নীরদের শাসনে তার

ভবানীপুরে দিদির কাছে যাতায়াতও বন্ধ হল। মনে-মনে তাকে মানতেই হল যে, ভগ্নীপতি শশাঙ্কদা বিশেষ করে দৌরাত্ম্য করেন বলেই তাঁকে তার এত ভালো লাগে, তার নিজের ছেলেমানুষিও ঢেউ খেলিয়ে ওঠে।

রাজারামবাবুর মৃত্যুর পরে নীরদ গেল বিলেতে। ঊর্মি কলেজে যেত; বাকি সময়টা নিজেকে আবদ্ধ রাখত জেনানায়। এককালে যুবকদলের মধ্যে তার ভক্ত ছিল অনেক। ভালোবাসার ইচ্ছাটাই এখন মৃদুমন্দ বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। তাই নীরদের একখানি ফোটোগ্রাফ রাখলে ডেস্কের উপরে; মনে-মনে জপ করলে, 'কী প্রতিভা! কী তপস্যা! কী নির্মল চরিত্র! কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য!' ঊর্মি কনভেন্টে পড়েছিল—ইংরেজিতে পাকা। সে মনে-মনে হাসত, হাসতে লজ্জা পেত নীরদের উপদেশপূর্ণ দীর্ঘ চিঠির অক্ষম ইংরেজিতে। এমন সময় ডাক এল ভবানীপুর থেকে শর্মিলার কঠিন অসুখে। ঊর্মি উৎসাহিত হয়ে উঠল: রোগীর শুশ্রূষার কাজটা তার ভাবীকালের ডাক্তারি-কাজেরই অঙ্গ। তা ছাড়া, তার এম. এসসি. পরীক্ষার বিষয় ছিল শারীরতত্ত্ব। বই-খাতা ব্যাগে পুরে তখনই সে ভবানীপুরে উপস্থিত।

সে বই-পড়া মেয়ে। সংসারের কর্মধারার চিন্তার সূত্রটি ছিল তার দিদির মধ্যে। ঊর্মির কাজগুলি যেন খেলা, এক-এক রকম ছুটি—যেন পিকনিক। ভুল হয়, ত্রুটি হয়—সে সব-কিছুতেই উচ্ছ্বসিত। ভগ্নীপতি শশাঙ্কের সান্নিধ্যে সে ছুটির হিল্লোল অনুভব করে। নিজেরই ছুটির আনন্দে সে এখানকার সমস্ত কিছু পূর্ণ করেছে, দিনরাত্রি চঞ্চল—সে শুধু সেবায় নয়, তারই রসময় স্বরূপে। শশাঙ্ক আনন্দিত: এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতেই সে গৌরবান্বিত। শশাঙ্কের কাজের দরদ সে বোঝে না, তিরস্কার করলে তার অভিমান দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে—তাকে নিয়ে যেতে হয় নিউ মার্কেটে, এরোপ্লেন-ওড়া দেখতে দমদম-পর্যন্ত। ছুটির দিনে শশাঙ্কের আপিস-ঘরে এসে বলে, 'পরেশনাথের মন্দির দেখাতে নিয়ে যাবে। চলো আমার সঙ্গে লক্ষ্মীটি।' শশাঙ্ক বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে বসে; ঊর্মি তার কাছে চৌকি টেনে বলে, 'বুঝিয়ে দাও।' সহজেই বুঝত, গাণিতিক নিয়মগুলো জটিল ঠেকত না। কখনো নিতান্ত অসময়ে বেরোতে হত মোটর হাঁকিয়ে। এক-একদিন কঠিন দায়িত্বের কথা মনে হলে সে বই খুলে মাথা গুঁজে বসত; মনে তবু না ভেবে পারত না: নীরদ একটা মনের মতো চিঠি লিখতে পারে না কেন।

ফাল্গুন মাসের হোলির দিনে ঊর্মি দিদির পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করলে। চুপি-চুপি আপিস-ঘরে শশাঙ্কের মাথায় দিলে আবীর। ঠেলাঠেলি-চেঁচামেচিতে সমস্ত বাড়ি মুখরিত। রাত্রে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখা ছাড়িয়ে উঠল পূর্ণচাঁদ। ঊর্মির বুকের মধ্যে রক্তের দোলা—যেন বসন্তকালে মাধবীলতার ফুল ফোটানোর বেদনা। গভীর রাত্রে বুক ফেটে এল কান্না। পরদিন অনুতপ্ত হয়ে সে চলে এল নিজের বাড়ি। এসে দেখলে নীরদের চিঠি: কোনো য়ুরোপীয় মহিলাকে তার

বিবাহ করার সংকল্প। ঊর্মি লাফিয়ে উঠল—মুক্তির আনন্দে এনগেজমেন্ট আংটিটা ছুঁড়ে ফেললে ভিক্ষুকের দিকে। এমন সময়ে শশাঙ্কের আবির্ভাব। চোখে লাগল ঘোর, মনে আবিলতা। সেদিন রাত্রে যখন ভবানীপুরে ফিরল—সংসারের সমস্ত দাবি, ভয়লজ্জা লুপ্ত।

একদিন দিদির ঘরে ডাক পড়ল : শশাঙ্ক কাজে ফাঁকি দিয়ে সর্বনাশের প্রান্তসীমায়। ঊর্মি বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেল নিজের মনের রহস্য; দিদির পায়ে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে আমাকে, এখনই দূর করে তাড়িয়ে দাও।' আর সে দিদির কাছছাড়া হল না—ওষুধপত্র দেওয়া, নাওয়ানো-খাওয়ানোর ভার নিলে নিজের হাতে। আবার সে বই পড়তে আরম্ভ করলে, দিদির বিছানার ধারে। নিজেকে আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না। তবুও দিদির অনুরোধে দু-একবার বাইরে যেতে উৎসাহই দেখা গেল। অবশেষে শর্মিলা আরোগ্য লাভ করে স্বামীর সঙ্গে তার মিলন ঘটাতে চাইলেন। ঊর্মি বললে, 'আমি কিছু ভাবতে পারি নে। তোমরা দুজনে যা ঠিক করবে তাই হবে।' তার পরে বাড়ি গেল সাত দিনের মেয়াদে।

মেয়াদ-অন্তে এল তার চিঠি। একটি শশাঙ্কের নামে : 'চলেছি বিলেতে। বাবার আদেশমতো ডাক্তারি শিখে আসব।...তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করে গেলুম ইতিমধ্যে কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে।' অন্যটি দিদিকে : 'দিদি, শত-সহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে অপরাধ করেছি, মাপ কোরো।...কিসে সুখ তাই-বা নিশ্চিত কী জানি।...ভুল করতে ভয় করি।'

এক্রাম সর্দার ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। হরিশ কুণ্ডুর এক লাঠিয়াল।

এলালতা ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলালতার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। অবিমিশ্র সত্যকথা বলা তার ব্যসনের মতো ছিল। কিন্তু, মা মায়াময়ীর অকারণ সন্দেহের আঘাতে তার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্দম। নানা উপলক্ষে মায়ের কাছে বাপের অসম্মানে নিষ্ফল আক্রোশে তার চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত। বাপের অতিমাত্র ধৈর্যের জন্য তাঁকে অপরাধী না করে পারত না। মায়াময়ী প্রায়ই এই আশঙ্কা ব্যক্ত করতেন যে, এলা তার ভাবী শাশুড়ির হাড় জ্বালাতন করবে। তাই বিবাহের প্রতি এলার বিমুখতা ছিল সংস্কারগত।

মায়ের বিশেষ অবিচারে আহত হয়ে এলা পড়তে গেল কলকাতায়। তার ম্যাট্রিক পাশ করার পরেই মার মৃত্যু। সুন্দরী এলার পাত্রের পক্ষে প্রার্থীর অভাব ছিল না। কিন্তু পরীক্ষাগুলি সে পাস করলে, বিবাহ করলে না। বাপের মৃত্যুর পর এল সে কাকার আশ্রয়ে। সেখানে খুড়তুতো বোন সুরমাকে পড়ানোর ভার নিয়ে মঙ্গলকাব্য আর চসারের একটা তুলনামূলক থীসিস লিখতে শুরু করে সে নিজের চারদিকে একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। কিন্তু বুঝতে দেরি হল না, কাকার

"কী খবর?"

"আজ তোর খোঁজে পুলিস আসবে [illegible]

"আমি কি ভাবছিলুম না একদিন পুলিস ধরবে আমাকে?"

"সেটা সহজ কথা নয়। অপমান করবে। তোমার মতো মেয়ের পক্ষে [illegible] হত। এইজন্যেই আমাকে আসতে হোলো। অন্য যাদের উপর হুকুম হয়েছিল সবাইকে ঠেলে চলে এসেছি।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "মারো আমাকে অন্তু, তোমার নিজের হাতে,—তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার হতে পারে না।"

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে, "এই মত মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন কঠোর সুরে বললে—"যাও, এখনি শুতে যাও। হুকুম করছি, শুতে যাও।"

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বারবার বলতে লাগল—"অন্তু, অন্তু আমার, রাজা, ~~[illegible]~~ আমার, দেবতা, ~~[illegible]~~ আমার, আর কারো হাত দিয়ে আমাকে মারতে দিয়ো না। তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, তুমি আমাকে মারো।"

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। বললে, "শোও, এখনি শোও, ঘুমোও!"

"ঘুম হবে না।"

স্নেহের সঙ্গে তাঁর সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটতে বসেছে। এমন সময়ে সেখানে দেশনেতা ইন্দ্রনাথের আগমন। এলা অসংকোচে তাঁর কাছে গিয়ে কাজ চাইলে। ইন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।' এলার বুক কেঁপে উঠল : 'ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না।... আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ'; কিন্তু ভান করতে পারব না।' ইন্দ্রনাথ বললেন, 'সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বন্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও, তুমি দেশের।' এলা মাথা উঁচু করে বললে, 'এই প্রতিজ্ঞাই আমার।' আচরে দলের মধ্যে তার প্রেরণা জ্বলে উঠল দীপবর্তিকার মতো। যৌবনের স্বধর্মে কখনো মন চঞ্চল হলেও সেই চঞ্চলতা জয় করে সে অনুভব করত নিজের শক্তির গর্ব।

সেবার স্টীমারে মোকামাঘাটে অতীনকে দেখে তার একচমকের চির-পরিচয় ঘটে গেল। মন বললে, 'কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চারিদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম।...এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।' হঠাৎ অতীনের কাছে এসে বললে, 'আপনি খদ্দর পরেন না কেন?' ঘাটে পৌঁছে অতীনকে কুলির সন্ধান করতে দেখে ভালোমানুষের মতো এসে বললে, 'কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্ছি।' বলেই অতীনের ছোটো সুটকেশটা তুলে নিলে। নিজের সাতগুণ ভারী বাক্সটা দেখিয়ে বললে, 'সংকোচ বোধ করেন তো... আমার বাক্সটা ওই আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।' আধুনিক আভিজাত্যের নিদর্শন-রূপে এলার ছিল থার্ড ক্লাসের টিকিট। অতীন সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলে তারও মন প্রবল টান দিলে সেই দিকে। অতীন সাহিত্যের অমরাবতীর স্পর্শ-পাওয়া প্রতিভাবান ছেলে। এলার মন পাবার জন্য সে দলের মধ্যে এসে পড়ল। ইতিমধ্যে দেশে এল বন্যা। এলা তার বক্তৃতায় বললে, 'যে অশ্রু-প্লাবিত দুর্দিনে বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে-সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই।' অতীন নিজের কাপড়ের তোরঙ্গ তার পায়ের নিচে এনে দিলে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল। সকল পদাতিকের সঙ্গে অতীনকে মিলিয়ে নিতে তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; বুঝেছিল, অতীনের সংশোধনের জন্য তার ঈর্ষারও প্রয়োজন। অতীনের জন্মদিনের উৎসবেও সে স্নেহযত্ন-কুশলসম্ভাষণ প্রভৃতির চটকে ঘোরতর দিদিয়ানা শুরু করলে। অবশেষে অনেক রাত্রে তার ভক্তদলের হাত এড়িয়ে অতীন উপহার পেল প্রথম চুম্বনের পুরস্কার। সেদিন এলার মুখে তার নাম হল—অন্তু।

দিনে-দিনে এলা দলের সম্বন্ধে আস্থা হারাতে লাগল। ইন্দ্রনাথকে বললে, 'যতই দিন যাচ্ছে...আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির

কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।...আমার ভালোবাসা দিনে-দিনেই আমার অন্য-সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।...মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।'

সেদিন দিনশেষে এলা ঘরে বসে লিখছিল। বেগনি-রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, হাতে একজোড়া লালরঙের শাঁখা, গলায় সোনার হার। 'হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট ; মনে হয় বয়স খুব কম, কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য।' এক-প্রান্তে খদ্দরের সবুজরঙের চাদরে-ঢাকা লোহার খাট, মেঝেতে পাতা নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ। অতীন এসে তাকে গ্রহণ না করবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে। এলা বললে, 'উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো।...দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।...অন্তু, শাস্তির সীমা নেই...যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে-হৃদয়ে গাঁট বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এত-বড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে।...অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।' অতীন তার প্রেমে সন্দেহ প্রকাশ করলে। এলা বললে, 'এমন কথা বলছ কী-করে অকৃতজ্ঞ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছু চাই নে এ-জগতে। যে-সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত, সে-সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।...মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে...প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এনেছি জগতে। সঙ্গে-সঙ্গে এনেছি জীব-প্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র।...যে-তৃপ্তির সামান্য উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত তলানিতে এসে।...তাই আমার সমস্ত দাবি তুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে।' অতীন তাকে বর্বরের মতো কেড়ে নিতে পারে নি বলে আক্ষেপ করলে। এলা তার বুকের উপরে পড়ে মুখের কাছে মুখ তুলে বললে, 'দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।' পর-মুহূর্তে দলের কর্মী বটুর লালায়িত দৃষ্টির কথা মনে হতে কোনো-একদিন তার কবলে পড়বার কল্পনায় ভীত হয়ে বললে, 'জানো অন্তু...বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।'

অনেকদিন অতীনের সংবাদ না পেয়ে অনেক কষ্টে তার ঠিকানা সংগ্রহ করে এলা গঙ্গার ধারে পোড়ো-বাড়িতে এসে আলুথালু-অন্ধবেগে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পূর্বে ত্যাগবীর ছেলেদের দৈন্যদশায় মনে-মনে সে গর্ব অনুভব করত। কিন্তু অতীনের এই দৈন্যদশায় তার কণ্ঠ এল রুদ্ধ হয়ে। ঘরটা গোছানোর চেষ্টায়

তার ঝুলির মধ্য থেকে ইংরেজী-বাংলা বইগুলি বার করে সে আর স্থির থাকতে পারল না ; মাটিতে পড়ে তার পায়ে লুটিয়ে বললে, 'মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।...যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি। ...কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ ?' অতীনকে নিজের পৈতৃক বাড়ি এবং জমা টাকা নিতে অনুরোধ করে বললে, 'ফিরে এস, অন্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ।...আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু...সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।'

বটু পুলিশের সঙ্গে চক্রান্ত করে এলাকে বিবাহ-প্রস্তাব পাঠালে ; এলা তার পত্রের উপর লিখে দিলে—'পিশাচ'। ফলে, পুলিসের হাতে তার মর্মান্তিক পরিণতির আশঙ্কায় দলপতির আদেশে অতীন তাকে খুন করতে এল সন্ধ্যায়। অতীনের ভগ্নস্বাস্থ্যে এলার বেদনার সীমা রইল না ; পুলিসের সতর্ক-দৃষ্টির নিশ্চিত বিপদ উপেক্ষা করে সেখানে আসার জন্যও উৎকণ্ঠিত। মিনতি করে বললে, 'কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।' অবশেষে তার উদ্দেশ্যের কথা শুনে বললে পা জড়িয়ে : 'মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে।' উঠে দাঁড়িয়ে চুমু খেয়ে-খেয়ে সে ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা—'একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ-দেহ তোমার।...অন্তু অন্তু আমার, আমার রাজা, আমার দেবতা...ভালোবাসার দোহাই, মারো আমাকে মারো'। তাকে ঘুম পাড়াতে অতীনের আগ্রহ দেখে বললে, 'কিছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ-মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফরম এনেছ ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি ; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষচুম্বন আজ অফুরান হল অন্তু। অন্তু।'

ওঙ্কারানন্দ স্বামী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। কৃষ্ণদয়ালের পরমার্থতত্ত্বের উপদেষ্টা।

ঔরংজীব ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক চরিত্র। শাজাহানের শেষ-বয়সে ঔরংজীব বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ দারা তখন দিল্লিতে। পিতার অসুস্থতার সংবাদে ঔরংজীব দারাকে পরাজিত ও নিহত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। সুজা বাংলার শাসনভার মঞ্জুরি চাইলে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে তাঁর শরীর-মনের স্বাস্থ্য ও পরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করে বলে পাঠালেন—যখন স্বয়ং সম্রাট শাজাহান সুজাকে বাংলার শাসনকার্যে নিয়োগ করেছেন তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরিপত্রের আবশ্যক কী। অনতিপরেই ঔরংজীবের বৃহৎ সৈন্যদল তাঁর পুত্র মহম্মদ এবং সেনাপতি মীরজুমলার সঙ্গে প্রেরিত হল। পিতৃব্য-কন্যার প্রণয়াকৃষ্ট মহম্মদ সুজার সঙ্গে যোগ দিয়ে ঢাকায় গেলে সেখানে ঔরংজীবের

এক পত্রবাহক চর ধরা পড়ল। ঔরংজীব লিখেছিলেন, 'প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ... রমণীর ছলনাময় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল-সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাঁহার হস্তে, তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন। যাহা হউক, ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে মাপ করিলাম। কিন্তু যে-কার্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।' এই-কৌশলে তিনি সুজার সঙ্গে তার মনান্তর ঘটালেন।

কপালীচরণ ॥ 'করুণা' উপন্যাস। করুণার গ্রামস্থ এক নেটিব ডাক্তার। করুণার শিশুর অসুখে কপালীচরণ চিকিৎসা করেন। ফি দেবার সময় বলেন, অসুখ আগে সারুক। কিন্তু বাড়াবাড়ি অসুখের সময় ডাকতে গেলে বিল পাঠিয়ে দিলেন এবং হিসাব বুঝে পেয়ে এসে অম্লানবদনে বললেন, 'ছেলে বাঁচবে না।'

কমরুদ্দি বিশ্বাস ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের এক প্রজা।

কমলা ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। কমলা মাতৃগর্ভে থাকাকালে তার পিতার মৃত্যু হয়। মাতুলালয় ধোবাপুকুরে জন্মকালেই মাতৃহীনা হয়ে সে বিধবা মাসির কোলে মানুষ। অবশেষে তারও মৃত্যু হলে মামা-মামির দাসত্ব সয়ে বড়ো হতে লাগল। চোদ্দ-বছর বয়সেও তার পাত্র জোটবার সম্ভাবনা ছিল না; রংপুরের ডাক্তার নলিনাক্ষ নৌকায় কলকাতা যাবার পথে হঠাৎ তাকে বিবাহ করে বসল।

কমলার সঙ্গিনীরা বড়ো খ্যাপাতে আরম্ভ করেছিল। বেশি বয়সে বরকে পেয়ে সে যে সাতরাজার ধন মানিক পায় নি, তা দেখাবার জন্যই সে স্বামীকে দেখলে না। অনেক রাত্রে বিবাহের লগ্ন ছিল, নিতান্ত ক্লান্ত শরীরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে উঠে দেখলে, বিছানায় কেউ নেই। যেদিন বিকেলে সে নতনেত্রে স্বামীর সঙ্গে নৌকায় উঠল, সেদিনই ঘণ্টা-দুয়েক পরে ঘূর্ণিবাতাসে তাদের নৌকাডুবি। পদ্মার চরে অর্ধ-অচেতন কমলাকে পত্নীজ্ঞানে চেতনা সম্পাদন করলে রমেশ। নিজের অনিচ্ছায় সুশীলাকে বিবাহ করে ফেরার পথে তারও নৌকাডুবি। তার পিতা ও আত্মীয়স্বজন সকলেই নিরুদ্দিষ্ট। কমলা জ্ঞানলাভ করে অব্যক্ত কান্নায় উচ্ছ্বসিত; পরে স্বামীজ্ঞানে তার সঙ্গে এল। শাঁখ বাজল না, উলুধ্বনি হল না—তবু কাজকর্মের অবকাশে অল্পে-অল্পে তাদের প্রণয়-গ্রন্থি আঁট হয়ে এল।

তিন-মাস পরে একদিন কমলা বললে, 'আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?...আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে? আমি তো শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত—না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুচিবে না।'

রমেশ নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলে, বিবাহের সময় তাকে দেখে সে কী ভেবেছিল? কমলা বললে, 'আমি তো তোমাকে দেখি নাই...যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল—তোমার নাম আমি শুনিই নাই।'

রমেশ সমস্যা সমাধানের উপায় না-দেখে কলকাতায় এসে তাকে রাখতে গেল স্কুলে। কমলা ভীত হয়ে তার হাত চেপে ধরল। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে থাকতে হল বোর্ডিঙে। ছুটির সময় মেয়েদের বাড়ি যেতে দেখে সে কান্নাকাটি করে ফিরে এল। এই ক'মাসে অনতিপল্লবিতা লতার মতো কমলা অনেকখানি বেড়ে উঠেছিল: মুখ নত করে যখন সে ইংরেজিশিক্ষার বই থেকে ছবি দেখছিল, সোনার কাঠির মতো তার মুখখানি চারিদিকের সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তুলছিল। রমেশকে চিন্তিত দেখে সে বললে, 'আচ্ছা, আমি ছুটির সময়ে ইস্কুলে থাকিতে চাহি নাই বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ?' রমেশ পড়াশুনার বিষয়ে প্রশ্ন করায় সে ভূগোল-প্রবেশের ছবি দেখিয়ে পৃথিবীর গোলাকৃতি-সম্বন্ধে তার বিস্ময় উৎপাদনের চেষ্টা করলে। রমেশ হেমনলিনীকে বিবাহের উদ্যোগ করেছিল। সহসা সেখানে সন্দেহের ছায়াপাতে সে কমলাকে নিয়ে দেশে যাত্রা করলে। গোয়ালন্দে এসে তাদের গন্তব্য বদল হল পশ্চিমে।

স্টীমারে দরমা-ঘেরা একটা জায়গায় রান্নার ব্যবস্থা হল; উমেশ নামে একটি কায়স্থ বালকও জুটে গেল। কমলার বাইরের সহায়তার প্রয়োজন ছিল না। মামার বাড়িতে সে চিরকাল রান্নাবাড়া, ছেলে মানুষ করার কাজে অভ্যস্ত। উমেশের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যেই সে সমস্ত ব্যবস্থা করে নিলে। সেই মাতৃহীন বালকটির মাতৃ-সম্বোধন তার হৃদয়ের গভীর তলদেশে সাড়া জাগাল; বললে: 'উমেশ, তুই আমাদের সঙ্গেই চল।' রাত্রে ওকে রমেশ একটা গল্প বানিয়ে বললে: কোনো ক্ষত্রিয়েরা নিজে বিবাহ করতে না গিয়ে তলোয়ার পাঠাত। এইভাবে বিবাহের পরে কাঞ্চীরাজকন্যা চন্দ্রা যাত্রাপথে অন্য-এক বিবাহের যাত্রীদলে মিলিত হয়। কিছুকাল পরে সে-পক্ষের বর বুঝতে পারে, সে রাজকুমারী চন্দ্রা। রমেশ প্রশ্ন করলে: সে-পক্ষের বর কি চন্দ্রার কাছে সমস্ত প্রকাশ করবে? কমলা বললে, 'তুমি বেশ যা-হোক, না বলিয়া বুঝি সমস্ত গোলমাল করিয়া রাখিবে? সে-যে বড়ো বিশ্রী।' পরে রমেশের নির্দেশে অনিচ্ছুক পদক্ষেপে পাশের ঘরে যেতে তার উদ্গত অশ্রু বাধা মানল না।

ক্রমে কমলার চোখে-মুখে গ্রীবার আন্দোলনে তার অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল। তখনই গাজিপুরের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ। সেই বৃদ্ধকে নিয়ে হেসে-বকে রেঁধে-খাইয়ে কমলার হৃদয়স্রোত বাধা অতিক্রম করে গেল। রমেশের অনিচ্ছাসত্ত্বেও উমেশকে নিয়ে সে নেমে পড়ল গাজিপুরে। চক্রবর্তীর ছোটো মেয়ে শৈলজার সঙ্গে অচিরে গড়ে উঠল সখ্য। শৈলজার জীবন থেকে

প্রেমালোকের ছটা এবং উত্তাপ প্রতিফলিত হয়ে তার নারী-প্রকৃতি সুপ্তি থেকে জেগে উঠল। স্থানাভাবে রমেশকে থাকতে হল বাইরের ঘরে। একদিন শৈলজার ছলনায় সে ভিতরে এসে প্রশ্ন করলে : কমলা কি তাকে ডেকেছে ? কমলা বলে উঠল, 'না না না, আমি ডাকি নাই—আমি কেন ডাকিতে যাইব ?' গাজিপুরে আসার পরেই সে বুঝেছিল, কাছে পেলেই পাওয়া হয় না, ডেকে আনলেই আসা হয় না।

শেষে গঙ্গাতীরে একটা বাসা পেয়ে কমলা ধোয়ামোছা এবং সাজানো-গোছানোয় ব্যাপৃত ছিল। যেদিন সমস্ত শেষ হল, রমেশের হস্তস্খলিত একটি চিঠিতে সে স্বামীর পরিচয় জানতে পারল। সকালে শৈলজার কাঁধে মুখ লুকিয়ে তার কান্না আর বাধা মানল না। সেদিন এলাহাবাদ থেকে রমেশের একটা চিঠি পেয়ে তার মনে হল, যেন হাত দিয়ে সে একটা পঙ্কিল পদার্থ নাড়ছে। উমেশকে যথোচিত পুরস্কৃত করে সে যাত্রা শুনতে পাঠালে; পরে শৈলজার শিশুকন্যা উমাকে একজোড়া ব্রেসলেট পরিয়ে বললে, 'তোদের এখান হইতে আমি তো আজ চলিলাম দিদি—খুব সুখে ছিলাম—এমন সুখ আমার জীবনে কখনো পাই নাই।'

সন্ধ্যাবেলায় স্নানের ছলে গঙ্গাতীরে এসে কমলা অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করলে। গুরুজনের উদ্দেশে প্রণাম জানাতে গিয়ে আর-একটি প্রণম্য ব্যক্তির কথা মনে হল। কিন্তু সেই জীবনেশ্বরকে স্মরণ করবার সম্বল কিছুই ছিল না। বালুতটে বসে গোধূলির আলোকে আবার সে রমেশের চিঠিখানি পড়লে : তিনি নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়। কমলা অশ্রুচোখে প্রাণপণে বললে, 'আমি যদি সতী হই, তবে এই জীবনেই আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইব, বিধাতা আমাকে কখনোই বাধা দিতে পারিবেন না।' রুমালে-বাঁধা চাবির গোছা আর রমেশের দেওয়া ব্রোচটি জলের মধ্যে ফেলে সে চলতে লাগল পশ্চিমের দিকে। প্রত্যুষে একটি প্রৌঢ়ার সঙ্গে দেখা—নাম নবীনকালী। কমলা রান্নাবাড়ার ভার নিয়ে তাঁর বজরায় আশ্রয় পেল। কিন্তু সেই আশ্রয়ে অল্পদিনেই তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। কাশীতে এসে একদিন নবীনকালী নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডাক দিলেন। কমলা সর্বাঙ্গমনে পুলকিত হয়ে তাঁকে দেখে ভাবলে, 'আমার মতো হতভাগিনীর এমন স্বামী! দেবতার মতো এমন সৌম্য-নির্মল প্রসন্ন-সুন্দর মূর্তি! ওগো ঠাকুর, আমার সকল দুঃখ সার্থক হইয়াছে।' নবীনকালী অতঃপর মিরাট যাত্রার উদ্যোগ করায় সে বললে, 'আমাকে দয়া করুন, আমাকে এখান হইতে লইয়া যাইবেন না।' কিন্তু ফল হল না। যাত্রার পথে রেলগাড়ির দ্রুত-ধাবনের মধ্যে ঘাট, বাড়ি, মন্দিরচূড়া, যা-কিছু কমলার চোখে পড়ল—সমস্তই নলিনাক্ষের আবির্ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হয়ে তাকে স্পর্শ করলে। অবশেষে মোগলসরাইয়ে উমেশকে দেখে সে অলক্ষ্যে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

উমেশের সঙ্গে কমলা এল চক্রবর্তীর কাছে। তিনি তখন শৈলজার সঙ্গে

কাশীতে। সমস্ত শুনে চক্রবর্তী তাকে স্বামীত্যক্তা হরিদাসী-পরিচয়ে নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরীর কাছে রেখে এলেন। কমলা প্রথম দিনেই তাঁর ঘরকন্নার ভার চেয়ে নিলে। স্নানান্তে বিছানার শিয়রের কাছে গা-আলমারিতে নলিনাক্ষের একজোড়া খড়ম দেখে সে ছোটো শিশুটির মতো বুকের কাছে ধরে আঁচল দিয়ে মুছে রাখলে। হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহের প্রস্তাব হল। হেমনলিনীর আনা কয়েকটি ফুল নলিনাক্ষের খড়ম-জোড়ার উপরে রেখে প্রণাম করতে কমলা আর অশ্রুসংবরণ করতে পারল না। সন্ধ্যাবেলায় তার মলিনমুখ দেখে ক্ষেমংকরী চক্রবর্তীর কাছে পাঠাতে চাইলেন। সে বললে, 'বেশ আছি মা…আমি যদি কখনো তোমার পায়ে অপরাধ করি আমাকে তুমি যেমন খুশি শাস্তি দিয়ো, কিন্তু একদিনের জন্যও দূরে পাঠাইয়ো না।' অন্ধকার শয়নকক্ষে দ্বার রুদ্ধ করে সে মাটির উপরে বসে মনে-মনে বলতে লাগল: 'আমি কাল হইতে যেন কোন দুঃখকে মনে স্থান না দিই, যেন এক মুহূর্ত মুখ বিরস না করি…যতদিন জীবন আছে কেবল সেবা করিব, আর-কিছু চাহিব না—চাহিব না—চাহিব না।'

পরদিন হেমনলিনী সংসার সম্বন্ধে নিজের অনভিজ্ঞতার উল্লেখ করলে। কমলা শিশুর মতো সরলচিত্তে বললে, 'দিদি, আমাকে কি তোমার ভালো লাগিবে? …আমি ভারি মূর্খ।…ভার তুমি সমস্ত আমার উপর দিয়ো।…আমরা দুই বোন মিলিয়া সংসার চালাইব, তুমি তাঁহাকে সুখে রাখিবে, আমি তোমাদের সেবা করিব।' হেমনলিনী প্রশ্ন করলে: স্বামীকে কী তার মনে পড়ে? কমলা স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বললে, 'স্বামীকে যে মনে করিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না দিদি। খুড়ার বাড়িতে যখন আসিলাম তখন আমার খুড়তুতো বোন…স্বামীকে যেরকম করিয়া সেবা করেন তাহা চক্ষে দেখিয়া আমার প্রথম চৈতন্য জন্মিল।… ভগবান আমার সেই পূজার ফল দিয়াছেন, এখন আমার স্বামী আমার মনের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, তিনি আমাকে গ্রহণ না'ই করিলেন—কিন্তু আমি তাঁহাকে এখন পাইয়াছি।' শৈলজা একদিন কমলাকে স্বামীর কাছে তার পরিচয় দিতে বললে। কমলা বললে, 'না দিদি, না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি…আমার কথা কাহাকেও বলিবার নয়…আমার কোনো দুঃখ নাই'। কমলা একদিন চক্রবর্তীর বাসায় গেলে সহসা রমেশ এসে নলিনাক্ষের কাছে তার নির্দোষিতার কথা জানাতে চাইলে। জোড়হাতে কমলা বললে, 'আমার কথা কাহারও কাছে বলিবেন না, আমার এই মিনতি রাখিবেন।'

হেমনলিনী পরে পরিচয় জেনে তাকে জড়িয়ে ধরলে: 'কমলা।' সে বললে, 'ভাই, আমার নাম যে কেহ জানে সে আমার ইচ্ছা নয়।' কিন্তু স্বামীকে বঞ্চনা করার কথায় সে বিবর্ণ মুখে বসে পড়ল: 'আমি কেমন করিয়া তাঁর কাছে আমার সব কথা প্রকাশ করিব?…কিন্তু…অদৃষ্টে যা থাকে তা হোক…তিনি

আমার সবই জানবেন।'

পরদিন স্নানান্তে উপাসনাগৃহটি মার্জনা করতে গিয়ে সে হাঁটু গেড়ে স্বামীকে প্রণাম করলে; সদ্যস্নানে আর্দ্র চুলগুলি তাঁর পা ঢেকে পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে সে অন্তরের চৈতন্য-আভায় দীপ্ত হয়ে বললে, 'আমি কমলা।' দ্বিতীয়বার নলিনাক্ষের পায়ের ধুলো নিতে বড়ো-বড়ো অশ্রুর ফোঁটা তার কপোল বেয়ে ঝরতে লাগল।

কীরমউল্লা ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

করুণা ॥ 'করুণা' উপন্যাস। জমিদার অনুপকুমারের একমাত্র সুন্দরী কন্যা। অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলে ফুল ভাসিয়ে, শিব গড়ে, কাঠবিড়ালির পিছনে ছুটে করুণার দিন কাটত। অনুপকুমার শেষ-বয়সে নরেন্দ্রকে দত্তক নিলে কাল্পনিক বালিকার সমস্ত কল্পনা তারই উপরে ন্যস্ত হল।

পিতার মৃত্যু এবং নরেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের পরে করুণার দুঃখের শুরু। অনুরোধ উপেক্ষা করে নরেন্দ্র কলকাতায় গেলে সে মুখ লুকিয়ে কাঁদত। তবু দুঃখ তার কাছে বেশিক্ষণ টিকতে পারত না; অশ্রুর কুহেলিকা ভেদ করে তার হাসির কিরণ জ্বলতে থাকত। অবশেষে নরেন্দ্র তার কু-অভ্যাসগুলো নিয়ে বাড়ি এল। তখন তার মুখ হল মলিন; অভাগিনী আকুল হয়ে কাঁদলে। অনতিপরেই শীর্ণদেহ করুণার কোলে এল সন্তান। একে অর্থের অভাব, তাতে সন্তানপালনের অভিজ্ঞতাও ছিল না। ছেলেটির অসুখ হয়ে মৃত্যু হল বিনা-চিকিৎসায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাগানের ঘাটে করুণা উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছিল; তখন স্বামীর অকারণ সন্দেহে প্রহৃত হয়ে তাকে বিতাড়িত হতে হল।

পথিমধ্যে অগত্যা নিরাশ্রয় করুণাকে আশ্রয় নিতে হল স্বরূপের; তাতে তার লুব্ধতায় দিন কাটত ভয়ে-ভয়ে। কাশী স্টেশনে একদিন প্রতিবেশী সার্বভৌমকে দেখে পায়ে পড়ে তার কান্নাও ব্যর্থ হল। অবশেষে মহেন্দ্রের আশ্রয় লাভ করে তার স্ত্রী রজনীর সঙ্গে তার সখ্য গড়ে উঠল। হাসি-গল্পে রইল ভুলে দুঃখ। হয়তো সে আশা করেছিল: আবার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে—আবার ফিরে যাবে তার সংসারে। ইতিমধ্যে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি বিকিয়ে গেছে জেনেও সে ফিরে এল স্বামীর কাছে। কিন্তু ক্রমাগত নির্যাতনে ঘন-ঘন মূর্ছায় অবশেষে তার মৃত্যু আসন্ন হল। মৃত্যুকালে স্বামীকে ডেকে তার হাতে রাখলে কম্পিত হাতখানি।

কালিমদ্দি মিঞা ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। জনৈক খানসামা।

কাত্যায়নী ঠাকুরানী ॥ 'করুণা' উপন্যাস। রঘুনাথ সার্বভৌমের দ্বিতীয়া স্ত্রী।

বিপত্নীক পণ্ডিতের তরুণী ভার্যা। স্বামিগৃহে এসেই কাত্যায়নী সরগরম করে তুললেন মেয়েমহল। হাত-পা নেড়ে, চোখ-মুখ ঘুরিয়ে চতুর্দশভুবনের সংবাদ দিতেন; তবু ঘণ্টায়-ঘণ্টায় স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, পরচর্চা তিনি ভালোবাসেন না। চেহারা যদিও মন্দ ছিল না, তাঁর ভাবভঙ্গি অন্য-জাতের। এক রাত্রে গদাধরের সঙ্গে তাঁর অন্তর্ধান এবং সেই সঙ্গে টাকাকড়ি গহনাপত্রেরও। পণ্ডিত-মশায় কালীঘাটে এসে দেখলেন: একখানা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি থেকে নেমে তিনি তাম্বূলরঞ্জিত ওষ্ঠে হাস্যমুখে চলেছেন মন্দিরে। তাঁকে কাছে আসতে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন কাত্যায়নী: 'কে রে মিন্‌সে? গায়ের উপর আসিয়া পড়িস যে?'

কানাই গুপ্ত ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক ছাত্রবন্ধু।

কানাই গুপ্ত ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। দেশনেতা ইন্দ্রনাথের 'প্রধান মন্ত্রী'। কানাই গুপ্ত পুলিসের পেনসনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর। বেঁটে-মোটা প্রৌঢ় মানুষটি; অনতিপরিমাণ দাড়িগোঁফ-কণ্টকিত মুখমণ্ডল। 'সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত; জামা নেই। হাত-দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয় সর্বদা কাজে উদ্যত'। দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্য সদর-রাস্তায় তাঁর চায়ের দোকান। একপাশে একটি ছোটো ঘরে বিক্রির জন্য কিছু স্কুলকলেজ-পাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড; কিছু য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। অল্পবিত্ত ছেলেরা পাতা উলটিয়ে যেত, দোকানদার আপত্তি করত না। নিভৃতে চা খাবার জন্য ঘরের অন্য-অংশ চটের পরদায় ভাগ করা।

চায়ের দোকানেই শেষে পুলিসের দৃষ্টি। কয়েকজন গুণ্ডা ছেলের বীররসের ঘটা দেখে আওয়াজে তাদের জন্‌ বুষভের পুষ্যিবাছুর বলে বোধ হল। কানাই গুপ্ত সিডিশনের নমুনা-সুদ্ধ পুলিসে রিপোর্ট করে দিলেন। তাঁর মতে: 'বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না-করে ভুল করা সাংঘাতিক।' আর-একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসাব দেখছিলেন; ধুলো-মাখা ছেঁড়া-কাপড়-পরা একটি ছেলে এসে চুপিচুপি মথুরমামার নাম করে দিনাজপুর যাবার টাকা চাইলে তাকেও পুলিসের ভয় দেখিয়ে বিদায় করলেন। দলের প্রেরণারূপিণী এলা একদিন সেখানে এলে কানাই গুপ্ত বললেন, 'এলাদি ...আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, ব'লো, অলকা তেল মাথায় পর থেকে চুল

বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।'

অতঃপর ছেলেদের নানা স্থানে ছড়িয়ে দিতে পরামর্শ দিয়ে তিনি প্রত্যেকের Ostensible means of livelihood স্থির করলেন : মাধব কবিরাজের কুইনিন-মিশ্রিত জ্বরাশনি বটিকাগুলোর লেবেল বদলিয়ে ম্যালেরিয়ারি-গুটিকায় পরিণত করে প্রতুল সেনকে ক্যাম্বিসের ব্যাগ-হাতে লাগাবেন প্রচারের কাজে ; ফার্স্ট ক্লাস এম. এসসি. নিবারণকে সপ্তধাতুর সঙ্গে নব্যরসায়নের কয়েকটি নূতন ধাতুর নাম মিলিয়ে ভৈরবী-কবচের প্রচারে ; এবং এইভাবে আরও কয়েকজনকে নানা কাজে। সুন্দরী এলাকে দলের মধ্যে রাখার জন্য ইন্দ্রনাথকে বললেন, 'ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন-কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র।... তোমার এই সর্বনেশে রিসার্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়াখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যাবসার সাদা চোখে।'

অবশেষে আত্মগোপনের চেষ্টায় ব্যর্থ কানাই গুপ্ত পুলিসের গোয়েন্দার খাতায় নিজের নাম লিখিয়ে দিলেন। দলের যারা আপনিই ঝরে পড়ে পুলিসের পাশতলায় তাদের ঝাঁটিয়ে ফেলে দলের স্বাস্থ্য এবং পুলিসের বিশ্বাস উভয়দিক রক্ষার চেষ্টা করলেন। প্রতিভাবান কর্মী অতীন দলের মধ্যে এসেছিল এলার প্রেমে। তারই একটি ডায়েরি সাবেক বাসায় থাকতে কৌশলে তিনি হস্তগত করেন। ডায়েরির পাতায় এলার প্রতি তার উদ্বেলিত প্রেম, এবং বাংলাভাষায় তার আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। বটুর বিশ্বাসঘাতকতায় অতীনের অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা পুলিসের হস্তগত হলে কানাই গুপ্ত পুলিসের কাছে সম্মান রক্ষা এবং বটুর উপর টেক্কা দেবার জন্য বাড়িটার একটা ফটো তুলে দিলেন পুলিসের হাতে, এবং অবিলম্বে সেই পোড়ো-বাড়িতে এসে বললেন, 'তোমার ডায়েরি হারিয়েছিল।...কী বলব বাবাজি আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তাহলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।' শেষে নিজের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বললেন, 'কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে।...চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তাহলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি—এর অক্ষর তোমার জানা আছে, মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো।'

কালু মুখুজ্যে ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের বিশ্বস্ত কর্মচারী।

'বেঁটে, গৌরবর্ণ', পরিপুষ্ট চেহারা, ঈষৎ কটা, ড্যাবড্যাবা চোখ, তার উপরে ঝুঁকে-পড়া রোমশ কাঁচাপাকা মোটা ভুরু, মস্ত ঘন পাকা গোঁফ অথচ মাথার চুল প্রায় কাঁচা'।

চাটুজ্যে-জমিদারের সঙ্গে কালু মুখুজ্যের সম্বন্ধ পুরুষানুক্রমিক। বিপ্রদাসের সমস্ত বিশ্বাসের কাজ তার হাত দিয়েই হত। কালুর কোনো-এক পূর্বপুরুষ চাটুজ্যেদের জন্য জেল খাটে। অদৃষ্টের পরিহাসে বিপ্রদাসের দেনা এবং ভগ্নীর বিবাহ শত্রুকুলে। একদিন এক-কিস্তি সুদ দেবার জন্য কালু গেল মধুসূদনের কাছে। পরনে সযত্নে কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, পরিবারের মর্যাদা-রক্ষার উপযুক্ত পুরনো দামি জামিয়ার গায়ে; আঙুলে দামি পাথরের আংটি। কুমুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বাইরের ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখে সে খুশি; কিন্তু মনে না ভেবে পারলে না: কুমুর চোখের নিচে কালি, মুখের সে লাবণ্য গেল কোথায়? কুমু খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় ভাবলে: বাড়িতে সে নতুন বউ, মুখ ফুটে খাওয়ানোর কথা বলতে পারবে না, কেবল কষ্ট পাবে। বললে, 'সন্ধ্যের পর খেলে আমার সহ্য হয় না, দিদি, তাই আমাদের রামদাস কবিরাজের কাছ থেকে মকরধ্বজ আনিয়ে খাচ্ছি।' কিন্তু আহারের আয়োজন সম্পন্ন হলে তার ক্ষুধার লেশমাত্র অভাব দেখা গেল না।

আংশিক অর্থ প্রত্যাখ্যাত হওয়াতে দেনার সমস্ত টাকা সংগ্রহের জন্য কালু মুখুজ্যের ঘোরাঘুরির অন্ত রইল না। কুমু অনতিপরেই দাদার কাছে ফিরে এলে সে উদ্বিগ্নমুখে বললে, 'দাদা, ছোটোখুকি যে হঠাৎ আজ সকালে চলে এল, রাগারাগি করে আসে নি তো? মধুসূদনকে চটাবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, এটা মনে রাখতে হবে।' এদিকে বিলেত-প্রবাসী ছোটো ভাই সুবোধের সই ছাড়া টাকা পাওয়া অসম্ভব: অসময়ে তাকে ফিরিয়ে আনতে বিপ্রদাসের অনিচ্ছা। কালু জোর দিয়ে বললে, 'বড়োবাবু, মিথ্যে ভাবছ, বিষয়কর্মের একটা শেষ ব্যবস্থা এখনই করা চাই...বারো-পার্সেন্ট সুদে মাড়োয়ারির হাতে মাথা বিকিয়ে দিতে পারব না ..দাদা, আর দেরি করা নয়, খুকিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দাও।' বিপ্রদাস মধুর অনুমতির অপেক্ষা করায় বললে, 'কেন, খুকি কি মধুসূদনের পাটকাটা মজুর? নিজের ঘরে যাবে তার আবার হুকুম কিসের?'

এদিকে মধুসূদনের বাড়ি যাওয়া-আসা ছিল কালুর; বিশেষ তদন্তে অন্যত্র তার আসক্তির সংবাদও জানা ছিল। কুমু স্বামিগৃহে যেতে অস্বীকৃত হওয়াতে তবু ভীত হয়ে বললে, 'বুক ফুলিয়ে নিজের বিপদ ঘটানো ও তোমাদের পৈতৃক পথ।...তোমাদের সাংঘাতিক পাগলামিগুলো চুপ করে সইতে পারি নে।' বিপ্রদাস বললেন, 'বাতি তলার খোপটার মধ্যে এসে জলছে...ওর চেয়ে পুরো অন্ধকারে সোয়াস্তি পাওয়া যায়।' কালুর বুকে লাগল; বিপ্রদাসের মুখের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না ভাই, যা

করবার আমিই করব। যাই একবার দালাল-মহলে ঘুরে আসি গে।'

অবশেষে কুমুকে ফিরতেই হল দৈবের বিধানে। বিদায়ের দিনে বিপ্রদাসের নির্বিকার শূন্যতা কালুর বুকে বাজল। বিষয়কর্মের কোনো কথা বলে তাঁকে বিচলিত করতে তার ইচ্ছা হল না ; ইচ্ছা হল : কিছু-একটা বলে দাদাকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু কিছুই না করতে পেরে চুপ করে বসে রইল।

কাসেম সর্দার ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের চকুয়া কাছারির এক লাঠিয়াল। দেশকর্মী অমূল্য চকুয়া কাছারি লুঠ করতে এলে কাসেম সর্দার লাঠি হাতে ছুটে এসে পিস্তলের গুলিতে জখম হল। পুলিস তাকেই সন্দেহ করায় মনিবের পা জড়িয়ে বললে, 'খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ-কাজ করি নি।' ভয়ের দৃষ্টিতে পরাভবের লজ্জায় তার অত্যুক্তি : চার-পাঁচশো লোক, বড়ো-বড়ো বন্দুক-তলোয়ায় ; এমন কি পাশের জমিদারের এক্রাম সর্দারের গলার আওয়াজও নাকি শুনেছে।

কিনু ভট্টাচার্য ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের গ্রহাচার্য। কিনুর এক ঘটক ভগ্নীপতি রাজাবাহাদুর মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর বিবাহে আগ্রহী। বিপ্রদাসের কাছে বার্ষিক আদায় করতে এসে কিনু পরোক্ষে তা এগিয়ে দিলেন : বললেন, আষাঢ় মাস থেকে বৃষরাশির (অর্থাৎ, বিপ্রদাসের) রাজসম্মান—স্ত্রীলোকঘটিত অর্থলাভ, শত্রুনাশ। কুমুদিনীর হাত দেখেও তিনি অনুরূপ আশান্বিত।

কুমার মুখুজ্যে ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। কুমার মুখুজ্যে অ্যাটর্নি। অমিতের বোন সিসি-লিসির পরিচিত।—'সংক্ষেপে...কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি...অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল।' কারণ, সে ছিল দলের বাইরে, মধ্যে-মধ্যে তাদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যেত। সকলেই আন্দাজ করত : 'যে-গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি।' সকলেই কৌতুক অনুভব করত ; কিন্তু লিসি প্রায়ই প্রবলবেগে তার পুচ্ছমর্দন করে যেত।

এহেন কুমার মুখুজ্যে শিলঙ পাহাড়ে গেল বায়ুসেবনে। অমিত সেখানে গিয়ে লাবণ্যের প্রেমে পড়েছিল। 'পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয়-নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা' চলছিল। অমিত রাস্তায়-ঘাটে দূর থেকে কুমার মুখোকে দেখলে।—'তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে...যায় নি বলে তার বিলেতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। ...মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা মোটা চুরুট...এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে ; মনে

করলে 'ধূমকেতু...সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো-বিদ্যের অন্তর্গত...তার সার্থকতার প্রমাণ...যদি না পড়ে ধরা।' কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করলে যার নাম দেওয়া যেতে পারে 'অমিত রায়ের অমিতচার'। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্য কিছুদিন তারও শিলঙে থাকার কথা ছিল। 'কিন্তু জনশ্রুতিবিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচ দিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুটধূমাকৃত অত্যুক্তি-উদ্‌গারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে-কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।'

কুমুদিনী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনী 'সুন্দরী, লম্বা ছিপছিপে, যেন রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড; চোখ একেবারে...নিবিড় কালো, আর নাকটি নিখুঁত রেখায় যেন ফুলের পাপড়ি দিয়ে তৈরি। রং শাঁখের মতো চিকন গৌর; নিটোল দুখানি হাত; সে-হাতের সেবা কমলার বরদান...সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব।...একরকমের সৌন্দর্য আছে...যেন একটা দৈব আবির্ভাব, পৃথিবীর সাধারণ ঘটনার চেয়ে অসাধারণ পরিমাণে বেশি,—প্রতিক্ষণেই যেন সে প্রত্যাশার অতীত। কুমুর সৌন্দর্য সেই শ্রেণীর। ও যেন ভোরের শুকতারার মতো, রাত্রের জগৎ থেকে স্বতন্ত্র, প্রভাতের জগতের ওপারে।'

নুরনগরের চাটুজ্যে-জমিদারবংশে কুমুদিনীর জন্ম। তার বাপ মুকুন্দ-লালের আমলে ঐশ্বর্যের ভগ্নদশা। কুমুদিনী তখন শিশু। রাসের সময় তার মায়ের অভিমানের ফলে বিকারের ঘোরে মুকুন্দলালের মৃত্যু। মায়ের উপরে রাগে-দুঃখে কুমুদিনীর বুক ফেটে গেল; বাবার পায়ের উপর মাথা রেখে সে মাপ চেয়ে নিলে মায়ের জন্য। বড়ো ভাই বিপ্রদাসের উপরে সংসারের ভার। তাঁর মোটা অঙ্কের দেনা রাজাবাহাদুর মধুসূদনের কাছে। 'কুমুদিনী নিজের জন্যে নিজে সংকুচিত। তার বিশ্বাস সে অপয়া।' জন্ম থেকে চারদিকে দেখেছে দুর্ভাগ্যের পাপদৃষ্টি। বংশের দুর্গতির জন্য নিজেকে অপরাধী করে, হৃদয়ের পাত্র উপুড় করে ভাইদের ভালোবাসে। এক-একদিন বিছানা থেকে উঠে ভাবে: 'কোথায় আমার রাজপুত্র, কোথায় আমার সাতরাজার-ধন মানিক, বাঁচাও আমার ভাইদের, আমি চিরদিন তোমার দাসী হয়ে থাকব।' ঘরেই সে পড়াশুনা করেছিল; পুরানো-নতুন দুই-আমলের আলো-আঁধারে তার বাস। বিপ্রদাসের যত্নে দাবাখেলায়, ফটোতোলায়, বন্দুকে, এসরাজে পাকা। সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যয়ন করে সে কুমারসম্ভবে দেখলে শিবপূজার শিবকে।—'কুমারীর ধ্যানে তার ভাবী পতি পবিত্রতার দৈবজ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে' উঠল। বিলেত থেকে ছোটো ভাই সুবোধের টাকার দাবি আসে। কুমু কেবলই ভাবে, অসম্ভব কিছু ঘটে না কি? আকাশের কোনো গ্রহ, কোনো নক্ষত্র বাধা সরিয়ে দিতে পারে না?

কিন্তু কিছুদিন থেকে তার বাঁ চোখ নাচছিল। গ্রহাচার্য হাত দেখে বলেছিল, সে রাজরানী হবে। এমনসময়েই মধুসূদন ঘোষালের বিবাহ-প্রস্তাব—কুমুর মন্দভাগ্যের তেপান্তর পেরিয়ে রাজপুত্রের আবির্ভাব ছদ্মবেশে। বরের বয়স যৌবনের প্রান্তসীমায়। বয়সের পার্থক্য কুমুর মনে আসে নি। কুলীনের ঘরে সে চার বোনের বিবাহ দেখেছে। মা কি ছেলে বেছে নেয়? স্বামীও তেমন। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়ে সে ফলাহার করালে; সকালে ঠাকুরের কাছে বিজোড়-সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে দেখলে: শেষের ফুলটি ঠাকুরের মতোই নীল—অপরাজিতা। বয়সের অজুহাতে বিপ্রদাসের অমত দেখে বললে, 'তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে।...আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে বলছি আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না।' হায়, ঘোষালদের সঙ্গে তাদের পূর্বকালের রেষারেষি পাত্রপক্ষের নিয়ত আঘাতে প্রকটিত হল। কুমু কেঁদে উঠে বললে, 'দাদা কিছুই বুঝতে পারছি নে।...ও'রা এ-সব কী করছেন? এতে কি তোমাদের মান থাকবে?' কিন্তু, অন্তর্যামীর সম্মুখে যে সত্যগ্রন্থিতে গাঁঠ পড়ে গেছে; বাইরের অনুষ্ঠানটুকু শুধু বাকি। কুমু জপতে লাগল: 'তিনি ভালোই হন মন্দই হন, তিনি আমার পরম গতি। দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ / বীতরাগভয়ক্রোধ—শুধু যতিধর্মের নয়, সতীধর্মেরও এই লক্ষণ।' মা নন্দরানীর পুণ্যচরিতে কুমু এক জায়গায় ত্রুটি দেখেছিল—স্বামীর অপরাধে তিনি কিছুকালের জন্যও ধৈর্য হারিয়েছিলেন।

বিবাহের সমস্তক্ষণ কুমুর চোখ দিয়ে জল পড়ল। বরের হাতে যখন হাত দিলে, সে-হাত ঠাণ্ডা হিম। মনে অভিমান ঠেলে উঠতে লাগল: 'ঠাকুর কি তবে আমাকে ভোলালেন?' বিপ্রদাস তখন শয্যাশায়ী। রাত্রে কুমু প্রার্থনা করেছিল: দাদাকে একটু সুস্থ দেখে যেন সে যেতে পারে। সে প্রার্থনা পূর্ণ হল না। রেলগাড়িতে সঙ্গিনীদের সমালোচনায় কুমু জানালার বাইরে ছিল চেয়ে। একটি চাষির মেয়েকে আড়কাঠি ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটিকে বাড়ি পাঠাবার জন্য সাহায্য চাওয়া হলে সে থলি উজাড় করে দিলে দশ টাকা। হাওড়ায় স্বামীর সঙ্গে তাকে উঠতে হল গাড়িতে; যে অতিশয় শুচিতাবোধ তার উনিশ বছরের কুমারী-জীবনে অঙ্গে-অঙ্গে গভীরভাবে ব্যাপ্ত ছিল, ভেবে পেল না, তা কেমন করে ছিন্ন করে ফেলবে। কুমুর হাতে ছিল নীলার আংটি—দাদার কাছে পাওয়া। সেই আংটি সম্বন্ধে মধুর সংস্কার ও অসংযত জিদ দেখে রী-রী করে উঠল তার সমস্ত শরীর। মধু-প্রাসাদে গোলমাল-ধুমধামের বান-ডাকা দিনের শেষে কুমু তেতলায় পেঁছিল। চিরদিন পতির ধ্যানে সে মহাতপস্বী রজতগিরিনিভ শিবকেই দেখেছিল। বয়সে বাধত না, রূপেও নয়—কিন্তু সত্যকার রাজা কোথায়! মেজো-জা নিস্তারিণীর সাহায্যে একবার অবকাশ পেয়ে সে মনে-মনে বললে, 'ঠাকুর, বল দাও, বল দাও...আমাকে জয়ী করো, সে-জয়

'যোগাযোগ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি

তোমারই।' নিস্তারিণীর ছেলে হাবলুকে সে কোলে নিয়ে বাঁচল—এতদিন যে গোপালকে সে ফুল দিয়েছে, পরম দুঃখের সময়ে যেন সান্ত্বনা দিলে সে এসে। স্বামীকে উপলক্ষ করে তার দেবতার পূজোকে বৈকুণ্ঠনাথ কঠিন করেছেন— এ-প্রতিমা স্বচ্ছ নয়, কিন্তু এই-তো ভক্তির পরীক্ষা।

ফুলশয্যার সন্ধ্যাবেলায় কুমু স্নানের ঘরে যুগলরূপের পটখানি সামনে রেখে বললে, 'আমি তোমারই, আজ তুমিই আমাকে নাও। সে আর কেউ নয়, সে তুমিই, সে তুমিই, সে তুমিই। তোমারই যুগলরূপ প্রকাশ হোক আমার জীবনে।' দাদার টেলিগ্রামখানি ছিল তার বুকের কাছে। রাত্রে উপর থেকে ডাক এলে সে স্নানের ঘরে মেঝের উপরে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। মূর্ছাভঙ্গে হাতের মুঠো শক্ত করে বললে, 'এই আমার অভিসার, বাইরে অন্ধকার ভিতরে আলো।... মেরে গিরিধর গোপাল ঔর নাহি কোহি।' স্বামীর কোনো আঘাত সে মনের মধ্যে নিলে না। সকালে ছাদের উপরে সে মানসপূজায় বসেছিল: উঠে তার থলির মধ্যে দেখতে পেল না নীলার আংটি। আহত হয়ে নিস্তারিণীকে বললে, 'আজ থেকে আমার নিজের বলে কিছুই রইল না?' নিস্তারিণী বোঝালে: স্ত্রী তো দাসীমাত্র। কুমুর মনে পড়ল ইন্দুমতীর কথা—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ / প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। বললে, 'স্ত্রী যাদের দাসী তারা কোন্ জাতের লোক?' সেদিনই হাবলুকে কিছু উপহার দেওয়ার অপরাধে অপমানিত হয়ে সে আশ্রয় নিলে নিচের তলায় অন্ধকার বাতিঘরে। পরদিন পিলসুজ-প্রভৃতি মাজা শেষ করে স্নানান্তে পূর্বদিকে মুখ করে বসল। কতদিন প্রত্যাশিত প্রিয়তমের মিলনের কল্পনায় সে ভোরে উঠে গাইত, 'হমারে-তুমারে সংপ্রীতি লগী হৈ / শুন মনমোহন প্যারে—'। কিন্তু তার এতদিনের অন্তরের আয়োজন ব্যর্থ হল। দাদার শরীরের কথা জানবারও উপায় ছিল না। হঠাৎ সে কেঁদে উঠল দু-হাতে মুখ ঢেকে। ক্রমে তার অপমানের বিরক্তি মিলিয়ে এল বিষাদের ম্লান ছায়ায়। প্রতিজ্ঞা করলে: মনের মধ্যে কিছুতেই ক্রোধের আগুন সে জ্বলে উঠতে দেবে না।

রাত্রে স্বামীর হাতে দাদার একখানি টেলিগ্রাম পেয়ে কুমু বিস্মিত হয়ে ভাবলে: এ দৈবেরই লীলা, নিজের প্রতিজ্ঞারই প্রতিধ্বনি। পরদিন থেকে দেবতার কাছে প্রার্থনামন্ত্র পড়ে তার সাধনা আরম্ভের সংকল্প ছিল। কিন্তু ঠাকুর সময় দিলেন না; স্বামীর আহ্বানে তাকে উপরে যেতে হল। মনে-মনে বললে, 'প্রভু, তুমি ডেকেছ আমাকে, তুমি ডেকেছ।...আমাকে কাঁটাপথের উপর দিয়েই নিয়ে যাবে,— সে তুমিই, সে তুমিই, সে আর কেউ নয়।' সকালে চন্দনগোলা জলে দেহকে অভিষিক্ত করে সে দেবতাকে উৎসর্গ করলে। দেহকে সত্যরূপে সম্পূর্ণরূপে তিনিই পেয়েছেন, তাঁর পাওয়ার বাইরে সমস্তই মিথ্যা, মায়া। পুণ্য-সম্মিলনের নিত্যক্ষেত্র বলে আপন দেহের উপর ভক্তিতে তার চোখের পাতা ভিজে এল। সংসারের কাজের মধ্যেও তার মনে চলতে লাগল জপের ধারা: 'পিতেব পুত্রস্য

সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম।' মধুসূদন তাকে তার দাদার চিঠির কথা জানায় নি। নিস্তারিণীর কাছে তা শুনে মনের মধ্যে তার অভিমানের গান বেজে উঠল। আপিসঘরে এসে চিঠিটা নিয়ে সে স্থির হয়ে বসল। মধুসূদন এলে সেটি টুকরো-টুকরো করলে: 'তুমি আমাকে পড়তে দিতে ইচ্ছা কর নি, সেইজন্যে এ-চিঠি আমি পড়ব না।...কিন্তু, এমন কষ্ট আমাকে আর কখনো দিয়ো না।'

নিস্তারিণীকে দেশে পাঠানোর উদ্যোগ হলে কুমুও তার সঙ্গে যেতে চাইলে; তাতে সে রক্ষা পেল। স্বামীর প্রতিকূলতা অপ্রিয় হলেও কুমুর পক্ষে সহজ ছিল; কিন্তু তার নম্রতাকে গ্রহণ করবার পাথেয় তার ছিল না। তার হৃদয়ের যে দান স্খলিত হয়ে ধুলায় পড়েছিল উপায় ছিল না তা কুড়িয়ে নেবার। পরের দিন রাত্রে স্বামীর আদেশে কুমু কাপড় ছেড়ে আসতে গেল স্নানের ঘরে। তার আহ্বানে যখন বাইরে এল তখনো সে অপ্রস্তুত। সেই আহ্বানে কুমুর এক চিরপরিচিত সুর মনে পড়ল; বাবা তার মাকে ডাকতেন 'বড়োবউ' বলে। কুমু পায়ের কাছে পড়ে বললে, 'আমাকে মাপ করো।...এখনও আমার মন তৈরি হয় নি। আমাকে একটুখানি সময় দাও।' মধুসূদন ব্যঙ্গ করলে: তার দাদা তার গুরু? কুমু দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'হ্যাঁ, আমার দাদা আমার গুরু।' পরমুহূর্তে স্বামীর কাতরতায় ব্যস্ত হয়ে তার পায়ের ধুলো নিলে: 'আমি তোমার দাসী, আমাকে তুমি আদেশ করো।' স্বামীর প্রতীক্ষায় তার সমস্ত গা ঝিম-ঝিম করে এল; মনে-মনে বললে, 'ঠাকুর, তুমি আমাকে কখনো ভোলাতে পার না.. ধ্রুবকে তুমিই বনে এনেছিল, বনের মধ্যে তাকে দেখা দেবে বলে।' অনেক পরে সমস্ত শক্তি সংহত করে সে নিজেই তাকে আহ্বান করলে।

পরদিন কুমু ছাদের উপর অবসন্নভাবে বসে ছিল। ঠাকুরের উপর তার রাগ। নিরপরাধ ছেলেকে নিষ্ঠুর বাপ অকারণে প্রহার করলে ছেলের যে অবস্থা হয়, সেই-রকমের ভাব। যে-শরীরে মন নেই ঠাকুর সেই মাংসপিণ্ডকে নৈবেদ্য করবেন? বিদ্রোহিণী মন বললে, 'তোমাকে আমি সহ্য করব কী করে?...তোমার ভক্তকে নিজে না গ্রহণ করে তাকে বিক্রি করে দিলে কোন্ দাসীর হাটে,—যে-হাটে মাছমাংসের দরে মেয়ে বিক্রি হয়...ছাগলকে দিয়ে ফুলের বন মুড়িয়ে খাইয়ে দেয়।' একটা কালো ক্ষুধিত জরা তাকে যেন গ্রাস করছিল। স্বামীর বয়স বেশি বলে নয়—এ লালায়িত, এর সংযমের শক্তি শিথিল, এই-প্রেম বিষয়াসক্তিরই স্বজাতীয়। সেদিনের অনিবেদিত ফুলগুলি একটা সিল্কের রুমালে জড়িয়ে সে হাবলুকে দিয়েছিল। তাই নিয়ে আবার এক বিপত্তি। সমস্ত দিন কুমুর মন তোলপাড় করতে লাগল, চিরজীবন কি তাকে এই সমুদ্রে সাঁতার দিতে হবে? হঠাৎ ডেস্ক খুলে বার করলে যুগলরূপের পট: পটখানা সে নষ্ট করে ফেলবে। কিন্তু দাঁত দিয়ে গ্রন্থি কেটে সেই চিরপরিচিত মূর্তি বার হতেই সে কেঁদে উঠল বুকে চেপে। সেদিন মুরলী বেহারাকে শীতে কাঁপতে দেখে নিজের

আলোয়ানখানা দিয়েও বুঝলে, সে-বাড়িতে দয়া করার পথও সংকীর্ণ।

একদিন সে দাদার পাঠানো এসরাজখানা, একটি মুক্তোর মালা আর সেই নীলার আংটিটি অভাবিতভাবে পেল স্বামীর হাত থেকে। কিন্তু তার বাজনা শোনানোর অনুরোধে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তে সচেতন হয়ে মালা পরে সে প্রণাম করে বললে, 'তুমি আমার বাজনা শুনবে?' আলাপ আরম্ভ করে পৌঁছল সে ছায়ানটে : 'ঠাড়ি রহো মেরে আঁখনকে আগে।' সুরের আকাশে সেই অপরূপের আবির্ভাব হল, যাকে কুমু গানে পেয়েছে, প্রাণে পেয়েছে। হঠাৎ একদৃষ্টে স্বামীকে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে তার বাজনা গেল থেমে। মধুসূদন উদ্বেলিত হয়ে জানতে চাইলে তার প্রার্থনা। সে শুধু বেহারাকে দিতে চাইলে একটা শীতের কাপড়। সেদিন সে নিস্তারিণীকে বললে, 'মনের মধ্যে সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই এসেছিলুম।...সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশ ভরে ভালোবাসা তেমনি করেই জেগেছিল।...মনের মধ্যে এমন-কিছু এনেছিলুম যাতে সবই পছন্দমতো করে নেওয়া সহজ হত। গোড়াতেই সেইটেকে তোমার বড়োঠাকুর ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন।...আমার শরীরের উপরকার নরম ছালটাকে কে যেন ঘষড়ে তুলে দিল, তাই চারিদিকে সবই আমাকে লাগছে, কেবলই লাগছে, যা-কিছু ছুঁই তাতেই চমকে উঠি; এর পরে কড়া পড়ে গেলে কোনো-একদিন হয়তো সয়ে যাবে, কিন্তু জীবনে কোনোদিন আর আনন্দ পাব না তো।...তোমার কত ভাগ্যি ভাই, কত পুণ্যি করেছিলে, ঠাকুরপোকে এমন সমস্ত মনটা দিয়ে ভালোবাসতে পেরেছ। আগে মনে করতুম, ভালোবাসাই সহজ—সব স্ত্রী সব স্বামীকে আপনিই ভালোবাসে। আজ দেখতে পাচ্ছি ভালোবাসতে পারাটাই সব চেয়ে দুর্লভ, জন্মজন্মান্তরের সাধনায় ঘটে।...আর কিছু না হই ভালো স্ত্রী যেন হতে পারি। পুণ্য তাতেই বেশি, সেইটেই কঠিন সাধনা।'

কুমু শেষে দাদার কাছে আসতে অনুমতি পেল। এসে তাঁর সেবার ভার নিলে। ইচ্ছা, মীরাবাঈয়ের আদর্শটা কেউ তাকে বুঝিয়ে দেয়। সসংকোচে বললে, 'মীরাবাঈ আপনার যথার্থ স্বামীকে অন্তরের মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই সমাজের স্বামীকে মন থেকে ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু সংসারকে ছাড়বার সেই বড়ো অধিকার কি আমার আছে?' দাদার শিয়রের কাছে বসে সে গাইলে : 'মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর, / চরণকমল বলিহার রে।' কিন্তু দাদার মুখের দিকে চেয়ে তার স্বস্তি রইল না স্বামীর কাছে তাঁর দেনার কথা ভেবে। বললে, 'দাদা, আমি যাওয়া ঠিক করেছি।' ইতিমধ্যে কানে এল বড়ো-ভাজ শ্যামাসুন্দরীর প্রতি মধুসূদনের আসক্তির কথা। অতঃপর দাদার সঙ্গে তার স্থির হল : ভাই-বোনে মাথা উঁচু করে সমস্ত অগ্রাহ্য করবে। মধুসূদন নিতে এলেও সে গেল না। তা নিয়েও আর একদফা অশান্তি ঘটল।

দু-দিন পরেই নিস্তারিণীর আগমনে প্রকাশ পেল, সে গর্ভিণী। কুমুর মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হল। স্বামীর সঙ্গে নিজের অল্পকালের পরিচয় ভিতরে-ভিতরে কী বিকৃত মূর্তি ধারণ করেছে, মুহূর্তেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। মধুসূদন জীবনের প্রারম্ভে দুঃসহভাবেই গরিব ছিল ; প্রতিমুহূর্তে তার স্বাভাবিক ইতরতায়, ভাষার কর্কশতায়, দাম্ভিক অসৌজন্যে কুমুর মনকে সংকুচিত করে তুলত—প্রতিমুহূর্তে মনে হত অশ্লীল। সেই মধুসূদনের সঙ্গে যখন তার রক্তমাংসের বন্ধন অবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, একান্ত পীড়িত না হয়ে সে পারল না। সারাদিন কুমু লুকিয়ে ফিরল ; সন্ধ্যার পর অনেক ইতস্তত করে গেল দাদার কাছে। বিপ্রদাস তার সন্তানকে নিজের ঘরছাড়া করতে কুণ্ঠিত। কুমু বললে, 'তবে কি যেতে হবে দাদা ?...কিন্তু... কোনোদিন কোনো কারণেই তুমি ওদের বাড়ি যেতে পারবে না। ...সে আমি সইতে পারব না।...তুমি আমাকেও স্বাধীন করে নিয়ো। তত্দিনে ওদের ছেলেকে আমি ওদের হাতে দিয়ে যাব।...সমাজের কাছ থেকে অপরাধের সমস্ত লাঞ্ছনা আমিই একলা মেনে নেব...একদিন ওদেরকে মুক্তি দেব, আমিও মুক্তি নেব...মিথ্যে হয়ে মিথ্যের মধ্যে থাকতে পারব না।...দাদা, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না, আমি বিশ্বাস করি।...চারিদিকে এত এলোমেলো, এত উলটো-পালটা, তবু এই জঞ্জালে একেবারে ঢেকে ফেলে নি জগৎটাকে। এ-সমস্তকে ছাড়িয়ে গিয়েও চন্দ্রসূর্যকে নিয়ে সংসারের কাজ চলছে, সেই-যেখানে ছাড়িয়ে গেছে সেইখানে আছে বৈকুণ্ঠ, সেইখানে আছেন আমার ঠাকুর।...এ-যদি না বুঝতুম তাহলে এইখানে তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরতুম, সে গারদে ঢুকতুম না। দাদা, এ সংসারে তুমি আমার আছ বলেই তবে এ কথা বুঝতে পেরেছি।'—এই বলে সে দাদার পায়ের উপর মাথা রেখে পড়ে রইল।

কুলদা ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের শুকসায়রের কাছারির নায়েব। স্বদেশী আন্দোলনকালে কুলদা ছিল মনিবের মতের বিরুদ্ধে। বিদেশী পণ্যের ধ্বংস উপলক্ষে সন্দীপের অনুরোধে সে মিরজানের নৌকো ডুবিয়ে দিতে রাজি হল ; কিন্তু দায় স্বীকার করিয়ে নিয়ে সে কয়েকখানা চিঠি আদায় করে রাখলে। পরে ছল করে মিরজানকে ডেকে এনে তার নৌকোখানা স্রোতের মধ্যে ফুটো করে দিলে ডুবিয়ে। সেই সঙ্গে সন্দীপের কাছে একটা মোটা-অঙ্কের মুনাফা আদায়ের জন্য বললে, 'যে-লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল পুলিস তাকে সন্দেহ করেছে'—ইত্যাদি।

কুসুম ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। সন্দীপের অন্যতমা প্রণয়িনী। কুসুম বিধবা। সন্দীপের কাছে ধরা দিয়েছিল সে ভয়ে-ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে—ভয়ের আঘাতেই বেড়ে উঠেছিল তার হৃদয়ের বেগ।

কৃষ্ণদয়াল ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার পালক-পিতা কৃষ্ণদয়াল। 'শ্যামবর্ণ দোহারা গোছের মানুষ, বেশি লম্বা' নন। 'মুখের মধ্যে বড়ো-বড়ো' দুটো 'চোখ সব চেয়ে চোখে পড়ে, বাকি প্রায় সমস্তই কাঁচাপাকা গোঁফে-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন।' পরনে 'সর্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র...হাতের কাছে পিতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। মাথার সামনের দিকে টাক' পড়ে আসছে—'বাকি বড়ো-বড়ো চুল গ্রন্থি' দিয়ে 'মাথার উপরে একটা চূড়া' করে বাঁধা।

কৃষ্ণদয়ালের তেইশ বছর বয়সে তাঁর প্রথমা স্ত্রী একটি পুত্র প্রসব করে মারা গেলে প্রবল বৈরাগ্যের ঝোঁকে ছেলেটিকে শ্বশুরবাড়ি রেখে তিনি একেবারে পশ্চিমে চলে গেলেন ; এবং ছ-মাসের মধ্যেই কাশীতে আনন্দময়ীকে বিবাহ করলেন। পশ্চিমে কমিসেরিয়েটে কাজ নিয়ে মনিবদের কাছে নানা উপায়ে প্রতিপত্তি করে পলটনের গোরাদের সঙ্গে মিশে মদ-মাংস খেয়ে একাকার করলেন। দেশের পুজারী-পুরোহিত বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী দেখলে তখন তিনি গায়ে পড়ে অপমান করাকেই পৌরুষ বলে জ্ঞান করতেন। আনন্দময়ীর পুজোর উপকরণও টান মেরে ফেলে দিতেন। মিউটিনির সময় এটোয়াতে কৌশলে দু-একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজের প্রাণরক্ষা করে তিনি যশ ও জায়গির লাভ করলেন।

গোরার বাবা এক আইরিশম্যান। লড়াইয়ে তাঁর মৃত্যুর পরেই গোরাকে জন্ম দিয়ে তাঁর স্ত্রীরও মৃত্যু হয়। কৃষ্ণদয়াল ছেলেটিকে পাদরির হাতে দিতে চাইলে সন্তানহীনা আনন্দময়ী বাধা দিয়ে তাকে পুত্রস্নেহে পালন করেন। কৃষ্ণদয়ালের ধর্মাধর্ম-বিচার না থাকায় বিশেষ আপত্তি করেন নি। মিউটিনির পরে কাজ ছেড়ে নবজাত গোরাকে নিয়ে তাঁরা কিছুদিন কাশীতে রইলেন ; পরে কলকাতায় এসে বড়ো ছেলে মহিমকে নিজের কাছে আনলেন।

চাকরি ছেড়ে কৃষ্ণদয়াল রাশি-রাশি টাকা নিয়ে অত্যন্ত শুচি হয়ে উঠলেন। নূতন সন্ন্যাসী দেখলেই তখন নূতন সাধনার পন্থা শিখতে বসতেন। মুক্তির নিগূঢ় পথ এবং যোগের নিগূঢ় প্রণালীর জন্য তাঁর লুব্ধতার অবধি রইল না। সহসা এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে পেয়ে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন। গোরা তাঁর ঘরে গেলে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠতেন। গুটি-দুই-তিন ঘর নিজের জন্য স্বতন্ত্র করে তিনি 'সাধনাশ্রম'-নামাঙ্কিত কাষ্ঠফলক লটকে দিলেন। গোরা হঠাৎ ঘোরতর হিন্দু হয়ে উঠতে তিনি খুশি হলেন না। একদিন গোরাকে ডেকে বললেন, 'দেখো বাবা, হিন্দুশাস্ত্র বড়ো গভীর জিনিস। ঋষিরা যে-ধর্ম স্থাপন করে গেছেন তা তলিয়ে বোঝা যে-সে লোকের কর্ম নয়। আমার বিবেচনায় না-বুঝে এ নিয়ে নাড়াচাড়া না-করাই ভালো।' গোরা বললে : সে তো ব্রাহ্মণের সন্তান। কৃষ্ণদয়াল কেবলই মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, 'কিন্তু বাবা, হিন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান

হওয়া সোজা, খৃষ্টান যে-সে হতে পারে—কিন্তু হিন্দু! বাস্‌রে! ও বড়ো শক্ত কথা।' পরে বললেন, 'তুমি যা বলছ সেও সত্য। যার যেটা কর্মফল, নির্দিষ্ট ধর্ম, তাকে একদিন ঘুরে-ফিরে সেই ধর্মের পথেই আসতে হবে... ভগবানের ইচ্ছে। আমরা কী করতে পারি!' কর্মফল এবং ভগবানের ইচ্ছা, সোঽহংবাদ এবং ভক্তিতত্ত্ব সমস্তই তিনি সমানভাবে বিশ্বাস করতেন।

কৃষ্ণদয়াল যখন কিছুই মানতেন না, গোরার পৈতে দিয়েছিলেন। এখন নিজের বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা এবং গোরার বিবাহের জন্য ভাবিত হলেন। ন্যায়ত বিষয়সম্পত্তি মহিমেরই প্রাপ্য, তাই গোরাকে একটিমাত্র জায়গির দিয়ে মহিমকেই সমস্ত দেবার মনস্থ করলেন। কিন্তু আনন্দময়ী গোরার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে চাইলে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'না না, আমি বেঁচে থাকতে কোনো-মতেই সে হতে পারবে না। গোরাকে তো জানই। এ-কথা শুনলে সে কী-যে করে বসবে তা কিছুই বলা যায় না। তার পরে সমাজে একটা হুলস্থুল পড়ে যাবে। ...এ দিকে গবর্মেন্ট কী করে তাও বলা যায় না...এখন এই নিয়ে যদি একটা গোলমাল উঠে পড়ে তা-হলে আমার সাধন-ভজন সমস্ত মাটি হবে, আরও কী বিপদ ঘটে বলা যায় না।' গোরাকে প্রাণ থাকতে তিনি ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ দিতে পারেন না। হেদোতলায় তাঁর ব্রাহ্ম বাল্যবন্ধু পরেশবাবুর অনেকগুলি মেয়ে ছিল। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সঙ্গে মুসলমান দোকানের কাবাব খেয়ে কৃষ্ণদয়াল হিন্দুসমাজের সংস্কার করতেন। গোরা সেখানে যাতায়াত করলে তার বিবাহের ব্যবস্থা হতে পারে, এই ভেবে গোরাকে তিনি তাঁর বন্ধুর খবর আনতে পাঠালেন।

গোরা হঠাৎ দেশভ্রমণে বেরিয়ে এক সংঘর্ষ বাধিয়ে গেল জেলে। কৃষ্ণদয়াল গোরাকে হৃদয়ের মধ্যে স্থান দেন নি—এমন-কি তার সম্বন্ধে তাঁর অন্তঃকরণে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল। গোরা জেল থেকে বেরিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলে আনন্দময়ী চিন্তিত হয়ে স্বামীর কাছে এলেন। কৃষ্ণদয়াল মৃগচর্মের উপর বসে ঘেরণ্ডসংহিতার একটি বাংলা অনুবাদ পাঠ করছিলেন। তাঁর তপস্যাও ইতিমধ্যে ঘোরতর হয়ে উঠেছিল; নিঃশ্বাস নিয়ে অসাধ্যসাধন হচ্ছিল, আহারের মাত্রাও এত কমেছিল যে, পেট প্রায় পিঠের সঙ্গে ঠেকেছিল। এই তপস্যা ভাঙবার ইন্দ্রপ্রেরিত বিঘ্নস্বরূপ আনন্দময়ী এসে গোরাকে সমস্ত খুলে বলতে চাইলেন। কৃষ্ণদয়াল বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়েছ! এ-কথা আজ প্রকাশ হলে...পেন্‌সন তো বন্ধ হবেই, হয়তো পুলিসে টানাটানি করবে।' আনন্দময়ী তাঁর স্বাস্থ্যের অবহেলার অনুযোগ করায় তিনি স্ত্রীর মূঢ়তায় উচ্চভাবে ঈষৎহাস্য করলেন: 'শরীর!'—বলে পুনশ্চ ঘেরণ্ডসংহিতায় নিবিষ্ট হলেন।

কৃষ্ণদয়াল শেষের দিকে খবরের কাগজ স্পর্শও করতেন না। কিন্তু তাঁর উপযুক্ত পুত্র গোরা মহাসমারোহে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছে এবং সে যে পিতারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে কালে তাঁর মতোই সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠবে, এই সংবাদ

তাঁর প্রসাদজীবীরা বিশেষ গৌরবের সঙ্গেই ব্যক্ত করলে। কৃষ্ণদয়াল অনেক কাল গোরার ঘরে পদার্পণ করেন নি। সেদিন পট্টবস্ত্র ছেড়ে গোরার সন্ধানে গেলেন। কৃষ্ণদয়ালের পরিবার বৈষ্ণব। নিজে শক্তিমন্ত্র নিয়ে বিশেষভাবে সাধনাশ্রমে ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এসে দেখলেন : গোরা তাঁর গৃহদেবতার পুজো করতে বসেছে। শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এ-কী কাণ্ড! এখানে তোমার কী কাজ!' গোরা জানতে চাইলে, দোষ কী? কৃষ্ণদয়াল বললেন, 'দোষ নেই! বল কী!...ওতে যে অপরাধ হচ্ছে...বাড়িসুদ্ধ আমাদের সকলের।' গোরার প্রশ্ন : পুজোরি রামহরির যে অধিকার আছে, তার তাও নেই? কৃষ্ণদয়াল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'দেখো, পুজো করাই রামহরির জাতব্যাবসা। ব্যাবসাতে যে অপরাধ হয় দেবতা সেটা নেন না।' পরে বললেন, 'তুমি নাকি প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে সব পণ্ডিতদের ডেকেছ?...আমি বেঁচে থাকতে এ কোনোমতেই হতে দেব না।' গোরা কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'কারণ দেখাবার আমি কোনো দরকার দেখি নে। আমরা তো তোমার গুরুজন, মান্যব্যক্তি; এ-সমস্ত শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম আমাদের অনুমতি ব্যতীত করবার বিধিই নেই। ওতে যে পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধ করতে হয় তা জান?' গোরা আরও প্রশ্ন করতে গেলে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : 'আবার তর্ক? আমার মুখের উপর প্রতিবাদ করতে তোমার সংকোচ হয় না? এ দিকে বল হিন্দু! বিলাতি ঝাঁজ যাবে কোথায়! আমি যা বলি তাই শোনো। ও সমস্ত বন্ধ করে দাও।' গোরা প্রায়শ্চিত্ত না করে সামাজিক পঙ্‌ক্তিতে বসবার অক্ষমতা জানালে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : 'বেশ তো।...সে তো ভালোই। ...এই দেখো-না, আমি কারও সঙ্গে খাই নে, নিমন্ত্রণ হলেও না।...তুমি যে-রকম সাত্ত্বিকভাবে জীবন কাটাতে চাও তোমারও তো এইরকম পন্থাই অবলম্বন করা শ্রেয়।'

গোরার প্রায়শ্চিত্তের দিন কৃষ্ণদয়াল হঠাৎ রক্তবমন শুরু করলেন। গোরা সংবাদ পেয়ে বাড়ি এলে মৃদুকণ্ঠে তার জন্মকথা প্রকাশ করে বললেন, 'আমার মৃত্যুর পরে তুমি আমার শ্রাদ্ধ করবে কী করে?' পরে মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়ে বললেন, 'দেখো গোরা, কথাটা কারও কাছে প্রকাশ করবার তো দরকার দেখি নে।...তুমি একটু বুঝে-সুজে বাঁচিয়ে চললেই যেমন চলছিল তেমনি চলে যাবে'।

কেতকী মিত্র (কেটি মিটার) ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিতের বোন সিসির বাহন নরেন মিটারের বোন। আসল নাম কেতকী মিত্র। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির চোখের ভাবটি স্নিগ্ধ ছিল। কেটির বয়স তখন আঠারো। অমিত-কেটি দু-জনেই ছিল ইংলণ্ডে। কেটির প্রণয়মুগ্ধ এক পাঞ্জাবী যুবকের সঙ্গে নদীতে বাচখেলায় জিতে অমিত আংটি পরিয়ে দিয়েছিল তার হাতে। জুন

মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ তখন কথা কয়ে উঠেছিল ; ধরণী ধৈর্য হারিয়েছিল মাঠে-মাঠে ফুলের বৈচিত্র্যে। কেটির মুখে তখন প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি ; হাসিটি ছিল সহজ, ভাবের আবেগে মুখখানি রক্তিম হয়ে উঠত। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মনে-মনে বলেছিল : 'মন আমি'—ফরাসি ভাষায় যার অর্থ 'বন্ধু'।

কিন্তু কালক্রমে অমিতের মন হারিয়ে সে দশের মনের মতো নিজেকে সাজাতে বসল। দাদা নরেন মিটারের 'কায়দাকারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত' হয়ে সে 'বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো' এসেন্সে পরিণত হল। 'বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই...কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে...উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন' করলে। 'মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা।' প্রথম বয়সের স্নিগ্ধ কালো চোখের ভাবটি এখন যেন একটা আধখোলা ছুরির ঝলক ; ঠোঁট দুটির সরল মাধুর্য বারবার বেঁকে-বেঁকে তার মধ্যে একটা 'বাঁকা অঙ্কুশের ভাব স্থায়ী হয়ে' গেল। দেহের 'উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস...বুকের অনেকখানিই অনাবৃত'। আর 'অলংকরণের অঙ্গরূপে...সুমার্জিতনখররমণীয় দুই-আঙুলে চেপে' সে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত হল। 'সব চেয়ে...দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে... সমুচ্চ-খুরওআলা জুতো-জোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায় ; যেন ছাগ-জাতীয় জীবের' আদর্শে 'পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা' সে 'এভোল্যুশনের ত্রুটি' সংশোধনে তৎপর হল।

অক্‌স্‌ফোর্ডের মুগ্ধ-রজনীর সাত বছর পরে। গরমের সময় শিলঙ থেকে অমিতের কোনো খবর পাওয়া গেল না। শিলঙ-ফেরত কুমার মুখুজ্যে সংবাদ দিলে যে, লাবণ্য-নাম্নী কোনো গভর্নেসের প্রেমে তার অবস্থা সংকটজনক। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল : অবস্থার সরেজমিন তদন্ত করা এবং সর্বনাশের স্রোতে নিমজ্জমান অমিতের ঝুঁটি ধরে আশু টেনে তোলা দরকার। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হওয়া সম্বন্ধে এ-দেশের পলিটিক্‌সের যে-আক্ষেপ, কেটির ভাবটা সেই জাতের। টেলিগ্রাফ করে শিলঙের হোটেলে জায়গা ঠিক করে সিসি-কেটি-নরেন মিটার সেখানে পৌঁছল।

দুই-সখী প্রথমেই শত্রুপক্ষ ও রণক্ষেত্রটির সন্ধান নেবার মনস্থ করলে। অমিত ক্ষণে-ক্ষণে বেরিয়ে যেত। সেদিন বেরোল কমলালেবুর মধু সন্ধানের অজুহাতে। মধুকরের এই ডানার চাঞ্চল্যে দুই-বন্ধু স্থির করলে, সেদিনই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। লাবণ্য তার ছাত্রী সুরমাদের আশ্রিত। দুই-সখী যথাস্থানে দরজা পার হয়ে এক শিক্ষয়িত্রী, আর-এক ছাত্রীকে দেখলে। কেটি টক্‌-টক্‌ করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, 'দুঃখিত।...মিস্টার অমিট্রায় এখানে এসেছেন কি-না খবর নিতে এলুম।' লাবণ্যের ঠিক বোধগম্য হল না। কেটির মুখে

পড়ল বিদ্যুচ্চকিত আড়হাসির রেখা ; ঝাঁঝের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে, 'আমরা তো জানি, এ-বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him'। লাবণ্য গৃহকর্ত্রীকে ডাকতে গেল। কেটি সুরমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে : 'তোমার টীচার ?...নাম বুঝি লাবণ্য ? ...গট ম্যাচেস ?' পরে বুঝিয়ে বললে, দেশালাই। দেশালাই পেয়ে সিগারেট ধরিয়ে : 'ইংরেজি পড় ?' গতিক দেখে সুরমা বাড়ির মধ্যে দৌড় দিলে। তার পরে আরম্ভ হল টিপ্পনী : 'গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক, ম্যানার্স্ শেখে নি। ...ফেমাস লাবণ্য ! ডিল্লীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্‌ক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার। সিলি ! মেন আর ফানি !...তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্‌-এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।' এই বলে অ্যাল্‌জেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেট ঠেকিয়ে সে রুপোর শিকলওয়ালা প্রসাধনের থলি বার করলে ; পাউডার-প্রলেপান্তে অঞ্জনের পেন্‌সিলের সাহায্যে ফুটিয়ে নিলে আর-একটু ভ্রূর রেখা। এমন সময়ে এলেন গৃহকর্ত্রী যোগমায়া। কেটি নির্লিপ্তভাবে সিগারেট টানতে-টানতে ঘাড় বেঁকিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। তার ট্যাবি-নামধারী ক্ষুদ্র কুকুরটা যোগমায়ার শাড়ির উপরে দু-পায়ের পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিলে। কেটি তার নাকের উপরে তর্জনী তাড়ন করে বললে, 'নটি ডগ'। সিসি অমিতের খোঁজ করাতে সে তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'যে-মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিতকে সে কোনোকালে জানেই না।' নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির গর্ব ছিল। সিডিশন-দমনে সে ক্ষিপ্রহস্ত। বন্ধুদের মধ্যে মিষ্টমুখো ভালোমানুষি সে সহ্য করতে পারত না। সিসির সংকোচ ভাঙবার জন্য সে তার মুখেও একটা সিগারেট বসিয়ে নিজের সিগারেট মুখে করেই সেটা ধরিয়ে দিলে। তখনি অমিতকে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে ভিতরে যেতে দেখে সিসি বললে, 'চলো কেটি, ঘরে যাই।...কোনো ফল হবে না।' কেটি বড়োবড়ো চোখ বিস্ফারিত করে বললে, 'হতেই হবে ফল।'

অনতিপরেই অমিত-লাবণ্য উপস্থিত। লাবণ্যের হাতে অমিতের আংটি দেখে কেটির মাথায় রক্ত উঠল চড়ে। দু-চোখ লাল করে সে কুকুরটাকে কানমলা দিতে লাগল ; কানমলার অধিকাংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। অমিত সিসিকে জানালে, লাবণ্যের সঙ্গে তার বিবাহ। কেটি মুখে হাসি টেনে বললে, 'আই কন্‌গ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে। রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।...এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।...নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টেলম্যান্‌রা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি

বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ-দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। ...অমিট, তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এই আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এক-মুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে।' সিসি বললে, 'বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই ?' কেটি বললে, 'মনে-মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল—এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার।...তা এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে, সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন।...এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না।'—বলতে-বলতে তার গলা ভার হয়ে এল : 'বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক, অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।' —এই বলে আংটিটা খুলে টেবিলের উপরে রাখতেই তার 'এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।'

কেটির এই বেদনার পরিচয় পেয়ে লাবণ্য অমিতের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে। তারপরেই শুরু হল অমিতের প্রেমের স্পর্শে কেটির জন্মান্তর। চরম ফলের প্রত্যাশায় উপরকার রঙিন পাপড়ি খসিয়ে সে স্বাভাবিক শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠল। অমিতের মুখে তার নাম হল—'কেয়া'।

কেদারবাবু ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। এক কারখানার মালিক।

কেদারেশ্বর ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। হাসি ও তাতার কাকা। হাসির মৃত্যুর পরে তাতার সঙ্গে কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান লাভ করে। তাতার নাম হয় ধ্রুব। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায় স্বভাবতই তার উপরে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

নক্ষত্র ত্রিপুরা অভিযান করায় গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে নিয়ে রাজ্যত্যাগের সংকল্প করলেন। কেদারেশ্বর কিছুতেই রাজি হল না। নক্ষত্র রায় সিংহাসনে বসলে তাঁর কৃপালাভের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল। গোবিন্দমাণিক্যের আমলে সে রাজভোগে পরিতৃপ্ত হয়ে প্রাসাদে বাস করত ; সকলে তাকে সভয়ে সম্মান করত। রাজার প্রসাদচ্যুত হয়ে সে অবজ্ঞা এবং অন্নকষ্ট ভোগ করতে লাগল। একদিন কিছু ভেট সংগ্রহ করে রাজসভায় এসে পরম পরিতোষ সহকারে সে বিনীতহাস্য করে দাঁড়াল। নক্ষত্র জ্বলে উঠলেন। কেদারেশ্বর অনেক কষ্টে মনের মধ্যে যে বক্তৃতাটুকু গড়ে তুলেছিল, পেটের মধ্যেই তা চুরমার হয়ে গেল। চোখে-মুখে-কণ্ঠস্বরে প্রচুর পরিমাণে করুণ রস সঞ্চার করে বললে, 'মহারাজ, ধ্রুবকে কি

ভুলিয়া গিয়াছেন।...সে যে মহারাজের জন্য কাকা-কাকা করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে।' নক্ষত্রের আদেশে তার কাঁধের উপরে অনেকগুলো হাত এসে পড়ল। কেদারেশ্বর তীরের মতো ছিটকে পড়ল বাইরে।

কেনারাম ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। কেনারাম গুজুরপাড়া গ্রামের অধিবাসী। সেখানে নক্ষত্র রায়ের নির্বাসনকালে তাঁর নকল পুরোহিত। গরিব কেনারাম নক্ষত্রের বিবিধ অত্যাচার নীরবে সহ্য করত।

কেনারাম ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের পুরোহিত।

কৈলাস রায়চৌধুরী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। সুচরিতার মাসি হরিমোহিনীর ছোটো দেওর কৈলাস। তাদেরই চক্রান্তে বিষয়বিচ্যুতা তীর্থবাসিনী হরিমোহিনী অনেককাল পরে কলকাতায় উপনীত। অন্যথা সুচরিতা সেখানে ব্রাহ্ম পরেশবাবুর আশ্রিত। তারই পৈতৃক অর্থে অর্জিত বাড়িতে এসে হরিমোহিনী ব্রাহ্মসমাজের আওতা থেকে কোম্পানির কাগজাদিসহ সুচরিতাকে উদ্ধার করে তাঁর শ্বাশুরিক দুর্গে আবদ্ধ করতে চেষ্টিত।

কিছুদিন পূর্বে কৈলাসের বউটি মারা গিয়েছিল; মনের মতো কন্যা পায় নি। হরিমোহিনীর পত্রের উত্তরে কৈলাস লিখলে—হরিমোহিনীর বাড়ি-ত্যাগের পর থেকে তাঁর কুশলসমাচারের জন্য চিন্তিত। পত্রের উপসংহারে ছিল—'আপনি যে পাত্রীটির কথা লিখিয়াছেন তাহার সমস্ত খবর ভালো করিয়া জানাইবেন। আপনি বলিয়াছেন, তাহার বয়স বারো-তেরো হইবে, কিন্তু বাড়ন্ত মেয়ে, দেখিতে কিছু ডাগর দেখায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তাহার যে-সম্পত্তির কথা লিখিয়াছেন তাহাতে তাহার জীবনস্বত্ব অথবা চিরস্বত্ব তাহা ভালো করিয়া খোঁজ করিয়া লিখিলে অগ্রজমহাশয়দিগকে জানাইয়া তাঁহাদের মত লইব। ...পাত্রীটির হিন্দুধর্মে নিষ্ঠা আছে শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, কিন্তু এতদিন সে ব্রাহ্মঘরে মানুষ হইয়াছে, এ-কথা...আর-কাহাকেও জানাইবেন না। আগামী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গাস্নানের যোগ আছে, যদি সুবিধা পাই সেই সময়ে গিয়া কন্যা দেখিয়া আসিব।'

সুচরিতা জিদ করে অন্যত্র গিয়েছিল। এদিকে গঙ্গাস্নানের যোগে কৈলাসও উপস্থিত। 'গায়ে তসরের চায়না কোট, কোমরে একটা চাদর জড়ানো, হাতে... ক্যাম্বিসের ব্যাগ...বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি...বেঁটেখাটো আঁটসাট মজবুত গোছের চেহারা...গোঁফদাড়ি কিছুদিন ক্ষৌরকার্যের অভাবে কুশাগ্রের' মতো অঙ্কুরিত। প্রণামান্তে হরিমোহিনীকে বললে, 'তা শরীর তো বেশ ভালোই দেখা যাচ্ছে।' হরিমোহিনী বললেন : পোড়া শরীর গেলেই বাঁচেন। কৈলাস

আপত্তি প্রকাশ করলে : যদিচ দাদা নেই তবু হরিমোহিনী থাকাতে তাদের মস্ত একটা ভরসা আছে—'এই দেখো-না কেন, তুমি আছ বলেই কলকাতায় আসা হল—তবু একটা দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া গেল।' আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীদের সংবাদ বিবৃত করে সে চারদিকে চেয়ে বললে, 'এ-বাড়িটা বুঝি তারই ?...পাকা বাড়ি দেখছি !' লক্ষ্য করে দেখলে : ঘরের কড়িগুলো বেশ মজবুত শালের, দরজা-জানালা আমকাঠের নয় : 'কী বল বউঠাকরুন, সাত-আট হাজার টাকা হতে পারে।' হরিমোহিনীর মতে : বিশ হাজারের এক-পয়সা কম নয়। কৈলাস অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে নীরবে নিরীক্ষণ করতে লাগল ; সম্মতিসূচক একটা মাথা নাড়লেই সেই শালকাঠের কড়ি-বরগা আর সেগুনকাঠের জানালা-দরজা-সমেত পাকা ইমারতটির একেশ্বর প্রভু সে হতে পারে—এই চিন্তায় বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করলে। জিজ্ঞাসা করলে, 'সব তো হল, কিন্তু মেয়েটি ?' হরিমোহিনী মিথ্যা করে বললেন, পিসির বাড়িতে হঠাৎ নিমন্ত্রণে গেছে। কৈলাস বললে, 'তা-হলে দেখার কী হবে ? আমার যে আবার একটা মকদ্দমা আছে, কালই যেতে হবে।' শেষে হরিমোহিনীর অনুরোধে এখানে ক্ষতিপূরণের আয়োজনটুকু বিচার করে স্থির করলে : না হয় মকদ্দমাটা একতরফা ডিক্রিতে ফেঁসে যাবে। হঠাৎ তার চোখে পড়ল হরিমোহিনীর পুজোর ঘরে কিছু জল জমে আছে—সেখানে জলনিকাশের কোনো নালা নেই। কৈলাস অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল : 'বউঠাকরুন, ওটা-তো ভালো হচ্ছে না।...ওই-যে ওখানে জল বসছে, ও-তো কোনোমতে চলবে না।... না-না, সে হচ্ছে না। ছাত যে একেবারে জখম হয়ে যাবে। তা বলছি, বউঠাকরুন, এ ঘরে তোমার জল-ঢালাঢালি চলবে না।' হরিমোহিনী চুপ করে গেলেন। তখন সে কন্যাটির রূপ-সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করলে। —'মনে-মনে...একটি অদৃষ্টপূর্ব মূর্তিতে পটল-চেরা চোখের সঙ্গে বাঁশির মতো নাসিকা যোজনা' করে সে আগুলফবিলম্বিত কেশরাজির মধ্যে নিজের কল্পনাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে তুলল।

আলোচ্য বিষয়গুলি নিঃশেষ হলে অহোরাত্র তামাক টেনে-টেনে কৈলাস বাড়ির দেওয়ালগুলো কালি করবার জো করলে। দিনের বেলায় হুঁকো হাতে সে গলির মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে রাস্তার লোকচলাচল দেখত ; সন্ধ্যার সময় ঘরের মধ্যে তার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। শেষে সঙ্গীর অভাবে নিচের তলায় একটা ছোটো ঘরে তক্তপোশে হুঁকো নিয়ে বেহারাটার সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করত। হরিমোহিনী উত্ত্যক্ত হয়ে একদিন সুচরিতাকে ধরে আনলেন। সুচরিতা দেখলে : নিচের ঘরে একটা অপরিচিত লোক বেহারাকে দিয়ে প্রবল করতাড়নশব্দ-সহযোগে তৈল মর্দন করছে—সংকোচ না-মেনে সে বিশেষ কৌতূহলের সঙ্গে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে। হরিমোহিনী কিছুতেই আর সুচরিতাকে বিবাহে মত করাতে পারলেন না।

ক্ষান্ত ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার এক অধিবাসিনী। ভুবনেশ্বরী-মন্দিরে জীববলি বন্ধ হওয়াতে বিবিধ অমঙ্গলের দৃষ্টান্তে ক্ষান্ত বললে, 'তা কেন, আমার ভাশুরপো, সে যে মরবে এ কে জানত। তিন দিনের জ্বর। যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উলটে গেল।'

ক্ষেমংকরী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নলিনাক্ষ চাটুজ্যের মা। বাল্যকাল থেকে ক্ষেমংকরী নৈষ্ঠিক শিক্ষার মধ্যে মানুষ। স্বামী রাজবল্লভ ব্রাহ্মমতে এক বিধবাকে বিবাহ করায় অগত্যা কাশীতে গিয়ে রইলেন। নলিনাক্ষও তাঁর সঙ্গী হতে কেঁদে বললেন, 'বাছা, আমার সঙ্গে তোদের তো কিছুই মেলে না, কেন মিছিমিছি কষ্ট পাইবি ?'

ক্ষেমংকরী তপস্বিনীর মতো ছিলেন ; স্নানাহ্নিক-পূজায় দিন কেটে গেলে একবেলা ফল-দুধ-মিষ্টি খেয়ে থাকতেন। নিজের কাজগুলিতে বেতনভুক্ চাকরের হস্তক্ষেপও সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু নিয়ম-সংযমে নলিনাক্ষের নিষ্ঠা তাঁর ভালো লাগত না ; পুরুষমানুষদের তিনি বৃহৎবালকের মতো মনে করতেন। অবশ্যই ধর্ম সকলকেই রক্ষা করতে হবে, কিন্তু আচার পুরুষমানুষের জন্য নয়—এই তাঁর মত। চারিদিকে পারিপাট্য ও সৌন্দর্যবিন্যাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল—সুন্দর ছেলে, সুন্দর মুখ তিনি বড়ো ভালোবাসতেন। দশাশ্বমেধঘাটে প্রাতঃস্নান সেরে প্রত্যেক শিবলিঙ্গে ফুল ও গঙ্গাজল দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক-একদিন একটি সুন্দর খোট্টার ছেলে কিংবা হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বাড়ি নিয়ে আসতেন। সুন্দর জিনিস দেখলে না-কিনেও পারতেন না। কোন্ জিনিসটি কে পেলে খুশি হবে, তাই মনে করে উপহার পাঠাতে তাঁর আনন্দ ছিল। একটি বড়ো আবলুশ কাঠের সিন্দুকের মধ্যে তাঁর নানা অনাবশ্যক শৌখিন জিনিস সঞ্চিত ছিল। নলিনাক্ষের একটি পরমাসুন্দরী বালিকা-বধূ কল্পনা করে মনে-মনে তাকে সাজাচ্ছেন-পরাচ্ছেন এই সুখ-চিন্তায় তাঁর অবসর কাটত। ইতিমধ্যে নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার বিবাহ এবং নৌকাডুবিতে মেয়েটির নিরুদ্দেশের কথা তিনি জানতেন না।

শীতের সময়েও নিয়মিত প্রাতঃস্নানে ক্ষেমংকরী নুমোনিয়ায় পড়লেন। কাশীতে নবাগত অন্নদাবাবুর মেয়ে হেমনলিনীর সেবায় তাঁর সংকটের অবস্থা কাটল। নলিনাক্ষের দৃষ্টান্তে তাকেও নানা-রকম নিয়ম-পালনে প্রবৃত্ত দেখে ক্ষেমংকরী কৌতুক করে বলতেন, 'মা, তোমরা দেখিতেছি, নলিনকে আরও খ্যাপাইয়া তুলিবে।...তোমরা সাজগোজ করিয়া হাসিয়া-খেলিয়া আমোদ-আহ্লাদে বেড়াইবে ; তোমাদের কি এখন সাধন করিবার বয়স ?...আমরা ভাইবোনেরা এই-সকল শিক্ষার মধ্যেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছি। এ যদি আমরা ছাড়ি তো আমাদের দ্বিতীয় কোনো আশ্রয় থাকে না। কিন্তু তোমরা তো সেরকম নও...

যে যাহা পাইয়াছে সে তাহাই ভালো করিয়া রক্ষা করিয়া চলুক, আমি তো এই বলি।' অপরাহ্ণে হেমনলিনীর চুল বাঁধতে-বাঁধতে আরও বলতেন, 'তুমি বুঝি মনে করো মা, আমি নিতান্তই সেকেলে, এখনকার কালের ফ্যাশান কিছু জানি না।...একটি বেশ ভালো মেম পাইয়াছিলাম...সে চলিয়া গেলে আবার আমাকে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িতে হইত। কী করিব মা, সংস্কার...ওটা মনের ঘৃণা নয়, ও কেবল একটা অভ্যাস।' হেমনলিনীর খোঁপা খুলে নতুন-নতুন বিনুনি করতে, নিজের সিন্দুক থেকে কাপড় বের করে তাকে সাজাতে তাঁর ভারি ভালো লাগত। বাংলা মাসিকপত্র ও গল্পের বই পড়তেও তিনি বড়ো ভালোবাসতেন; হেমনলিনীর সমস্ত বই অল্পদিনেই পড়ে ফেললেন। কোনো-কোনো প্রবন্ধ এবং বই-সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা শুনে হেমনলিনী আশ্চর্য হয়ে যেত।

ক্ষেমংকরী আবার জ্বরে পড়লেন। একটি ছোটো মেয়ের সঙ্গে নলিনাক্ষের বিবাহ দিয়ে তাকে নিজের হাতে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু নিজের আয়ু-সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি অন্নদাবাবুকে ডাকিয়ে হেমনলিনীর সঙ্গে তার বিবাহ-প্রস্তাব করলেন। এমন সময়ে একদিন দশাশ্বমেধঘাটে তাঁকে প্রণাম করলে কমলা। ক্ষেমংকরী বললেন, 'দেখি-দেখি, কী রূপ! যেন লক্ষ্মীটির প্রতিমা।' মেয়েটি স্বামী-পরিত্যক্তা জেনে তাকে কাছে টেনে বললেন, এসো-তো মা দেখি।...আহা, তোমাকে ফেলিয়া যাইতে পারে, জগতে এমন পাষাণও আছে! আমি আশীর্বাদ করিতেছি, সে আবার ফিরিয়া আসিবে। বিধাতা এত রূপ কখনো বৃথা নষ্ট করিবার জন্য গড়েন নাই।' কমলা তাঁর কাজ করতে চাইলে বললেন, 'পোড়াকপাল! আমার আবার কাজ! সংসারে ওই-তো আমার একটিমাত্র ছেলে, সেও সন্ন্যাসীর মতো থাকে...দেখো বাছা, আমার কাছে যখন তোমাকে চব্বিশ-ঘণ্টা থাকিতে হইবে...আমার মুখে আমার ছেলের গুণগান বার-বার শুনিয়া তোমার বিরক্ত ধরিবে, কিন্তু ওইটে তোমাকে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে।' কমলা রান্নাবাড়ার ভার চাইতে হেসে বললেন, 'গৃহিণীর রাজত্ব ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে—জীবনে অনেক জিনিস ছাড়িতে হইয়াছে, তবু ওইটুকু সঙ্গে-সঙ্গে লাগিয়াই আছে। তা মা, আজকের মতো তুমিই রাঁধো···বন্ধন একেবারেই তো কাটে না...ভাঁড়ারঘরের সিংহাসনটি কম নয়।' রাত্রে তাঁর জ্বর এলে কমলা পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তিনি বললেন, 'আর-জন্মে নিশ্চয় তুমি আমার মা ছিলে, মা।...আমার একটা অভ্যাস আছে, আমি বাজে কোনো লোকের সেবা সহিতে পারি না, কিন্তু তুমি আমার গায়ে হাত দিলে আমার গা যেন জুড়াইয়া যায়।'

হেমনলিনীর সম্মতি পেয়ে তিনি মকরমুখো সোনার বালা দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করে এলেন। পরে তাঁর ম্লান ভাব দেখে মনে-মনে ভাবলেন: 'নলিনের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ যে-কোনো মেয়ের পক্ষেই সৌভাগ্যের বিষয়,

কিন্তু এই শিক্ষামদমত্তা মেয়েটি আমার নলিনকে কি তাহার যোগ্য বলিয়াই মনে করিতেছেন না ? ...আমারই দোষ। বুড়া হইয়া গেলাম, তবু ধৈর্য ধরিতে পারিলাম না।...হায়-হায়, চিনিয়া দেখিবার মতো সময় যে হাতে নাই, এখন সংসারের সব কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া যাইবার জন্য তলব আসিয়াছে।' অন্নদাবাবুকে বললেন, 'দেখুন, বিবাহের সম্বন্ধে বেশি তাড়াতাড়ি করিয়া কাজ নাই।...হেমের মনের ভাব আমি অবশ্য বুঝি না—কিন্তু আমি নলিনের কথা বলিতে পারি, সে এখনো মনস্থির করিতে পারে নাই।' আহারের আয়োজন উপলক্ষে রান্নাঘরে এসে তিনি কমলাকে সাজালেন নিজের হাতে ; তার কপোল চুম্বন করে বললেন, 'আহা, এ-রূপ রাজার ঘরে মানাইত।...এসো-এসো মা, লজ্জা করিয়ো না। তোমাকে দেখিয়া কলেজে-পড়া বিদুষী রূপসীরা লজ্জা পাইবেন'। পুত্রাভিমানী জননী নলিনাক্ষের প্রতি হেমনলিনীর অবজ্ঞা কল্পনা করে কমলার জয়লাভে তৃপ্তি অনুভব করলেন।

অবশেষে নলিনাক্ষ একদিন মার কাছে কমলার পরিচয় দিতে চাইলে। কমলা তার অজ্ঞাতবাসের জবাবদিহির জন্য চিন্তিত হতে বললে, 'মা তাঁহার জীবনে অনেক অপরাধকে ক্ষমা করিয়া আসিয়াছেন, যাহা অপরাধ নহে তাহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিবেন।'

ক্ষেমা ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার এক দাসী। ক্ষেমা হাউমাউ-শব্দে নানা অভিযোগ তুলে বিমলার সকালবেলাকার দীপক রাগিণীর সুরে যেন বাসন-মাজার জল ছিটিয়ে দিত।

ক্ষেমা ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর দূর-সম্পর্কের এক পিসি। কুমুর পিতার আমল থেকে কুমুদের আশ্রিত।

খড়্গসিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের এক আশ্রিত। খড়্গসিংহকে কেউ বলত খুড়াসাহেব, কেউ বলত সুবাদারসাহেব। পৃথিবীতে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল না, ভাই ছিল না—তাঁর খুড়া হবার কোনো সুদূর সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁর সুবাও তার বেশি ছিল না ; কিন্তু কেউ তাঁর উপাধি-সম্বন্ধে কোনোদিন আপত্তি উত্থাপন করে নি। বিদেশী কেউ দুর্গে এলে খুড়াসাহেব তাকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বসতেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তার মনে বদ্ধমূল করে ছাড়তেন।

সুজা-কর্তৃক বিজয়গড় আক্রান্ত হলে ত্রিপুরার পুরোহিত রঘুপতি দুর্গে আশ্রিত হলেন। খুড়োসাহেব সেই ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনার ভার নিলেন। রঘুপতির মূর্তি দেখে তিনি মুগ্ধ। ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে একই সময়ে

উৎপন্ন, মনুর পর থেকে বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষেরা যে সে-দুর্গে বাস করছেন, দুর্গের উপর শিবের কী বর আছে, কার্তবীর্যার্জুন দুর্গে কী ভাবে বন্দী হয়েছিলেন—কিছুই আর রঘুপতির অগোচর রইল না। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল: শত্রুপক্ষের কামানের গোলা দুর্গে পৌঁছতে পারে নি। খুড়োসাহেব রঘুপতির দিকে চেয়ে হাসলেন।

পরদিন খুড়োসাহেব রঘুপতিকে নিয়ে দুর্গ দেখাতে লাগলেন: কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় বন্দিশালা। রঘুপতি দুর্গের প্রশংসা করে সুরঙ্গপথ-সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করায় খুড়োসাহেব সহসা আত্মসংবরণ করলেন: 'না, এ-দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।' কিন্তু রঘুপতির বিস্ময়ে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন: 'নাই, এ কি হইতে পারে। অবশ্যই আছে, তবে আমরা হয়তো কেহ জানি না।' পরে বুঝলেন: একবার 'নাই' একবার 'আছে' বললে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হতে পারে—বিদেশীর চোখে বিজয়গড় কোনো-অংশে খাটো হয়ে যাবে, এও নিতান্ত অসহ্য। তখন বললেন, 'ঠাকুর, বোধ করি, আপনার রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছু প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই।...চলুন একবার দেখাইয়া লইয়া আসি।' সহসা দারার প্রেরিত জয়সিংহের আক্রমণে বন্দী সুজা দুর্গে আনীত হলেন। খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নিচে শ্বেত হাস্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল। বেশভূষারও ত্রুটি রইল না। পাকা দাড়ি দু-ভাগে বিভক্ত করে দুই কানে লটকে দিলেন—মাথায় বাঁকা পাগড়ি, কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার, পায়ে শিঙের মতো পাকানো জরির জুতা। বিজয়গড়ের মহিমা যেন তাঁরই সর্বাঙ্গে তরঙ্গিত হতে লাগল। রাজপুত সুচেতসিংহকে তিনি দুর্গ দেখাতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পরদিন দুর্গের মধ্যে শা-সুজার পলায়নবার্তা রাষ্ট্র হল। সেই-সঙ্গে রঘুপতিকেও না-দেখে খুড়াসাহেব পাগড়ি খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সুচেতসিংহ বিস্মিত: এ কি ভূতের কাণ্ড! খুড়াসাহেব বললেন, 'না, এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেতসিংহ, এ একজন নিতান্ত নির্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আর-একজন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ।...একজন পলাইয়াছে। আর-একজনকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।' এই বলে রাজসভায় এসে তিনি বিক্রমসিংহের পদতলে তলোয়ার খুলে রাখলেন: 'আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী!' তাঁর নির্বাসনদণ্ড হল। খুড়াসাহেব বিক্রমসিংহের পা জড়িয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমি বৃদ্ধ, আমার...মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়াবয়সে শেয়াল-কুকুরের মতো আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না।'

শেষে জয়সিংহের অনুরোধে তাঁকে মার্জনা করা হল। সভা থেকে

বেরোবার সময় খুড়োসাহেব পড়ে গেলেন। সেদিন থেকে আর তাঁকে দেখা যেত না।

খুদি ॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীর স্বামিগৃহের এক বালিকা।

খুদি ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের সেজো বোনের এক মেয়ে।

খেমি ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের দাসী।

গঙ্গাধর ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। রায়গড়পতি বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

গঙ্গামণি ঘটক ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। ঘটক নীলমণির পিতা।

গণেশ গাঙ্গুলি ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। আদিত্যের সরকার। দেশোদ্ধারব্রতে সরলা জেলে গেলে আদিত্যের স্ত্রী নীরজা তাকে একটা চিঠি পাঠাতে গণেশের সহায়তা চাইলে। গণেশ গাঙ্গুলির কৃতিত্বের অভিমান ছিল; সে বললে, 'পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা, শুনি, কেননা পুলিসের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।' নীরজা লিখেছিল: জেল থেকে সে বেরিয়ে এলে তাদের পথ যাবে মিলে। গণেশ বললে, 'ওই-যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।'

গণেশ মজুমদার ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক সন্ত্রাসবাদী কর্মী।

গদা ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। মুকুন্দলাল দত্তের এক ভৃত্য।

গদাই ঘোষ ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের মাতুলালয়ের এক প্রতিবেশী।

গদাধর ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের এক বন্ধু। বারো-বছর বয়সে বাপের সঙ্গে বিরোধ করে গদাধর নিরুদ্দেশ; ষোল-বছর বয়সে মাস্টারের সঙ্গে ঝগড়া করে ক্লাস-ছাড়া। কুড়ি-বছর বয়সে স্ত্রীর সঙ্গে মনান্তর এবং তাকে পিতৃভবনে পাঠিয়ে সে নিশ্চিন্ত। এইভাবে স্বাধীনতার ধাপে-ধাপে উপরে উঠে গদাধর ত্রিশ-বছর বয়সে অসভ্য বাংলাদেশের সমস্ত কুসংস্কারকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়।

হঠাৎ মোহিনী নামে এক বিধবা নয়নপথবর্তী হল। সে বললে, 'দেখুন মশায়, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড়ো শোচনীয়।...এখন আমাদিগের

উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙিয়া দেওয়া।...স্ত্রীলোকদের কণ্ঠমোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না-দেখাই তবে কে দেখাইবে?' মোহিনীকে একাদশী করতে হয়, মোহিনী মাছ খেতে পায় না—এই-সমস্ত অত্যাচারে অত্যন্ত কাতর হয়ে তাকে মুক্ত করবার বিবিধ উপায় আলোচনা হতে লাগল। শেষে একরাত্রে মহেন্দ্রের সঙ্গে ঢুকে পড়ল তার বাড়িতে। তখনই আরম্ভ হল বৃষ্টি। কিন্তু পরোপকারের জন্য গদাধর বজ্রবিদ্যুৎও মাথায় নিতে প্রস্তুত। সহসা তার পিঠে পড়ল লাঠির ঘা। ভিজতে-ভিজতে তন্দ্রাঘোরে তবু সে জড়িতস্বরে বলতে লাগল, 'দেশ ও সমাজসংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্তব্য।... যে না-পারে সে পশু, সে পশু, সে পশু।'

অতঃপর দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য গদাধর এল নরেন্দ্রের গৃহে। সেখানে রঘুনাথের স্ত্রী কাত্যায়নীকে দেখে আবার উঠল জ্বলে। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের বয়সের এই তারতম্য কোন হৃদয়বান মানুষের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব—বিশেষত সমাজসংস্কারই যার জীবনের উদ্দেশ্য! তাই একদা সে বণিতা কাত্যায়নীকে নিয়েই নিরুদ্দেশ!

গিল্‌বি ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। জনৈকা ইংরেজ মহিলা। নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার সঙ্গিনী ও শিক্ষয়িত্রী। বাংলাদেশে স্বদেশী-হাওয়ার শুরুতে অপমান ও সমালোচনার ঝড়ে গিল্‌বিকে বিদায় নিতে হল। বিমলাকে ভালোবাসত বলে বিদায়কালে সে অশ্রুসংবরণ করতে পারল না।

গুপি ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনলালের এক হরকরা।

গুরুচরণ ভাদুড়ি ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। হরিশ কুণ্ডুর গোমস্তা। একদিন গুরুচরণ টাকা আদায়ে যায়। এক নিঃস্ব মুসলমান প্রজার সম্বল বলতে কিছু ছিল না—ছিল শুধু যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বললে, 'তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে।' নিকে করবার উমেদারও পাওয়া গেল। স্বামীর চোখের জলে ভাদুড়ির মন ভিজল না।

গোকুল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের খানসামা।

গোপাল ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের ভৃত্য।

গোপাল ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের পিসতুতো-বোন মুনুর স্বামী। গরিব গোপাল মদ খেয়ে স্ত্রীকে মারত। পরে অনুতাপে হাউমাউ করে কাঁদত: 'আর কখনও মদ ছোঁব না।' কিন্তু পরদিনই সন্ধ্যাবেলায় আবার মদ নিয়ে বসত।

গোবর্ধন ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার জনৈক প্রজা। ছ-মাস অসুখে অত্যন্ত প্লীহাবৃদ্ধি-হেতু গোবর্ধন দেবীর কাছে মানত করে। অনেকে ভাবলে, সে মানত পূরণ না-করায় মা রাজ্য ছেড়ে গেছেন।

গোবিন্দমাণিক্য ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক ত্রিপুরাধিপতি। ভুবনেশ্বরী-দেবী-মন্দিরের ঘাটে গোবিন্দমাণিক্য স্নানে আসতেন। একদিন একটি ছোটো মেয়ে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। রাজা বললেন, 'মা, আমি তোমার সন্তান।' বালিকার আঁচল ভরে ফুল তুলে দিয়ে তাঁর দেবপূজার কাজ হল। পরদিন থেকে হাসি আর তার ছোটো ভাই তাতার মুখ দেখলে তবে তাঁর প্রভাত হত। যেদিন তারা না আসত সেদিন তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হত না। আষাঢ়ের সকাল-বেলায় মন্দিরে মহিষবলির রক্ত দেখে হাসি প্রশ্ন করতে লাগল। রাজা ব্যথিত-হৃদয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। পরদিন তার কাকার বাড়িতে রাজার কোলে প্রলাপ বকতে-বকতে মেয়েটির মৃত্যু হল। রাজা বললেন, 'মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।'

ভুবনেশ্বরীর পুরোহিত রঘুপতিকে গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'মন্দিরে জীববলি আর হইবে না।...একটি বালিকার মূর্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।...আমার রাজ্যে যে-ব্যক্তি দেবতার নিকট জীববলি দিবে তাহার নির্বাসনদণ্ড হইবে।' সভাস্থলে উত্তেজনার ঝড় উঠল। তাতাকে কোলে নিয়ে নৃপতি বল সঞ্চয় করলেন। তাতা আর তার কাকা কেদারেশ্বরকে তিনি নিজের কাছেই রাখলেন; তাতার নাম দিলেন ধ্রুব। প্রতিদিন সংসারের আবর্তে প্রবেশ করার আগে সেই শিশুর সঙ্গে আসতেন নদীতীরের মুক্ত আকাশের নিচে। মন্দিরের পরিচারক জয়সিংহ একদিন বলির সম্বন্ধে শাস্ত্রের কথা উত্থাপন করায় বললেন: মানুষ আপনার প্রবৃত্তি অনুসারেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে—বলির সকর্দম রক্ত গায়ে মেখে উল্লাসে-চিৎকারে সে মায়ের পূজা করে না, নিজের হৃদয়ের হিংসারাক্ষসীরই পূজা করে—'হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।'

ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের সঙ্গে রঘুপতির চক্রান্তের কথা কানে এল। গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্রকে নিয়ে অপরাহ্ণে বেড়াতে এলেন গোমতীতীরের অরণ্যে; চলতে-চলতে এক-জায়গায় ফিরে দাঁড়িয়ে তার মুখের দিকে বিষণ্ন-দৃষ্টি রেখে বললেন, 'নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?...তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট ও রাজছত্র।...শতসহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি।...পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সে-ই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে, সে তো দস্যু...ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি

ছুরি মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই...যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে।...নগরে-গ্রামে যেখানে নিশ্চিন্তচিত্তে পরমস্নেহে ভাইয়ে-ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিয়ো না।'—এই বলে তরবারি দিতে গেলেন তার হাতে। পরে অনুতপ্ত নক্ষত্রের হাত ধরে এলেন মন্দিরে। রঘুপতিকে বললেন, 'ঠাকুর, আশীর্বাদ করুন...এ-রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে-প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ-রাজ্যের ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়'। অতঃপর একরাত্রে বলির জন্য অপহৃত হল ধ্রুব। অর্ধরাত্রে সংবাদ পেয়ে রাজা মন্দিরে এসে তাকে উদ্ধার করলেন। পরদিন অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে সেই অপরাধের শাস্তি দিতে হল : রঘুপতি ও নক্ষত্রের আট-বছরের নির্বাসন। বিদায়কালে সাশ্রুনেত্রে ভাইকে বললেন, 'নক্ষত্র...আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ।'—বলে সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন : 'বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না-জানি পূর্বজন্মে কী অপরাধ করিয়াছিলাম।...দেবতা তোমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন।'

দুটি বছর নির্বিঘ্নে কাটল। তার পরেই দেশে এল দুর্ভিক্ষ। গোবিন্দ-মাণিক্য প্রজাদের খাজনা মাফ করে দিলেন। মন্দিরের নূতন পুরোহিত বিল্বনকে বললেন, 'ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিয়াছি?' অনতিপরে শা-সুজার সহায়তায় রঘুপতি ও নক্ষত্রের অভিযানের সংবাদ এল। ব্যথিতহৃদয়ে নৃপতি ধ্রুবকে কোলে নিয়ে বললেন, 'ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস।' যুদ্ধ করতে অস্বীকৃত হয়ে তিনি বিল্বনকে বললেন, 'আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি...সেইজন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেইজন্যই এই যুদ্ধ। রাজ্য-পরিত্যাগের জন্য এ-সকল ভগবানের আদেশ।' বাদানুবাদের মধ্যে তিনি অধীর হয়ে বললেন, 'তুমি কি বল, আমি স্বহস্তে এই তরবারি লইয়া নক্ষত্র রায়কে আঘাত করিব?' ধ্রুব হঠাৎ বলে উঠল, 'ছি, ও-কথা বলতে নেই।' রাজার মনে হল : তিনি যেন দৈববাণী শুনলেন। বিল্বনের অনুরোধে তিনি নক্ষত্রকে একটি পত্র দিলেন। বিল্বন সেটি নিয়ে গেলেন। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তিনি দেখলেন : ইতিমধ্যে তিনি যে-সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন, গোবিন্দমাণিক্য তাদের বিদায় করে দিয়েছেন। গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'ঠাকুর, আমার জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।...আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব।' এদিকে রঘুপতি ও নক্ষত্রের সঙ্গে সমাগত মোগলসৈন্যের অত্যাচার চরমে উঠল। নিরীহ প্রজাদের রক্ষার জন্য গোবিন্দমাণিক্য সন্ন্যাসীবেশে রাজ্যত্যাগ করলেন—নক্ষত্রের জন্য একটি চিঠিতে রেখে গেলেন আশীর্বাদ।

কেদারেশ্বরের অনিচ্ছায় ধ্রুবকেও তিনি সঙ্গে নিতে পারলেন না। যাত্রাপথে সকলকে নক্ষত্রের কাছে থেকে তিনি রাজ্যের হিতসাধনের অনুরোধ করলেন।

চট্টগ্রামের ময়ানি নদীর তীরে এসে গোবিন্দমাণিক্য কুটির বাঁধলেন। দেখলেন : নির্জনে ধ্যানপরায়ণা প্রকৃতি স্নেহধারা সঞ্চয় করে নদীরূপে লোকালয়ে প্রেরণ করছে। তিনিও বিজনে-সঞ্চিত প্রেম সজনে বিতরণ করতে চললেন। অবশেষে আলমখালের কাছে একটি রুগ্ণ বালকের সেবা করে মানুষের সেবায় তাঁর জীবন কাটাবার বাসনা হল। চট্টগ্রামের দক্ষিণে রাজাকুলে এসে তিনি গ্রামবাসী ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে তুলতে লাগলেন। ঔরংজীবের ভয়ে সেখানে এলেন শা-সুজা ; আর এলেন অনুতপ্ত রঘুপতি। রাজা তাঁকে প্রণাম করে বললেন, 'ঠাকুর, তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ, আমার শত্রু আমার ছায়ার মতো আমার সঙ্গে-সঙ্গেই লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার হাত হইতে তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ।' বিল্বনও শেষে ধ্রুবকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। গোবিন্দমাণিক্য বললেন, 'আর সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।'

নক্ষত্রমাণিক্যের মৃত্যুর পরে যখন ত্রিপুরা থেকে দূত এল, রাজা তাঁর আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে ফিরতে চাইলেন না। বিল্বন তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করতে প্রতিশ্রুত হলে অগত্যা ধ্রুব এবং রঘুপতিকে নিয়ে তিনি রাজ্যপ্রবেশ করলেন। গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হয়েছিল ; ব্রাহ্মণদের অনেক জমি তিনি দান করেছিলেন তাম্রপত্রে। অনেক সৎকার্য সম্পন্ন করে অবশেষে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গোরা (গৌরমোহন) ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গৌরমোহনের ডাকনাম গোরা। গায়ের রঙ উগ্ররকমের সাদা। মাথায় প্রায় ছ-ফুট, হাড় চওড়া, দু-হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবা—গলার আওয়াজ এমন মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনলে চমকে উঠতে হয়। 'মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত ; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো'; চোখের উপরে ভ্রূরেখা অস্পষ্ট—'কপাল কানের দিকে চওড়া'। 'ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা'—নাকটা তার উপরে 'খাঁড়ার মতো' উদ্যত। দু-চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ন ; তার 'দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে' নিবদ্ধ—অথচ মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এসে 'কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত' করতে পারে। চারদিকের সকলকে সে খাপছাড়া রকমে ছাড়িয়ে উঠেছিল ; কলেজের পণ্ডিতমশায় তাকে বলতেন, রজতগিরি।

আইরিশবংশীয় গোরা মিউটিনির সময় এটোয়াতে জন্মকালেই পিতা-মাতাকে হারিয়ে কৃষ্ণদয়ালের স্ত্রী আনন্দময়ীর কোলে পালিত। নিজেকে তাঁদেরই সন্তান বলে জানত। পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় এসে সে পাড়ার ও ইস্কুলের ছেলেদের

সর্দার হয়ে 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' আউড়ে ইংরেজি বক্তৃতায় ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হয়ে উঠল। বয়স হলে কেশববাবুর বক্তৃতায় সে ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকৃষ্ট হল। কৃষ্ণদয়ালের কাছে যে-সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাগম হত জো পেলেই তাঁদের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিত—সে-তর্ক প্রায় ঘুষির কাছাকাছি। কিন্তু হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ধৈর্য ও ঔদার্যে গোরা সংযত না হয়ে পারল না। তাঁর কাছে বেদান্ত পড়তে আরম্ভ করে সে তলিয়ে গেল দর্শন-আলোচনায়। এমন সময়ে এক ইংরেজ মিশনারি হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজকে আক্রমণ করে দেশের লোককে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করায় গোরা অংকুশে আহত হয়ে লড়াই শুরু করলে। সংবাদপত্রে চিঠি চালাচালি বন্ধ হলে সে 'হিন্দুইজ্‌ম্‌' নাম দিয়ে ইংরেজিতে একটি বই লিখতে লাগল। এমনি করে সে হার মানল নিজেরই ওকালতির কাছে; বললে, 'আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামির মতো খাড়া করিয়া বিদেশীর আইনমতে তাহার বিচার করিতে আমরা দিবই না।...দেশের যাহা-কিছু আছে তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।' এর পরে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করে টিকি রেখে খাওয়া-ছোঁওয়ার বিচার করে বাপ-মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে সে একাকার করলে।

গোরার আবাল্যবন্ধু বিনয়। শিশুকাল থেকে দু-বন্ধুতে বাড়ির ছাদে ছুটোছুটি এবং পরীক্ষার সময় পড়া মুখস্থ করত। দু-জনের কলেজে পাস করা যখন আর বাকি ছিল না, তখনও সেই ছাদের উপরে মাসে একবার করে হিন্দুহিতৈষী সভা বসত। গোরা তার সভাপতি। ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর পরিবারে বিনয়ের আলাপ থাকায় গোরা পদে-পদে তাকে আঘাত করতে লাগল। এমন-কি হিন্দু-সমাজের আচারের প্রতি নিষ্ঠাহীনতার জন্য আনন্দময়ীর হাতেও অন্নগ্রহণ অসম্ভব বোধ করলে। একদিন কৃষ্ণদয়ালের নির্দেশে সে তাঁর বাল্যবন্ধু পরেশবাবুর খবর নিতে গেল সূর্যগ্রহণে ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নান সেরে। তার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতে-বাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড়তোলা কটকি জুতো। শিক্ষিত লোকের সমস্ত বই-পড়া ও নকল-করা সংস্কারকে একেবারে উপেক্ষা করবার জন্যই তার এই যুদ্ধসাজ। সেখানে বিনয়ের উপস্থিতি সে যেন লক্ষ্যই করলে না। পরেশের স্ত্রী কৃষ্ণদয়ালের সাকার-উপাসনায় বিরক্তি প্রকাশ করায় বললে, 'যার প্রকাশ নেই তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।' ব্রাহ্মসমাজের হারানবাবু বাঙালি-চরিত্রের নানা দোষের ব্যাখ্যা করছিলেন। গোরা তার সিংহনাদকে যথাসাধ্য রুদ্ধ করে বললে, 'আমাদের জাতের দ্বারা কখনো কিছুই হবে না, এ-কথা কি এতই সহজে বলবার ?...মিথ্যা পাপ, মিথ্যা নিন্দা আরও পাপ এবং স্বজাতির মিথ্যা নিন্দার মতো পাপ অল্পই আছে।'

পরদিন বিনয়ের সঙ্গে তার তর্ক বেধে উঠল; পাড়াসুদ্ধ লোক বলতে পারলে দু-বন্ধুতে সাক্ষাৎ ঘটেছে। পরেশের বাড়ি বিনয়ের যাতায়াত ও ভদ্রতার অনুরোধে চা-পানই তর্কের বিষয়। রাত্রে দু-বন্ধুতে আহারান্তে মাদুর পেতে বসল ছাদে। বিনয় পরেশের পরিবারে তার প্রথম প্রেমের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলে। এই সমস্ত ব্যাপারকে চিরদিন কবিত্বের আবর্জনা বলে গোরা উপেক্ষা করত। কিন্তু বিনয়ের এই অনুভূতির বেগ তার মনকেও ঠেলা দিতে লাগল। শেষরাত্রে চাঁদ যখন নিচে নেমে গেল গোরা বললে, 'বিনয়...তোমার জীবনে তুমি আজ একটা প্রবল সত্যের সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ—তার সঙ্গে ফাঁকি চলে না।... আমি যে-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছি সেই-ক্ষেত্রের সত্যকেও অমনি করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা।...স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাঙ্গীণভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই। সেদিন সে আমার ধনপ্রাণ, আমার অস্থিমজ্জারক্ত, আমার আকাশ-আলোক, আমার সমস্তই অনায়াসে আকর্ষণ করে নিতে পারবে।...বিনয়, তোমার এ প্রেমকেও পার হয়ে আসতে হবে—আমি বলছি, ওখানে থামলে চলবে না। আমাকে যে মহাশক্তি আহ্বান করছেন তিনি যে কত বড়ো সত্য একদিন তোমাকে আমি তা দেখাব। ...ভাই বিনয়। আমরা মরব, এক মরণে মরব। আমরা দুজনে এক, আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করবে না, কেউ বাধা দিতে পারবে না।' উৎসাহের আতিশয্যে সে বিনয়কে আলিঙ্গন করে ধরল: 'ভাই, আমার দেবীকে আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি, সে তো সৌন্দর্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান। সেখানে গান গেয়ে, ফুল দিয়ে পুজো নয়; সেখানে প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে পুজো করতে হবে...এ-একটা দুর্জয় দুঃসহ আবির্ভাব—এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ংকর—এর মধ্যে সেই কঠিন ঝংকার আছে যাতে করে সপ্তসুর এক-সঙ্গে বেজে উঠে তার ছিঁড়ে পড়ে যায়।...দেখো আমার বুকের ভিতরে কে ডমরু বাজাচ্ছে।'

গোরা প্রত্যহ পাড়ার নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে যাতায়াত করত—শিক্ষিত দলের মধ্যে তার এমন যাতায়াত ছিল না। গোরাকে তারা 'দাদাঠাকুর' বলত এবং কড়িবাঁধা হুঁকো দিয়ে অভ্যর্থনা করত। গোরার এক ভক্ত অপদেবতার আক্রমণ-সন্দেহে বিনা-চিকিৎসায় মারা গেল। গোরা সমস্ত শরীর শক্ত করে বিনয়কে বললে, 'সমস্ত জাত মিথ্যার কাছে মাথা বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে। দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ...চার দিকের হীনতার আকর্ষণ থেকে অল্প লোক কখনোই নিজেকে বই-পড়া বিদ্যার দ্বারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।...নৌকার খোলে যদি ছিদ্র থাকে তবে নৌকার মাস্তুল কখনোই গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতে পারবে না।' আনন্দময়ীর সপত্নীপুত্র মহিমের কন্যার সঙ্গে বিনয়ের বিবাহপ্রস্তাবে আবার পরেশবাবুর মেয়েদের কথা উঠল।

গোরা বললে, 'আমি যখন আমার মাকে দেখেছি, মাকে জেনেছি, তখন আমার দেশের সমস্ত স্ত্রীলোককে সেই এক জায়গায় দেখেছি ও জেনেছি।...সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় স্ত্রীলোক রাত্রির মতোই প্রচ্ছন্ন—তার সমস্ত কাজ নিগূঢ় এবং নিভৃত।...মেয়েদেরও যদি...আমরা প্রকাশ্য কর্মক্ষেত্রে টেনে আনি তা-হলে তাদের নিগূঢ় কর্মের ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যায়—তাতে সমাজের স্বাস্থ্য ও শান্তি ভঙ্গ হয়, সমাজে একটা মত্ততা প্রবেশ করে।'

সাপ যেমন কিছু গিলতে আরম্ভ করলে ছাড়তে পারে না, গোরাও তেমনি তার কোন সংকল্প সহজে ত্যাগ করতে পারত না। রাগ করে বিনয়কে ধরে রাখা শক্ত হবে বুঝে সে পরেশবাবুর মেয়েদের মধ্যে গিয়ে তাকে পাহারা দেবার মনস্থ করলে। পরেশের বাড়ি এসে আবার হারানের সঙ্গে তর্ক: গোরার মুখে আবার অবজ্ঞার হাসি, ঘৃণার ভ্রূকুটি, আত্মমর্যাদার গৌরব ও অসন্দিগ্ধ প্রত্যয় তরঙ্গিত হতে লাগল। হারান প্রস্থান করলে সে পরেশের আশ্রিতা বন্ধুকন্যা সুচরিতার দিকে তাকালে। শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যে সে ঔদ্ধত্য ও প্রগল্‌ভতাই কল্পনা করেছিল; কিন্তু তার বুদ্ধির উজ্জ্বলতা ও সলজ্জ নম্রতায় অভিভূত হয়ে বললে, 'ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি, বিশেষ শক্তি, বিশেষ সত্য আছে, সেইটের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারাই ভারত সার্থক হবে...আপনার প্রতি আমার এই অনুরোধ, আপনি ভারতবর্ষের ভিতরে আসুন, এর সমস্ত ভালোমন্দের মাঝখানেই নেবে দাঁড়ান,—যদি বিকৃতি থাকে, তবে ভিতর থেকে সংশোধন করে তুলুন...এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে...এর কোনো কাজেই লাগবেন না।' পরেশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে এল গঙ্গাতীরে। সেই কালো জলের নিবিড় অন্ধকারে নগরের অব্যক্ত কোলাহলে, নক্ষত্রের অপরিস্ফুট আলোকে বিশ্বব্যাপিনী কোন্ অবগুণ্ঠিতা মায়াবিনীর সামনে দাঁড়াল সে আত্মবিস্মৃত হয়ে। গোরার সংকল্পবদ্ধ জীবনে এ কিসের আবির্ভাব! সংগ্রাম করবার জন্য সে মুষ্টি দৃঢ় করলে; অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল, নম্রতায় কোমল দুই চক্ষের দৃষ্টি তার মুখের উপরে স্থাপিত হল। পরদিনই গোরা সেই আবেশের জাল ছিন্ন করে পথে বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যাকুল হল। আহারান্তে পিঠে একটা পুঁটলি বেঁধে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক-রোড ধরে।

গোরা চলেও শ্রান্ত হত না, আহার-বিহারের অসুবিধাতেও দৃক্‌পাত করত না। তার সঙ্গীরা একে-একে অদৃশ্য হল। কলকাতার ভদ্র-শিক্ষিত সমাজের বাইরে গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ দুর্বল—গোরা তা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলে। চলতে-চলতে সে চর-ঘোষপুরে উপস্থিত। গ্রামটি নীলকর সাহেবদের ইজারা। সাহেবের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গ্রামের অধিকাংশ লোক ছিল হাজতে। গোরা এক নাপিতের বাড়ি আশ্রয় নিয়ে তাদের রক্ষা করবার সংকল্প করলে। নাপিত ভীত হওয়াতে বিরক্ত হয়ে নীলকুঠির

তহশীলদারকে যথোচিত তিরস্কার করে সে সদরে গেল ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যাজিস্ট্রেট প্রজাদেরই দোষারোপ করলেন। গোরা মেঘমন্দ্রস্বরে জবাব দিলে, 'তারা বদমায়েস নয়, তারা নির্ভীক, স্বাধীনচেতা...আপনি যখন অত্যাচারের প্রতিবিধান করবেন না ব'লে মনস্থির করেছেন...আমি গ্রামের লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করব।' পরদিন গোরা ঘোষপুরের প্রজাদের হয়ে জামিনের দরখাস্ত করলে; কিন্তু ফল হল না। সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও কোন উকিল রাজি হল না। গোরা উকিলের সন্ধানে রওনা হল কলকাতায়। পথিমধ্যে একদল ছাত্রকে পুলিসের হাতে অপমানিত হতে দেখে কিল-ঘুষি-লাথি মেরে সে নিজেই গেল হাজতে। বিনয় সংবাদ পেয়ে দেখা করতে এল। গোরা নিজের পক্ষে উকিল দিতে অনিচ্ছুক হয়ে বললে, 'আমাদের দেশের যে ধর্মনীতি তাতে আমরা জানি সুবিচার করার গরজ রাজার; প্রজার প্রতি অবিচার রাজারই অধর্ম'।...রাজা মাথার উপরে থাকতে ন্যায়বিচার পয়সা দিয়ে কিনতে যদি সর্বস্বান্ত হতে হয়, তবে এমন বিচারের জন্যে আমি সিকি-পয়সা খরচ করতে চাই নে।' নিশ্চিত জেলে যাবে জেনে সে আনন্দময়ীকে লিখলে, 'কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি একটুও কষ্ট পাইলে চলিবে না।...আরও অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে.. ভৃগুপদাঘাতের চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণ চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়াছেন...সেই চিহ্ন যদি তাঁর অলংকার হয় তবে আমার ভাবনা কী, তোমারই বা দুঃখ কিসের?'

একমাস পরে কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে গোরা নিজেকে অশুচি বোধ করলে। বিনয় পরেশের কন্যা ললিতাকে বিবাহ করবার সংকল্প করেছিল; শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বললে, 'সমস্ত পৃথিবী যে-ভারতবর্ষকে ত্যাগ করেছে, যাকে অপমান করেছে, আমি তারই সঙ্গে এক অপমানের আসনে স্থান নিতে চাই—আমার এই জাতিভেদের ভারতবর্ষ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই পৌত্তলিক ভারতবর্ষ। তুমি এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে আমার সঙ্গেও ভিন্ন হবে।' জেলের অবরোধের মধ্যে দুটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা গোরার মনে গভীরতর মুক্তি এনে দিত—একটি মুখ তার আজন্ম-পরিচিত মাতার, আর-একটি বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত নম্রসুন্দর মুখ সুচরিতার। সুচরিতার স্মৃতিকে সে ঠেকাতে পারে নি। সেদিন সুচরিতা দেখা করতে এলে তাকে ব্যক্তি বলে সে দেখলে না, একটি ভাব বলে দেখলে; ভারতের যে-নারীপ্রকৃতি তার গৃহকে মধুর করে তোলে পুণ্যে-সৌন্দর্যে প্রেমে-পবিত্রতায়—সেই লক্ষ্মীরূপে দেখলে। মনে-মনে সে আশ্চর্য হয়ে ভাবলে: ভারতবর্ষের যে-নারী এতদিন তার অনুভবগোচর ছিল, তাতে যেন শক্তি ছিল প্রাণ ছিল না, পেশী ছিল স্নায়ু ছিল

না—নারীকে এতদিন ক্ষুদ্র জেনে তার পৌরুষও শীর্ণ হয়ে ছিল। বিনয়ের ব্যাপারে মর্মাহত হয়ে সে সুচরিতার সঙ্গে দেখা করতে গেল : 'আপনার কাছে আমি কোনোরকম ছোটো প্রত্যাশা করি নে···সম্প্রদায়ের লোকের কাছ থেকে মানুষ যেটুকু প্রত্যাশা করতে পারে আমি আপনার কাছ থেকে তার চেয়ে অনেক বেশি করি। ...ভারতবর্ষের সৌরমণ্ডলের মধ্যেই তোমার স্থান—তুমি আমার আপন দেশের... যেখানে তোমার প্রতিষ্ঠা সেইখানেই তোমাকে দৃঢ় করে প্রতিষ্ঠিত করব তবে আমি ছাড়ব।' পরদিন গোরা এসে সুচরিতার মাসি হরিমোহিনীর ঠাকুরকে প্রণাম করলে। সুচরিতা জিজ্ঞাসা করলে : সে কি ঠাকুরকে ভক্তি করে? গোরা জোরের সঙ্গে বললে, 'আমি ঠাকুরকে ভক্তি করি কিনা ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু আমি আমার দেশের ভক্তিকে ভক্তি করি।···তুমি কেবল পাথরকেই দেখ, আমি তোমার মাসির ভক্তিপূর্ণ করুণ হৃদয়কেই দেখি।...ভাবের অসীমতা বিস্তৃতির অসীমতার চেয়ে ঢের বড়ো জিনিস।...পরিমাণগত অসীমকে তুমি অসীম বল, সেই জন্যেই চোখ বুঁজে তোমাকে অসীমের কথা ভাবতে হয়, জানি নে তাতে কোনো ফল পাও কিনা। কিন্তু হৃদয়ের অসীমকে চোখ মেলে এতটুকু পদার্থের মধ্যেও পাওয়া যায়।...আমাদের দেশের কোনো ভক্তই সসীমের পূজা করে না—সীমার মধ্যে সীমাকে হারিয়ে ফেলা ওই-তো তাদের ভক্তির আনন্দ।...তুমি জানতে চাও, আমি কোনোদিনই ঈশ্বরকে চেয়েছি কিনা। না, আমার মন ও-দিকেই যায় নি...কিন্তু আমার দেশের লোকের ভক্তিকে তোমরা যে উপহাস করবে এও আমি কোনোদিন সহ্য করতে পারব না।... তোমার সঙ্গে একসঙ্গে একদৃষ্টিতে আমি আমার দেশকে সম্মুখে দেখব এই একটি আকাঙ্ক্ষা যেন আমাকে দগ্ধ করছে। আমার ভারতবর্ষের জন্য আমি পুরুষ তো কেবলমাত্র খেটে মরতে পারি—কিন্তু তুমি না-হলে প্রদীপ জ্বেলে তাঁকে বরণ করবে কে? ভারতবর্ষের সেবা সুন্দর হবে না, তুমি যদি তাঁর কাছ থেকে দূরে থাক।' সুচরিতার সংশয়বিহীন দু-চোখে তখন অশ্রু। ভূমিকম্পে পাথরের রাজপ্রাসাদ যেমন টলে, গোরার হৃদয় তেমনি করে টলতে লাগল।

গোরার স্বভাবে দ্বিধা জিনিসটা নিতান্ত কম। পরদিন আবার সুচরিতার কাছে গিয়ে সে হরিমোহিনী-কর্তৃক তিরস্কৃত হল। তখন সহসা যেন জেগে উঠে সে নিজেকে সচেতন করে তুলল। আনন্দময়ী নিজগৃহের একাংশে বিনয়ের বিবাহের আয়োজন করায় সে শুধু বাধাই দিলে না—নিজেও যোগ দেবার অক্ষমতা জানালে। কারাবাসের অশুচিতা দূর করবার জন্য সে এক প্রায়শ্চিত্ত-সভার আয়োজন করছিল—এই প্রায়শ্চিত্ত শুধু অশুচিতার নয়, সমস্ত দিকে নির্মল হয়ে নূতন দেহ নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নবজন্ম লাভের জন্য। এদিকে কারামুক্তির পর তার কাছে লোকসমাগম ও স্তবস্তুতি চলছিল। গোরার পক্ষে তা শ্বাসরোধকর ও অসহ্য মনে হল। তাই আগের মতো আবার আরম্ভ করলে পল্লীভ্রমণ। সকালে কিছু খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোত—ফিরত রাত্রে। এই প্রথম সে লক্ষ করলে যে,

পল্লীর মধ্যে সমাজের বন্ধন ও লোকাচার শিক্ষিত ভদ্রসমাজের চেয়ে বেশি—কিন্তু তা কিছুমাত্র বল দিচ্ছে না। ডাকাতির চেয়ে পুলিস-তদন্ত যেমন গ্রামের পক্ষে গুরুতর দুর্ঘটনা, তেমনি মৃত্যুর চেয়ে শ্রাদ্ধ তাদের পক্ষে আরও দুর্ভাগ্যের কারণ। এই-সমস্ত ক্রিয়াকর্মে কেউ কাউকে দয়া করে না; কোনো বিপদ-আপদ হলে হিন্দুরা মুসলমানের মতো এক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ধর্মের দ্বারা মুসলমান এক, কেবল আচারের দ্বারা নয়—তারা এমন একটা জিনিসকে গ্রহণ করেছে, যা শুধু 'না'-মাত্র নয়, 'হাঁ'—যা ঋণাত্মক নয়, ধনাত্মক।

বিবাহের দিন প্রত্যুষে বিনয় এসে দেখলে, গোরা ঠাকুরঘরে পুজোয় বসেছে। গোরা তাকে উপরে নিয়ে গেল। সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিললে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা গোরার প্রেমের উপর পড়ে তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করে তুলল। কিছুকাল থেকে গোরার হৃদয়ের একটি আকাঙ্ক্ষা, একটি পূর্ণতার অভাব কোনো কাজ দিয়েই পূরণ হচ্ছিল না; সে শুধু নিজে নয়, তার কাজও উর্ধ্বের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছিল—আলো চাই, উজ্জ্বল আলো, সুন্দর আলো। সমস্ত দিন এমনি করে কাটল। অবশেষে অপরাহ্ন যখন সায়াহ্নে বিলীন হতে চলেছে, গোরা একখানা চাদর কাঁধে ফেলে পথে বেরিয়ে পড়ল; মনে-মনে বললে, 'যে আমারই তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ, আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব।' সমস্ত পৃথিবীর মাঝখানে সুচরিতা তারই আহ্বানের জন্য অপেক্ষা করে আছে। জনাকীর্ণ কলকাতার পথে সে বেগে চলতে লাগল—কেউ যেন, কিছুই যেন তাকে স্পর্শ করলে না। সুচরিতার বাড়ির সামনে এসে সে সচেতন হয়ে দাঁড়াল: দেখলে, দরজা বন্ধ। সুচরিতা বিবাহবাড়িতে গিয়েছিল। ছোটো-ছোটো ঘটনার মধ্যেও গোরা বিশেষ অর্থ বুঝতে চেষ্টা করত; বুঝলে, এ স্বদেশদেবতারই অভিপ্রায়। এ-জীবনে সুচরিতার দ্বার তার পক্ষে রুদ্ধ—সুচরিতা তার পক্ষে নেই। সে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ—আসক্তি-অনুরক্তি তার জন্য নয়। গোরার জীবন যখন থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, মন দিতে চেষ্টা করেছে সে পুজোর্চনায়; কিন্তু কিছুতেই ভক্তিকে জাগ্রত করতে পারে নি। ভাবলে: সংসারে ব্রাহ্মণের জন্য নিয়ম-সংযম, ধর্মসাধনায় তার জন্য জ্ঞান—এই ব্রাহ্মণের গৌরব।

প্রায়শ্চিত্ত কাশীপুরের বাগানে। গোরা আগের দিন বাগানে যেতে প্রস্তুত হল। এমন সময়ে হরিমোহিনী উপস্থিত—সুচরিতাকে অন্যত্র বিবাহ করতে সে বুঝিয়ে বলে, এই তাঁর ইচ্ছা। গোরার বুকে বজ্রসূচি বিঁধছিল। দৈবের যোগে সুচরিতাকে সে-ই দেখেছে প্রগাঢ় সত্যরূপে, সুচরিতাকে পেয়েছে। আর-কেউ তাকে পাবে কেমন করে। গোরা ভাবতে লাগল। কৃষ্ণদয়াল কেবলই তার প্রায়শ্চিত্তে বাধা দিয়ে আসছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই জেনেছেন, অন্তরের মধ্যে সে ব্রাহ্মণ নয়, তপস্বী নয়। নিজের সম্বন্ধে সত্য কথাটি শোনবার জন্য তখনি গেল

সে কৃষ্ণদয়ালের মহলে। কিন্তু সেখানেও দরজা বন্ধ। গোরা হতাশ হয়ে ভাবলে, তার প্রায়শ্চিত্ত সেদিনই। দেশের জন্য তাকে বড়ো ত্যাগ করতে হবে, নাড়ি ছেদন করে প্রবেশ করতে হবে নবজীবনে—প্রাতে জনসমাজে লৌকিক প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু সুচরিতার সঙ্গে আর তো দেখা হতে পারে না; দেবতাকে নিবেদন করা হয়ে গেছে। হরিমোহিনীর নির্দেশ-মতো তাই সে বড়ো-বড়ো অক্ষরে লিখে দিলে, 'বিবাহই নারীর জীবনে সাধনার পথ, গৃহধর্মই তাহার প্রধান ধর্ম। এই বিবাহ ইচ্ছাপূরণের জন্য নহে, কল্যাণসাধনের জন্য।' প্রত্যুষেই গোরা এল বাগানে। সমস্ত কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে তার হৃদয়ের নিগূঢ়তলে তার হৃদয়বাসী কোন্ গৃহশত্রু শুধু একটি কথাই বলছিল: 'অন্যায় রহিয়া গেল।' এ-অন্যায় নিয়মের ত্রুটি নয়, মন্ত্রের ভ্রম নয়, শাস্ত্রের বিরুদ্ধতা নয়—এ-অন্যায় ছিল প্রকৃতির ভিতরে। গোরা স্নান করে উঠল। এমন সময়ে সংবাদ পেঁছিল: কৃষ্ণদয়াল গুরুতর অসুস্থ। গোরা গৃহে ফিরে এসে তাঁর কাছে শুনলে নিজের জন্মবৃত্তান্ত। অধীর হয়ে সে চাইলে মার দিকে। সহসা অগ্নিগিরি-উচ্ছ্বাসের মতো তার মুখ দিয়ে বেরোল—'মা, তুমি আমার মা নও?' একে-একে সে সমস্ত শুনলে। তার শৈশব থেকে জীবনের ভিত্তি, তার পশ্চাতের অতীত, তার একলক্ষ্যবর্তী সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ—সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেল। তার মা নেই, বাপ নেই, দেশ নেই, জাতি নেই, নাম নেই, গোত্র নেই, দেবতা নেই! তার সমস্তই কেবল একটা—'না!' এই দিক্‌চিহ্ন-হীন অদ্ভুত শূন্যতার মধ্যে সে বসে রইল নির্বাক হয়ে।

পরেশবাবু চিরদিন শাস্ত্রের অনুশাসন ও লোকাচার অপেক্ষা সত্য ও হৃদয়কেই বড়ো করে দেখতেন—ললিতার বিবাহ-উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মসমাজভ্রষ্ট হয়েছিলেন। গোরা তাঁর কাছে গেল। সুচরিতাও সেখানে ছিল। গোরা ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে পরেশবাবুকে বললে, 'আমি হিন্দু নই।...ভারতবর্ষের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত দেবমন্দিরের দ্বার আজ আমার কাছে রুদ্ধ...আজ সমস্ত দেশের মধ্যে কোনো পঙ্‌ক্তিতে কোনো জায়গায় আমার আহারের আসন নেই।...আমি একটি নিষ্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে সেই অভেদ্য দুর্গের মধ্যে আমার ভক্তিকে সম্পূর্ণ নিরাপদে রক্ষা করবার জন্যে একদিন আমার চারদিকের সঙ্গে কী লড়াই না করেছি! আজ...আমি একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সত্যের মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ জ্ঞান-অজ্ঞান একেবারেই আমার বুকের কাছে এসে পেঁছেছে—আজ আমি সত্যকার সেবার অধিকারী হয়েছি...আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়।...আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...কাল রাত্রে আমি বিধাতার কাছে প্রার্থনা করেছিলুম যে, আজ প্রাতঃকালে আমি যেন নূতন জীবন

লাভ করি।...আজ প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে আমি ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি...আপনি আজ কোনো সমাজেই স্থান পান নি। আমাকে আপনার শিষ্য করুন। আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান-ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে, কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।' সুচরিতার দিকে ফিরে সে বললে, 'সুচরিতা, আমি আর তোমার গুরু নই। আমি তোমার কাছে এই বলে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আমার হাত ধরে তোমার ওই গুরুর কাছে আমাকে নিয়ে যাও।'—এই বলে সুচরিতার হাত ধরে সে নত হল পরেশের পদতলে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সে আনন্দময়ীর পা দু-খানি মাথার উপরে রেখে বললে, 'মা, তুমিই আমার মা। যে-মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই—শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'

চন্দ্রনাথবাবু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের ছেলেবেলার মাস্টারমশাই। চন্দ্রনাথবাবু এন্ট্রেন্স-স্কুলের হেডমাস্টার। অন্তরের মধ্যে অন্তর্যামীকে রেখে তিনি না ভয় করতেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। বড়োঘরের ছেলে নিখিলেশকে তিনিই তাঁর শান্ত-পবিত্র মূর্তির প্রভাবে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করেন। তাঁকে সে নিজের কাছে রাখতে চাইলে বলতেন, 'দেখো, তোমাকে আমি যা দিয়েছি তার দাম পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েছি তার দাম যদি নিই তা হলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি করা হবে।' আরও বলতেন, 'দেখো নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।' বরাবর বাসা থেকে তিনি রোদবৃষ্টি মাথায় করে আসতেন। নিখিলেশ নিজের গাড়ি ব্যবহার করতে অনুরোধ করলে বলতেন, 'আমরা হচ্ছি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।' তাঁর এম. এ. পাস ছেলে নিখিলেশের কাছে কাজ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে বিপত্নীক বৃদ্ধকে ফেলে চলে গেল রেঙ্গুনে।

চন্দ্রনাথবাবুর ভক্ত পঞ্চুকে নিখিলেশ কিছু দান করতে চাইলে তিনি নিষেধ করতেন : 'তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পারো, দুঃখ নষ্ট করতে পারো না। আমাদের বাংলা দেশে পঞ্চু তো একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেছে।' এই-দুঃখের মূলচ্ছেদনের ব্রত নিখিলেশের। কোথাও সামান্য অমঙ্গলের হাওয়া দিলেই চন্দ্রনাথবাবুর চিত্তে ঘা দিত। নিখিলেশের গৃহে সহসা দেশভক্ত সন্দীপের আগমনে বললেন, 'সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?' তাঁর অগোচর ছিল না : ভিতরে-ভিতরে নিখিলেশ

এবং তার স্ত্রী বিমলার মধ্যে সম্বন্ধের নাড়ি কাটা পড়ছিল। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাসা গিয়ে নিখিল নানা কথায় রাত দুপুর করত। ভাদ্রমাসের গুমোটে নিজের বাসায় নিখিলেশের পক্ষে ক্লেশকর বুঝে তিনিই এসে উঠলেন তার বাড়িতে। ফাঁক পেলে বিমলার মনকেও একটা শিখরের উপরে দাঁড় করিয়ে দিতেন। আর, দেশের জন্য সন্দীপকে অন্যায় করতে দেখে বলতেন, 'দেখুন... কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।...কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মতো দেখে এসেছে তারাই আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।'

পঞ্চু অভাবের তাড়নায় হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হল। চন্দ্রনাথবাবু তার ছেলে-মেয়েদের নিজের কাছে এনে রাখলেন। ঘরে তিনি একলা, সমস্ত দিন ইস্কুল। পঞ্চু ফিরে এলে কিছু টাকা ধার দিয়ে তাকে উপদেশ দিলেন কাপড়ের ব্যবসা করতে। এমন সময় গ্রামের ছেলেরা সন্দীপকে দলপতি করে বিলিতি-কাপড় উঠিয়ে দেবার দাবি জানালে। তারা প্রায় সকলেই চন্দ্রনাথবাবুর ছাত্র। তাঁর নিঃশব্দ বেদনা সেদিন আর বাধা মানল না—উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন: 'দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই-সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?...আমি-তো একে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যত দূর পর্যন্ত পার করো, মরণ পর্যন্ত—আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে-পিছনে চলতে রাজি আছি। কিন্তু এই গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।' পঞ্চুর উপরেও অত্যাচার শুরু হল। চন্দ্রনাথবাবু বললেন, 'অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না।'—বলে তার পক্ষে দাঁড়ালেন। এমন-কি, এরই ফলে তার বৈষয়িক সংকট উপস্থিত হলে বাক্স-বিছানা-সহ তার বাড়িতে এসে উঠলেন।

অবশেষে উভয় সম্প্রদায়ে দাঙ্গা উপস্থিত। নিখিলেশের আহ্বানে চন্দ্রনাথবাবু এসে বললেন, 'আর কল্যাণ নেই। ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি, এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরোবে, তার আর কোনো লজ্জা থাকবে না।...দাও, দাও, তোমার এলাকা থেকে ওদের এখনই বিদায় করে দাও।...বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও।...মানুষকে, মানুষের কর্মক্ষেত্রকে উনি একবার বড়ো জায়গা থেকে দেখে নিন।'

চন্দ্রভান ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মুকুন্দলালের এক বৃদ্ধ জমাদার। সদর দরজায় তামাক-মাখা, সিদ্ধি-কোটার অবকাশে বেঞ্চিতে বসে চন্দ্রভান লম্বা দাড়ি দু-ভাগ করে আঁচড়ে কানের ওপর বাঁধত।

চন্দ্রমাধববাবু ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমারসভার সভাপতি। চন্দ্রমাধববাবু ব্রাহ্ম-কলেজের অধ্যাপক; দেশের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী। 'শরীরটি কৃশ কিন্তু কঠিন, মাথাটা মস্ত, বড়ো দুইটি চোখ অন্যমনস্ক খেয়ালে পরিপূর্ণ।'

মধুমিস্ত্রির গলির দশ-নম্বরে তাঁর বাসাতেই চিরকুমারসভার কার্যালয়। কিন্তু সভ্য-সংখ্যা ঠেকেছিল এসে তিনটিতে—যূথভ্রষ্টেরা গৃহী হয়ে রোজগারে প্রবৃত্ত। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব সভার মধ্যে কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলে ধরে বলছিলেন, 'আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন ...পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে-একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয়জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেই জন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব এবং কোনোরকম শপথেও বদ্ধ হতে চাই নে...বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন।' বিষয়কর্মে চন্দ্রমাধববাবুর মতো অপটু কেউ ছিল না, কিন্তু তাঁর মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে: 'আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য।...মনে করো, আমরা সকলেই যদি দিয়াশালাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহলে দেশে সস্তা দেশালাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না।'—এই বলে জাপানে এবং য়ুরোপে সবসুদ্ধ কত দেশালাই তৈরি হয়, কোন্-কোন্ জাতের কাঠি ব্যবহার হয়, কাঠির সঙ্গে কী দাহ্য পদার্থ থাকে, ভারতবর্ষে কত আসে—সমস্তই বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

চন্দ্রমাধবের ব্যস্ততার অবধি ছিল না। সভ্যদের নানারকম প্রস্তুতি দরকার। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কি সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কী-রকম চিকিৎসা করতে হবে—সে-সম্বন্ধে শিক্ষালাভের জন্য একটি ডাক্তারকে ধরেছিলেন। দেশবাসীর উপকারের জন্য সভ্যদের কিছু আইনের জ্ঞান থাকাও চাই। অবিচার-অত্যাচার থেকে রক্ষা এবং নিজের-নিজের অধিকার সম্বন্ধে চাষাভূষোদের বুঝিয়ে দেওয়া চাই। তাই তাঁকে বলতে শোনা যেত—'না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে, আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে—গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশি অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে।' প্রাক্তন সভাপতি অক্ষয়ের পরামর্শে আর-একটি চিন্তাও তাঁর মনের মধ্যে খেলছিল: 'চিরকুমারসভার সংস্রবে আর-একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ-সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে।..আমাদের এক-দল কুমারব্রত ধারণ করে এক-জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে

কাজ করবেন, আর-একদল গৃহী নিজ-নিজ রুচি ও সাধ্য অনুসারে...দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব-প্রভৃতি শিখতে হবে, তাঁরা যে-দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্নতন্ন করে সংগ্রহ করবেন—তা-হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে।'

সংসার-ব্যাপারে তাঁর ভগিনী নির্মলার উপরেই চন্দ্রমাধবের একান্ত নির্ভর। একদিন বোতাম হারিয়ে তিনি নিতান্তই বিব্রত। সহসা নির্মলার ভাবান্তরে সন্দিগ্ধ হয়ে তার মুখটি চোখের কাছে তুলে ধরলেন। বুঝলেন : নির্মল আকাশে মেঘোদয়। তারও কুমারসভার সভ্য হবার ইচ্ছা। কাজেই নিজের চুলগুলোর মধ্যে ঘন-ঘন আঙুল চালিয়ে চন্দ্রবাবু অত্যন্ত বিশৃঙ্খল করে তুললেন। ছেলেরা যদি পারে, মেয়েরা কেন পারবে না, নিষ্কলুষচিত্ত চন্দ্রমাধব তার কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। কাজেই সভাস্থলে কথাটায় পালে হাওয়া না-পেয়ে তাঁকে ঝেঁকে উঠতে হল এবং নির্মলা অবশেষে সভ্য হল। চন্দ্রমাধব প্রায়ই বলতে লাগলেন, 'সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। এই-জন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি।'

হেনকালে তিনি এক সভ্যের কাছ থেকে নির্মলাকে বিবাহের প্রস্তাব পেলেন। বিস্মিত হয়ে ভাবলেন : 'কী আশ্চর্য! আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ! এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।' অনতিপরেই তাঁকে সভায় তুলতে হল এক নূতনতর প্রস্তাব : 'আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না-ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে।'

চন্দ্রমোহন ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। হেমনলিনীদের কলুটোলার এক প্রতিবেশী।

চন্দ্রা ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের কথিত গল্পের কাঞ্চীরাজকন্যা।

চিত্রসিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। বিজয়গড়পতি বিক্রমসিংহের এক পূর্বপুরুষ।

চিন্তামণি ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার জনৈক কৃষক। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরে জীববলি বন্ধ হলে তাকেই দুর্নিমিত্তের কারণ মনে করে চিন্তামণি অন্য-একজন চাষিকে বলে, 'অত কথায় কাজ কী, দেখো-না কেন, এ-বছর যেমন ধান সস্তা হয়েছে এমন অন্য-কোনো-বছর হয় নি। এ-বছর চাষার কপালে কী আছে কে জানে।'

চূড়োমণি ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। গুজুরপাড়ার এক অধিবাসী। নক্ষত্র রায়ের একটি শিশু-বিড়ালের বিবাহের ঘটক।

চেৎসিং ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের কথিত গল্পের চরিত্র।

ছমু ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক ভৃত্য।

জগত্তারিণী ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। বিবাহযোগ্যা নৃপবালা-নীরবালার মা। বিধবা হবার পরে জগত্তারিণী মেয়েদের বিবাহ দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু ইচ্ছা হলেও তার উপায় করে উঠতে পারেন না— সময় যতই উত্তীর্ণ হয়, অন্য-পাঁচজনের উপরে দোষারোপ করতে থাকেন। বড়ো-জামাই অক্ষয়ের উপরেই তাঁর ভরসা। কিন্তু ঢিলে লোকদের স্বভাব এই যে, হঠাৎ একদা অসময়ে তাঁরা মনস্থির করে বসেন এবং ভালোমন্দ বিচারের পরিশ্রম স্বীকার না করে একদমে সমস্ত কাজ সেরে নিতে চেষ্টা করেন। তাই সেদিন তাকে বলে বসলেন, 'বাবা অক্ষয়।...তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।...তা যা বল বাবা, আসছে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।'

পরিবারে কর্তার আমলের আশ্রিত রসিক দুটি কুলীনের ছেলে নিয়ে এল। মনের আনন্দে জগত্তারিণী জলখাবার তৈরি করলেন। কিন্তু অক্ষয়ের চক্রান্তে তারা মুর্গি-মটনের জন্য লালায়িত হওয়াতে বললেন, 'বাবা ..আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম।' নিজের শৈথিল্যে যার কিছুই মনের মতো হয় না, সর্বদা ভৎর্সনা করবার জন্য তার একটা হতভাগ্যকে চাই। রসিক জগত্তারিণীর সেই বহিঃস্থিত আত্মগ্লানি-বিশেষ। অবশেষে বোনপোর কাছে পাত্রের সন্ধানে তিনি রওনা হলেন কাশীতে—তীর্থদর্শনেরও পরিকল্পনা ছিল। সঙ্গে নিলেন বড়ো মেয়ে পুরবালাকে। পুরবালার উপরে তাঁর বড়ো নির্ভর। সে তাঁর দেখাশোনার জন্য রসিকের নাম প্রস্তাব করায় বললেন, 'রক্ষে করো, আমাকে আর দেখেশুনে কাজ নেই! তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।'

কাশী থেকে জগত্তারিণী দুটি পাত্র স্থির করে এলেন। পুরবালাকে বললেন, 'মা পুরি, তুই একটু মনোযোগ না-করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কী-রকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।' মেজো মেয়ে শৈল বোঝালে: 'মা...ছেলে-দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাৎ—'। জগত্তারিণী ঝেঁকে উঠলেন: 'বিবেচনা করতে-করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল—আর বিবেচনা করতে পারি নে।' অক্ষয়ের মন্তব্য: 'বিবেচনা

সময়মতো এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক্।' জগত্তারিণী বললেন, 'বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো।'

মেয়েদের চোখের জল তবু থামে না। ত্যক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'বাবা অক্ষয়। দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি।...ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনি আসবে...তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে-পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও।' পাত্র দেখে কিন্তু মেয়েদের অপছন্দ হল না; কারণ, তারা কর্ত্রীর মনোনীত-দুটি নয়—রসিকের চেষ্টাতেই কুমারসভা থেকে সংগৃহীত। জগত্তারিণী বললেন, 'দেখলে-তো বাবা, কেমন ছেলে-দুটি?...মেয়েদের রকম দেখলে-তো বাবা! এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই!'

জগবন্ধু ।। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। সন্ত্রাসবাদী দলের এক সভ্য।

জগমোহন ।। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। জগমোহন শচীশের জ্যাঠা। সে-কালের এক নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করতেন বললে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সঙ্গে তাঁর তর্কের পদ্ধতি ছিল এই: 'ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া / সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই / অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই।'

ইংরেজি-ভাষায় জগমোহন অসামান্য ওস্তাদ। কারও মতে তিনি বাংলার মেকলে, কারও মতে জন্‌সন্। বাড়ির মধ্যে কোন্-অংশে তাঁর চলাফেরা তা মেঝে থেকে কড়ি পর্যন্ত ইংরেজি বইয়ের বোঝা দেখলেই জানা যেত। লৌকিক-অলৌকিক কোনো শক্তির কাছে তিনি হাতজোড় করতে নারাজ। কারও কাছে তিনি লেশমাত্র সুবিধা প্রত্যাশা করেন এমন সন্দেহ পাছে কারও মনে আসে, এই ভয়ে ক্ষমতাশালী লোকদেরও দূরে রেখে চলতেন; দেবতাকে না-মানার মধ্যেও এই ভাবটা ছিল। গুরুজনকে ভক্তি করাও তাঁর মতে একটা ঝুঁটা সংস্কার। শচীশের সঙ্গে তিনি সমবয়সীর মতো ব্যবহার করতেন।

বালক-বয়সে জগমোহনের বিবাহ হয়। যৌবনকালে যখন স্ত্রী মারা যান, তার আগেই তিনি ম্যাল্‌থস পড়েছিলেন—আর বিবাহ করেন নি। শচীশকে পিতৃস্নেহের বিপত্তি থেকে রক্ষা করতে তিনি নিজের ছেলের মতো অধিকার করেন। তাঁর নাস্তিক-ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন।' পাড়ার মুসলমান ব্যাপারী আর চামারদের নিয়ে তিনি ভোজের আয়োজন করতেন। শচীশের বাবা হরিমোহন তাঁকে ব্রাহ্ম বলে ভৎর্সনা করলে বলতেন, 'তোমার ঠাকুরের ভোগ তুমি রোজই দিতেছ, আমি কথা কই-না। আমার ঠাকুরের ভোগ আমি একদিন দিব, ইহাতে বাধা দিয়ো না।...ব্রাহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না।...আমরা সজীবকে মানি; তাহাকে চোখে দেখা যায়,

কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।...আমার এই চামার-মুসলমান দেবতা।...তাহাদের সামনে ভোগের সামগ্রী দিলে তাহারা অনায়াসে সেটা হাতে করিয়া তুলিয়া খাইয়া ফেলে। তোমার কোনো দেবতা তাহা পারে না।'

এজমালি দেবত্র-সম্পত্তির সেবায়েত জগমোহন। হরিমোহন তাঁর অনাচার সম্বন্ধে মকদ্দমা করায় আদালতে তিনি স্পষ্টই কবুল করলেন যে, দেবদেবী তিনি মানেন না। মকদ্দমায় হার হলে আইনজ্ঞেরা আপিল করতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন, 'যে-ঠাকুরকে আমি মানি না তাহাকেও আমি ফাঁকি দিতে পারিব না। দেবতা মানিবার মতো বুদ্ধি যাহাদের, দেবতাকে বঞ্চনা করিবার মতো ধর্মবুদ্ধিও তাহাদেরই।' বিষয়চ্যুত জগমোহন একটা এনট্রেন্স স্কুলের হেডমাস্টারি নিলেন। চিরকাল শচীশকে তাঁর আপনার বলেই জানা ছিল। ভাগাভাগির দিনে সে যখন কাছে রয়ে গেল—কিছুই আশ্চর্য হলেন না। হরিমোহন এর মধ্যে তাঁর অন্নসংস্থানের কৌশল আবিষ্কার করায় শেষে চমকে উঠলেন। শচীশকে বললেন, 'গুডবাই শচীশ!' তার পরে তার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়লেন।

ননিবালা-নামে এক নির্যাতিতা বালবিধবা শচীশের সঙ্গে এল তাঁর আশ্রয়ে। জগমোহন রেগে আগুন: পুরুষটিকে পেলে মাথা গুঁড়ো করে দেন, এমনি ভাব। ঝড়ের বেগে ঘরে এসে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, 'এসো। আমার মা এসো! ধুলায় কেন বসিয়া!' মেয়েটি সন্তানসম্ভাবিতা জেনে বললেন, 'শচীশ, এই মেয়েটি আজ যে-লজ্জা বহন করিতেছে সে-যে আমার লজ্জা, তোমার লজ্জা। আহা ওর উপরে এতবড়ো বোঝা কে চাপাইল।' মেয়েটিকে তিনি উপরে নিয়ে গেলেন: 'মা, এই দেখো আমার ঘরের শ্রী! সাত জন্মে ঝাঁট পড়ে না; সমস্ত উলটাপালটা...তুমি আসিয়াছ, এখন আমার ঘরের শ্রী ফিরিবে, আর পাগলা জগাইও মানুষের মতো হইয়া উঠিবে।' তাকে তিনি কোনো সংকোচ করতে দিলেন না—সে নিজে রেঁধে কাছে বসে না-খাওয়ালে খেতেন না। তাঁর বুড়ি ঝি ননিবালার পরিচয় পেয়ে চাকরি ছেড়ে গেল। জগমোহন বললেন, 'মা, আমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে, তাই নিন্দায় বান ডাকিবার সময় আসিল।' কোনো-এক সম্পর্কের দিদিমা মেয়েটিকে হাসপাতালে পাঠাতে উপদেশ দিলেন। জগমোহন বললেন, 'মা যে! টাকার সুবিধা হইয়াছে বলিয়াই খামকা মাকে হাসপাতালে পাঠাইব?' দিদিমা গালে হাত দিলেন: 'মা বলিস কাকে রে!' জগমোহন বললেন, 'জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে।'

নিজের সম্বন্ধে বাইরে নানা-কথা শুনে জগমোহন উচ্চহাস্য করলেন: 'আমাদের নাস্তিকের ধর্মশাস্ত্রে ভালো কাজের জন্য নিন্দার নরকভোগ বিধান।' ইস্কুলে যাবার সময় বাড়ির সমস্ত পথই তিনি বন্ধ করে যেতেন—সুবিধা পেলে

এক-একবার এসে দেখে যেতেন। একদিন শচীশের দাদা পুরন্দরকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে ভীমগর্জনে তাড়া করলেন—বুঝতে বাকি রইল না, ননির দুঃখের কারণ কে। আর-একদিন সন্ধ্যাবেলায় ননিকে স্কটের গল্প তর্জমা করে শোনাতে-শোনাতেও এমন ঘটল। শেষে মেয়েটিকে বাঁচাবার অন্য উপায় না দেখে জগমোহন তাকে নিয়ে পশ্চিমে যেতে উদ্যত। এমন সময়ই ননিবালাকে শচীশের বিবাহ-প্রস্তাব। তাকে বুকে চেপে জগমোহনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল—এমন অশ্রুপাত কখনো তিনি করেন নি। হরিমোহন এ-বিষয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করতে এল। তিনি বললেন, 'শচীশকে আমি ছেলের মতো করিয়াই মানুষ করিয়াছি; আজ তা আমার সার্থক হইল, সে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।' অতঃপর একদিন শচীশের সঙ্গে ননিবালার মন-জানাজানির দিন স্থির করে তিনি নিজের পছন্দমতো বেনারসি শাড়ি, জামা, ওড়না কিনে আনলেন। ননি তাঁর আশীর্বাদ চাইলে বললেন, 'মা, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, বুড়ো-বয়সে তুমি এই নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলিবে। আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।'—বলে তার চিবুকখানি তুলে ধরলেন। কিন্তু অনতিপরেই একদিন ননিবালা আত্মঘাতিনী হল।

কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে জগমোহন নিজের বাড়িতে চেষ্টা করে প্রাইভেট হাসপাতাল বসালেন। প্রথমে মরল একটি মুসলমান—পরে জগমোহন। মৃত্যুকালে তিনি শচীশকে বললেন, 'এতদিন যে-ধর্ম মানিয়াছি আজ তার শেষ বকশিস চুকাইয়া লইলাম—কোনো খেদ রহিল না।' সংসারে পুণ্যের উপরেই জগমোহনের রাগ ছিল বেশি। শচীশকে বলতেন, 'সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া। যাদের সুর দুর্বল পোদ্দার তাহাদিগকে টান মারিয়া ফেলিয়া দেয়; এই বৈরাগীগুলো সেই ফেলিয়া-দেওয়া মেকি টাকা, জীবনের কারবারে অচল। অথচ এরা জাঁক করিয়া বেড়ায় যে, এরাই সংসার ত্যাগ করিয়াছে। যার কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে সংসার হইতে তার কোনোমতে ফসকাইবার জো নাই। শুকনো পাতা গাছ হইতে ঝরিয়া পড়ে, গাছ তাকে ঝরাইয়া ফেলে বলিয়াই—সে-যে আবর্জনা।' বাড়িটি দিয়েছিলেন শচীশকে। উইলে শর্ত ছিল: কোনোদিন সে-বাড়িতে পুজোর্চনা হবে না—নিচের তলায় মুসলমান ছেলেদের নাইট-স্কুল বসবে; শচীশের মৃত্যুর পরে সমস্ত বাড়িটাই তাদের শিক্ষা এবং উন্নতির কাজে লাগবে।

জটাধর ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের এক কর্মচারী।

জন্মেজয় ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের জনৈক সঙ্গী।

জয়ন্ত হাজরা ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। ফৌজদারি আদালতের এক কড়া হাকিম।

জয়সিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। জনৈক ঐতিহাসিক রাজপুত রাজা। শাজাহানের শেষবয়সে যুবরাজ দারার আদেশে জয়সিংহ সুজাকে পরাস্ত করেন।

জয়সিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার ভুবনেশ্বরী-মন্দিরের পরিচারক। জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়—বালক-বয়সে পিতৃমাতৃহীন। মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি-কর্তৃক পালিত ও শিক্ষিত। মন্দিরকেই সে গৃহ এবং ভুবনেশ্বরী-প্রতিমাকে মা বলে জানত। সেখানে নিজ হাতের সযত্নলালিত বৃক্ষগুলিই তার সঙ্গী। বিপুল বল ও সাহসের জন্য তার খ্যাতি। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন আসক্তি, ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি তারও সেইরূপ ভাব ছিল।

রাজাদেশে মন্দিরে জীববলি বন্ধ হওয়াতে রঘুপতির কর্কশতায় জয়সিংহ মর্মাহত। দেবীর প্রত্যাদেশ-ছলে রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের সাহায্যে রঘুপতি রাজহত্যার চক্রান্ত করলেন। জয়সিংহ বললে, 'গুরুদেব...আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন...তাহা শুনিলে পাপ আছে।' রঘুপতি বোঝালেন : কালরূপিণী মহামায়ার মহাখর্পরে লক্ষকোটি জীব-শোণিতের স্রোত প্রবাহিত। জয়সিংহ অশ্রুচোখে প্রতিমার দিকে চাইলে : 'এইজন্যই কি তোকে সকলে মা বলে, মা। তুই এমন পাষাণী। রাক্ষসী, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পুরিবার জন্য তুই ওই লোল-জিহ্বা বাহির করিয়াছিস।...সত্য-সত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন, করুণাস্বরূপিণী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্তসমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন। না না মা...এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা...আমি সহিতে পারিব না।' রঘুপতির পায়ে পড়ে সে বললে, 'সত্যিই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন—রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না।...তা যদি সত্য হয়, তবে আমিই রাজরক্ত আনিব...মায়ের নামে গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না।' সমস্ত রাত্রি জয়সিংহের নিদ্রা হল না—যাকে সে মা বলে জানত তাঁর মাতৃত্ব আহত। পরদিন জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে গেল মন্দিরে। প্রতিমার দিকে চেয়ে জোড়হাতে বললে, 'কেন মা...ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধের শোণিত চাই?...পুণ্যের শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত...করাই কি তোর অভিপ্রায়।...তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না...।' সহসা অন্তরাল থেকে রঘুপতির কণ্ঠস্বর। রোমাঞ্চিত জয়সিংহ দেবীর আদেশ ভেবে তখনি সশস্ত্রে নিষ্ক্রান্ত হল।

গোবিন্দমাণিক্য প্রত্যহ তাঁর প্রিয় বালক ধ্রুবকে নিয়ে গোমতীতীরে আসতেন। জয়সিংহ অতর্কিতে গুহাপথ দিয়ে তাঁর সম্মুখে এসে মন্দিরের ঘটনা জানালে। গোবিন্দমাণিক্য তাতে রঘুপতির কৌশল অনুমান করায় সে উঠল চমকে: 'না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না...আমার যে-বিশ্বাস যে-ভক্তি ছিল সেই থাক...মায়ের আদেশই হউক আর গুরুর আদেশই হউক ...আমি পালন করিব।'—এই বলে অসি উন্মোচন করলে। ধ্রুব সহসা কেঁদে উঠতে মুহূর্তে তলোয়ার ফেলে সে নৃপতিকে রঘুপতির চক্রান্তের কথা জানালে। পথে অনেকক্ষণ সে মুখ আচ্ছাদন করে বসে রইল। পরে মন্দিরে এসে রঘুপতিকে বললে, 'গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে ...জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন।' রঘুপতি তখনই তাকে মন্দিরে এনে প্রতিমার পাদস্পর্শ করিয়ে প্রতিজ্ঞা করালেন। দেবীর পাদস্পর্শ করে জয়সিংহ একবার গুরুর মুখে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাইলে—শেষে তাঁর প্রতিধ্বনি করে বললে, '২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।'

সন্ধ্যাবেলায় গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্রের হাত ধরে মন্দিরে এলেন। জয়সিংহ তাঁর অনুসরণ করে বলতে লাগল, 'মহারাজ, আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু।... যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতেছেন, তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি।' পরদিন গুরুর স্নেহস্বর শুনে সে তাঁর পদে লুণ্ঠিত হল: 'পিতা...আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না।...প্রভু...আপনিই আমাকে দূরে করিয়া দিয়াছেন।...আপনি সহসা আমাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন, কেই-বা পিতা, কেই-বা মাতা, কেই-বা ভ্রাতা।...আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ-কী রাক্ষসীর দেশে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।' প্রতিমা-দর্শনে আগত যাত্রীদের রঘুপতি জানালেন: বলি বন্ধ হওয়াতে দেবী দেশ ছেড়ে গেছেন। জয়সিংহ কম্পিতপদে কাছে এসে বললে, 'প্রভু, আমি কি একটি কথাও বলিতে পারিব না।'

ঊনত্রিশে আষাঢ়ের সূর্যকিরণপ্লাবিত আনন্দময় কাননে বসে অভিমানে জয়সিংহের হৃদয় ভরে উঠল। বাল্যকালের মতো সেই পাষাণমন্দিরকে সচেতন —মাকে আবার তার মা বলে মনে হল। অপরাহ্নে সে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে এসে বললে, 'মহারাজ, আমি বহু দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার গুরু, আপনার আশীর্বাদ লইতে আসিয়াছি।... আশীর্বাদ করুন, এখানে আমার যে-সকল সংশয় ছিল, সেখানে যেন সে-সকল সংশয় দূর হইয়া যায়।'

অর্ধরাত্রে গোমতীতীরের অরণ্যে মেঘে-চাঁদে আলো-অন্ধকার। জয়সিংহ একখানি ছুরি নিয়ে নদীতীরে পাথরের উপর শান দিচ্ছিল। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হতে জীবন্ত ঝড়বৃষ্টি-বিদ্যুতের মতো সে দীপালোকিত মন্দিরে উপস্থিত—দীর্ঘ চাদরে আবৃত দেহ, সর্বাঙ্গ বয়ে বৃষ্টিধারা ঝরছিল। রক্তলোলুপ রঘুপতিকে সরিয়ে সে এল প্রতিমার সম্মুখে : 'সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস মা। রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষ্ণা মিটিবে না। জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি...আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে।'—এই বলে কটিবন্ধের ছুরিখানি নিজের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করে সে পড়ে গেল প্রতিমার পদতলে।

জহরলাল ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শশাঙ্কের কারবারে কাজের ভার পেয়ে জহরলাল চুরি ক'রেছিল দু-হাতে।

জা (বিমলার) ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার বড়ো-জা। অসামান্যা রূপসী; ভরা-ভোগের সংসারে তাঁর অকালবৈধব্য। জপে-তপে ব্রত-উপবাসে ছিলেন ভয়ংকর রকমের সাত্ত্বিক। তাঁর এক খুড়তুতো ভাই ছিলেন উকিল। দেবর নিখিলেশের কাছে তাঁর কোনো দাবি অপূরণীয় ছিল না। তবু তার দেশি-জিনিসের খেয়াল দেখে বলতেন, 'যদি জজের কাছে দরবার করা যায়, তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম বিষয়-সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।'

জা (বিমলার) ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার বিধবা মেজো-জা। অপূর্ব রূপসী; রূপের খ্যাতিতেই ধনীঘরের বধূ। বড়োঘরের নিয়মে মদের পাত্র আর পণ্য-নারীর নূপুরের আঘাতে তাঁর কপাল ভাঙে অল্প-বয়সে। বিমলার স্বামী নিখিলেশের ছ-বছর বয়সে ন-বছরের মেজোরানীর আগমন। দুপুরবেলায় ছাদের প্রাচীরের ছায়ায় খেলা, বাগানে আমড়াকুচি নুনলঙ্কা মিশিয়ে খাওয়া, পুতুলের বিবাহ-উপলক্ষে গোপনে ভাঁড়ারের জিনিস সরানো, স্বামীর কাছে শৌখিন জিনিসের দরবার, অসুখের সময় কবিরাজের নিষিদ্ধ খাবার জোগানো—সমস্ত ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গী ছিল নিখিল। বড়ো হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিষয়-ব্যাপারে ঈর্ষা-সন্দেহ সত্ত্বেও বৃহৎ বাড়ির পরিমণ্ডলের সঙ্গে জড়ানো অন্তরের সেই সত্যসম্বন্ধটি ছিন্ন হয় নি। স্ত্রীর প্রতি নিখিলেশের ভালোবাসা অপার; মেজোরানীর শূন্যসভায় রূপ-যৌবনের বাতিগুলির দিনরাত্রি জ্বলা। কথাবার্তা-হাসিঠাট্টায় তাঁর রসের আমেজ লাগত। দেবরের যাতায়াতের পথে তাঁর প্রায়ই

ঘটত সঞ্চরণ। এক-একদিন দেবরকে রেঁধে খাওয়াতেন। বিমলা সে-সময়ে কাছে এলে হেসে বলতেন, 'বাস্‌-রে, ছোটোরানীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা!'

স্বদেশী-উপলক্ষে বাড়িতে সন্দীপের আগমনে বিমলার ভাবান্তরে মেজোরানী বাঁকা হাসি হাসতেন। বলতেন, 'ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ-বাড়িতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেছে, এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কী বল ভাই ছোটোরানী? রণবেশ তো পরেছ, রণরঙ্গিণী, এবার পুরুষের বুকে কষে হানো শেল।' একদিন বললেন, 'আমাদের ছোটোরানীর গুণ আছে। অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল, কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না। তখন একটা দস্তুর ছিল, স্বামীদেরও যত্ন করতে হত।... ছোটো রাক্ষুসি, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিরি কিরকম হয়ে গেছে।' আর-একদিন বিমলাকে বাইরে যেতে দেখে গান ধরলেন: 'রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে। / অগাধ জলের মকর যেমন, ও-তার চিটে-চিনি জ্ঞান নেই!'

নিখিলেশের দেশি জিনিস উৎপন্ন করার নেশায় উৎসাহদাতা ছিলেন মেজোরানী। বলতেন, 'ঠাকুরপো, শুনেছি আজকাল দিশি সাবান উঠেছে নাকি—আমাদের তো ভাই, সাবান মাথার দিন উঠেই গেছে, তবে ওতে যদি চর্বি না-থাকে তাহলে মাখতে পারি।' কখনো বলতেন, 'ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেছে, সে-তো আমার চাই!' দেশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড় কাচা হত, কালেভদ্রে লেখার শখ হলে তাঁব হাতির দাঁতের কলমটাই বেরোত। সেলাই করার সময়ে বিলিতি কাঁচি ছাড়া চলত না। বিমলা এই প্রবঞ্চনায় রাগ করলে বলতেন, 'দোষ হয়েছে কী? কত খুশি হয় বলু দেখি। ছোটো-বেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েছি, তোদের মতো ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারি নে। পুরুষমানুষ, ওর আর-তো কোনো নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর ওর এক সর্বনেশে নেশা তুই—এইখেনেই ও মজবে!' স্বদেশীর দল নিখিলেশের তহবিল লুঠের ভয় দেখালে মেজোরানী বিমলাকে বললেন, 'দেবী, প্রসন্ন হও-গো, তোমার দলবল ঠেকাও। আমরা তোমার বন্দেমাতরমের শিন্নি মানছি।' সেবার ভাজেদের কিছু টাকা ছিল নিখিলেশের সিন্দুকে—কথা-প্রসঙ্গে সে-কথা উঠলে বিমলা কৌতুক করে বললে: তার উপরেই মেজোরানীর অবিশ্বাস। মেজোরানী মুচকি হেসে বললেন, 'তা ঠিক বলেছিস লো, মেয়েমানুষের চুরি বড়ো সর্বনেশে।'

স্বদেশীর ক্রিয়াকলাপে অমঙ্গল-আশঙ্কায় মেজোরানী পুরোহিতকে ডাকিয়ে নিখিলেশের স্বস্ত্যয়ন করালেন। বললেন, 'আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি

কলকাতায় যাও—এখানে থাকলে ওরা কোনদিন কী করে বসে।' দেবরের কলকাতা যাবার আয়োজনের মধ্যে মেজোরানী দেখলেন বইপত্রগুলো রওনা হতে। দেশে আর স্থায়ীভাবে সে থাকবে-না শুনে বললেন, 'সত্যি নাকি? তা-হলে একবার এসো, একবার দেখো'সে কত জিনিসের উপর আমার মায়া।'—বলে নিখিলেশের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। দেখালেন: ছোটোবড়ো নানারকমের বাক্স আর পুঁটুলি—বাক্সে পান-সাজার সরঞ্জাম, বোতলে কেয়াখয়ের, টিনভর্তি মসলা, তাস, স্বদেশী চিরুনি। নিখিলেশের বিস্ময় দেখে বললেন, 'ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটোরানীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই তো হবে, তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো। ম'লে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে-কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে, সেইজন্যই তো এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্ছি।' নিখিল সেই ঘরময়-ছড়ানো বাক্সপুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রথম প্রত্যক্ষ করলে, সেই ভাগ্য-বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা রমণীর শুধু একটিমাত্র সম্বন্ধকে সমস্ত হৃদয়ের অমৃতে লালনের বেদনা; বিমলার সঙ্গে যে খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁর মনোমালিন্য সে শুধু বৈষয়িকতা নয়, জীবনের সেই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবি করবার কোনো জোর ছিল না। বেদনাহত নিখিল আবার সেই ছেলেবয়সে ফিরে যেতে চাইলে। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেজোরানী বললেন, 'না ভাই, মেয়েজন্ম নিয়ে আর নয়। যা সয়েছি তা একটা জন্মের উপর দিয়েই যাক, ফের আর কি সয়?' নিখিলেশ দুঃখের মধ্যেই মুক্তির ইঙ্গিত করায় বললেন, 'ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা-পড়তে চাই; আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধু নিতে হবে···তোমাদের একেবারে হালকা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে।·· আমাদের বোঝা···ছোটো জিনিসের বোঝা।···এমনি করে হালকা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি।'

নিখিলেশের সিন্দুকে-রাখা তাঁর টাকাটা ব্যাঙ্কে পাঠানোর কথা উঠতে জানা গেল, বিমলা তা খরচ করে ফেলেছে। মেজোরানী বিস্মিত; পরমুহূর্তে নিখিলেশের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'বেশ করেছে নিয়েছে। আমার স্বামীর পকেটে-বাক্সে যা-কিছু টাকা থাকত সব আমি চুরি করে লুকিয়ে রাখতুম; জানতুম সে-টাকা পাঁচভূতে লুটে খাবে। ঠাকুরপো, তোমারও প্রায় সেই দশা'। স্বদেশীর প্রতিক্রিয়ায় অকস্মাৎ শুরু হল দাঙ্গা; নিখিলেশ তখনি বেরিয়ে গেল। মেজোরানী ছুটে এসে বললেন, 'করলি কী, ছুটু, কী-সর্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন?' বেহারাকে বললেন, 'ডাক্-ডাক্, শিগগির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।' দেওয়ানের সামনে কখনো তিনি বেরোন নি; সেদিন আর লাজ-লজ্জা রইল না। বললেন, 'মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগগির

সওয়ার পাঠাও।...তাঁকে বলে পাঠাও, মেজোরানীর ওলাউঠো হয়েছে, তাঁর মরণ-কাল আসন্ন।' বিমলাকে গাল দিয়ে বললেন, 'রাক্ষুসি, সর্বনাশী! নিজে মরলি-নে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি!' দিনের আলো নিবে এল; ঠাকুরঘরে শংখঘণ্টা বেজে উঠল। মেজোরানী সেই ঘরে হাতজোড় করে বসে রইলেন।

জ্ঞানদাশংকর ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। যোগমায়ার স্বামীর পিতামহ। 'বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে-ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু... আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে-বাক্যে-ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।'

ঝড়ু ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের বেহারা।

ঝড়ু ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। জগত্তারিণীর বেহারা।

ঠাকুরদাসী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীর স্বামিগৃহের এক দাসী।

ডোনাল্ডসন ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শশাঙ্কের আপিসের বড়োসাহেব। শশাঙ্কের কর্মস্থানে এই-তুঙ্গীগ্রহের ছিল নির্মম দৃষ্টি।

তনসুকদাস হালওআই ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। তনসুকদাস হালওআই মুকুন্দলাল চাটুজ্যের মহাজন। বড়োবাজারের এক মস্ত কারবারী।

তমিজ ॥ 'গোরা' উপন্যাস। চর-ঘোষপুর গ্রামের ফরু সর্দারের ছেলে। গ্রামের এক নাপিতের স্ত্রীকে তমিজ বলত মাসি। পিতার অনুপস্থিতিতে সেখানেই সে আশ্রিত ছিল।

তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। কমলার মামা। তারিণী-চরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাস ধোবাপুকুর নামে গণ্ডগ্রাম। পেশা মহাজনি; কৃপণ বলে দুর্নাম ছিল। বাড়ির একটি চালাঘরে প্রাইমারি স্কুলের স্থান দিয়েছিলেন। নূতন ম্যাজিস্ট্রেট এলেই নিজের লোকহিতৈষিতা নিয়ে বিশেষ আড়ম্বর করতেন। স্কুলের পণ্ডিতকে শুধু খেতে দিয়ে রাত দশটা পর্যন্ত সুদের হিসাব কষিয়ে নিতেন। গবর্মেণ্টের সাহায্য আর স্কুলের বেতন থেকে তার মাইনে উঠে যেত।

নিতান্ত অচিকিৎসাতে তার বাড়িতে কমলার বিধবা মাতার মৃত্যু হয়। তারিণীর আর-একটি বিধবা বোন ঘরকন্নার সমস্ত কাজ করে ঝি রাখবার খরচ বাঁচাত। তারিণীর যে অনেক টাকা সে-কথা সকলেই জানত; কমলার বিবাহ উপলক্ষে তার জন্ম সম্বন্ধে খোঁটা দিয়ে পাড়ার ঘোটকর্তারা কিছু দোহন করে নিতে ইচ্ছুক ছিল। গ্রামে বিদেশের কোনো ব্রাহ্মণ-যুবক উপস্থিত হলেই তারিণী তাকে বিবাহের জন্য হাতে-পায়ে ধরতেন। চার বৎসর ধরে তিনি কমলার বয়স দশ বলে আসছিলেন। একদিন স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার বন্ধু নলিনাক্ষের সঙ্গে তারিণীর প্রাচীর-দেওয়া চালাঘরে বেড়াতে এলে তিনি তন্নতন্ন করে নলিনাক্ষের পরিচয় নিলেন। সন্ধ্যাবেলাতেই ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবুতে এসে নলিনাক্ষের হাতে পৈতে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাড়াতাড়ির দোহাই দিয়ে তিনি যথাসাধ্য খরচ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে বললেন, 'পরশু দিন ভালো আছে, পরশুই হইয়া যাক।'

তারিণী তলাপাত্র ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। জনৈক রাজনৈতিক কর্মী। শিলঙ-পাহাড়ে অমিত-লাবণ্যের আলাপ এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। অমিত বলেছিল, 'পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলি পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ওই তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি-চাটগাঁ পর্যন্ত চিৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলা দেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল।'

তারিণী সাণ্ডেল ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক সন্ত্রাসবাদী।

তিনকড়ি ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার এক অধিবাসী। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে বলি বন্ধ হওয়াকেই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির কারণ ভেবে তিনকড়ি বলে, 'সেদিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগল একখানা চালাও বাকি রইল না।'

তিনকড়ি ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার দাদা মহিমের শিশুপুত্র।

তিনকড়ি ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীদের এক বুড়ি প্রতিবেশিনী। মধুসূদন ঘোষালের মাতুলালয়ের পাড়ার মেয়ে—সেই সূত্রে মধুকে তিনকড়ির জানা। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর বিবাহ স্থির হলে একদিন বুড়ি বললে, 'হ্যাঁ-গা, আমাদের কুমুর কপালে কেমন রাজা জুটল? ওই-যে বেদেনীদের গান আছে—এক-যে ছিল কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন, / কেটে করলে সিংহাসন।...এও সেই শেয়ালকাঁটা বনের রাজা।'

তিনকড়ি দত্ত ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের চকুয়া কাছারির নায়েব। দেশকর্মী অমূল্য যেদিন কাছারি লুঠ করতে যায়, সেদিন সেখানে জমা হয়েছিল সদর-খাজনার সাড়ে-সাত হাজার টাকা। রাত্রে আহারের পরে তিনকড়ি মুখ ধুচ্ছিল; হঠাৎ আলো আর পিস্তলের আওয়াজে সে গেল মূর্ছা। মূর্ছা ভাঙলে ভয়ে-ভয়ে সিন্দুক থেকে টাকা বার করলে। অমূল্য আবার টাকা ফেরত দিতে গেলে চোরাই মাল পেয়ে তার ভয় হল আরো বেশি—অমূল্যকে খাওয়ানোর ছলে বসিয়ে রেখে সে পুলিসে খবর দিলে।

তিনু সরকার ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের জনৈক তালুকদার।

তুলসী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। মুকুন্দলাল দত্তের ভৃত্য।

ত্রিভঙ্গচন্দ্র ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের এক সমাজ-সংস্কারক বন্ধু।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের গাজিপুরের আশ্রয়দাতা। তরুণ বয়সে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী গাজিপুরে মাস্টারি নিয়ে আসেন তাঁর স্ত্রী হরিভাবিনীর বায়ু-পরিবর্তনের জন্য। স্ত্রী সম্পূর্ণ সুস্থ হলেও তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি চক্রবর্তীর কিছুমাত্র আস্থা জন্মায় নি। দুটি মেয়ের মধ্যে বড়ো বিধুর বিবাহ দেন কানপুরে। ছোটো শৈলজাকে প্রাণে ধরে বিদায় দিতে পারেন নি—নিঃস্ব বিপিনের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সাহেব-সুবাকে ধরে তাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাক্রমে নলিনাক্ষের পরিণীতা কমলাকে নিয়ে রমেশ চলেছিল পশ্চিমে। চক্রবর্তী সেই স্টীমারে গাজিপুর ফিরছিলেন। তিনি তাঁর পাকা গোঁফ এবং পাতলা চুলে টাকের আভাস নিয়ে রমেশের কাছে এসে বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ? নমস্কার।···আমার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী।···আপনি তো হিস্ট্রি পড়িয়াছেন? ভারতবর্ষে ভরত ছিলেন চক্রবর্তী রাজা, আমি তেমনি সমস্ত পশ্চিম-মল্লুকের চক্রবর্তীখুড়ো। যখন পশ্চিমে যাইতেছেন তখন আমার পরিচয় আপনার অগোচর থাকিবে না।' রমেশের গন্তব্যের স্থিরতা ছিল না। চক্রবর্তী বললেন, 'নমস্কার মহাশয়। আপনার প্রতি আমার ভক্তি হইতেছে।···আপনি যাইবেন এটা স্থির করিয়াছেন, অথচ কোথায় যাইবেন কিছুই স্থির করেন নাই, এ কি কম কথা!···আমাকে মাপ করিবেন—পরিবার সঙ্গে আছেন সে-খবরটা আমি বিশ্বস্তসূত্রে পূর্বেই জানিয়াছি। বউমা ওই ঘরটাতে রাঁধিতেছেন···আহা, মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।···মা একটুখানি মধুর হাসিলেন, বুঝিলাম প্রসন্ন হইয়াছেন···পাঁজিতে শুভক্ষণ দেখিয়া প্রতিবারই তো বাহির হই, কিন্তু এমন সৌভাগ্য ফি-বারে ঘটে না।' তৎপরে রান্নাঘরে কমলার কাছে গিয়ে বললেন,

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি

'চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে, ঘণ্টটা যা হইবে তা মুখে তুলিবার পূর্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অম্বলটা আমি রাঁধিব মা ; পশ্চিমের গরমে যাহারা বাস না-করে অম্বলটা তাহারা ঠিক দরদ দিয়া রাঁধিতে পারে না।···আমার এ-সমস্ত অভ্যাস আছে মা ; আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল, তাঁহারই অরুচি সারাইবার জন্য অম্বল রাঁধিয়া আমার হাত পাকিয়া গেছে।' কমলা অম্বল রাঁধা শিখতে চাইলে বললেন, 'ওরে বাস্ রে।···এক দিনেই শিখাইয়া বিদ্যার গুমর যদি নষ্ট করি তবে বীণাপাণি অপ্রসন্ন হইবেন। দু-চার দিন এ-বৃদ্ধকে খোশামোদ করিতে হইবে।···আমি পানটা কিছু বেশি খাই, কিন্তু সুপারি গোটা-গোটা থাকিলে চলিবে না।···কিন্তু মার ওই হাসিমুখখানিতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে।' এই হাস্য-পরিহাসে কমলাকে অতি সহজেই তিনি বশ করে নিলেন। বললেন, 'যাবে মা, গাজিপুরে? সেখানে গোলাপের খেত আছে, আর সেখানে তোমার এ বৃদ্ধ ভক্তটাও থাকে।' অতঃপর কমলার ঘরে তাঁর সভা জমে উঠল।

রমেশ-কমলাকে নিয়ে চক্রবর্তী গাজিপুরে নামলেন। বাড়ি এসে দেখলেন, হরিভাবিনী চাটনি রোদ্রে দিচ্ছেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, 'এই বুঝি! ঠাণ্ডা পড়িয়াছে—গায়ে একখানা র‍্যাপার দিতে নাই?' রোদে হরিভাবিনীর পিঠ পুড়ছিল ; গৃহিণী সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় বললেন, 'সেটাই কি ভালো? ছায়া জিনিসটা তো দুর্মূল্য নয়।' রমেশ-কমলাকে কিছুকাল নিজের বাড়িতে রেখে তিনি অবশেষে একটি বাংলো ঠিক করে দিলেন ; সেখানে কোন্ ঘর কী-কাজে ব্যবহার হবে, জমির কোথায় কী লাগানো হবে, তারও ব্যবস্থা করে দিলেন। বড়োদিনের ছুটি উপলক্ষে বড়ো মেয়েকে দেখতে চক্রবর্তী গেলেন এলাহাবাদে। ফিরে এসে দেখলেন : কমলা নিরুদ্দেশ। কলকাতা থেকে অক্ষয় রমেশের সংবাদ নিতে এল। তিনি অশ্রুপাত করে বললেন, 'আমার মা কমলাকে···কয়েক দিন মাত্র···দেখিয়া আমি আমার নিজের কন্যার সহিত তাঁহার প্রভেদ ভুলিয়া গেছি। দু-দিনের জন্য মায়া বাড়াইয়া মা-লক্ষ্মী যে আমাকে এমন বজ্রাঘাত করিয়া ত্যাগ করিয়া যাইবেন, এ কি আমি জানিতাম।··· আপনাদের রমেশটিকে আমি আজ-পর্যন্ত চিনিতে পারিলাম না।'

অক্ষয়ের কথায় চক্রবর্তীর ধারণা হল : কমলা হয়তো কাশীতে আছে। পশ্চিম-অঞ্চলে তাঁর সমস্তই জানাশুনা। শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন কাশীতে। কমলাও দৈবক্রমে সেখানে পেঁছিল। তার স্বামী নলিনাক্ষ তখন সেখানকার ডাক্তার। শৈলজার কাছে চক্রবর্তী কমলার বিবাহান্তে নৌকাডুবির কথা শুনলেন। অল্পদিনের মধ্যে ভোজনলোলুপতা দেখিয়ে তিনি বশ করে নিলেন নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরীকে। শেষে একদিন দশাশ্বমেধ ঘাটে কমলাকে তাঁর কাছে এনে বললেন, 'ইঁহার নাম হরিদাসী। ইনি আমার দূরসম্পর্কের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ইঁহার মা-বাপ কেহ নাই, আমার উপরেই নির্ভর।···বিবাহের

পরদিনই ইঁহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেছেন…হরিদাসীর ইচ্ছা ধর্মকর্ম লইয়া তীর্থবাস করে…এটিকে আপনার মেয়ের মতো যদি কাছে রাখেন, তবে আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হই।' কাশী থেকে বিদায় নেবার আগে আবার তিনি দেখা করতে এলেন : 'হরিদাসীকে আমি নাকি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি… নলিনাক্ষ যে ওর 'পরে…উদাসীনের মতো থাকিবেন…ওর প্রতি বিরক্তও হইবেন না, স্নেহও করিবেন না, ও আছে তো আছে, এইটুকুমাত্র সম্বন্ধ, সেটা যেন কেমন…একটি স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ ভার লইতে পারে, এমন পুরুষ জগতে অল্পই মেলে ; ভগবান যখন নলিনাক্ষবাবুকে সেই যথার্থ পৌরুষ দিয়াছেন তখন… ।' ক্ষেমংকরীর আক্ষেপ : বধূর মুখ দেখে তিনি যেতে পারলেন না। চক্রবর্তী বললেন, 'অমন কথা বলিবেন না। আমরা আছি কী করিতে? ঘটক-বিদায় এবং মিষ্টান্ন আদায় না করিয়া ছাড়িব বুঝি ?…আপনার যেরকম বউটি দরকার, সে আমি ঠিক জানি ; নিতান্ত কাঁচ হইলেও চলিবে না, অথচ আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে…তা, সে আপনি কিছুই ভাবিবেন না, ঈশ্বরের কৃপায় নিশ্চয়ই সে ঠিক হইয়াই আছে।'

রমেশ নলিনাক্ষকে কমলার নির্দোষিতার কথা জানাতে এলে চক্রবর্তী নিরস্ত করলেন : 'কমলা সম্বন্ধে যদি কোনো গ্রন্থি কোথাও মোচন করিবার প্রয়োজন থাকে তবে বিধাতার উপর সে ভার দিন, আপনি আর হাত দিবেন না।…কমলার সমুদয় দুঃখকে সৌভাগ্যে পরিণত করিয়া ঈশ্বর তাহার চারি দিক হইতে সমস্ত কুয়াশা কাটিয়া দিতেছেন।'

থাকো ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার মেজো-জার এক দাসী।

দক্ষিণাচরণ ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের এক পূর্ব-সহাধ্যায়ী। কলেজ-ক্লাবের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাচরণ ব্রাউনিঙের 'She should never have looked at me'—কবিতাটিকে তর্জমা করে লিখেছিল : 'আমায় ভালো বাসবে না সে এই যদি তার ছিল জানা, / তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা ?' পরে নিমকমহালের ইন্সপেক্টর না-হলে নিশ্চয় সে কবি হতে পারত।

দধি ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের আদিযুগের এক উড়ে চাকর।

দয়াল সিং ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। প্রতাপাদিত্যের এক প্রহরী।

দামিনী ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। দামিনী 'যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাইরে সে পুঞ্জ-পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ, অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্‌'

করে উঠছে। স্বামী শিবতোষ লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় তার বাধ্যতামূলক তপস্যার আরম্ভ। মন থেকে বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াতে ওঝার উৎপাতের ত্রুটি ছিল না। ভক্তদলের রান্নায় তবু সে ইচ্ছা করে তরকারিতে নুন দিত না, ইচ্ছা করে দুধ ধরিয়ে দিত। স্বামীর মৃত্যুকালে এই ভক্তিহীনতার চরম দণ্ডরূপে সে তার পিতৃদত্ত কলকাতার বাড়ি ও সম্পত্তিসহ গুরুর হতেই অর্পিত হল। দামিনীর বেশভূষা বিধবার মতো ছিল না; গুরুর উপদেশবাক্যের কাছ দিয়েও সে যেত না; গুরুজির কথার নকল করে হাসত। দামিনী 'জীবনরসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে-গন্ধে-হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর…সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে-হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা' দেবে না পণ করে বসেছিল।

কিন্তু শচীশ এবং শ্রীবিলাস গুরুজির সঙ্গে কলকাতায় তার বাড়িতে এল। তখন শচীশের প্রতি এক উন্মুখ ভালোবাসায় তার বিদ্রোহের আবরণটুকু কখন নিঃশব্দে চৌচির হয়ে গেল। দামিনীর সেবার মাধুর্য ভক্তদলের সাধনার উপরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। কিন্তু অন্যদিকে শুরু হল উপদ্রব। একদিন দেখা গেল, উদাসীন শচীশের বসবার ঘরে লীলানন্দ স্বামীর ফোটোগ্রাফখানি চূর্ণ-বিচূর্ণ। আর-একদিন শচীশ দেখলে, তার শয়নকক্ষের মেঝের উপরে চুল এলিয়ে সে মাথা ঠুকে বলছে, 'পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।' প্রতি-বছর গুরুজির পর্যটনকালে দামিনী তার মাসির বাড়ি গিয়ে থাকত; সম্বৎসর এই-সময়টুকুর জন্য তার প্রতীক্ষা ছিল। সেবার স্বেচ্ছায় সে গুরুজির সঙ্গ নিলে। একটা অন্তরীপের কাছে এসে পাহাড়ের কোলে সূর্যাস্তবেলায় গুরুজি গান ধরলেন: 'ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও / তোমার চরণ ঢাকি এলোকেশে।' গান শেষে দামিনী মাথা নত করে প্রণাম করলে; অনেকক্ষণ মাথা তুলল না—তার চুল এলিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গভীর রাত্রে এক গুহার মধ্যে ভূমিশয্যায় শচীশের পায়ে তার অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন ব্যর্থ হল। গুহা থেকে ফিরে তার দুই ভ্রূর মধ্যে আবার ভ্রূকুটি কালো হয়ে উঠল—তার এলোখোঁপা-বাঁধা ঘাড়ের দিকে, ঠোঁটের মধ্যে, চোখের কোণে এবং ক্ষণে ক্ষণে হাতের আক্ষেপে অবাধ্যতার ইশারা ব্যক্ত হতে লাগল। গুরুজির আহ্বান উপেক্ষা করে সে একটি রূপ-কৌলীন্য-বর্জিত কুকুরের বাচ্চা আর একটি আহত চিলের পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। শচীশ শান্তিলাভের জন্য একদিন তাকে গুরুর কাছে আহ্বান করলে। দামিনী জ্বলে উঠে বললে, 'তোমরা আমাকে শান্তি দিবে? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া-তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায়?' পরে জোড়হাত করে বললে, 'ওগো, দোহাই তোমাদের, আমাকে আর তলাইতে বলিও না। আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।'

দামিনী গুরুর কাছে ঘেঁষত না তাঁর উপরে রাগ ছিল বলে; আর

শচীশকেও এড়িয়ে চলত তার সম্বন্ধে মনের ভাব উলটো-রকমের বলে। একমাত্র শ্রীবিলাসের সম্বন্ধেই তার রাগ বা অনুরাগের বালাই ছিল না। গৃহপালিত জীবজন্তুগুলির সম্পর্কে শ্রীবিলাসের অনুগত্য সে উৎসাহের সঙ্গেই প্রচার করত; মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে শ্রীবিলাসকেই খাওয়াত, আর শচীশের মুখভাব দেখে মনে-মনে কঠিন হাসি হাসত। শচীশ তাকে কোনো আত্মীয়ার কাছে গিয়ে থাকতে অনুরোধ করায় সে আরও জ্বলে উঠল: 'তোমাদের ভক্তরা যে এই ভক্তিহীনাকে ভক্তির গারদে পায়ে বেড়ি দিয়া রাখিয়াছে।...তোমাদের কোনো ভক্ত বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোনো ভক্ত বা আর-এক মতলবে আর-এক বন্দোবস্ত করিবেন—মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি?... আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই। আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।'—বলতে-বলতে মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। গুরুজি তাকে মাসির বাড়ি পাঠাতে চাইলে সে বললে, 'ভার আপনি সাধ করিয়াই লইয়াছেন; এ আপনি অন্যের ঘাড়ে নামাইতে পারিবেন না।' গুরুজি যতই তাকে মনে-মনে ভয় এবং শচীশ মনে-মনে ব্যথা পেতে থাকে, ততই শ্রীবিলাসকে নিয়ে তার টানাটানি চলতে লাগল। শ্রীবিলাসের সাহায্যে সে কতকগুলি আধুনিক বই আনালে। গুরুজি সেগুলি আত্মসাৎ করায় সে তখনই তাঁর কাছে উপস্থিত: 'আপনার কোনো প্রয়োজনে তো কোথাও বাধে না; আমারই কিছুতে বুঝি প্রয়োজন নাই?...আমি সন্ন্যাসিনী নই তা আপনি জানেন, আমার ও-বইগুলি পড়িতে ভালো লাগে। আপনি দিন।' বইগুলি সে শ্রীবিলাসের সঙ্গে পড়ত—আর খিলখিল করে হেসে অস্থির হত।

শচীশ কিছুকাল বাইরে বেড়াতে গেল। তখন শ্রীবিলাসকে আর সে ডাকলে না; ঘরের মধ্যেই দরজা বন্ধ করে রইল। শচীশ ফিরে এসে একটি প্রার্থনার কথা জানালে। দামিনী বললে পা ছুঁয়ে, 'আমাকে হুকুম করো তুমি।' শচীশ অনুনয় করলে তাদের কাজে যোগ দিতে। সে বললে, 'তাই যোগ দিব, আমি কোনো অপরাধ করিব না।'—বলে আবার পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। দামিনীর অসহ্য দীপ্তির আলোটুকু শুধু রইল; পুজো অর্চনায়-সেবায় তার মাধুর্যের ফুল ফুটল। গুরুজির সঙ্গে ব্যবহারেই তার কঠিন পরীক্ষা, কিন্তু তাঁর কথাও এমনি মেনে নিলে যে আধুনিক বইগুলির ছেঁড়া পাতায় তাঁকে ফুল দিয়ে এল। তবু গুরুজি শচীশকে সেবার জন্য ডাকলে তার অসহ্য হত; গুরুজির কল্‌কেয় তাকে ফুঁ দিতে দেখলে সে প্রাণপণে জপত, 'অপরাধ করিব না, অপরাধ করিব না।' একদিন গুরুজির কীর্তন-দলের একজনের লাম্পট্যের জন্য তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। সে-রাত্রে দামিনী জোড়হাত করে শচীশকে বললে, 'প্রভু...শোনো।...তোমরা দিনরাত রস-রস করিতেছ, ও-ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে-তো আজ দেখিলে? তার

না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান ; তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই। এই নির্লজ্জ-নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ ?...প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও। যদি কেউ আমাকে বাঁচাইতে পারে তো সে তুমি।... তুমিই আমার গুরু হও।' শচীশের পায়ের কাছে অনেকক্ষণ মাথা ঠেকিয়ে সে গুনগুন করে বলতে লাগল, 'তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু। আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও !'

গুরুজিকে ছেড়ে তারা উঠল একটা পোড়ো বাড়িতে। শচীশ কিছুকাল বাইরে যেতে চাইলে। দামিনী বললে, 'সে হয় না। একলা ফিরিবেন, উঁহার দেখাশুনা করিবে কে ?' তবু শচীশকে দ্বিধা করতে দেখে বললে, 'তুমি আমার গুরু। আমি যত পাপিষ্ঠা হই আমাকে সেবা করিবার অধিকার দিয়ো।' কৃচ্ছ্রসাধনে শচীশের শরীরের অবস্থা শঙ্কাজনক হল। দামিনী ভগবানের উপর রাগ করত : যে তাঁকে ভক্তি করে না তার কাছে তিনি জব্দ, আর ভক্তের উপর দিয়েই এমনি করে তার শোধ তুলতে হয় ? খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধিবার জন্য সে প্রাণপণ করতে লাগল। একদিন শচীশের আহারের সময় উত্তীর্ণ হতে দেখে অভুক্ত দামিনী অপরাহ্নবেলায় খাবারের থালা হাতে নদী পার হয়ে বালুচরে পায়ের দাগ ধরে চলতে-চলতে অবশেষে তার দেখা পেল। কিন্তু কিছু খাওয়াতে না-পেরে ঘরে ফিরে মাটিতে পা ছড়িয়ে তার কান্না আর বাধা মানল না। এমনিতে তার চোখে আগুন যত সহজে জ্বলে, জল তত সহজে পড়ত না। শ্রীবিলাস সান্ত্বনা দিতে এলে সে বললে, 'আমি যে স্ত্রীজাত—ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা আমাদের স্বধর্ম। ও-যে একেবারে মেয়েদের নিজের কীর্তি।' শচীশ যখন আবার সদয় ব্যবহার করে তখন তার বড়ো ভয়। মনে-মনে বলে, 'আমাকে যত্ন এ-যে তোমার আপনাকে শাস্তি দেওয়া। এ আমি সহিব কী করিয়া !' এক রাত্রে হঠাৎ বৃষ্টি দেখে দামিনী তার ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করতে গেল। শচীশ তাকে ভুল বুঝে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল বাইরে। দামিনী প্রাণপণ শক্তিতে তার পায়ের কাছে এসে বাতাসের চিৎকার-শব্দকে হার মানিয়ে বললে, 'এই তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি, তোমার কাছে অপরাধ করি নাই, কেন তবে আমাকে এমন করিয়া শাস্তি দিতেছ ?...আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো।' শচীশ তাকে ত্যাগ করে যেতে অনুরোধ করায় সে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ; পরে বললে, 'তাই আমি যাইব।'

বিদায়কালে দামিনী শচীশকে প্রণাম করলে : 'শ্রীচরণে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো।' শ্রীবিলাসের সাহায্যে সে কলকাতায় মাসির বাড়িতে

আশ্রয় নিতে চলল। দামিনীর মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বলছিল। শ্রীবিলাস শচীশের সম্বন্ধে অনুযোগ করায় রাগ করে বললে, 'তুমি তাঁর সম্বন্ধে আমার সামনে অমন কথা বলিয়ো না। তিনি আমাকে কী বাঁচান বাঁচাইয়াছেন তুমি তার কী জান? তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে-দুঃখটা পাইয়াছেন সে-দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে'—বলে সে কিল মারতে লাগল নিজেরই বুকে। মাসির বাড়িতে নিন্দাবাদে তার স্থানাভাব ঘটায় দামিনী যেতে চাইলে গুরুর কাছে; গুরুকে সে ভালো করেই জানত: দলচরের জাত মানুষকে চায়। শ্রীবিলাস হঠাৎ তাকে বিবাহ-প্রস্তাব করায় দামিনী থামিয়ে দিলে: 'তুমি কি পাগল হইয়াছ?' পরে বললে: লোকে কী বলবে, ভবিষ্যতে কী ঘটবে—শ্রীবিলাসের কী দশা হবে। শ্রীবিলাস বললে: তার মতো সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা কী। দামিনীর চোখ ছলছল করে এল: 'তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।...তুমিও তো আমাকে জান।'

কলকাতার গলির মধ্যে আবার ইটকাঠগুলো গানের সুরে বেজে উঠল। দামিনী বললে, 'আমি একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলাম, কেবল এই-একটা ধাক্কার অপেক্ষা ছিল। আমার সেই-তুমি আর এই-তুমির মাঝখানে ওটা কেবল একটা ঘোর আসিয়াছিল। আমার গুরুকে আমি বারবার প্রণাম করি, তিনি আমার এই ঘোর ভাঙাইয়া দিয়াছেন।' শ্রীবিলাসের মুখের দিকে চেয়ে তার আর আশা মিটতে চাইত না। শ্রীবিলাস কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'বিধাতার ওই সৃষ্টিটা যে সুদৃশ্য, আমি সেইটেই আবিষ্কার করিতেছি।' আত্মীয়-পরিজনহীন নূতন গৃহস্থালীর প্রসঙ্গে বললে, 'ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে, সেও তোমারই হাতের সৃষ্টি হোক, পুরানো কালের ভাঙাচোরা তার কোথাও কিছু না থাক্।' চৈত্রমাসে বিবাহ। দামিনী আবদার করলে: শচীশকে আনতে হবে—সম্প্রদান করতে। দু-জনে হাত ধরে তাকে আনলে। বিবাহান্তে দামিনী শচীশের জীবিকার ব্যবস্থায় ব্যগ্র হল। নিজে সে পাড়ার ছোটো-ছোটো মেয়েদের সেলাই শেখাবার ভার নিলে। বাড়িতে নিজের জন্য বামুন-চাকর কিছুতেই রাখতে দিলে না। শ্রীবিলাসকে বললে, 'তোমরা কেবলই উল্টা বুঝিয়া দয়া কর। তুমি খাটিয়া হয়রান হইতেছ, আর আমি যদি না-খাটিতে পাই তবে আমার সে-দুঃখ আর সে-লজ্জা বহিবে কে?'

চৈত্রমাসে বিবাহ হল। তার পরে একটা ফাল্গুন কাটল—আর কাটল না। গুহা থেকে ফেরার সময় শচীশের পদাহত দামিনী বুকের মধ্যে একটা ব্যথা নিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করলে বলত, 'এই-ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ-আমার পরশমণি। এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি, নহিলে, আমি কি তোমার যোগ্য?' সেই ব্যথা অত্যন্ত বেড়ে উঠল; ডাক্তারের

ওষুধে কোনো ফল হল না। সে বললে, 'যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও।' যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়ল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল, দামিনী স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

দমোদর বিশ্বাস ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের পুরনো আমলের এক প্রজা। ঘোষালবংশে কুমুর বিবাহ স্থির হবার পরে বিপ্রদাস বৃদ্ধ দামোদরের মুখে পূর্ববৃত্তান্ত শুনলেন। ঠাকুর-বিসর্জনের মামলায় কী-করে সবসুদ্ধ ঘোষালদেরও বিসর্জন ঘটে, কী-কৌশলে কর্তাবাবুরা তাদের দেশছাড়া-সমাজছাড়া করেন—বলতে-বলতে দামোদরের মুখ ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

দারা ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাজাহানের শেষবয়সে দারা দিল্লির শাসনকর্তা হয়েছিলেন।

দারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায় ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। নৃপবালা-নীরবালার পাণিপ্রার্থীদের অন্যতম। 'বেঁটেখাটো, অত্যন্ত দাঁড়ি-গোঁফ-সংকুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিপি, কালোকোলো, গোলগাল' চেহারা। পাত্রী-দেখার দিনে দারুকেশ্বরের সঙ্গে ছিল মৃত্যুঞ্জয়। ভাবী শ্যালীপতি অক্ষয়ের হাত থেকে গুড়গুড়ির নলটা পেয়ে দারুকেশ্বর ফড়্‌ফড়্‌-শব্দে টানতে আরম্ভ করলে। অক্ষয়ের প্রশ্ন: মুর্গি না মটন। আহারের প্রসঙ্গ বুঝে আহ্লাদিত হয়ে সে দু-পায়ে চাপড় মারলে: 'তা মুর্গিই ভালো, কাটলেট! কী বলেন?' অক্ষয়ের প্ররোচনায় ফস্ করে একটা বই টেনে নিয়ে সে টপাটপ বাজাতে আরম্ভ করলে; তার পরে নিজেই ধরে বসল: 'অভয় দাও তো বলি আমার wish কী, / একটি-ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি!' বিবাহের পরে তাকে বিলেত পাঠাতে হবে, এই দাবি জানিয়ে সে অক্ষয়ের হাত চেপে ধরল: 'দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বুঝলে?' অক্ষয়ের শর্ত: ক্রিশ্চান হতে হবে। সঙ্গীটিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে দারুকেশ্বর বোঝালে: 'বিলেত থেকে ফিরে সেই-তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে—তখন ডবল-প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে।...আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম, তখন ক্রিশ্চান হতে আর বাকি কী রইল?' ইতিমধ্যে অন্তঃপুর থেকে বরফ-জল মিষ্টান্ন এসে তাকে একেবারে দমিয়ে দিলে: 'কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি-বেটা উড়েই গেল নাকি?...আশা দিয়ে নৈরাশ। শ্বশুরবাড়ি এসে মটন-চপ খেতে পাব না? আর এ-যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না।...ও-সব রোগীর পথ্যি চলবে না।...

আজই ক্রিশ্চান হব, এখনই ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান হয়ে তবে অন্য-কথা। মশায়, আর এই পুঁইশাক-কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আনুন আপনার পাদ্রি ডেকে।' এদিকে অন্তরালে ছিলেন পাত্রীর মা। কাজেই—

দারোগা ॥ 'গোরা' উপন্যাস। চর-ঘোষপুর এলাকার দারোগা। নীলকর সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটায় ঘোষপুরের বলিষ্ঠ পুরুষমাত্রেই গ্রেপ্তার হল; পলাতকদের সন্ধানের উপলক্ষে পুলিস তাদের ঘরে কিছু রাখলে-না, মেয়েদের ইজ্জত রাখাও দায় হল। নাজিমের শ্যালক একদিন তার বোনকে দেখতে এলে দারোগা বিনা কারণেই 'বেটা-তো জোয়ান কম নয়, দেখেছ বেটার বুকের ছাতি?'—বলে হাতের লাঠিটা দিয়ে এমন খোঁচা মারলে যে তার দাঁত ভেঙে রক্ত পড়তে লাগল। গোরা সেখানে এসে নীলকুঠির তহশিলদারকে তিরস্কার করায় দারোগা খাড়া হয়ে বললে, 'তাই-তো, লোকটা কম নয় তো দেখছি। ভেবেছিলেম ভিক্ষে নিতে এসেছে, এ-যে চোখ রাঙায়। ওরে তেওয়ারি!… দেখো বাপু, আমরা এখানে সরকারের কাজ করতে এসেছি, এতে যদি কোন কথা বল বা গোলমাল কর তাহলে মুশকিলে পড়বে।'

দাশরথি মণ্ডল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের কোনো-এক পূর্ব-পুরুষের লাঠিয়াল। ওরফে দাশু সর্দার।

দাসী (নরেন্দ্রের) ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের এক দাসীস্থানীয়া রক্ষিতা। সে যেমন ঝাঁটাতে ত্রুটি করত না, তেমনি তার অন্ত ছিল না অভিমানের। নরেন্দ্রের সন্ধানপর মহেন্দ্রকে দেখে সে হেসে মৃদু ভর্ৎসনা করলে: যেন গায়ের উপর এসে পড়াই তার উদ্দেশ্য ছিল। মনে ভাবলে: তার কটাক্ষের প্রভাবে মলয়সমীরে মহেন্দ্র বাসায় গিয়ে মরে থাকবে।

দিদিশাশুড়ি (বিমলার) ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার দিদিশাশুড়ি। রূপযৌবন-সত্ত্বেও তাঁর বড়ো দুই নাতবউ পাপের আগুন থেকে স্বামীদের রক্ষা করতে পারে নি। তাই অবশিষ্ট নাতি নিখিলেশের জন্য তিনি রূপসীর খোঁজ করেন নি। নিখিলেশ তাঁর বক্ষের হার, চক্ষের মণি। বিমলা তার ভালোবাসা পেয়েছিল বলে তাকে ভালবাসতেন আরও বেশি: নিখিলেশের অর্থের অপচয়ে কেউ বিরক্ত হলে বলতেন, 'কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করছিস? বিষয়সম্পত্তির কথা ভাবছিস? আমার বয়সে আমি তিনবার এ-সম্পত্তি রিসীভারের হাতে যেতে দেখেছি। পুরুষেরা কি মেয়েমানুষের মতো? ওরা-যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাতবউ, তোর কপাল ভালো যে সঙ্গে-সঙ্গে ও নিজেও উড়ছে না। দুঃখ পাস নি বলেই সে-কথা মনে থাকে না।'

নিখিলেশ সাহেবের দোকানের সাজসজ্জায় স্ত্রীকে সাজাত ; দেখে-দেখে তাঁরও পছন্দের রঙ ফিরছিল। অবশেষে কলিযুগের কল্যাণে নাতবউ ইংরেজি বই থেকে গল্প না-বললে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দীনশরণ বেদান্তরত্ন ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। যোগমায়ার স্বামিগৃহের সভাপণ্ডিত। স্বামিগৃহে নীরন্ধ্র পৌরাণিক পরিবেশে যোগমায়ার একমাত্র আশ্রয় ছিলেন তিনি। বেদান্তরত্ন বলতেন, 'মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়।…তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি। দেখনি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে দুঃখ বোধ করি না। তার মানে, মনের মধ্যে আমরা স্বাধীন মানি-নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে।…যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।' যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে তিনি ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। আরও বলতেন, 'মা…তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।'

দুর্গাসিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। বিজয়গড়পতি বিক্রমসিংহের পূর্বপুরুষ।

ধ্রুব (তাতা) ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার জনৈক শিশু ; মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয়। তাতা যেন তার দিদি হাসির ছায়া। নদীতীরের বৃক্ষতলে বসে সে হাসির গল্প শুনত ; সেই গাছের তলায় সেই সূর্যের আলোকে তার ছোটো হৃদয়টুকুতে কত ছবি উঠত। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে একদিন হাসিকে বলির রক্ত মুছতে দেখে ছোটো দুটি হাত দিয়ে সেও মুছতে লাগল। হাসির জ্বর এল ; তাতা তার চোখের পাতা খুলে দেবার চেষ্টা করলে : 'কী হয়েছে।…দিদির লেগেছে ?' অনতিপরে হাসির মৃত্যু হল। তখন সে যদি জানতে পারত, সেও তার সঙ্গে চলে যেত তার ছোটো ছায়াটির মতো। পরদিন প্রহরীদের হাত এড়িয়ে খালি গায়ে খালি পায়ে সে এল রাজসভায় ; বললে, 'দিদি কোথায়।' তাতার নামটি যার মুখে মানাত সে আর ছিল না ; মহারাজের আশ্রয়ে তাই তার নাম হল ধ্রুব।

দিদি আছে হরির কাছে : এই-আশ্বাসে মহারাজের শিক্ষামতো সে হরির গান গাইত। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায় মন্দিরে বলি দেবার জন্য তাকে অপহরণ করতে এলেন। ধ্রুব তাঁর গলা জড়িয়ে বললে, 'কাকা।' নক্ষত্র বললেন, তিনি তার কাকা নন। সে হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি কাকা।' নক্ষত্র তার দিদিকে দেখাবার প্রলোভন দেখালেন। মন্দিরে এসে সে 'দিদি-দিদি' বলে কাঁদতে-কাঁদতে প্রতিমার পদতলে ঘুমিয়ে পড়ল। দৈবক্রমে মহারাজের আগমনে তার রক্ষা।

নির্বাসিত নক্ষত্র যখন ত্রিপুরা অভিযান করলেন, ধ্রুব তখন চার বছরের। বিস্তর কথা শিখে তখন সে রাজাকে ‘পুতুল দেব’ বলে সান্ত্বনা দিত ; রাজার দুষ্টামির লক্ষণ দেখলে বলত, ‘ঘরে বন্ধ করে রাখব।’ একটি প্রতিবেশীর মেয়ে তার সঙ্গিনী জুটেছিল। গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগের সময় তাঁর সঙ্গে যেতে না পারায় ধ্রুব কেঁদে অস্থির হল।

নিজামতপুরের পথে তার কাকা কেদারেশ্বরের সঙ্গে মৃতপ্রায় ধ্রুব পূর্ব-আশ্রয় ফিরে পেল বিল্বনের সাহায্যে। বিল্বনের কাছে সংস্কৃত ভাষা শিখে সে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে। অবশেষে নক্ষত্রের মৃত্যুর পরে গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে সে ফিরে এল ত্রিপুরায়।

নকুড় ॥ ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস। গুজুরপাড়া গ্রামের এক অধিবাসী। নক্ষত্র রায়ের দরবারে তার নালিশ : ‘মথুর আমায় কুত্তো কয়েছে।’

নক্ষত্র রায় (নক্ষত্রমাণিক্য) ॥ ‘রাজর্ষি’ উপন্যাস। ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্যের ভ্রাতা। রাজাদেশে ভুবনেশ্বরীদেবীর মন্দিরে বলি বন্ধ হল। পুরোহিত রঘুপতি প্রতিহিংসায় তাঁকে রাজা হবার আশ্বাস দিলে নক্ষত্র রায় বললেন, ‘ঠাকুরমশায় যে কী বলেন তার ঠিক নাই।…দেখুন ঠাকুরমশায়, আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা, ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কী হয় বলুন দেখি।’ রঘুপতির প্রশ্ন : ব্যাঙের মাথায় দাগ আছে তো ? নক্ষত্র রায়ের সগর্ব উত্তর : ‘দাগ আছে বই-কি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন।’ কিন্তু তখনই রাজরক্ত আনবার প্রস্তাব হতে তাঁর মনে ভ্রাতৃস্নেহ জাগতে লাগল। রঘুপতি ব্যঙ্গ করলেন : ‘ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল নাকি ?’ নক্ষত্র রায় কাষ্ঠহাসি হাসলেন : ‘হাঃ হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ। ঠাকুরমশায় বেশ বলিলেন, যা-হক, ভ্রাতৃস্নেহ।’ পরে গোবিন্দ-মাণিক্য সমস্ত শুনে তাঁকে নিয়ে অরণ্যের দিকে চললেন। সংশয়ে-শঙ্কায় নক্ষত্র আকুল হয়ে উঠলেন। মনে হল, হৃদয়ের অন্ধকার থেকে তাঁর ভাবনার কীটগুলি বেরিয়ে আসছে। গোবিন্দমাণিক্য অরণ্যে এসে তাঁর হাতে দিলেন তরবারি। নক্ষত্র রায় দু-হাতে মুখ ঢেকে রুদ্ধকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন : ‘দাদা, আমি দোষী নই…আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে।…আমি এখানে থাকিতে চাই-না। আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই।’

গোবিন্দমাণিক্য তাঁর প্রিয় শিশু ধ্রুবকে মুকুট পরিয়ে খেলা করতেন ; নক্ষত্রের তা ভালো লাগত না। একদিন রাজাদেশে তিনি মন্দিরের খোঁজ নিতে এলেন। তখন অতর্কিতে রঘুপতির প্রশ্ন : ‘গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের চেয়ে প্রিয় কে ?’ নক্ষত্র প্রাণভয়ে বলে উঠলেন, সে ধ্রুব। রঘুপতি তার মুকুট নিয়ে খেলায় বিপদের আভাস দিতেই সগর্বে বললেন, ‘তা কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর। আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না।’ রঘুপতির নির্দেশ সেদিনই

সন্ধ্যাবেলায় ধ্রুবকে চাদরে আচ্ছাদন করে তিনি মন্দিরে বলি দিতে নিয়ে এলেন। ধ্রুবের কান্না দেখে তাঁর চোখে জল এল : তবু দুর্বলতা প্রকাশ করতে লজ্জিত হলেন। মদ খেয়ে অবশেষে তাঁর প্রাণ খুলে গেল : 'ঠাকুর, তোমার মনে-মনে ভয় হচ্ছে। তুমি মনে করছ আমিও ভয় করছি।...ভয় কিসের।...আমি তোমাকে রক্ষা করব।...ঠাকুর, তুমি বললে না কেন, আমি রাজাকে ধরে আনতুম, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত। ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত।' এমন সময়ে সহসা মন্দিরে ছায়া পড়ল ; নক্ষত্রের প্রাণ উড়ে গেল। পরদিন রাজাদেশে রঘুপতির সঙ্গে তাঁর নির্বাসন ঘটল। দাদার পায়ে পড়ে তাঁর মার্জনার আবেদন ব্যর্থ হল।

নির্বাসিত নক্ষত্র বিস্তর লোকলশকর নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী গুজুরপাড়ায় এলেন। সেখানে নটনটী এল ; হাটবাজার বসল ; ত্রিপুরার অনুকরণে দরবার বসল। নূতন-নূতন সৃষ্টিছাড়া আমোদ উদ্ভাবনে সভাসদ্‌দের পরামর্শের অবধি রইল না। এখানে ত্রিপুরার সমস্ত রাজ-অনুষ্ঠান অবলম্বন করে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতায়, মনের উল্লাসে তিনি বিলাসে মগ্ন হলেন। তাঁর ভৃত্যদের মধ্যে কেউ মন্ত্রী, কেউ সেনাপতি, কেউ দেওয়ানজি-পদে অধিষ্ঠিত হল। পুরোহিত কেনারামকে তিনি 'রঘুপতি' বলে ডাকতেন—আসল রঘুপতিকে ভয় করতেন বলে এই খেলার রঘুপতিকে অশেষ দুঃখ দিয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। একদা প্রাসাদে বিড়াল-শাবকের বিবাহ। নক্ষত্র রায় রেগে উঠে রঘুপতিকে হাঁক দিলেন। এমন সময়ে সহসা আসল রঘুপতির আগমনে তিনি চমকিত হলেন : বিড়ালের বিবাহ এবং সাহানা-সারঙ্গ বন্ধ হল। নক্ষত্র রায় হাতজোড় করে বললেন, 'ঠাকুর, আমাকে মাপ করো...দাদার বিরুদ্ধে আমি কোনো চক্রান্ত করিতে পারিব না।...আমি জানি, তিনি আমাকে ভালোবাসেন।' কিন্তু ধ্রুবের সিংহাসনপ্রাপ্তির সম্ভাবনার আভাসে তিনি তখনই তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আমি কি এই সামান্য কথাটা আর বুঝি না।'

কোথাও নদী, কোথাও অরণ্য, কোথাও ছায়াহীন প্রান্তর—পথশ্রমে ক্লান্ত শীর্ণ নক্ষত্র রঘুপতির ছায়ার মতো চললেন। রঘুপতির হাতে যতই তিনি কষ্ট পান ততই তাঁর বশ হতে লাগলেন। রাজমহলে এসে সুজাকে যথোচিত নজরানা দিয়ে সৈন্য সংগ্রহ হল। পাছে দুর্বলস্বভাব নক্ষত্র বিনাযুদ্ধে গোবিন্দ-মাণিক্যের কাছে ধরা দেন, রঘুপতি তাই তাঁর রাজাভিমান উদ্রেকের চেষ্টা করলেন। বললেন, 'যাত্রা করিতে হইবে, মহারাজ, প্রস্তুত হন।' নক্ষত্র পুলকিত হয়ে উঠলেন : 'ঠাকুর, আপনাকে কখনোই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কী চান সেইটে আমাকে বলুন।' পথিমধ্যে সৈন্যরা লুটপাট করছিল ; রঘুপতি নিষেধ করলে তিনি স্পর্ধার সঙ্গে বললেন, 'আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি তোমরা লুঠপাট করিতে যাও।' রঘুপতিকে বললেন, 'ঠাকুর, এ-সব বিষয় তুমি কিছু বোঝ না—তুমি তো কখনো যুদ্ধ কর

নাই।' কিন্তু ত্রিপুরায় পেঁছেই গোবিন্দমাণিক্যের একটি পত্র পেয়ে আবার তাঁর ভাবান্তর ঘটল। কেঁদে উঠে বললেন, 'আমি এ-রাজ্য চাই না। দাদা, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও'।—বলে তখনই অশ্বারোহণে দাদার কাছে যেতে উদ্যত হলেন। কিন্তু সহসা রঘুপতির আগমনে ন পারলেন না।

গোবিন্দমাণিক্য রাজ্য ত্যাগ করে গেলে নক্ষত্র রায় 'ছত্রমাণিক্য' নাম নিয়ে মহাসমারোহে রাজপদে বসলেন। রাজকোষে বেশি অর্থ ছিল না; প্রজাদের যথাসর্বস্ব হরণ করে তিনি মোগলসৈন্যদের বিদায় করলেন। দুর্ভিক্ষে-দারিদ্র্যে চারদিক থেকে অভিশাপ বর্ষিত হতে লাগল। তবুও রাজসভায় বিলাসব্যসনের অন্ত ছিল না। গোবিন্দমাণিক্যের উল্লেখমাত্রে তিনি রুষ্ট হয়ে উঠতেন এবং অধিকতর উৎপীড়ন চালিয়ে প্রজাদের মুখ বন্ধ করতেন। এদিকে রাজকার্যও কিছু বুঝতেন না—কেউ উপদেশ দিতে গেলেও চটে উঠতেন। রঘুপতি পরামর্শ দিতে এলে একদিন ক্ষেপে উঠে বললেন, 'ঠাকুর, তুমি তোমার মন্দিরের কাজ করো গে। রাজসভায় তোমার কোনো প্রয়োজন নাই।' ছ-বছর পরেই নক্ষত্রমাণিক্যের মৃত্যু হল।

ননকু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের এক দরোয়ান।

ননিগোপাল ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যের সহপাঠী শোভনলালের বাবা। একদিন ননিগোপাল ছেলের প্যাঁটরার মধ্যে লাবণ্যের একটা ছবি আবিষ্কার করে বাড়ি চড়াও হয়ে তার অধ্যাপক পিতাকে গাল পেড়ে গেলেন: বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে তিনি সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজারদর যে কত, আর কিছুদিন পরে সে-দাম যে কত উঠবে—তাঁর হিসেবি-বুদ্ধিতে তা ছিল কড়ায়-গণ্ডায় জানা। এমন মূল্যবান জিনিসকে বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি যে সিঁধ-কেটে চুরি করারই নামান্তর।

ননিবালা ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। জনৈকা বালবিধবা। বিধবা মায়ের সঙ্গে ননিবালা তার মামার বাড়িতে আশ্রিত ছিল। মায়ের মৃত্যুর পরে দুশ্চরিত্র মামাতো ভাইগুলির চক্রান্তে পুরন্দরের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী। অবশেষে সন্তান-সম্ভাবনাকালে লাঞ্ছিত-নিরাশ্রিত হয়ে শচীশের সহায়তায় তার জ্যাঠার গৃহে আনীত হল। সেখানে এসে জড়োসড়ো হয়ে মাটিতে বসে মুখের উপরে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। 'নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স'—সে-মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নি; ফুলের উপরে ধুলো লাগলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না। তার দুটি 'কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ।'

জগমোহনের স্নেহে ননিবালা ধন্য হয়ে গেল। মানুষ যে মানুষের কতখানি তা সে এর আগে কোনোদিন এমন করে অনুভব করে নি—এমনকি মা থাকতেও নয়। মা তাকে মেয়ে বলে দেখত না, বিধবা মেয়ে বলে দেখত। কিন্তু এখানেও বারবার পুরন্দরের অভ্যাগমে ননী ভয়ে মূর্ছিত হতে লাগল। ভয়ের চমকে যেন বাঁশপাতার মতো কাঁপতে-কাঁপতে একদিন সে একটি মৃতসন্তান প্রসব করলে। অবশেষে শচীশের সঙ্গে সিভিল-মতে তার বিবাহের উদ্যোগ। একদিন জগমোহন শচীশের সঙ্গে তার আলাপের ব্যবস্থা করলেন। ননী গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁর হাত ধরে বললে, 'বাবা, তুমি আজ আমাকে আশীর্বাদ করো।'—বলে তার দু-চোখ দিয়ে শুধু জল পড়তে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে জগমোহন ছুটে এসে দেখলেন: বিছানার উপরে তার মৃতদেহ। যে-কাপড়গুলি তিনি দিয়েছিলেন সেগুলি পরা—হাতে একখানা চিঠি। সে লিখেছিল: 'বাবা, পারিলাম না, আমাকে পাপ করো। তোমার কথা ভাবিয়া এতদিন আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাকে যে আজও ভুলিতে পারি নাই। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম।'

নন্দ ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার এক প্রধান ভক্ত। নন্দ ছুতোরের ছেলে; বয়স বাইশ। বাপের দোকানে সে কাঠের বাক্স তৈরি করত। গোরার ক্রিকেট এবং শিকারের ইতর-ভদ্র-মিশ্রিত দলের মধ্যে ব্যায়ামে ও খেলায় সে ছিল সেরা। সবাই তাকে দলপতি বলে স্বীকার করত। পায়ে একটা বাটালি পড়ে ক্ষত হয়ে তার ধনুষ্টংকার হলে তার মা বলে, ছেলেকে ভূতে পেয়েছে। নন্দ বার-বার গোরাকে সংবাদ দিতে বলে; কিন্তু ডাক্তারি-চিকিৎসার ভয়ে তাকে সংবাদ দেওয়া হয় না। ভূতের ওঝা সমস্ত রাত তাকে ছেঁকা দিয়ে মন্ত্র পড়ে ভূত ছাড়াবার অপচেষ্টা করে; ফলে তার মৃত্যু হয়।

নন্দবাবু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার মেজো-জার এক বোনপো।

নন্দরানী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর মা! নন্দরানীর অন্দরমহলে পালপার্বণ, ব্রত-উপবাস, অতিথিসেবা; কর্তার ইয়ারমহলে মজলিসি সমারোহ। এই বিরুদ্ধ-হাওয়ার দুই-কক্ষবর্তী গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে নন্দরানীকে বিস্তর সহ্য করতে হত। নন্দরানী জানতেন, বাইরের দিকে স্বামীর টানের দৌড় যতই হোক, তিনিই ধ্রুব; ভিতরের শক্ত টান তাঁরই দিকে। কিন্তু সেই ভালোবাসার উপরে স্বামী অন্যায় করলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

রাসের সময় তামসিক আয়োজনটা হত বৈঠকখানায়। নন্দরানীর রাত্রে ঘুম নেই, বুকে ব্যথা—দরজার ফাঁক দিয়ে কিছু আভাস পেতেন। কিন্তু সেবার

সেই আয়োজন অন্যত্র স্থানান্তরিত হওয়াতে তাঁর মন রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে আছাড় খেয়ে মরতে লাগল। ঘরে কাজকর্ম, খাওয়ানো-দাওয়ানো; বুকের মধ্যে নড়তে-চড়তে কাঁটা বেঁধে, কেউ জানতে পারে না। তৃপ্তকণ্ঠের রব ওঠে, 'জয় হোক রানীমার।' উৎসব-শেষেও স্বামী ফিরলেন না দেখে নন্দরানীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। দেওয়ানজিকে ডাকিয়ে পরদার আড়াল থেকে বললেন, 'কর্তাকে বলবেন বৃন্দাবনে মার কাছে আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে। তাঁর শরীর ভালো নেই।' জানতেন: কর্তা ফিরলে অল্প-একটু কান্নাকাটি-সাধ্যসাধনাতেই সব শোধ হবে—প্রতিবারে এমনই হত। বিদায়ের পূর্বমুহূর্তে শয়নকক্ষে খাটের উপর পড়ে তবু তাঁর কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটল।

বৃন্দাবনে টেলিগ্রাম গেল: কর্তার অবস্থা সংকটজনক। প্রবল বর্ষণে রেললাইন ভাঙার জন্য পথিমধ্যে নন্দরানী আটকা পড়লেন। ফিরে এসে আর দেখা পেলেন না—দরজার কাছেই মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সংসারে আর তাঁর কিছুই রুচল না; ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আর সান্ত্বনা পেলেন না। গুরু এসে শাস্ত্রবচন শোনালে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাতের লোহা খুললেন না; বললেন, 'আমার হাত দেখে বলেছিল আমার এয়োত ক্ষয় হবে না। সে কি মিথ্যে হতে পারে?' দূরসম্পর্কের ক্ষেমা ঠাকুরঝি এসে বললে, 'যা হবার তা-তো হয়েছে, এখন ঘরের দিকে তাকাও। কর্তা যে যাবার সময় বলে গেছেন, বড়োবউ ঘরে কি আলো জ্বালবে না?' নন্দরানীর শীর্ণ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; শয্যা থেকে উঠে দূরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'যাব, আলো জ্বালতে যাব। এবার আর দেরি হবে না।'

মাঘ মাসের শুক্লা-চতুর্দশী। নন্দরানী কপালে মোটা সিঁদুর পরে গায়ে জড়ালেন লাল বেনারসী। তারপরে 'সংসারের দিকে না তাকিয়ে মুখে হাসি নিয়ে চলে গেলেন।'

নবকৃষ্ণ ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। বক্তার শ্যালক। নবকৃষ্ণ ইংরেজি-সাহিত্যে রোমহর্ষক এম. এ.। নায়ক অমিত অক্সফোর্ডের ছাত্র এবং বক্তার রচনার ভক্ত। নবকৃষ্ণ বলত, 'রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।···অমিত কেবলই ছোটো-লেখককে বড়ো করে বড়ো-লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।'

নবগোপাল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর দাদা বিপ্রদাসের ছ-আনি শরিক। পৈতৃক-আমলে বিষয় ভাগ করে তারা বাইরের দিক থেকে লাঠি হাতে দশ-আনির সীমানা খাবলেছে—রাধাকান্ত জীউর সেবায়তি-অধিকারে দশে-ছয়ে যতই সূক্ষ্মভাবে ভাগ করবার চেষ্টা হয়েছে ততই তার শস্য-অংশ উকিল-মোক্তারের আঙিনায় নয়-ছয় হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদন ঘোষালের বিবাহ-উপলক্ষে ঘোষালদের সাবেক-ভিটায় উৎসবের সমারোহ জাগল। ছ-আনির কর্তা নবগোপাল এসে বললে, 'বংশের অমর্যাদা সওয়া যায় না। একদিন আমাদের কর্তারা ওই ঘোষালদের হাড়ে-হাড়ে ঠকাঠোক লাগিয়েছেন, আজ তারা আমাদেরই এলাকার উপর চড়াও হয়ে টাকার ঝলক মারতে এসেছে। ভয় নেই দাদা, খরচ যা লাগে আমরাও আছি। বিষয় ভাগ হোক বংশের মান তো ভাগ হয়ে যায় নি।'—বলে ঠেলে-ঠুলে সে-ই কর্মকর্তা হয়ে বসল। বিপ্রদাস প্রতিযোগিতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করায় বললে, 'চতুর্মুখ তাঁর পা ঝাড়া দিয়েই বেশি মানুষ গড়েছেন ; চারটে মুখ কেবল বড়ো-বড়ো কথা বলবার জন্যেই। সাড়ে-পনেরো-আনা লোক যে ইতর, তাদের কাছে সম্মান রাখতে হলে ইতরের রাস্তাই ধরতে হয়।…এটা সত্যযুগ নয়। জলের নৌকো চালাতে চাও পাঁকের উপর দিয়ে! তোমার প্রজারা আছে…এদের-যে বুক ফেটে যাবে। তুমি চুপ করে থাকো, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।'

প্রজাদের সঙ্গে নবগোপাল উঠে-পড়ে লাগল। আমলা-ফয়লা পাইক-বরকন্দাজ সবারই গায়ে উঠল নূতন বনাতের চাদর, রাঙন ধুতি। সালুতে-মোড়া ঝালর-ঝোলানো নিশান-ওড়ানো দুই-শরিকের চার-চার হাতি বেরোল। পাত্রপক্ষ সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ করায় নবগোপাল রেগে আগুন : জমিদারবংশের অপমান! প্রজাদের নিয়ে চাটুজো-বাড়িতে সেও মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করলে। উপকরণের স্বল্পতা-সত্ত্বেও ঘন-ঘন চাটুজ্যেদের জয়ধ্বনিতে-কলধ্বনিতে বাতাসে চলল সমুদ্রমন্থন। বরপক্ষের নিমন্ত্রণে লোকসমাগম হল না ; প্রজারা খুব হেসে নিলে। উভয়পক্ষে মনান্তর উঠল চরমে। এমন অবস্থায় কন্যাপক্ষ বরপক্ষের হাতে-পায়ে ধরে সাধ্যসাধন করে—নবগোপাল গ্রাহ্যও করলে না। বিদায়কালে সে বরকে বললে, 'ভায়া, বিয়েবাড়িতে তোমাদের হাটখোলার আড়ত থেকে যে চালচলন আমদানি করেছিলে, সে-কথাটা ইঙ্গিতেও দাদাকে জানিয়ো না ; উনি এর কিছুই জানেন না, ওঁর শরীরও বড়ো খারাপ।'

নবীন ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের এক প্রতিবেশী ডাক্তার। মহেন্দ্র গৃহত্যাগ করার পরে নবীন তার মাকে দেখতেন।

নবীন ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের দলের এক গায়ক। বিবাহযোগ্যা একটি মাতৃহীনা শালী ছিল তার আশ্রয়ে। নবীনের ছোটো-ভাই কলকাতায় পড়ত ; মাস-কয়েক পরে কলেজের পরীক্ষা দিয়ে তাকে বিবাহ করবে স্থির ছিল। নবীন কীর্তনের আসরে রসের চর্চায় মেতে উঠত ; আর গোপনে-গোপনে মেয়েটির প্রতি আসক্ত ছিল। স্ত্রীর কাছে তা ধরা পড়লে মেয়েটিকে বিবাহ করতে তাকে বেশি পীড়াপীড়ি করতে হল না। এই বিবাহের পরেই তার স্ত্রী আত্মঘাতিনী হল।

নবীন ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের মেজো-ভাই। মধুসূদনের বিশেষ স্নেহভাজন এবং তার মির্জাপুরের প্রাসাদের ম্যানেজার। দাদার কাছে এসেই সে লেখাপড়া শিখে মানুষ। নবীন ছিল খাঁটি; সংসারের কাজেও তার স্বাভাবিক পটুতা। যে-কোনো বিবাদ-বিসম্বাদ সে সহজে মিটিয়ে দিতে পারত—সকলেই ভাবত তার উপরেই পক্ষপাত।

মধুসূদনের শেষ-বয়সে বিবাহ কুমুদিনীর সঙ্গে; কিন্তু তার দাদা বিপ্রদাসের সম্পর্কে তার বিরাগ আন্তরিক। তাঁর কোনো-একটা চিঠির কথা বউরানীকে বলার অপরাধে সস্ত্রীক নবীনের উপরে দেশে যাবার আদেশ হল। নবীন দেশে যাবার জন্য তখনই তৈরি—ফলে তারই জয় হল। স্ত্রী নিস্তারিণীর সঙ্গে একদিন একটি বই নিয়ে নবীন কাড়াকাড়ি করছিল; বইটি ইংরেজি সংক্ষিপ্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার এক খণ্ড। সারাদিন কাজকর্মের পরে সে রাত জেগে বই পড়ত—তাতেই নিস্তারিণীর আপত্তি। নবীন বউরানীকে মধ্যস্থ মানলে এবং তার বিপদের ভান-করা মুখভঙ্গিতে কুমু উঠল হেসে। নবীন মনে-মনে অতঃপর বউরানীকে হাসাবার প্রতিজ্ঞা করলে।

ব্যবসায়ে মধুসূদনের কোনো-একটা সংকটের সময়ে নবীন নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করাতে জ্যোতিষীর কাছে যেতে চাইলে; এইভাবে সে মধুসূদনকেও সেখানে নিয়ে গেল। নবীনের চক্রান্তে জ্যোতিষবচন এই যে: নববধূর মর্মপীড়াতেই মধুর উপরে ভাগ্যের কোপ। পরে স্ত্রীর সম্বন্ধে মধুসূদনের ঔদার্যের সুযোগে নবীন তাকে দাদার কাছে পাঠাতে সক্ষম হল। এদিকে বিধবা বড়ো ভাজ শ্যামাসুন্দরীর জালে মধুসূদনকে জড়িয়ে পড়তে দেখে সে বুঝলে: কুমু তার যে-ঘুমন্ত ক্ষুধাকে জাগিয়েছে তারই অন্নের অভাবে এই বিপত্তি। বিপ্রদাসের কাছ থেকে কুমুর একখানা ভালো ছবি চেয়ে এনে সে দাদার শয়নকক্ষে টাঙিয়ে রাখলে। তাতে ফল পেতেও দেরি হল না।

নবীনকালী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। জনৈক মুকুন্দলাল দত্তের প্রৌঢ়া স্ত্রী। তাঁরা ছিলেন কাশীতে। গাজিপুরে সিদ্ধেশ্বরবাবুর বাড়ি বিবাহে নিমন্ত্রিত হয়ে পাছে সে-বাড়িতে থাকতে-খেতে হয় বলে, বোটে করে সেখানে এসেছিলেন। নবীনকালী কৈফিয়ত দিয়েছিলেন: 'জানাই-তো ভাই, কর্তার শরীর ভালো নয়। আর ছেলেবেলা হইতে উঁহাদের অভ্যাসই একরকম। বাড়িতে গোরু রাখিয়া দুধ হইতে মাখন তুলিয়া সেই মাখন-মারা ঘিয়ে উঁহার লুচি তৈরি হয়—আবার সে-গোরুকে যা-তা খাওয়াইলে চলিবে না'—ইত্যাদি।

কাশী প্রত্যাবর্তনের পথে নবীনকালী প্রত্যূষে স্নানে বেরিয়ে ঘাটের বৃক্ষতলে কমলাকে দেখলেন। নলিনাক্ষের পত্নী কমলা গাজিপুর থেকে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর সন্ধানে একাকী পায়ে হেঁটে চলেছিল। নবীনকালী তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখলেন। জিজ্ঞাসাবাদে জানলেন, তার নাম

কমলা—সে ব্রাহ্মণের মেয়ে এবং রাঁধতে-বাড়তে জানে। বিনা-বেতনে পাচিকা-ব্রাহ্মণী লাভ করে তিনি খুশি হলেন: 'বামুন-চাকর সমস্তই আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদের আবার যে-সে বামুন হইবার জো নাই···বামুনকে মাইনে দিতে হয় চৌদ্দ-টাকা, তার উপরে ভাত-কাপড় আছে। তা-হোক, ব্রাহ্মণের মেয়ে, তুমি বিপদে পড়িয়াছ—তা, চলো, আমাদের ওখানেই চলো। কত লোক খাচ্ছে-দাচ্ছে···এখানে কেবল কর্তা আর আমি আছি। মেয়ে-গুলির সব বিবাহ দিয়াছি; তা, তাহারা বেশ বড়ো ঘরেই পড়িয়াছে। আমার একটিমাত্র ছেলে, সে হাকিম, এখন সেরাজগঞ্জে আছে, লাট-সাহেবের ওখান হইতে দু-মাস অন্তর তাহার নামে চিঠি আসে, আমি কর্তাকে বলি, আমাদের নোটোর তো অভাব কিছুই নাই, কেন তাহার এই গেরো'—ইত্যাদি। কাশী পৌঁছে চোদ্দ-টাকা বেতনের বামুনের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না; একটা উড়ে-বামুন ছিল, নবীনকালী তার উপরে হঠাৎ আগুন হয়ে বিনা-বেতনে বিদায় করে দিলেন। চোদ্দ-টাকা বেতনের অতি-দুর্লভ দ্বিতীয় পাচক জোটবার অপেক্ষায় কমলার উপরেই রাঁধাবাড়ার ভার পড়ল। কমলা পাছে হাতছাড়া হয়ে যায় নবীনকালী তাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখলেন; সতর্ক করে বললেন, 'দেখো বাছা, কাশী শহর ভালো জায়গা নয়। তোমার অল্প বয়স। বাড়ির বাহিরে কখনো বাহির হইয়ো না। গঙ্গাস্নান-বিশ্বেশ্বরদর্শনে আমি যখন যাইব তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব।' দিনের মধ্যে কাজের অভাব ছিল না—সন্ধ্যার পরে নবীনকালী তাঁর যে-সমস্ত ঐশ্বর্য, গহনাপত্র, সোনারুপার বাসন, মখমল-কিংখাবের গৃহসজ্জা ও লোকলশকর সঙ্গে আনতে পারেন নি, তারই বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন।

নবীনকালী যে কমলাকে ভালোবাসতেন না তা নয়—'কিন্তু সে-ভালোবাসার মধ্যে রস ছিল না।' একদিন কর্তার শরীর খারাপ হলে তিনি কমলাকে রুটির হুকুম করে বললেন, 'ওগো, ও বামুনঠাকরুন···তাই বলিয়া একরাশ ঘি লইয়ো না। জানি-তো তোমার রান্নার শ্রী···এর চেয়ে সেই-যে উড়ে বামুনটা ছিল ভালো, সে ঘি লইত বটে. কিন্তু রান্নায় ঘিয়ের স্বাদ একটু-আধটু পাওয়া যাইত।' চাকর তুলসীকে হুকুম হল নলিনাক্ষ ডাক্তারকে ডেকে আনতে। নলিনাক্ষ কমলার স্বামীর নাম। তুলসী নিচে এলে কমলা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে। উপর থেকে রব এল: 'রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া কিসের পরামর্শ চলিতেছে রে, তুলসী? আমার বুঝি চোখ নাই মনে করিস? শহরে যাইবার পথে একবার বুঝি রান্নাঘর না-মাড়াইয়া গেলে চলে না? এমনি করিয়াই জিনিসপত্রগুলো সরাইতে হয় বটে! বলি, বামুনঠাকরুন, রাস্তায় পড়িয়া ছিলে, দয়া করিয়া তোমাকে আশ্রয় দিলাম, এমনি করিয়াই তাহার শোধ তুলিতে হয় বুঝি!' নবীনকালী জানতেন, অন্ধকারে ঢেলা মারলেও অধিকাংশ ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ে। কমলা কাজকর্ম সেরে একজন

আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাইলে। নবীনকালী বললেন, 'এ-সব ভালো কথা নয়। আমার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে, আমি এ-সব বুঝি। খবর তোমাকে কে আনিয়া দিল? তুলসী বুঝি? ও-ছোঁড়াটাকে আর রাখা নয়।'—এই বলে তুলসীকে তন্দণ্ডেই দূর করে দেওয়া হল।

কমলার পদে-পদে ত্রুটি হতে দেখে নবীনকালী বললেন, 'তোমার গতিক তো ভালো দেখি না। তোমাকে কি ভূতে পাইয়াছে?' কমলা বিদায় চাইলে ঝংকার করে উঠলেন: 'বটেই তো! কলিকালে কাহারও ভালো করিতে নাই। তোমাকে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবার জন্যে আমার এতকালের অমন ভালো বামুনটাকে ছাড়াইয়া দিলাম, একবার খবরও লইলাম না, তুমি সত্যি বামুনের মেয়ে কি না। আজ উনি বলেন কিনা, আমাকে বিদায় দিন। যদি পালাইবার চেষ্টা কর-তো পুলিসে খবর দিব না! আমার ছেলে হাকিম—তার হুকুমে কত লোক ফাঁসি গেছে···শুনেইছ তো—গদা কর্তার মুখের উপরে জবাব দিতে গিয়াছিল, সে-বেটা এমনি জব্দ হইয়াছে, আজও সে জেল খাটিতেছে।' কর্তার বায়ু-পরিবর্তনের জন্য মিরাট-যাত্রার উদ্যোগ হল। কমলা বললে, 'আমি তো কাশী ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।' নবীনকালী বললেন, 'আমরা পারিব, আর তুমি পারিবে না! বড়ো ভক্তি দেখিতেছি।···তা কেমন থাক দেখা যাইবে।'

পাছে বামুনঠাকরুন গোলমালে পালিয়ে যায়, এই ভয়ে নবীনকালী তাকে দিয়েই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার কাজ করিয়ে নিলেন। যাত্রার পূর্বরাত্রে এবং স্টেশনে যাবার পথে তাকে নিজের কাছেই রাখলেন; কমলাকে নিয়ে উঠলেন এক ইন্টারমিডিয়েট স্ত্রীকক্ষে। গাড়ি ছাড়লে নবীনকালী পানের ডিবে খুলে বললেন, 'এই দেখো, যা ভাবিয়াছিলাম, তাই হইয়াছে। চুনের কৌটাটা ফেলিয়া আসিয়াছ? এখন আমি করি কী। যেটি আমি নিজে না-দেখিব সেটিতে একটা-না-একটা গলদ হইয়া আছেই। এ-কিন্তু বামুনঠাকরুন, তুমি শয়তানি করিয়া করিয়াছ। কেবল আমাকে জব্দ করিবার মৎলবে। ইচ্ছা করিয়া আমাদের হাড় জ্বালাইতেছ। আজ তরকারিতে নুন নাই, কাল পায়সে ধরা গন্ধ—মনে করিতেছ, এ-সমস্ত চালাকি আমরা বুঝি না। আচ্ছা, চলো মিরাটে, তার পরে দেখা যাইবে তুমিই-বা কে, আর আমিই-বা কে।···ওগো অত করিয়া ঝুঁকিয়া দেখিতেছ কী। তুমি-তো আর পাখি নও, তোমার ডানা নাই যে উড়িয়া যাইবে।' কিন্তু, মোগলসরাইয়ে গাড়ি ছাড়বার সময়ে কমলা হঠাৎ নেমে পড়ল। নবীনকালী চেঁচামেচি শুরু করলেন: 'বামুনঠাকরুন, করিতেছ কী। গাড়ি ছাড়িয়া দেয়-যে। ওঠো, ওঠো!'—বলতে-বলতে গাড়ি স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

নরেন ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশদের বাড়ির এক নূতন জামাই। শচীশ আর তার বন্ধু শ্রীবিলাসকে নরেন দৈবলব্ধ জিনিস বলে মনে করত। বিধবা

দামিনীকে বিবাহের ফলে শ্রীবিলাসের নামে কুৎসা রটলেও সে তাদের আশ্রয় দেয় নিজেরই একটা বাড়িতে।

নরেন ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের আশ্রয়ে পালিত দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় ছেলে। স্বদেশীর উৎসাহে নরেনের নাওয়া-খাওয়া ছিল না। নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী মিস গিল্‌বিকে একদিন সে ঢিল ছুঁড়ে অপমান করলে। পরে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে লোকের কাছে বলে বেড়াতে লাগল : গিল্‌বিই তাকে অপমান করে বানিয়ে বলেছে।

নরেন মিত্র ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। ওরফে নরেন মিটার। অমিত রায়ের বোন সিসির পাণিপ্রার্থী। সিসির বন্ধু কেটি মিত্তিরের দাদা। 'দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনেরও ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই-দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই-কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়, এইজন্য আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো-বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে।' স্পষ্ট-বক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি-আঁকা ছেড়ে সে ছবির সমঝদারিতে পরিপক্বতা সম্বন্ধে প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। 'চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই-হাতে সেটাকে চটকাতে পারে।' ফরাসি-ছাঁচে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্ত কণ্টকিত, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া-চুলের প্রতি সযত্ন অবহেলা। 'চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো-ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার-টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলেব উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার-টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে-মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো'—এ-সব দেখে তার আভিজাত্য সম্বন্ধে কারও দ্বিরুক্তি করতে সাহস হত না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজিস্ট্রি-বইয়ে তার গায়ের মাপ এবং নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায়, যেখানে পাতিয়ালা-কপূরতলার নাম। তার "স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত-বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস-কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত; ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।'

নরেন্দ্র ॥ 'করুণা' উপন্যাস। জমিদার অনুপকুমারের পালিত এক ব্রাহ্মণপুত্র। বাল্যকালে নরেন্দ্র ছিল শান্ত-সুবোধ—পাঠশালার গুরুমশায়ের প্রিয়পাত্র।

কলকাতায় পড়তে গিয়ে তার কতকগুলি উৎকট রোগ হল: পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করে সঙ্গীদের গলা জড়িয়ে বেড়ানো, ভদ্রলোকদের কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো, নিরীহ পথচারীদের গায়ে ধুলো দেওয়া—ইত্যাদি। অনুপের মৃত্যুব পরে তাঁর মেয়ে করুণার সঙ্গে তার বিবাহ হল। ফলে তাঁর অতিথিশালাটি পরিণত হল বাবুর্চিখানায়; অতিথিদের জন্য নিযুক্ত হল দরোয়ান; ব্রাণ্ডি কেনার অসুবিধাহেতু গ্রামে বসল ডিসপেনসারি। রায় বাহাদুর-উপাধিলাভের জন্য ঘোড়দৌড়ের তহবিলে জমা পড়ল হাজার টাকা; বাগবাজারে কেনা হল বাড়ি, আর কাশীপুরে বাগান।

অনতিপরেই পাওনাদারের ভয়ে নরেন্দ্রকে বাড়ি আসতে হল। সঙ্গে এল একদল বন্ধু এবং কুকুর। করুণার উপরে তার সর্বদাই অসন্তোষ, মত্তদশা সন্ধ্যাবেলায়। শেষে গ্রামেও ঋণের জন্য সে তিষ্ঠোতে পারল না; শয্যাশায়িনী করুণাকে ফেলে আবার গেল কলকাতায়। আর তারপরে গেল জেলে। পণ্ডিতমশায়ের চেষ্টায় মুক্তিলাভ করেও তার ভাবান্তর ঘটল না। এমন সময়ে করুণার সম্বন্ধে এক হীন সন্দেহ তাকে পেয়ে বসল—তাকে প্রহার করে একরাত্রে বিতাড়িত করলে। ঋণের দায়ে শেষে বাড়িঘর সমস্ত বিকিয়ে গেল; তখন আশ্রয় নিলে একটি নীচজাতীয়া নারীর কাছে। তখন মহেন্দ্রের আশ্রয়ে করুণার অবস্থিতির সংবাদ পেয়ে লিখলে, 'তিন-শত টাকা আমার প্রয়োজন…না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিব।' মহেন্দ্র এসে তিরস্কার করায় বললে, 'আমি সন্ধান লইয়াছি, আজকাল সে খুব উপার্জন করিতেছে।'

মহেন্দ্রের আনুকূল্যে অবশেষে একটি ভাড়াবাড়িতে তার আশ্রয় হল। সেখানেও একাধিপত্য চলল নীচজাতীয়া মেয়েটির—গালাগালি-মারামারির বিরাম রইল না। আসবাবপত্রগুলো শীঘ্রই শেষ হল—তখন মহেন্দ্রের কাছে টাকা আদায়ের জন্য শুরু হল করুণাকে নির্যাতন। কমলার মৃত্যু আসন্ন হলে নরেন্দ্রকে তার কাছে আনা হল—তখন তার মুখমণ্ডল স্ফীত, দুই চোখ আরক্ত, বেশবাস বিশৃঙ্খল।

নরেশ দাশগুপ্ত ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলালতার পিতা। নরেশ দাশগুপ্ত সাইকোলজিতে বিলাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত। তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় বিশেষভাবে যশস্বী। সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লক্ষ ছিল না, দক্ষতাও সামান্য। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে স্থান নিয়েছিলেন, যেহেতু সেই-প্রদেশে জন্ম। মানুষকে বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়ার স্বভাব তাঁর বারবার অভিজ্ঞতাতেও শোধন হয় নি—বঞ্চনাকারীর অকরুণ কৃতঘ্নতাকেও মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে স্বীকার করে নিতেন। বিষয়বুদ্ধির ত্রুটিতে স্ত্রীর কাছেও গঞ্জনা ভোগ করতেন। ছোটো ভাই সুরেশকে শেষ-পর্যন্ত পড়িয়ে এবং বিলেতে পাঠিয়ে তিনি স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত আর মহাজনের কাছে

ঋণী হয়েছিলেন। এলা মার সম্বন্ধে অনুযোগ করলে বলতেন, 'স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে, কিন্তু আরাম নেই।' মায়ের সঙ্গে নিয়ত-সংঘর্ষে মেয়ের শরীর খারাপ হতে দেখে তাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠিয়ে তিনি অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় মগ্ন হন।

নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায় ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। কমলার স্বামী। পিতা রাজবল্লভ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে নলিনাক্ষও ধর্মপ্রচারের উৎসাহে বক্তৃতাশক্তিতে ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করে এবং সরকারি-ডাক্তারের কাজে বাংলার নানা-স্থানে চরিত্রের নির্মলতা, চিকিৎসার নৈপুণ্য ও সৎকর্মের উদ্‌যোগে খ্যাতিলাভ করে। অতঃপর স্বামীপরিত্যক্তা অপমানিতা মাকে সুখী করবার জন্য রঙপুরের ডাক্তারি ছেড়ে সে এল কাশীতে। মা বধূ আনতে চাইলে বললে, 'কাজ-কী মা, বেশ আছি।' দুই-একদিন চিন্তা করে বললে, 'তুমি যেমন চাও আমি তেমনি একটি বউ আনিয়া তোমার দাসী করিয়া দিব; তোমার সঙ্গে কোনো বিষয়ে অমিল হইবে, তোমাকে দুঃখ দিবে, এমন মেয়ে আমি কখনই ঘরে আনিব না।' মাঘ-মাসে নলিনাক্ষ রঙপুরের জিনিসপত্র বিক্রি করে নৌকাযোগে ফেরার পথে এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে অনাথা কমলাকে বিবাহ করে বসল। যেদিন বধূকে নিয়ে নৌকায় উঠল, সেইদিনই ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে সূর্যাস্তের একদণ্ড পরে নৌকাডুবি। দুর্যোগের অবসানে অনেক খোঁজ করেও সে কমলার সন্ধান পেল না।

পরের বছর নলিনাক্ষ কলকাতায় এলে ছাত্ররা তাকে বক্তৃতা দেবার জন্য ধরে পড়ল। নলিনাক্ষ বক্তৃতায় বলছিল, 'সংসারে যে-ব্যক্তি কিছু হারায় নাই সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই তখন যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে।' যুবাবয়সেও তার শৈশবের লাবণ্য এবং অন্তরাত্মার ধ্যানপরতার গাম্ভীর্য অন্নদাবাবু এবং তাঁর কন্যা হেমনলিনীকে আকৃষ্ট করল। হেমনলিনীর দাদা যোগেনের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের ঘনিষ্ঠতা হল। নলিনাক্ষ প্রাণায়াম করত, খাওয়া-দাওয়ার আচারবিচার করত—আচারপরায়ণা মার কাছে পাছে সংকুচিত হয়ে যেতে হয় তাই চা-ও খেত না। যোগেন সেই খাপছাড়া ব্যবহারের অভিযোগ করায় বললে, 'যোগেনবাবু···খাপের ভিতরে তলোয়ারের যে-অংশটা থাকিতে বাধ্য সেটাতে সকল তলোয়ারেই ঐক্য আছে—বাহিরের হাতলটাতে শিল্পীর ইচ্ছা ও নৈপুণ্য-অনুসারে কারিগরি নানা-রকমের হইয়া থাকে।' অনতিপরে মার অসুখের সংবাদে নলিনাক্ষকে কাশীতে ফিরতে হল। বিদায়কালে সে অন্নদাবাবুকে বললে, 'আপনাদের কাছ হইতে আমি অনেক উপকার পাইয়াছি। প্রতিবেশীকে যেমন যত্ন-সাহায্য করিতে হয়

তাহা-তো করিয়াইছেন ; তাছাড়া যে-সকল গভীর কথা লইয়া এতদিন আমি একলা মনে-মনে আলোচনা করিতেছিলাম, আপনাদের শ্রদ্ধার দ্বারা তাহাকে নূতন তেজ দিয়াছেন—আমার ভাবনা ও সাধনা আপনাদের জীবন অবলম্বন করিয়া আমার পক্ষে আরও দ্বিগুণ আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছে।'

নলিনাক্ষ ফেরার পরে সকন্যা অন্নদাবাবু এলেন কাশীতে। নলিনাক্ষ তার পীড়িতা মায়ের পথ্য প্রস্তুত করে দিত। একদিন সকালে সে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে এলে ক্ষেমংকরী হেমনলিনীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। এতদিন যাকে গুরুর মতো উপদেশ দিয়ে এসেছে তার সঙ্গে হঠাৎ বিবাহের প্রস্তাবে নলিনাক্ষ সংকুচিত হয়ে উঠল। কিন্তু মার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে তাঁকে আঘাত দেবার ভয়ে এতদিন যে-কথা বলে নি, সেই কমলার সঙ্গে দশ-মাস আগে বিবাহ এবং নৌকাডুবির কথা প্রকাশ করে বললে, 'আমি মনে-মনে ঠিক করিয়াছি, পুরা একটি-বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে তাহার মৃত্যু স্থির করিব।' এমন সময়ে গাজিপুরের চক্রবর্তীর সহায়তায় তাঁর অনাথা আত্মীয়া-পরিচয়ে ক্ষেমংকরীর কাছে কমলার আশ্রয় ঘটল। নলিনাক্ষ রোগী দেখে বাড়ি ফিরেই মাকে দেখতে যেত। মার শরীর খারাপ হওয়াতে সে রান্নার জন্য লোক নিযুক্ত করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়। সেদিন রান্নাঘরে নূতন লোক দেখে খুশি হল। আহারের পর আপনার মনে কী-একটা অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করতে-করতে সে প্রাত্যহিক নিয়মমতো অধ্যয়নে গেল।

মাতার বারংবার অনুরোধে নলিনাক্ষকে শেষে বিবাহে মত দিতে হল। কিন্তু শয়নগৃহের দেয়াল-আলমারিতে সেদিন নিজের খড়মজোড়ার উপরে কয়েকটি সদ্য-সিক্ত ফুল দেখে সে অন্নদাবাবুর বাসায় এসে বললে, 'আপনি জানেন না, পূর্বেই আমার বিবাহ হইয়াছে।···কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে···নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এমনকি তিনি বাঁচিয়া আছেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।' অনতিপরে হেমনলিনীকে লেখা রমেশের এক পত্রে কমলার বৃত্তান্ত জেনে সে ঘরে ফিরল। শীতের সূর্যাস্তকাল তখন তার শয়নকক্ষটিকে নব-বিবাহের রক্তিমচ্ছটায় রঞ্জিত করে তুলেছে—সেই আরক্ত সন্ধ্যায় তার শিয়রের কাছে কয়েকটি গোলাপের গন্ধে তার সংযমের শান্তি ও জ্ঞানের গভীরতার মধ্যে নানা সুরের রাগিণী বাজিয়ে তুলল। একটি সোনার রঙের গোলাপের কুঁড়ি নিয়ে সে মুখের উপরে চোখের পল্লবে বোলাতে লাগল। সহসা শয্যার আড়ালে কুণ্ঠিতা কমলাকে দেখে সে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, 'তুমি ওঠো, আমার কাছে তোমার কোনো লজ্জা নাই।'

পরদিন নলিনাক্ষ উপাসনাগৃহ থেকে বেরোবার সময় কমলা তার পরিচয় দিলে। ধীরে-ধীরে তার হাতটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে নলিনাক্ষ বললে, 'আমি জানি, তুমি আমার কমলা। এসো, আমার ঘরে এসো।' পরে গুটিকয়েক স্থলপদ্ম এনে বললে, 'কমলা, এই ফুল-কটি তুমি জল দিয়া তাজা করিয়া রাখো, আজ সন্ধ্যার পর আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করিতে যাইব।'

নয়ন রায় ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। গোবিন্দমাণিক্যের এক সভাসদ্। গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগের সময়ে মোগল-সৈন্যদের অশিষ্টতায় সে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিতে অনুরোধ করে।

নয়নচাঁদ ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের এক বৃদ্ধ অনুচর। রামচন্দ্রের দ্বিতীয়-বিবাহেব সংবাদটি প্রতাপাদিত্যের ভয়ে সে দিয়ে আসে যশোহরের অন্তঃপুরে।

নাজিম ॥ 'গোরা' উপন্যাস। চরঘোষপুর গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ প্রজা।

নাপিত ॥ 'গোরা' উপন্যাস। চরঘোষপুর গ্রামের জনৈক নাপিত। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে বিবাদে ঘোষপুরের মুসলমান প্রজারা হাজতে আটক হয়। ফরুর একমাত্র ছেলে তমিজকে নাপিতের স্ত্রী নিজের কাছে রেখে মানুষ করত। গোরা গ্রাম-পর্যটনে এসে এই অনাচারের জন্য ভৎর্সনা করায় নাপিত বললে, 'ঠাকুর, আমরা বলি হরি, ওরা বলে আল্লা, কোনো তফাত নেই।…অনেকদিন আছি, এদের উপর আমার মায়া পড়ে গেছে। আমি হিন্দু নাপিত, আমার জোতজমা বিশেষ-কিছু নেই বলে কুঠির লোক আমার গায়ে হাত দেয় না।'

গোরা কিছুদূর গিয়ে আবার ফিরে এল। নাপিত ব্যস্তভাবে তার আহারের জোগাড় করে দিলে। গোরা তাদের রক্ষা করবার অভিপ্রায় জানাতে জোড়হাত করে বললে, 'দোহাই আপনার, রক্ষা করবার যদি চেষ্টা করেন তা-হলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। ও-বেটারা ভাববে আমিই চক্রান্ত করে আপনাকে ডেকে এনে ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষী জোগাড় করে দিয়েছি। এতদিন কোনোপ্রকারে টিকে ছিলুম, আর টিকতে পারব না। আমাকে সুদ্ধ যদি এখান থেকে উঠতে হয় তা-হলে গ্রাম পয়মাল হয়ে যাবে।' গোরা ঘোষপুরের অত্যাচারের কথা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জানাতে গিয়েই তাঁর বিষদৃষ্টিতে পড়ল।

নায়েব ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। সানকিভাঙার চক্রবর্তীদের এক নায়েব। চক্রবর্তীদের কোনো কায়স্থ প্রজা অবাধ্য হয়ে মামলায় সর্বস্বান্ত হয়। দু-দিন অনাহারের পর সে তার শেষ-সম্বল একটি রুপোর গয়না বিক্রি করতে বেরোয়। জমিদারেব শাসনে কেউ কিনতে সাহস করে না। গয়নার দাম ত্রিশ-টাকা— নায়েব কিনতে চায় পাঁচ-টাকায়। অবশেষে গয়নার পুঁটুলি নিয়ে বলে, 'এই পাঁচ-টাকা তোমার খাজনা-বাকিতে জমা করে দিলুম।'

নিখিলেশ ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের অন্যতম বক্তা। ধনীঘরে নিখিলেশের সাবেককালের সম্মান, রাজ-উপাধি। বংশের মধ্যে সে-ই প্রথম রীতিমতো

শিক্ষিত ও নির্মলচরিত্র। অন্তরে তার সত্যের প্রতিষ্ঠা ছেলেবেলার মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুর আদর্শে। বিমলার সঙ্গে যখন বিবাহ হয়, তখন এম. এ. পড়ত। বিমলার দিকে তার আদরের বান বইত। পুরনো-কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে সে তার সঙ্গিনী ও শিক্ষক নিযুক্ত করলে মিস্ গিল্বিকে। বিমলা স্বামিপূজার ব্যগ্র হলে বলত, 'পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে থাকে।…স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।' মেয়েদের উপর নিখিলেশের মন ছিল করুণায় ভরা। বিধবা জায়েদের ঈর্ষায় বিমলা রাগ করলে বলত, 'সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোটো করে বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে।…একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন, আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মতো পরের মন জুগিয়ে চেয়ে-চিন্তে নিতে হচ্ছে, এ-অপমান যে বড়ো কঠিন।…ঈর্ষা-জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই-যে যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।… যে-মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠতে চায়— ওই তার সান্ত্বনা।' বিমলাকে নিখিলেশ বাইরে আনতে চাইত: 'আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। ওইখানে আমাদের দেনাপাওনা বাকি আছে।…এখানে…তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েছ তাও জান না।…সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।'

কলেজে পড়বার সময় থেকেই নিখিলেশ দেশের জিনিস দেশেই উৎপন্ন করতে উৎসাহী। দেশের খেজুরগাছের রস থেকে চিনি তৈরি, চাষের কাজে নানা আশ্চর্য পরীক্ষা, সঞ্চয়ের অভ্যাস জাগাতে ব্যাঙ্কের পত্তন, তাঁত আর ধান-ভানার যন্ত্র উদ্ভাবন, স্বদেশী স্টীমার চালানো—ইত্যাদি পরীক্ষায় তার অনেকগুলো কোম্পানির কাগজ ডুবেছিল। দেশের শক্তির উৎস-সন্ধানই তার ব্রত। স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে বিমলা বিলিতি পোশাক পুড়িয়ে ফেলতে চাইলে বলত, 'গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি-পয়সা বাজে-খরচ করতে নেই।…আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে দুর্বলতার গোঁজামিলন।…মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছে। আজ আমাদের খাওয়াপরা-চলাফেরা-ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত পৃথিবীর যোগে।…এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ—এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।'

এমন সময়ে সেখানে এল তার পূর্ব-সহাধ্যায়ী দেশনেতা সন্দীপ। তার

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি

বক্তৃতায় ঝড়ের বেগ ও মাংসবহুল আসক্তির টানে বিমলা সংসারের দিকে পিছন ফিরে বসল। নিখিল জীবনে অনেক দুঃখ কল্পনা করত; কিন্তু যে-দুঃখ কোনোদিন কল্পনা করে নি, তাই তার জীবনের পূর্ণচাঁদের উপরে ছায়াবিস্তার করতে এল। মন বললে, 'বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ-পর্যন্ত তার পরীক্ষা হয় নি। এবার বুঝি সময় এল।··· পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই। কিন্তু, জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল···আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেইজন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিস চাই নি···বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে-শক্তিতে-প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল। একটা কথা তখন ভাবি নি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তাহলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়।' স্ত্রী-পুরুষের মিলননীতি সম্পর্কে একটি বিলেতি বই বিমলাকে পড়তে দিতে সন্দীপের প্রস্তাব শুনে সে বললে, 'ও-বই যখন আমি পড়েছি তখন বিমলই-বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিসকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করছে; এমনিভাবে আলোচনা চলছে যেন মানুষ-পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়োজোর সমাজতত্ত্ব। কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে নিয়ে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্ছে···সে-কথা ভুলো না।···মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাস্টারের কাছ থেকে চিনতে চাও, তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।'

নিখিল বিমলাকে কিছু বলতে পারল না, সন্দীপকেও না—শুধু যুগ-যুগান্তের মহামেলায় লক্ষ-কোটি মানুষের ভিড়ে বিমলাকে দাঁড় করিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে। স্ত্রী! এই কথাটিতে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের ফুল। বিমল যদি সে-কথা অস্বীকার করে তবে সামাজিক অধিকারে কী প্রয়োজন। অনেক রাত্রে বিমলা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন না-হলে সে শুতে যেতে পারত না। যেদিন তার জানালার সামনে একটি বড়ো তারা শ্রাবণের মেঘ ছিঁড়ে জ্বলজ্বল করে উঠল, মুহূর্তে উঠল তার বুক ভরে। মনে হল, 'এই বিশ্ববস্তুর পর্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে-ক্ষণে তার ছবি দেখলুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধুলোয় অস্পষ্ট আয়না।···আমার আয়নাতেই-বা কী, আর ছবিতেই-বা কী! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের টিপ এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখছে।' বিছানায় বিমলার কাছে গিয়ে তাকে না-জাগিয়ে নিখিল তার ললাটে রেখে এল

একটি চুম্বন; সে-চুম্বন তার পূজার নৈবেদ্য—কেননা, জন্মের পর জন্মে সেই চুম্বনের মালা গাঁথা হয়ে পরানো হবে সেই প্রেয়সীর গলায়। এমন সময়ে তার মেজো-ভাজ এসে তাকে ঘুমোতে যেতে অনুরোধ করলেন। নিখিল কোনো কথা না বলে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ঘরে গেল।

এদিকে সকলের চোখে পড়ল নিখিলেশের এলাকা থেকে নুন-চিনি বিলিতি-কাপড় নির্বাসিত হয় নি। অথচ কিছুকাল আগে স্বদেশী জিনিসের আমদানি করে সে-ই তাদের উপহাসের পাত্র ছিল। সে দেশী ছুরিতে দেশী পেনসিল কাটত, পিতলের ঘটিতে জল খেত, দেশী বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করত—এই আসবাবের দৈন্য আর ফিকে স্বদেশীতে সবাই ছিল লজ্জিত। গ্রামের ছেলেরা সন্দীপকে দলপতি করে মেতে উঠল। তাদের অনেকেই নিখিলের অবৈতনিক স্কুলের এনট্রেন্স পাস, তারই বৃত্তিভোগী। নিখিল দেশী মিলের দেশী সুতো আনিয়ে নিজের তাঁতের স্কুলে জোলাদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে হাটে পাঠাত। দেশের যারা ব্রত নেয় নি তাদের উপর জবরদস্তিতে সে সম্মতি দিতে পারল না। বিশেষ করে কুণ্ডু-জমিদারের প্রজা পঞ্চুকে রক্ষা করতে গিয়ে সেই সংঘর্ষ উঠল চরমে। এদিকে কাগজে-কাগজে ছড়া ও ছবির অজস্র ধারাবর্ষণে রসিকতার উৎস খুলে গেল—নিখিলের এলাকায় আপামর সাধারণ নাকি স্বদেশীর জন্য উৎসুক, কেবল তারই জমিদারি-চালের উৎপীড়নে কাতর। লাল কালিতে লেখা একটা বেনামি শাসানি-চিঠি পেয়ে নিখিল কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে বললে, 'আমাদের দেশ দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্যন্ত ভয় করে-করে আধমরা হয়ে রয়েছে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও···তা-হলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে একচুল মাথা নিচু করবে না।···ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়।···মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে, এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয়, তা-হলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।···আমি, স্বদেশীর চেয়ে বড়ো জিনিস চালাতে চাই···আমি মরা-খুঁটি চাই-নে তো, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরি হবে।··· দাসত্বের যে-বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনই সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে।···ভয়ের শাসনে তোমরা নির্বিচারে কেবলই সকল-তাতেই সকলকে মেনে এসেছ, সেইটেকেই ধর্ম বলতে শিখেছ···আমার লড়াই দুর্বলতার ওই নিদারুণতার সঙ্গে।'

ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টলমল করে। নিখিল কেন গান গাইতে পারে না—'ভরা বাদর মাহ ভাদর / শূন্য মন্দির মোর।' প্রতি-বছর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষে তারা বোট করে বেড়াতে যেত শ্যামদহর বিলে; এবারে বিমলার

তা মনে পড়ল না। ছুটি, ছুটি, ছুটি! স্ত্রী-পুরুষের ভালোবাসাকে এতকাল বড়ো বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। শূন্য? কেন শূন্য এত বড়ো মন্দির! সেদিন দিনের বেলায় শোবার ঘর থেকে একটা বই আনতে গিয়ে বিমলার অজস্র টুকিটাকি তার মনকে আবিষ্ট করে ধরল। মূল শিকড়টা কাটা পড়লেই প্রাণ যে ছুটি পায় তা নয়—লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তার ছিন্ন-পত্রের পাপড়িগুলো চারিদিকে ছড়ানো। কিন্তু বাইরে গিয়ে আবার পঞ্চুকে দেখে, তার দুঃখের কাহিনী শুনে মনে হল, জীবনটা অনেকদূর বিস্তৃত—'শূন্য মন্দির' নয়, চন্দ্রনাথবাবুর বাতায়ন থেকে দেখলে—'কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া।' একদিন বিমলার দিক থেকেও এল বিলিতি কাপড় উঠিয়ে দেবার অনুরোধ। দেশের জন্য দেশের উপরে অত্যাচার করতে অক্ষমতা জানিয়ে নিখিল চলে এল বাইরে—এই-প্রথম বিমলাকে এবং তার সাজকে সে দেখল পৃথক করে। মোহ ঘুচুক, আবরণ কেটে যাক—যে-দুঃখ বিশ্বের তাই হোক তার গলার হার!

দেশের একটি দেবীপ্রতিমা খাড়া করতে সন্দীপের উদ্‌যোগ। নিখিলেশ বললে, 'দেশ-জিনিসকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জানতে চাই…এতবড়ো জিনিসের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার জাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই, লজ্জাও বোধ করি।…দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারি নে।… বড়ো-বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন যখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না।…ওদের পলিটিক্‌সের ঝুলি-ভরা মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা…এর ভার কি কম? আর, এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না? দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না, আমি বলছি তারা দেশকেও মানছে না।' এমনকি, বন্দেমাতরম্‌-মন্ত্রকেও নিখিল চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করতে পারত না। বলত, 'যে-কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্য মোহকে দলে টানা চলবে না।…মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যেই অপদেবতা।… সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েছ ব'লেই তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত-শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকি তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েছ।…তুমি যে-ফল দেশের হাতে তুলে দেবে তারও পরের ফল আছে…আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই-ফলটাই সকলের।… মুসলমান-শাসনে বর্গি বলো, শিখ বলো, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল চেয়েছিল। বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফল কামনা করেছিল; কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব সেইদিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়ো, যিনি সত্য-দেবতা, তিনি সত্য-ফল দেবেন।'

সন্দীপকে বিদায় করতে নিখিলেশ বাইরের দিকে জোর দিতে পারল না। দাম্পত্য তার জীবনের বিকাশ, নিতান্ত ভিতরের জিনিস—বাইরের দিকে চাপ দিতে গেলে সেই দেবতার অপমান করা হয়। কিন্তু সন্দীপের অত্যাচারে মুসলমানের দল রুখে দাঁড়াল; মৌলবি প্রচারকের আনাগোনা এবং গোহত্যা শুরু হল। নিখিল জানত এতে যে কৃত্রিম জিদ আছে বাধা দিতে গেলে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। কয়েকজন হিন্দু প্রজাকে ডাকিয়ে সে বোঝাবার চেষ্টা করলে। ব্যর্থ হয়ে শেষে মনস্থ করলে, সন্দীপকে নিয়ে কলকাতা যাবে। এদিকে ভিতরে-ভিতরে অলক্ষ্যে বিমলার পরিবর্তন চলছিল। অর্ধরাত্রে নিখিলেশের কানে এল যেন বাদল-রাতের দমকা-হাওয়ার দীর্ঘশ্বাস—সমস্ত বিশ্বচরাচরের মাঝখানটিতে যেন তার ঘরখানির নিদ্রাহীন কান্না। বিছানা থেকে উঠে বাইরে গিয়ে দেখলে: বিমলা বারান্দায় মাটির উপরে উপুড় হয়ে আছে। নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার মনে হল: এই-বেদনার সে বিচার করবার কে! সেই অসীম বিশ্ব আর বিশ্বেশ্বরের রহস্যকে সে জোড়হাত করে প্রণাম করলে। নিঃশব্দে ফিরতে গেল, পারল না—ধীরে-ধীরে বিমলার শিয়রের কাছে এসে হাত রাখলে তার মাথায়।

পরদিন চলছিল কলকাতা-যাত্রার আয়োজন। নিখিলেশ বাইরে গিয়ে দেখলে: তার কাছারি-লুটের দায়ে অভিযুক্ত সন্দীপের এক বালক-ভক্তকে এনেছে দারোগা। তাকে মুক্তি দিয়ে ঘরে এসে ভাজেদের পুজোর প্রণামীর টাকাগুলো ব্যাংকে পাঠাতে খোঁজ পড়ল চাবির। বিমলা বললে, তা খরচ করে ফেলেছে। ডাকাতের সঙ্গে সিন্দুকের টাকা-চুরির কোনো-একটা যোগ আছে বুঝেও নিখিল কোনো প্রশ্ন করলে না। তার মন বললে: বিমলাকে নিজের ছাঁচে ঢালাই করার ইচ্ছার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোথাও একটা জুলুম ছিল; এই-জুলুমের জন্যই ভিতরে-ভিতরে কখন তারা তফাত হয়ে গেছে—জীবনটা প্রথম থেকে শুরু করবার সুযোগ পেলে আর-একবার সহজের রাস্তায় সে ভালোবাসার আহ্বান জানায়। বিমলা ফিরে যাচ্ছিল; নিখিল হাত ধরে তাকে ঘরে নিয়ে এল। এদিকে মুসলমানের দল ক্ষেপে ওঠায় সন্দীপ পলাতক। মেয়েদের উপরে তাদের অত্যাচারের সংবাদে নিখিল আর স্থির থাকতে পারল না—নিষেধ না-শুনে একাই সে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত-দশটায় মারাত্মক আঘাতে অচেতন নিখিলেশকে পালকিতে করে বাড়ি আনা হল। দেওয়ানজির উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বললেন, 'কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।'

নিধিরাম ভট্ট ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের এক প্রতিবেশী। নিধিরাম ভট্ট নিজের মূর্খতা নিয়ে গর্ব করতেন। প্রায়ই নিজের বিবাহের গল্প করতেন: বর্ণপরিচয় পর্যন্ত শিখেই তিনি দাঁড়ি দিয়েছিলেন লেখাপড়ায়। কন্যাপক্ষ দেখতে

এলে দাদার সঙ্গে যুক্তি করে তাদের সামনে উঠলেন একটা পালকিতে। পরনে শামলা-চাপকান, হাতে কাগজের তাড়া। কন্যাকর্তারা বুঝলেন: তিনি লেখাপড়া-কাজকর্ম করেন। নিধি যে-কথাটা গোপন করতেন তা এই-যে, পাড়ার একটি ছাত্র তাঁকে বলে দিয়েছিল, কন্যাপক্ষের কেউ তাঁকে কোন্-কলেজে পড়েন জিজ্ঞাসা করলে যেন বলেন, বিষপ্স কলেজে। দৈবক্রমে বিবাহসভায় এই প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেছিলেন, 'বিষাক্ত কলেজে।'

নরেন্দ্রের পণ্ডিতমশায় দ্বিতীয় বিবাহের উদ্‌যোগ করে তাঁকে সাহায্যের জন্য ডাকলেন। নিধি এসেই একবার এঘর একবার ওঘর, এটা উলটে ওটা পালটে তোলপাড় করে তুললেন—এ-পাড়া ও-পাড়ায় জেগে উঠল তাঁর চটিজুতোর ব্যস্ততা। কিন্তু পণ্ডিতের গৃহবাসী বোলতাদের পীড়নে তাঁকে টিকি উড়িয়ে রণে ভঙ্গ দিতে হল। বিবাহবাড়ি যাবার সময়ে আবার এক বিপত্তি: নদীপথে নৌকায় তিনি তটস্থ—বাতাস উঠলেই মাস্তুলটা নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন এমনই অবস্থা।

নরেন্দ্রের অবর্তমানে তার স্ত্রী করুণাকে পরামর্শ দিতে এসে নিধি তার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করলেন। একদিন স্বরূপের কয়েকটি কবিতা কুড়িয়ে পেয়ে তাকে তার মন বোঝবার জন্য বললেন, 'করুণা ত ভাই তোমার জন্য একেবারে পাগল।' পরে নরেন্দ্রকে স্বরূপের উল্লেখ করে বললেন, 'সে-বাবুটি কি করে বলিতে পারো?…কিছুই হয় নাই, তবে কি-না—সে-কথা থাক্… কিন্তু সাবধানে থাকিয়ো, ও লোকটি যেন আর বাড়ির ভিতরের দিকে না-যায়।' এইভাবে তার সংসারে ডেকে আনলেন বিপত্তি।

গদাধরের সঙ্গে গৃহত্যাগিনী পণ্ডিতের দ্বিতীয়া স্ত্রীর সন্ধানে নিধি এলেন কলকাতায়। গদাধর পণ্ডিতকে চোর বলে অভিহিত করায় চাপকান-পরিহিত নিধি বলে উঠলেন, 'কোন্ হ্যায় রে।' বলেই পকেট থেকে কাগজ-পেনসিল বার করে জানতে চাইলেন পাহারাওয়ালার নম্বর; একটা ছ্যাকরা-গাড়ির গাড়োয়ানকে ডেকে বললেন, 'লালদীঘির এণ্ড্রুসাহেবের বাড়ি জান?' গতিক দেখে সবাই সরে পড়ল।

নিবারণ ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। নিবারণ ফার্স্ট-ক্লাস এম. এসসি.। সন্ত্রাসবাদী দলের এক সভ্য।

নিবারণ ঘোষাল ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। দেশকর্মী অমূল্যচরণের পিতা।

নির্মলা (ফেনি) ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার সভাপতি চন্দ্রমাধববাবুর ভাগ্নী। নির্মলার ডাকনাম ফেনি। আশৈশব সে চন্দ্রমাধবের কাছে মানুষ, তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত ও শুভচেষ্টার অনুবর্তিনী—ক্ষীণদৃষ্টি

অন্যমনস্ক অধ্যাপকের নিঃসঙ্গতার একমাত্র সঙ্গী। বাইরের ঘরে কুমারসভার অধিবেশন বসলে ঈষৎ-মুক্ত দরজার অন্তরালে নিয়ত উৎকর্ণ।

চিরকুমার-সভা যেদিন স্থানান্তরের কথা উঠল, নির্মলার রুদ্ধ অভিমান সহসা অশ্রুজলে বিগলিত হবার উপক্রম : 'এতদিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন ? আমি কী করেছি ?' উৎসাহ-দীপ্তিতে আরক্তিম হয়ে সে বললে, 'মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না ?···যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন—তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না ? তা যদি হয় তাহলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।' প্রস্তাব-আকারে কথাটা সভায় উঠলে সভ্যদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত। অকুণ্ঠিত নির্মলা সহসা ঘরের মধ্যে এসে বর্ষার রৌদ্ররশ্মির মতো অশ্রুকটাক্ষ নিক্ষেপ করলে : 'আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শুভচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন ?···আমি স্ত্রীজাতি-পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে—আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি···এর বেশি আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই।'

কুমারসভার সভ্য অবলাকান্ত সুকুমার তরুণবেশের অন্তরালে বালবিধবা শৈলবালা। তার মুখে চন্দ্রবাবুর প্রশংসায় সভায় নবাগতা নির্মলা খুশি হয়ে তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। চন্দ্রবাবুর নির্দেশে নির্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ রচনার ভার নিয়েছিল। কিন্তু কদিন ধরে গরম পড়ে গিয়ে হঠাৎ দক্ষিণা বাতাস বইতে আরম্ভ করায় কিছুতেই কাজে মন দিতে পারে নি—কাজেই অবলাকান্তকেই ভার দিয়েছিল একটা অধ্যায় লিখে দিতে। অবলাকান্তের কাছ থেকে চিঠি পাবার অপেক্ষায়, হয়তো-বা লেখা পাবারই আশার সে ছিল উদ্‌গ্রীব। চন্দ্রবাবু অবলাকান্তের প্রশংসা করাতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল : 'খুব ভালো—চমৎকার···আর এমন সুন্দর নম্র স্বভাব!' নির্মলার এ-হেন অবস্থায় পেঁছিল এক চিঠি : চিঠিটা অবলাকান্তের নয়, পূর্ণর। চিঠির প্রথম অংশে ছিল কুমারসভার সভ্যদের কৌমার্যব্রত-গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব। নির্মলা বললে, 'আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না, কী বল, মামা ? অন্য-কেউ কি আপত্তি করবেন ? অবলাকান্তবাবু—'। পত্রের শেষাংশে ছিল নির্মলাকে তার বিবাহের প্রস্তাব। নির্মলা রক্তিম মুখে বলে উঠল, 'এ হতেই পারে না।' চন্দ্রবাবু বিস্মিত : কেন কুমারব্রত উঠিয়ে দিতে তার তো আপত্তি নেই। নির্মলার উত্তর : 'তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই···মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে

কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না—আমার কাজ আছে।'

সভায় কুমারব্রতের নিয়ম উঠিয়ে দেওয়া হলে শৈলবালা ছদ্মবেশ ত্যাগ করলে। নির্মলার তীব্র প্রতিবাদ : 'অন্যায় ! ভারি অন্যায় ! অবলাকান্তবাবু—'

নিস্তারিণী (মোতির মা) ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের মেজো-ভাই নবীনের স্ত্রী। সাত-বছরের ছেলে মতিলালের নামানুসারে তার ডাকনাম মোতির মা। 'মোটাসোটা কালোকোলো মেয়ে, মস্ত ডাগর চোখ, স্নেহরসে ভরা মুখের ভাব'। স্বামীর সঙ্গে নিস্তারিণী মধুসূদনের আশ্রিত ; তার মির্জাপুরের প্রাসাদের কর্ত্রী।

মধুসূদনের সঙ্গে বিবাহের পরে সেলুন-গাড়িতে কুমুদিনীর মন ছিল বেদনায় ভরা। মেয়েদের দলে ছিল কুমুর প্রায়-সমবয়সী নিস্তারিণী। সে এসে চুপিচুপি বললে, 'মন কেমন করছে ভাই ? এদের কথায় কান দিয়ো না, দু-দিন এই রকম টেপাটেপি-বলাবলি করবে, তারপরে কণ্ঠ থেকে বিষ নেমে গেলেই থেমে যাবে।…যেদিন নুরনগরে এলুম, ইস্টিশনে তোমার দাদাকে দেখলুম যে।…আহা কী সুপুরুষ ! এমন কখনো চক্ষে দেখি নি। ওই-যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে—গোরার রূপে লাগল রসের বান…অমন দেবতার মতো রূপ, এখনো ঘর খালি ! কোন্ ভাগ্যবতীর কপালে আছে ওই বর !' নিস্তারিণীর বুঝতে বাকি ছিল না, কোন্‌খানে কুমুর দরদ—তাই সে নানাভাবে বিপ্রদাসের কথাই আলোচনা করলে। রাত্রে অন্য মেয়েদের কৌতূহল থেকে রক্ষা করতে সে কুমুকে আনলে নিজের ঘরে। বললে, 'তুমি একটু কেঁদে নাও ভাই,—চোখের জল যে বুক ভরে জমে উঠেছে।' অর্ধরাত্রে সে কুমুকে দেখলে গড় হয়ে মেঝেতে প্রণাম করতে। নিস্তারিণীর যখন বিবাহ হয় তখন সে কাঁচ খুকি, বিনা-বিচারে ধরা দিয়েছিল সংসারের কবলে—কুমুর-বয়সী মেয়ের পক্ষে মধুসূদন পরপুরুষ। নিস্তারিণীর গা কেমন করতে লাগল—বোধ হল যেন : কোনো-এক অজানা জন্তুর লালায়িত গুহার সম্মুখে কুমু তার দেবতাকে স্মরণ করছে।

অপমানিতা কুমুর সঙ্গ নিস্তারিণী ত্যাগ করলে না। বড়োবউকে নষ্ট করার অপরাধে তাকে বিদায় করার উদ্‌যোগ হল। নিস্তারিণী স্বামীকে বললে, 'ভয় পাও বলেই ভয় দেখান !…তোমার দাদা রেগেও হিসেবে ভুল করেন না। জানেন, আমাকে ঘরকন্না থেকে বরখাস্ত করলে সেটা একটুও সস্তা হবে না।…তোমার দাদাকে ব'লো যতোবড়ো রাজাই হন-না, মাইনে করে লোক রেখে রানীর মান ভাঙাতে পারবেন না…বাসরঘরের ব্যাপারে মুটে ডাকতে বারণ ক'রো।' দাদার জন্য কুমুর মন খারাপ দেখে সে স্বামীর সাহায্যে তাঁর সংবাদ আনাবার ব্যবস্থা করলে। স্বামীর উপর তার প্রভাব ছিল সুগভীর। অবশেষে স্বামীর সঙ্গে নিস্তারিণীর এক চক্রান্তে মধুসূদনের

বিষয়বুদ্ধির সঙ্গে ভালোবাসার সন্ধি ঘটল—তখন নিস্তারিণী পুলকিত হয়ে কুমুর সঙ্গে 'মনের কথা' পাতালে।

যতদিন মধুসূদনের দিক থেকে বাধা ছিল স্থূল, নিস্তারিণীর মন ছিল কুমুর পক্ষে—কিন্তু যে-বাধা সূক্ষ্ম, একান্ত মর্মগত, তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা তার পক্ষে কঠিন। স্বামী যে-মুহূর্তে প্রসন্ন হবে সেই-মুহূর্তেই স্ত্রী সৌভাগ্য মনে করবে, এই ছিল নিস্তারিণীর ধারণা। কুমু অতঃপর দাদার কাছে গেলে শ্যামাসুন্দরীর প্রতি মধুসূদনের আসক্তি প্রকট হল। নিস্তারিণী কুমুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বললে, 'বাড়িকে ভূতে পেয়েছে বউরানী। ওখানে টিকে থাকা দায়, তুমি কি যাবে না?' কুমু অসম্মত হওয়াতে বললে, 'বল কী বউরানী, সংসার যে তোমারই, সে-তো তোমার হাতছাড়া হলে চলবে না।' বিদায়কালে বিপ্রদাসের পায়ের ধুলো নিয়ে সে বললে, 'আপন সংসারে না-থাকলে মেয়েরা যে বাঁচে না, পুরুষেরা ভেসে বেড়াতে পারে, মেয়েদের কোথাও স্থিতি চাই তো।...মন্ত্র পড়ে স্ত্রী যে কেনা হয়েই গেছে।...এ বাঁধন যে মরণের বাড়া।'

দু-দিন পরে নিস্তারিণী আবার দেখা করতে এল—নানারকম লক্ষণ মিলিয়ে সন্দেহ করলে, কুমু সন্তানসম্ভাবিতা। মনে-মনে খুশি হয়ে বললে : মা কালী যেন তাই করেন—মানিনীর শ্বশুরবাড়িকে অবজ্ঞা, কিন্তু এই নাড়িতে-নাড়িতে গ্রন্থি ছেদনের পথ কোথায়? বাড়ি ফিরতে কুমুর তখনো আপত্তি দেখে সে বিরক্ত হল : 'কেন পারবে-না ভাই? তুমি যতবড়ো ঘরেরই মেয়ে হও-না কেন, তোমার বেলাতেই তো সংসারের নিয়ম উলটে যাবে না। তুমি ঘোষালদের ঘরের বউ তো, ঘোষাল-বংশের ইষ্টদেবতা কি তোমাকে সহজে ছুটি দেবেন? পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।' অবশেষে নিস্তারিণীর ইচ্ছাই সত্যে পরিণত হল।

নীরজা ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। আদিত্যের স্ত্রী। নীরজা আর তার স্বামীর ভালোবাসা একটি-ধারায় মিলেছিল ফুলের ব্যবসায়ে বাগানের নানা-কাজে—প্রবাসী বন্ধুর চিঠির মতো ঋতুতে-ঋতুতে বিভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনায়। বাগানের পশ্চিমদিকে ছিল একটি মহানিমগাছের গুঁড়ি-সমতল-করা ছোটো টেবিল। ভোরবেলা সেখানে চা খেয়ে দুজনে বেরোত কাজে—নীরজার মাথায় ফুল-কাটা রেশমের ছাতি, আদিত্যের মাথায় সোলার টুপি। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিক্রম—ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে; বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন,—পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েতবেল।

নীরজার ভালোবাসায় ছিল প্রচণ্ড জেদ; সে-ভালোবাসায় বিধাতার হস্তক্ষেপও সে সহ্য করতে পারত না। তার প্রিয় কুকুর 'ডলি' যেদিন মারা গেল তার কোলে, সেদিন সে অনুভব করলে অলক্ষণের প্রথম স্পর্শ। নীরজার সন্তান

হওয়ার আশা ছিল না—শেষে ঘটল সম্ভাবনা। প্রসবের সংকটে অস্ত্রাঘাতে শিশুটি গেল মারা—নীরজা উত্থানশক্তিরহিত হয়ে বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীটির মতো স্বল্পরক্ত-ক্লান্তদেহে বিছানায় আশ্রয় নিলে। বাগানের সহকারিণী হল আদিত্যের দূরসম্পর্কের বোন সরলা। নীরজার মনের মধ্যে যে-রস ছিল মিষ্ট, তা হল কটু—দুর্বল শরীরের মতো নীরস স্বভাবটাও যেন তার অপরিচিত। ক্ষণে-ক্ষণে আয়াকে জিজ্ঞাসা করত, 'আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।...সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন।... আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ওই-সময়েই।' বাগানের পুরনো মালী হলধর তারই প্রশ্রয়ে কাউকে গ্রাহ্য করত না। নীরজা বলত, 'হোক-না, হোক-না, বেশ তো। চলুক-না এমনই কিছুদিন...একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়।... মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন।...আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস-নে কথা, চুপ করে থাক্।...ওর বুকে জ্বলছে আগুন।'

সকালে তাকে নিদ্রিত দেখে আদিত্য তার জন্য প্রাত্যহিক নিয়মমতো রেখে গিয়েছিল একটি ফুল। সরলা সেটি এনে দিতে নীরজা অবজ্ঞার সঙ্গে দিলে ঠেলে: 'জান, মার্কেটে এ-ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী।...জান এ-ফুলের নাম?...ভারি তো জান তুমি। ওর নাম গ্রাণ্ডিফ্লোরা।...কী করছিলে সমস্ত সকাল।...আনাড়ির মতো সমস্ত নষ্ট করবে তুমি।' অতঃপর হলা মালীর সাহায্যে নিজেই সে বাগানের কাজ করবার মনস্থ করলে। হলা এসে তার প্রশংসা করে নিজের ভাগনীর জন্য একটি বাজুবন্ধ আদায় করলে। নীরজা বালিশে মাথা গুঁজে বললে, 'রোশনি, রোশনি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ওই হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।...আমার পোড়াকপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন। আমি কি জানি-নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে।' স্বামীর সম্বন্ধে এক গূঢ় আশঙ্কায় পীড়িত হয়ে নীরজা তার খুড়তুত-দেওর রমেনকে বললে, 'দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।' হঠাৎ তীব্র আগ্রহে সে ধরল তার হাত চেপে: 'মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।'

নীরজা আবার রোশনিকে ডাকলে: 'তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত রংমহলের রঙ্গিণী। দশ-বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে সেই রং তো এখনও ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রংমহল?...আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি।...ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে।' আদিত্য এসে তার পায়ের কাছটি ফুলে ঢেকে দিতে নীরজা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল: 'সত্যি বলো,

আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি?' নীরজা দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি—রোশনির এই অনুযোগে আদিত্য সরলাকে ডাক দিলে। নীরজার শিরায়-শিরায় ঝনঝন করে উঠল: 'আহা, সমস্ত-দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার, তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন। ··আয়াকে ডাকো-না।···আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম?···আমাদের বিয়ের পরেই ওই অরাকিড-ঘরের প্রথম পত্তন···ওটাকে নষ্ট করে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না।···সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।' আদিত্য বোঝালে, সরলা তার জ্যাঠামশাইয়ের হাতে তৈরি। নীরজা বললে, 'সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।···সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?··· অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিসট্রেস করে দাও।' হঠাৎ সে ভেঙে পড়ল কান্নায়: 'তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত-কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ওই আশ্চর্য সরলার সামনে।··· আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে।···বিয়ের পর···থেকে ওই বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত···আজ দেখলুম ওই বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন।···আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে।···এমনটা কেন হতে পারল, বলব?···তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে-কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।'

ক্রমাগত এই সন্দেহেই আদিত্যের মন ফেরে সরলার দিকে। তার এক চিঠিতে সরলাকে অন্যত্র কাজে লাগানোর সংকল্প জেনে নীরজার বুকের মধ্যে ঝড় বইতে লাগল। রমেনকে ডেকে সে বালিশে মাথা ঠুকে বলতে লাগল: 'অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ করে।' রমেনের ত্যাগের উপদেশ শুনে বললে, 'বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়।···আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।···যখন চোখের জলে ভিতরে-ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো।···আমাকে গুরুর সন্ধান দাও।···দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার—আর দেরি নয়, এখনই। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।···অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না, এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।' একবার ঠাকুরঘরে গেল শক্তি-সংগ্রহের জন্য। ঘরে ফিরে আদিত্যকে দেখে আবার লুটিয়ে পড়ল তার পায়ের উপরে: 'মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ ক'রো না আমাকে'। সরলাকে সে পরিয়ে দিলে একটি মুক্তোর মালা: 'একদিন

ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো।…বিশেষ-বিশেষ দিনে এ-মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ও'র মনে পড়বে।' শেষে এই-দানের মধ্যেও তার মনের জ্বালা প্রকাশ হয়ে পড়ল। কাতর হয়ে বললে, 'এ-কী হল ঠাকুরপো।…কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন।'

সরলা অতঃপর স্বেচ্ছায় গেল জেলে। নীরজা তাকে একটি চিঠি পাঠিয়ে হলা মালীকে দিয়েই বাগানের কাজ চালাতে চেষ্টা করলে। একদিন সে আদিত্যের হাত চেপে বললে, 'ওই-যে দারোয়ানটা ওইখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই-যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে, ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।' কথাপ্রসঙ্গে একসময়ে সে উঠে বসল বিছানায়: 'আমাকে দয়া করো, দয়া করো।…এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনই করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে-ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনই করেই মনে-মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা-হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না।…হাওয়ায়-হাওয়ায় কোন শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?'

হঠাৎ সরলার মুক্তির সংবাদে নীরজা মূর্ছিত হল। জ্ঞান ফিরতে চাইলে তাকে আশীর্বাদ করতে—চোখ বুজে হাতের মুঠো শক্ত করে বললে, 'ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।' রাত তখন নটা। জ্ঞানে-অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল নীরজা কী-যেন জপ করছিল। সরলা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই তার সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল—ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' হঠাৎ এক অস্বাভাবিক জোর এল তার দেহে—চোখের তারা জ্বলতে লাগল: সরলার হাত চেপে তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে উঠল, 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।' সহসা দাঁড়িয়ে উঠল তার ঢিলে শেমিজপরা শীর্ণ মূর্তিটা: 'পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে-দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত'—বলতে-বলতে সে পড়ে গেল মেঝের উপরে। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তার প্রাণের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল।

নীরদ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক সন্ত্রাসপন্থী। নীরদ লোক ভালো, সাদাসিধে। অতীনের জন্মদিনের উৎসবে হঠাৎ তার 'পলাশীর যুদ্ধ' আবৃত্তির শখ হল—দাঁড়িয়ে উঠে শুরু করলে গিরীশ ঘোষের ভঙ্গিতে: 'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ, / বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি—'। নির্দয় স্মরণশক্তিতে সে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে ছাড়লে।

নীরদ মুখুজ্যে ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শর্মিলার ভাই হেমন্তের পূর্বসহাধ্যায়ী। নূতন-পাসকরা ডাক্তার। যৌবনের উত্তাপ যদি-বা নীরদের মধ্যে ছিল, আলোটা ছিল না। নিরতিশয় গম্ভীরভাবে কথা বলবার একটা ধরণ ছিল তার—সে আলোচনা করতে পারত, আলাপ করতে পারত না। বয়স অল্প, অথচ আমোদ-প্রমোদ কোনো-কিছুতেই মন টলত না। নিজের পসারের ক্ষতি করেও সে হালের যতকিছু আবিষ্কারের পরীক্ষা করত।

হেমন্তের হঠাৎ মৃত্যু হল ভুল চিকিৎসায়। নীরদ ছিল শুশ্রূষার সহায়তায়। রোগের অন্য-কারণ নির্দেশ করে সে হাওয়া-বদলের পরামর্শ দিয়েছিল। হেমন্তের বাপ তাঁর ছোটো মেয়ে ঊর্মির সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাকে জনহিতকর কাজে লাগাতে চাইলেন। নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হল না—যদিও ভাবে প্রকাশ পেল, উদ্বাহবন্ধন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে প্রায় আত্মঘাতের কাছাকাছি। এই-দুর্যোগ কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য শর্ত হল: পড়াশুনা এবং সকল বিষয়ে ঊর্মিকে পরিচালনা করে সে ভাবীপত্নীরূপে নিজের হাতে গড়ে তুলবে—তাও বৈজ্ঞানিকভাবে দৃঢ়নিয়ন্ত্রিত নিয়মে। ঊর্মিকে বললে, 'তোমার মধ্যে শক্তি নানাবিধ আছে। তাদের বেঁধে তুলতে হবে তোমার জীবনের একটিমাত্র লক্ষ্যের চারিদিকে।…বিক্ষিপ্তকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে একটা অভিপ্রায়ের টানে, আঁট হয়ে উঠবে, ডাইনামিক হবে, তবেই সেই একত্বকে বলা যেতে পারবে মরাল অর্গানিজ্‌ম্‌।' তার আরও শর্ত হল: 'তোমার টাকা থেকে এক-পয়সা নেব না, নিজের উপার্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে।'

রাজারামের মৃত্যুর পরে নীরদ ঊর্মির পাঠ্য-পর্যায়ের এক বাঁধা নিয়ম করে বললে, 'দেখো ঊর্মি, মনটাকে পথে চলতে-চলতে কেবলই চল্‌কিয়ে ফেলো না, পথের শেষে যখন পৌঁছবে তখন ঘড়াটাতে বাকি থাকবে কী।…তুমি প্রজাপতির মতো চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াও, কিছুই সংগ্রহ করে আনো না। হতে হবে মউমাছির মতো। প্রত্যেক মুহূর্তের হিসেব আছে। জীবনটা তো বিলাসিতা নয়।' নীরদের এই-কথাগুলো ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরির শিক্ষাতত্ত্বের বই থেকে সংগ্রহ করা। সবচেয়ে তার খারাপ লাগত, ঊর্মি যখন নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ-উপলক্ষে তার দিদির কাছে যেত। তাকে বলত, 'তোমার দাদার মৃত্যুকে সমস্ত জীবন দিয়ে সার্থক করবার ভার নিয়েছ তুমি। এরই মধ্যে কি তা ভুলতে আরম্ভ করেছ।…শশাঙ্কবাবুদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা তোমার চরিত্রগঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর।' এক-একদিন যেন একটা আবেশ আসত তার চোখে—মনে হত, অন্তরের গভীরতম রহস্য বুঝি প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু সেই গভীরের ভাষা তার জানা ছিল না। অথচ এই অক্ষমতাকেই সে শক্তির পরিচয় বলে মনে করত। নিজের রিসর্চের কাজটা শেষ হলে নীরদ য়ুরোপে পাঠালে—তাতে স্কলারশিপ পেয়ে ডিগ্রিলাভের জন্য সে পাড়ি দিলে সমুদ্রে। বিদায়কালে শশাঙ্কবাবুদের সম্বন্ধে বারবার সাবধান করে ঊর্মিকে বললে, 'আমি

কতকগুলো বই তোমার জন্যে রেখে যাচ্ছি। তার যে-সব চ্যাপটারে দাগ দিয়েছি সেইগুলো বিশেষ করে পোড়ো, এর পরে কাজে লাগবে।'

প্রথম-প্রথম ভারি-ভারি শব্দ জুটিয়ে দীর্ঘপ্রস্থ বচন জুড়ে প্রতি মেলে আসত তার চার-পাঁচ পাতা চিঠি। ইংরেজিভাষায় ঊর্মিকে অভিভূত করে দেবে, এই ছিল পণ। কিছুকাল পরে চমক লাগিয়ে এল টেলিগ্রাম: বড়ো-অঙ্কের টাকার জরুরী দাবি—অধ্যয়নের প্রয়োজন। অনতিকাল পরে আরো বড়ো-অংকের তাগিদ এল। শেষে এল তার চিঠি: যে-রিসর্চের কাজে সে আত্মনিবেদন করতে চায়, ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেজন্য আর-একটা স্যাক্রিফাইস তাকে মেনে নিতে হল: একজন য়ুরোপীয় মহিলা তাকে বিবাহ করে সে-কাজে আত্মদান করতে ইচ্ছুক। কাজ সেই একই: রাজারামবাবু যে-কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন, সেখানে তা নিয়োগ করলে অন্যায় হবে না—বরঞ্চ মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো হবে।

নীরবালা ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার প্রাক্তন সভাপতি অক্ষয়ের বিবাহযোগ্যা দুই শ্যালীর অন্যতমা। নীরবালা চতুর্দশী—কৌতুকে-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত। পরিবারে আশ্রিত রসিকের চেষ্টায় দুটি পাত্র স্থির হলে দিদি নৃপবালার পিঠে এক চাপড় মেরে নীরবালা বললে, 'তোর বর আসছে ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ-চোখ নাচছিল।' নৃপবালার বিস্ময়: একজনের বাঁ-চোখ নাচলে অন্যের বর আসবে কেন? নীরু বললে, 'তা-ভাই, আমার বাঁ-চোখটা না-হয় তোর বরের জন্যে নেচে নিলে তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, জলখাবার তো দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজদিদি কি স্বয়ংবরা হবে নাকি?' অক্ষয়ের কথায় নিজের সম্বন্ধেও আশান্বিত হয়ে সে উচ্ছ্বসিত: 'আহা মুখুজ্যেমশায়, কী সুসংবাদ শোনালে? তোমাকে কী বকশিস দেব। এই নাও আমার গলার হার—আমার দু-হাতের বালা।' কিন্তু, পাত্র-দুটি অচলবোধে পরিত্যক্ত হলে আবার সে বসন্তকালের দমকা-হওয়ার মতো দিদির হাত ধরে টেনে আনলে: 'আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, এ-দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা, না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া?··· রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।···মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না।' নৃপকে বললে, 'এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ-রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে-দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।'

বিধবা শৈলবালা কুমারসভার সভ্যদুটির ব্রতভঙ্গে উৎসাহী। নৃপর গলা জড়িয়ে নীরু বললে, 'শুনেছি কুমারসভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা *যদি দু-জনে দু-বন্ধুর হাতে পড়ি তা-হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি* হবে না···তাই-তো সেই যুগল-দেবতার জন্যে এত পুজোর আয়োজন করছি

ভাই। জোড়হস্তে মনে-মনে বলছি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি-বোনকে এক-বোঁটার দুটি ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।···মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়···চিরকুমার-সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী-নাম সার্থক হবে।···আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব।' বলা-বাহুল্য, বেশি কিছু আয়োজন করতে হল না—কুমারসভাটিকে সেখানে উঠিয়ে আনতেই একটা রুমাল দেখে সভ্যদের ভাবান্তর। সভান্তে নীরবালা আক্ষেপ করে বললে, 'সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে!···আমি এমনি বোকা, ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির-লুট দিয়ে যাব!'

নীলকান্ত॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীর স্বামীর এক বিশ্বাসী কর্মচারী। হরিমোহিনীর স্বামীপুত্রের অকালমৃত্যুর পরেও নীলকান্ত মনিবের বিষয় দেখাশুনা করত। হরিমোহিনীর বিষয়ের উপরে তাঁর দেওরদের লোভ দেখে বলত, 'আমাদের হকের এক-পয়সা কে লয় দেখিব।' হরিমোহিনী সম্পত্তিতে অনাসক্তি প্রকাশ করায় বলত, 'আমাদের যা হক তা ছাড়িব কেন? এমন পাগলামি করিয়ো না।' নীলকান্ত অনেক দুঃখে হক বাঁচিয়ে আসছিল—হকের চেয়ে বড়ো তার কাছে আর-কিছু ছিল না।

হরিমোহিনী একদিন গোপনে কাগজে সই দিতে তার আর ক্রোধের সীমা রইল না। প্রভুর মৃত্যুর পর থেকে তাঁর হক বাঁচানোই তার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তার সমস্ত-বুদ্ধি সমস্ত-শক্তি এতেই অবিশ্রাম নিযুক্ত ছিল। এই-নিয়ে মামলা-মকদ্দমা, উকিলবাড়ি হাঁটাহাঁটি, আইন খুঁজে বার করা, এতেই তার সুখ ছিল—এমন-কি নিজের কাজ দেখবারও সময় পেত না। সেই হক মেয়েমানুষের কলমের এক-আঁচড়েই উড়ে যেতে সে অশান্ত হয়ে একেবারে বৃন্দাবনে চলে গেল। হরিমোহিনী তাকে কিছু টাকা দিতে চাইতে বললে, 'আমার মনিবের সবই যখন গেল তখন ও পাঁচশো-টাকা লইয়া আমার সুখ হইবে না। ও থাক্।'

নীলমণি ঘটক॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের বিবাহের ঘটক। একদা প্রবল বর্ষণের মধ্যে কাদামাখা তালতলার চটি পায়ে গামছা এবং জীর্ণ ছাতির সহায়তায় বিপ্রদাসের গৃহে নীলমণির আবির্ভাব। বিপ্রদাস পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বললে, 'আজ্ঞে, কর্তারা আমাকে খুবই চিনতেন (মিথ্যে কথা), আপনারা তখন শিশু। আমার নাম নীলমণি ঘটক, 'গঙ্গামণি ঘটকের পুত্র।···ভালো পাত্রের সন্ধান আছে। আপনাদেরই ঘরের উপযুক্ত।' মধুসূদনের নাম শুনে বিপ্রদাস অমত করায় সে বরের ঐশ্বর্যের পরিমাণ এবং

গভর্নরের দরবারে তার ঘনিষ্ঠতার বিবরণ দাখিল করে বললে, 'রাজাবাহাদুর এবার বছর না-যেতে মহারাজা হবেন এটা একেবারে লাটসাহেবের নিজ-মুখের কথা। তাই এতদিন পরে তাঁর ভাবনা ধরেছে, মহারানীর পদ এখন আর খালি রাখা চলবে না। আপনাদের মহাচার্য কিনু ভটচাজ দূরসম্পর্কে আমার সম্বন্ধী, তার কাছে কন্যার কুষ্ঠি দেখা গেল···এই নিয়ে শহরের মেয়ের কুষ্ঠি ঘাঁটতে বাকি রাখি নি—এমন কুষ্ঠি আর-একটিও হাতে পড়ল না। এই দেখে নেবেন, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এ-সম্বন্ধ হয়েই গেছে, এ প্রজাপতির নির্বন্ধ।···ভেবে দেখবেন, দু-চার দিন বাদে আর-একবার আসব।'

নীলমাধব ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিত রায়ের এক বন্ধু। কলেজে পড়ার সময় অমিতের সঙ্গে নীলমাধব Blow gently over my garden··· এই-কবিতাটিকে কলকাতাই-ছাঁচে ঢালাই করে লিখেছিল—'ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে ওগো দক্ষিণ-হাওয়া / প্রেয়সীর সাথে যে-নিমেষে হবে চারি-চক্ষুতে চাওয়া।' ইকনমিক্‌সে এম. এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ এবং আশি ভরি গহনা সমেত সে নববধূকে ঘরে এনেছিল। চার-চক্ষুতে চাওয়াও হয়েছিল, দক্ষিণা-বাতাসও বয়েছিল—কিন্তু এই কবিতাটিকে ব্যবহার করবার সময় তার হয় নি।

নীলমাধব চৌধুরী ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। ঘটক বনমালী-কথিত দুটি পরমাসুন্দরী কন্যার পিতা।

নৃপবালা ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। অবিবাহিতা দুই-কন্যার অন্যতমা। নৃপবালা ষোড়শী, শান্তস্নিগ্ধ-স্বভাব—তার ছোটো-বোন নীরবালার বিপরীত। দুটি পাত্র দেখতে-আসার কথায় ছোটো-বোনকে খুশি হতে দেখে সে বলে, 'আঃ, কী বর-বর করছিস। দেখো-তো ভাই মেজদিদি।' পরে বললে তার গলা জড়িয়ে, 'মাগো-মা, আমরা কী জঞ্জাল। আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা, এত ঝঞ্ঝাট।' বিধবা শৈলবালার উল্লেখ করে সে বললে, 'আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি? আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে?'

নোটো ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নবীনকালীর ছেলে। সে সিরাজগঞ্জের হাকিম।

পঞ্চু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের প্রতিবেশী-জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা। সকালে একটা চাঙাড়িতে পান-দোক্তা রঙিন সুতো আয়না-চিরুনি নিয়ে বিলের হাঁটুজল ভেঙে পঞ্চু যেত নমঃশূদ্রদের পাড়ায়। সকাল-সকাল ফিরতে

পারলে খাওয়ার পরে ময়রার দোকানে যেত বাতাসা কাটতে—বাড়ি ফিরে আবার শাঁখা তৈরি করত রাত-দুপুর পর্যন্ত। এই কঠিন পরিশ্রমেও বছরের মধ্যে মাস-কয়েক খাওয়া চলত—খাদ্যের বেশি অংশই সস্তা বীজেকলা। একবার বড়ো অভাবের সময়ে সে নিখিলেশের বাগানের নারকেল চুরি করে; পরে কিছু সাশ্রয় হলে দোষ কবুল করে গোটাকয়েক ঝুনো-নারকেল দিয়ে যায়। চিরদিনই উপবাসের সীমানায় তার জীবন—তার উপরে তার স্ত্রীকে ধরল যক্ষ্মায়। ডাক্তার-খরচে জমিজমা সমস্ত বিক্রি-বন্ধক হল। স্ত্রীর মৃত্যুর পরেও সমাজে খরচ লাগল সাড়ে-তেইশ টাকা। নিখিল রাগ করে বললে, 'নাই-বা করলে প্রায়শ্চিত্ত।' ক্লান্ত গোরুর মতো চোখ তুলে সে বললে, 'মেয়েটি আছে, বিয়ে দিতে হবে। আর বউয়েরও তো গতি করা চাই।'

শেষে পণ্ডু এক সন্ন্যাসীর চেলাগিরি শুরু করলে—ছেলেমেয়েদের উপবাস ভোলবার জন্য বুঝতে চেষ্টা করলে, সুখদুঃখ স্বপ্নমাত্র। একরাত্রে ছেলেমেয়ে-চারটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে সে নিরুদ্দেশ। কয়েকমাস পরে যখন বৈরাগ্যের ঘোর কাটল, নিখিলেশের মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবুর ঘরে তার ছেলেমেয়েদের কান্না দেখে বললে, 'মাস্টারবাবু, এগুলোকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়াব সে-শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে-রেখে দৌড় মারব সে-মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন?' দিনকতক মাস্টারমশায়ের কাছে আশ্রয় পেয়ে সে নড়বার নাম করলে না। চন্দ্রনাথবাবু কিছু টাকা ধার দিয়ে ব্যবসা করতে উপদেশ দিলে তার মনে হল: দয়াধর্ম বলে জগতে কিছু নেই, শোধ দিতে হলে ধারের মূল্য কী! মাস্টারমশায়কে সে আর বড়ো করে প্রণাম করতে পারল না। কিছু ধুতি-শাড়ি শীতের কাপড় কিনে চাষীদের ঘরে বিক্রি করে সে এক-কিস্তি সুদ আর আসলের কিছু শোধ করলে—এই ঋণশোধের অংশ তার প্রণামের দিকে কাটা পড়ল।

এমন সময়ে স্বদেশীর হুজুগে কুণ্ডু-জমিদার তার কাপড়গুলি পুড়িয়ে দিতে বললেন। আপত্তি করে কাপড়গুলো রক্ষা হল না; অধিকন্তু জরিমানা ও লাঞ্ছনা জুটল। নিখিল তাকে রক্ষা করতে তার বাড়িটা কিনে নিয়ে প্রজা করে রাখতে চাইলে। পণ্ডু জোড়হাত করে বললে, 'হুজুর, রাজায়-রাজায় লড়াই, পুলিসের দারোগা থেকে উকিল-ব্যারিস্টার পর্যন্ত শকুনি-গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে, কিন্তু মরবার বেলায় আমি মরব।' শেষে বাড়িটা হস্তান্তর করে নিখিলেশের টাকায় কাপড় কিনে আবার ব্যবসা আরম্ভ করলে। পণ্ডুর বিষয় তার মাতামহের—পণ্ডু ছাড়া কেউ ওয়ারিশ ছিল না। হঠাৎ এক জাল-মামী তার জীবনস্বত্বের দাবি আর-এক প্রাপ্তবয়স্কা ভাইঝিকে নিয়ে উপস্থিত—নিখিলেশের মৌরসি-স্বত্ব নষ্ট করার জন্য জমিদারের চক্রান্ত। পণ্ডু বুড়িকে জিনিসপত্রে হাত দিতে দিত না। চন্দ্রনাথবাবু বুড়ির হাতের রান্না খেয়ে তাকে মিষ্টকথায় ভুলিয়ে পথ-খরচ দিয়ে বিদায় করলেন। মাস্টারমশায়ের

উপর পঞ্চুর যে-ভক্তিটুকু ছিল, তাও গেল—সংসারে ফন্দি চাই, কিন্তু জাত-খোয়ানো ? মিথ্যা-সাক্ষ্যে বুড়ির উপর টেক্কা দিলে তার খেদ ছিল না।

পটল ॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীর শ্বশুরালয়ের এক সন্তান।

পরমানন্দস্বামী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের কথিত গল্পের এক দৈবজ্ঞ।

পরান ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। রায়গড়পতি বসন্ত রায়ের এক প্রজা। উদয়াদিত্য যখন রায়গড় ত্যাগ করেন তখন তাঁর মাঝি ছিল পরান। পরে উদয়াদিত্য আবার রায়গড়ে এলে দেখা করতে আসে।

পরান ঘোষাল ॥ 'গোরা' উপন্যাস। কৃষ্ণদয়ালের এক অনুগত।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ 'গোরা' উপন্যাস। সুচরিতার এক ব্রাহ্ম পিতৃবন্ধু। স্কুল-ইন্সপেক্টারি কাজে পরেশ ভট্টাচার্য ঢাকায় অবস্থানকালে সুচরিতা আর তার ভাই তাঁর আশ্রিত। তাঁর তিনটি মাত্র কন্যা। সুচরিতার প্রতি তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরীর বিরূপতা অনুমান করে তিনি তার প্রতিই সমধিক স্নেহাসক্ত ছিলেন ; তার সঙ্গে নানা-বিষয়ে আলাপ করে নানা জায়গায় বেড়িয়ে, দূরে থাকলে পত্রযোগে নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করে তাকে অনেক পরিণত করে তুললেন। পরেশবাবু শান্ত সমাহিত, তাঁর অন্তর্নিবিষ্ট মুখশ্রীতে সর্বদা অন্তরের পরিপূর্ণ স্তব্ধতা ও আত্মপ্রসাদ প্রকাশ পেত ; শাস্ত্রচর্চা ও ছোটোখাটো নানা-বিষয়ে তিনি ব্রাহ্ম-অব্রাহ্মের সীমা-রক্ষার চেয়ে সত্যকেই বড়ো করে দেখতেন। সে-সময়ে ইংরেজি-শিক্ষিতদের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা নিয়ে আলোচনা ছিল না, ব্রাহ্মসমাজে তা ছিল হিন্দুত্বের সামগ্রী। পরেশবাবু সুচরিতাকে নিয়ে গীতা ও কালীসিংহের মহাভারত পড়তেন।

পেনসন নিয়ে তখন তিনি হেদোতলায়। সেখানে গোরা ও তার বন্ধু বিনয়ের আগমনে ব্রাহ্মসমাজের হারানবাবু অসন্তুষ্ট। 'পরেশবাবু বললেন, 'আপনি পারিবারিক অন্তঃপুরকে আর-একটুখানি বড়ো করে একটা সামাজিক অন্তঃপুর বানাতে চান। কিন্তু আমি মনে করি, নানা-মতের ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েদের মেশা উচিত ; নইলে তাদের বুদ্ধিকে জোর ক'রে খর্ব করে রাখা হয়।' গোরার হিন্দুয়ানি সম্বন্ধে তর্ক হলে বলতেন, 'সত্যের জোরকে যারা বিশ্বাস করে নিজেদের জবর্দস্তিকে তারা সংযত রাখে।…আমি ঈশ্বরের কাছে সর্বদাই এই প্রার্থনা করি যে, ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্বত্রই নতশিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি—বাইরের কোনো বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে।' অনতিদূরে

এক শহরে মেয়েরা একটি নাট্যানুষ্ঠানে গেল। গোরাও দৈবক্রমে সেখানে গিয়ে একদল ছাত্রের পক্ষে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে গেল জেলে। পরেশের মেজো-মেয়ে ললিতা বিনয়ের সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়। এই খামখেয়ালি দুর্জয় মেয়েটিকে পরেশবাবু সকলের চেয়ে স্নেহ করতেন—অন্যের কাছে নিন্দনীয় তার সত্যপরতাটুকুকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধাও করতেন। ললিতার দুরন্ত প্রকৃতিকে দমন করে তিনি তার ভিতরের মহত্ত্বটুকু দলিত করতে চান নি। তার কাছে গোরার কথা শুনে ব্যথিত হয়ে বললেন, 'গৌর তার কর্তব্যবুদ্ধির প্রবলতার ঝোঁকে হয়তো হঠাৎ আপনার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে পারে, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় যাকে ক্রাইম বলে তা-যে গোরার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধ তাতে আমার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কী করবে মা, কালের ন্যায়বুদ্ধি এখনো সে-পরিমাণে বিবেক লাভ করে নি। এখনো অপরাধের যে-দণ্ড ত্রুটিরও সেই-দণ্ড; উভয়কেই একই জেলের একই ঘানি টানতে হয়। এরকম যে সম্ভব হয়েছে কোনো-একজন মানুষকে সেজন্য দোষ দেওয়া যায় না। সমস্ত মানুষের পাপ এজন্য দায়ী।'

সুচরিতার বিধবা মাসি হরিমোহিনী সেখানে এলে পরেশবাবু একটি নিভৃত কক্ষে আশ্রয় দিয়ে তাঁর আচাররক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হারানবাবু একদিন সুচরিতাকে তাঁর ঠাকুরের প্রসাদ খাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করায় বললেন, 'পানুবাবু, আমরা যা-কিছু খাই সবই তো ঠাকুরের প্রসাদ।' বরদাসুন্দরী হারানের সঙ্গে সুচরিতার বিবাহ দিতে আগ্রহী। কিন্তু সুচরিতার মত না-জেনে পরেশবাবু তাতে মত দিতে পারলেন না। হারান এই অবিবেচনার জন্য অনুতাপের ভয় দেখালে বললেন, 'অনুতাপ তো ঈশ্বরের দয়া। অপরাধকেই ভয় করি, পানুবাবু, অনুতাপকে নয়।' ভূমার সঙ্গে মিলনকেই পরেশবাবু তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করেছিলেন—প্রেয়তম-সত্যতমের দিকেই তাঁর চিত্ত সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকত। মঙ্গলের প্রতি নির্ভর এবং সংসারের প্রতি ধৈর্যই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। এইভাবে নিজের মধ্যে একটা স্বাধীনতা লাভ করে তিনি মত ও আচরণ নিয়ে অন্যের উপরে জবর্দস্তি করতে পারতেন না; সাম্প্রদায়িক লোকের কাছে সেজন্য নিন্দিত হয়েও সেই-আঘাতে বিদ্ধ হয়ে থাকতেন না। মনের মধ্যে কেবলই আবৃত্তি করতেন, 'আমি আর-কাহারও হাত হইতে কিছু লইব না, আমি তাঁহার হাত হইতেই সমস্ত লইব।' শীতের দিনে সন্ধ্যার সময়ে তিনি পশ্চিম দিকের একটি ছোটো ঘরের মুক্ত দ্বারে আসন পেতে উপাসনায় বসতেন; তাঁর শুক্লকেশমণ্ডিত শান্ত মুখের উপরে সূর্যাস্তের আভা এসে পড়ত। সুচরিতাও তখন কাছে এসে বসলে তিনি তাঁর অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক মাধুর্য দিয়ে অন্তঃকরণ দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করতেন।

সুচরিতার পিতার গচ্ছিত টাকা ব্যাঙ্কে খাটিয়ে পরেশবাবু তাদের জন্য দুটি বাড়ি কিনেছিলেন কলকাতায়। নিজের সংসারের সঙ্গে তাদের ক্রমাগত

দ্বন্দ্ব ঘটতে থাকায় তিনি তার মাসির সঙ্গে সুচরিতাকে স্থানান্তরের উদ্‌যোগ করলেন। সুচরিতা তাঁর শিষ্যা, তাঁর কন্যা, সুহৃদ—সে তাঁর জীবনে তাঁর ঈশ্বরোপাসনার সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন সুচরিতার জীবনকে মঙ্গলপূর্ণ স্নেহের দ্বারা গড়তে-গড়তে তিনি নিজের জীবনকেও একটি পরিণতি দান করেছিলেন। সেই সুচরিতার সঙ্গে তাঁর বাহ্য-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবার সময়ে মনের মধ্যে যে বেদনা অনুভব করছিলেন, সেই নিগূঢ় বেদনাটিকে তিনি অন্তর্যামীর কাছে নিবেদন করে দিলেন। মনে-মনে বললেন, 'বৎসে, যাত্রা করো…ঈশ্বর আমার নিকট হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া বিচিত্রের ভিতর দিয়া তোমাকে চরম পরিণামে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান—তাঁহার মধ্যে তোমার জীবন সার্থক হউক।' সুচরিতার বাড়ি এসে তিনি জিনিসপত্র গুছিয়ে দিয়ে গেলেন ; সুচরিতাকে ব্যথিতভাবে কাছে কাছে ফিরতে দেখে বললেন, 'মা, পিছন ফিরে তাকিয়ো না…ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে তাঁকেই নিজের একমাত্র সহায় করো—তা হলে ভুল-ত্রুটি-ক্ষতির মধ্যে দিয়েও লাভের পথে চলতে পারবে—আর যদি নিজেকে আধা-আধি ভাগ কর, কতক ঈশ্বরে কতক অন্যত্রে, তা-হলে সমস্ত কঠিন হয়ে উঠবে।' হারানবাবু স্টিমারে বিনয়ের সঙ্গে একাকী ললিতার আসা নিয়ে কটাক্ষ করলেন। পরেশবাবু বললেন, 'পানুবাবু…নিন্দা করতে গেলে বাইরে থেকে করা যায়, কিন্তু বিচার করতে গেলে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়।' পরে এ-সম্বন্ধে বাইরেও কুৎসার কথা শুনে তিনি সুচরিতার কাছে এলেন : 'মা…তুমি কি বল, বিনয়কে আমাদের পরিবারে যাতায়াত করতে দিয়ে ললিতার কোনো অনিষ্ট করা হয়েছে ?' সুচরিতা বিনয়ের নির্মলস্বভাবের উল্লেখ করায় তিনি যেন এক নূতন তত্ত্ব লাভ করলেন : 'ঠিক কথা বলেছ, রাধে, ঠিক কথা বলেছ। তিনি ভালো লোক কিনা এইটেই দেখবার বিষয়—অন্তর্যামী ঈশ্বরও তাই দেখেন।'

ললিতা বিনয়কে বিবাহ করতে চাইলে আর-একদিন চিন্তিতমুখে তিনি সুচরিতার কাছে এলেন : 'ললিতা যে-ঝড়টা জাগিয়ে তুলেছে তার সমস্ত আঘাত সইতে পারবে তো ?…আমি এই-কথাটা খুব নিশ্চয় করে জানতে চাই যে, ললিতা কেবল রাগেয় মাথায় বিদ্রোহ করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছে না।' পরে বিনয়ের দিক থেকে সে-প্রসঙ্গ উঠতে বললেন, 'বিনয়, তুমি ললিতাকে একটা সংকট থেকে উদ্ধার করবার জন্যে একটা দুঃসাহসিক কাজ করবে এ-রকম আমি ইচ্ছা করি নে।…শ্রদ্ধার কর্তব্য শোধ করবার জন্যেই যে তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হয়েছ, এটা আমার কন্যার পক্ষে শ্রদ্ধেয় নয়।' কিন্তু, বিবাহসংকল্পে তারা অবিচল এবং হারানের নির্দয়তার জন্য হিন্দুমতে। পরেশবাবু তাঁর বিদ্রোহী কন্যার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমাদের ভাবী-বংশের মধ্যে যে দূরব্যাপী ভবিষ্যৎ রয়েছে তার ভার যার উপরে স্থাপিত, সেই তোমাদের সমাজ—তার কথা কি ভাববে না ?…তোমাদের মনে যে-আবেগ

উপস্থিত হয়েছে সেটা যে সম্পূর্ণ অমঙ্গল সে আমি জোর করে বলতে পারি নে। আমিও একদিন বিদ্রোহ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলুম, কোনো সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তাই করি নি। সমাজের উপর আজকাল এই-যে ক্রমাগত ঘাতপ্রতিঘাত চলছে এতে বোঝা যাচ্ছে তাঁরই শক্তির কাজ চলছে। তিনি যে নানাদিক থেকে ভেঙে-গড়ে শোধন করে কোন্ জিনিসটাকে কী-ভাবে দাঁড় করিয়ে তুলবেন আমি তার কী জানি!' বিবাহে শালগ্রাম-শিলা বাদ দেবার প্রসঙ্গে আবার তিনি চিন্তিত। সুচরিতাকে বললেন, 'কোনো-মানুষের সঙ্গে সমাজের যখন বিরোধ বাধে তখন দুটো-কথা ভেবে দেখবার আছে, দুই-পক্ষের মধ্যে ন্যায় কোন্ দিকে এবং প্রবল কে। সমাজ প্রবল তাতে সন্দেহ নেই, অতএব বিদ্রোহীকে দুঃখ পেতে হবে। ললিতা বারম্বার আমাকে বলছে, দুঃখ স্বীকার করতে সে-যে শুধু প্রস্তুত তা-নয়, এতে সে আনন্দ বোধ করছে। এ-কথা যদি সত্য হয় তা-হলে অন্যায় না-দেখলে আমি তাকে বাধা দেব কী করে?... মানুষকেই সমাজের খাতিরে সংকুচিত হয়ে থাকতে হবে এ-কথা কখনোই ঠিক নয়—সমাজকেই মানুষের খাতিরে নিজেকে কেবলই প্রশস্ত করে তুলতে হবে।'

হিন্দুমতে কন্যার বিবাহে মত দিয়ে পরেশবাবু তাঁর স্ত্রী এবং ব্রাহ্মসমাজের বিরাগভাজন হলেন। হরিমোহিনীর অসন্তোষের ভয়ে সুচরিতাকেও ডাকতে পারলেন না। বিনয়ের খুড়ো তাঁকে ছেলেধরা বলে গাল দিয়ে পত্র দিলেন। অগত্যা তাঁকেই বিবাহ-ব্যাপারে উদ্‌যোগী হতে হল। সুচরিতা একদিন জিজ্ঞাসা করলে: হিন্দুসমাজে অসংখ্য মত থাকা সত্ত্বেও কেন তারা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারে না। পরেশবাবু হেসে বললেন, 'দৈববশে যারা হিন্দু হয়ে জন্মাবে এ-সমাজ কেবলমাত্র তাদের।...মুসলমান-সমাজের সিংহদ্বার সমস্ত মানুষের জন্যে উদ্‌ঘাটিত, খ্রীস্টান সমাজও সকলকেই আহ্বান করছে।...অভিমন্যু ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতে জানত, বেরোতে জানত না; হিন্দু ঠিক তার উলটো। তার সমাজে প্রবেশ করার পথ একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শতসহস্র।...ইতিপূর্বে হিন্দু-সমাজের খিড়কির দরজা খোলা ছিল। তখন এ-দেশের অনার্য-জাতি হিন্দু-সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত।, এদিকে মুসলমানের আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দুরাজা ও জমিদারের প্রভাব যথেষ্ট ছিল...এখন ইংরেজ-অধিকারে সকলকেই আইনের দ্বারা রক্ষা করছে...সেইজন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে।...হিন্দুসমাজ এখনো যদি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না-জোগায়, ক্ষয়রোগকেই প্রশ্রয় দেয়, তা-হলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ-সংস্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক আঘাত হয়ে দাঁড়াবে।' অনতিপরেই একটি চিঠিতে পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজ থেকে ভ্রষ্ট হবার সংবাদ পেলেন। উত্তরে তিনি লিখলেন, 'ললিতার বিবাহ আমাকেই সম্পাদন করিতে হইবে। ইহাতে আমাকে যদি ত্যাগ করেন তাহাতে আপনাদের

অন্যায়-বিচার হইবে না। এক্ষণে ঈশ্বরের কাছে আমার এই একটিমাত্র প্রার্থনা রহিল, তিনি আমাকে সমস্ত সমাজের আশ্রয় হইতে বাহির করিয়া লইয়া তাঁহারই পদপ্রান্তে স্থানদান করুন।'

বরদাসুন্দরীর বন্ধুবান্ধবেরা ললিতাকে বড়ো উত্ত্যক্ত করতে লাগল। পরেশবাবু অগত্যা ললিতাকে নিয়ে বিবাহবাড়িতে গেলেন। বিবাহান্তেও তাঁকে কেন্দ্র করে স্ত্রী-কন্যা এবং বাইরের লোকদের আবর্তন চলতে লাগল। মানসিক শান্তিলাভের আশায় কিছুদিন দূর-বিদেশে গিয়ে পরেশবাবু একা থাকবার মনস্থ করলেন। আইরিশ-সন্তান গোরাও অবশেষে নিজের জন্ম-বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সুচরিতার হস্তধারণ করে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খৃীস্টানের অখণ্ড ভারততীর্থের অন্বেষণে তাঁর শিষ্যত্বে বৃত হল।

পার্বতী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক পরিচারিকা।

পাঁচু ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। বারাসতের ডাকঘরের এক বুড়ো পেয়াদা।

পাঁচু মণ্ডল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের এক প্রজা।

পীতাম্বর রায় ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। গুজুরপাড়া গ্রামের এক ছোটো জমিদার। নিজের পুরনো চণ্ডীমণ্ডপে বসে পীতম্বর নিজেকে রাজা বলে প্রচার করতেন। জগতের বড়ো-বড়ো রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ সেই ছায়াময় নীড়ে প্রবেশ করত না। ত্রিপুরার রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায় নির্বাসিত হয়ে সেখানে এলে তিনিই হলেন রাজা—পীতম্বর প্রজাদের মধ্যে গিয়ে ভর্তি হলেন। তিনি তাঁর পাকা দালান এবং চণ্ডীমণ্ডপসুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর আনন্দের সীমা রইল না। নক্ষত্র হাতি চড়ে বেরোলে তিনি প্রজাদের ডেকে বলতেন, 'রাজা দেখেছিস? ওই দেখ রাজা দেখ।' মাছ-তরকারি-আহার্যদ্রব্য নিয়ে তিনি নক্ষত্র রায়কে দেখতে আসতেন। ক্রমে পীতাম্বর নূতন রাজার দেওয়ানজি নামে প্রচলিত হলেন। প্রায়ই সৈন্যসামন্ত নিয়ে তাঁর পুকুর থেকে মাছ, বাগান থেকে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্য হিসেবে প্রাসাদে আসতে লাগল। এই-খেলাতে নক্ষত্রের প্রতি তাঁর স্নেহ আরো বেড়ে উঠল।

ত্রিপুরার পুরোহিত রঘুপতি যেদিন নক্ষত্রকে নিতে এলেন সেদিন ছিল বিড়াল-শাবকের বিবাহ। পীতাম্বর সকালে গামছা কাঁধে ফেলে নদীতীরে স্নান করতে এসেছেন—নক্ষত্রকে দেখে হাস্যবিকশিত মুখে বললেন, 'জয়োস্তু মহারাজ! শুনিলাম নাকি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভবিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে।' রঘুপতির গম্ভীর স্বর: তিনিই সেই বিটল ব্রাহ্মণ। পীতাম্বর হেসে বললেন, 'তবে-তো আপনার সাক্ষাতে

আপনার বর্ণনা করাটা ভালো হয় নাই।...কিছু মনে করিবেন না ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কী না বলে। আমাকে যাহারা সম্মুখে বলে রাজা, তাহারা আড়ালে বলে পিতু।...আসল-কথা কী জানেন, আপনার মুখটা কেমন ভারি অপ্রসন্ন দেখাইতেছে...মহারাজ এত প্রাতে যে নদীতীরে।' নক্ষত্র করুণ স্বরে বললেন, 'আমি-যে চলিলাম দেওয়ানজি।' পীতাম্বর বললেন, 'চলিলেন? কোথায়? ন-পাড়ায়, মণ্ডলদের বাড়ি?' রঘুপতি নক্ষত্রকে নৌকায় উঠতে বলায় তিনি সন্দিগ্ধ ও ক্রুদ্ধ: 'তুমি কে-হে ঠাকুর। আমাদের মহারাজকে হুকুম করিতে আসিয়াছ।' নক্ষত্র ব্যস্তভাবে তাঁর গুরুঠাকুর পরিচয় দিলে বললেন, 'হ'ক-না গুরুঠাকুর। উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকুন, চাল-কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন—মহারাজকে উঁহার কিসের আবশ্যক।' পরে তাঁকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব বুঝে বললেন, 'তবে আমিও যাই, লোকজন সঙ্গে লউন। রাজার মত চলুন। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না?' অবশেষে নক্ষত্রের কথায় কিছু ম্লান হয়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, 'দেখো বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মতো ভালোবাসি—আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে, যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই-একটি সাধ আছে।'

নক্ষত্র ও রঘুপতি নৌকায় উঠলেন। পীতাম্বর স্নান ভুলে গামছা-কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরে গেলেন। গুজুরপাড়া শূন্য হয়ে গেল। কেবল প্রতিদিন প্রকৃতির নিত্য-উৎসব, প্রভাতে পাখির গান, এবং নদীতরঙ্গের বিরাম রইল না।

পুরন্দর॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশের দাদা। পিতা হরিমোহনের স্নেহসিক্ত পুরন্দরের পড়াশুনা কিছু হয় নি—সকাল-সকাল বিবাহ হয়েছিল এবং বিবাহের চতুঃসীমার মধ্যেই সে আবদ্ধ ছিল না। জ্যাঠা জগমোহনের বাড়িতে চামারদের ভোজের আয়োজন দেখে সে ছটফট করে বললে, 'কেমন উহারা এ-বাড়িতে আসিয়া খায় আমি দেখিব।' জ্যাঠার কাছে গিয়ে কড়া-কড়া করে বললে: সে একটা বিষম কাণ্ড করবে। কিন্তু এদিকে সে ভিতু ছিল; যেখানে আবদার সেখানেই তার জোর বেশি—মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘাঁটাতে সাহস করলে না। দেবত্র-সম্পত্তির সেবায়েত জগমোহনের সঙ্গে তার পিতা হরিমোহনের মকদ্দমা বাধল। মকদ্দমায় জ্যাঠার হার হলে পুরন্দর ঢাকঢোল পিটিয়ে পাড়া মাথায় করলে—দু-দিন ধরে নিজে উদ্‌যোগ করে ব্রাহ্মণভোজনও করিয়ে দিলে। বাড়ি ভাগ হবার পরে নিজেদের অংশে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা করিয়ে সকালে-সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টার আওয়াজে কান ঝালাপালা করে আনন্দে লাফাতে লাগল।

পুরন্দরের দুশ্চরিত্র বন্ধুদের মধ্যে ছিল বালবিধবা ননিবালার মামাতো ভাইগুলি। ননিবালাকে তাদের আশ্রয় থেকে বার করে আনতে তাই তার অসুবিধা হল না। মেয়েটি যখন সন্তানসম্ভবা একদিন অর্ধরাত্রে সন্দেহবশে তাকে লাথি মেরে দূর করে দিলে। শচীশের সহায়তায় জ্যাঠার বাড়িতে তার আশ্রয় হওয়াতে পুরন্দর ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে লাগল। মনে করলে, একে-তো শচীশ নিজের ভোগের জন্য ননিকে তার হাতছাড়া করেছে—তার উপরে তাকেই অপমান করবার জন্য একেবারে পাশের বাড়িতেই রেখেছে। একদিন দুপুরবেলায় ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে ননির কাছে সে তর্জন-গর্জন শুরু করলে। হঠাৎ জ্যাঠার প্রাদুর্ভাবে বিড়ালের মতো ফুলতে-ফুলতে তাকে ভঙ্গ দিতে হল। আর-একদিন ননির এক ভাইকে সঙ্গে এনে সে জ্যাঠাকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে শাসিয়ে গেল। কথাটা তার পিতাকে জানতে দিতেও তার লজ্জা ছিল না। শচীশ মেয়েটিকে বিবাহের উদ্‌যোগ করায় সে নির্লজ্জের মতো বলে বেড়াতে লাগল : শচীশ যদি তাকে বিবাহ করে তবে সে আত্মহত্যা করবে। তার স্ত্রী বললে, 'তাহা হইলে তো আপদ চোকে, কিন্তু সে তোমার ক্ষমতায় কুলাইবে না।'

পুরবালা ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার প্রাক্তন সভাপতি অক্ষয়ের স্ত্রী—বিবাহযোগ্যা নৃপবালা-নীরবালার দিদি। পুরবালা তাঁর স্বামীটিকে নিয়ে সুখী—তাই বিশ্বাস, মেয়েদের যেমন-করে-হোক একটা বিবাহ হয়ে গেলেই তাদের সুখের দশা। মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের কথা তাঁর কাছে মনে হত বাড়াবাড়ি। তাই বলতেন, 'স্বয়ংবরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না—স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।'

বোনেদের বিবাহসমস্যায় স্বামীকে নিরুদ্বিগ্ন দেখে তিনি বলতেন, 'তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে! এতদিনে এক-একটির তিনটি-চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে!' কুমারসভার গোকুলে অবস্থানকালে স্বামীর বুভুক্ষার কথা শুনে তিনি বিজয়গর্বে উল্লসিতা। স্বামীর সঙ্গে নানা-জায়গায় যাতায়াত করে পুরবালা বিদেশ-ভ্রমণে পাকা—মার সঙ্গে তাই তাঁকে যেতে হল কাশীতে। স্বামীর সঙ্গে এই-বিচ্ছেদে পুরবালা স্বভাবতই কাতর। নিজের অজস্র স্বামিসৌভাগ্যের কথা মনে করে বিধবা মেজো-বোন শৈলবালার প্রতি তাঁর করুণার অন্ত ছিল না। শৈলবালা ছদ্মবেশে কুমারসভায় বিপ্লব ঘটাতে উদ্যোগী। বালকবেশী প্রিয়দর্শন শৈলকে দেখে তাঁর চোখ-দুটি ছলছল করে এল : আহা, শৈল যদি তাঁদের বোন না-হয়ে ভাই হত—তার এমন রূপ এমন-বুদ্ধি সমস্তই ব্যর্থ হয়ে গেল। এ-সমস্ত নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপারে মনে-মনে তাঁর সায় ছিল না। তবু তাঁর স্বামীর সঙ্গে সেই বোনটির বিচিত্র কৌতুকলীলায় বাধা দিতেও তাঁর মন সরল না।

পূর্ণ ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার সভাপতি চন্দ্রমাধববাবুর এক ছাত্র। পূর্ণ 'গৌরবর্ণ', একহারা, লঘুগামী, ক্ষিপ্রকারী, দ্রুতভাষী। সকল বিষয়ে গাঢ় মনোযোগ…দৃঢ়সংকল্প কাজের লোক।' কলেজে ভালোরকম পাস করে ওকালতি-দ্বারা সুচারুভাবে জীবননির্বাহের প্রত্যাশায় রাত জেগে পড়া মুখস্থ করত—দেশের কাজে নিজের কাজ নষ্ট করা তার সংকল্পের মধ্যে ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় পূর্ণ চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে গেছে—হঠাৎ জলখাবারের থালা হাতে তাঁর ভাগ্নী নির্মলা বিদ্যুতের মতো এসে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল। তারপরেই পূর্ণ চিরকুমার-সভার খাতায় নাম লিখিয়ে বসল। পরবর্তী অধিবেশনে চন্দ্রবাবু তাঁর সভার সম্বন্ধে লোকের পরিহাসের উল্লেখ করলেন। পাশের ঘরে ঈষৎমুক্ত দরজার অন্তরালে একটি নেপথ্যবাসিনী শ্রোত্রীকে স্মরণ করে পূর্ণ সোৎসাহে বললে, 'সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প।…আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে…কেবল যদি আমাদের সভাপতিমশায় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই-এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে'। পূর্ণর এই-বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়ে পেঁছিল, এবং চন্দ্রবাবুর একাকী-তপস্যার কথায় বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক-শব্দ উৎকর্ণ বক্তাকে পুরস্কৃত করলে।

কুমারসভাটিকে অন্যত্র উঠিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাবে পূর্ণ দমে গেল: 'আমার-তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না-দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।' অথচ চিরকুমার-সভার আদর্শ সম্বন্ধে তর্কপ্রসঙ্গে বরাবর তার মতামত ছিল অন্যরূপ: 'মুসলমানের স্বর্গে হুরি আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর-কিছু পাওয়া যাবে কি।' কিন্তু, তখনই আর-এক নূতন প্রস্তাবে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। চন্দ্রবাবু বললেন, 'আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জানো?' পূর্ণ নিরীহভাবে বললে, 'আপনার ভাগ্নী?' চন্দ্রবাবু বললেন, 'হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।' পূর্ণ একেবারে উত্তেজিত আবেগভরে নেপথ্যের দিকে লক্ষ করে বলতে লাগল, 'সে-বিষয়ে আমার লেশমাত্রও সন্দেহ নেই…পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।' তখন নির্মলা নিজেই এসে সভ্যপদে বৃত হতে চাইলে সে খুব চমৎকার করে কিছু-একটা বলতে গেল—কিন্তু কিছুই না-পেরে শুধু মনে-মনে অনেক আপত্তি করে বললে, 'দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন।'

নির্মলার সঙ্গে নূতন সভ্য অবলাকান্তের ব্যবহার পূর্ণর কিছুতেই ভালো ঠেকল না—প্রায়ই অনুযোগ করতে লাগল প্রৌঢ় রসিকের কাছে। একদিন কৃষিবিদ্যার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে কিছুতেই যখন তার কথা জোগাল না, রসিক কৌশলে রক্ষা করলে তাকে। সেই-থেকে কৃতজ্ঞ পূর্ণ শরণাপন্ন হল রসিকের। একদিন তারই পরামর্শে নির্মলার সঙ্গে আলাপ করতে গেল। কিন্তু কথা খুঁজে না-পেয়ে বলে উঠল, 'আপনি—আপনার ইয়ে কী-রকম বোধ হয়, ওই-যে—মিল্টনের আরিয়োপ্যাজিটিকা—ওটা কিনা আমাদের এম. এ.-কোর্সে আছে···ইয়ে হয়েছে—আপনি—এবারে কী-রকম গরম পড়েছে—আমি একবার রসিকবাবু—রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।' অবশেষে সাক্ষাৎ-আলাপের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পূর্ণ একটা চিঠি পাঠালে সভাপতির কাছে : 'দেব, আপনি যে-আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ···সে-আদর্শ এবং সেই-উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে-মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি, তাহা শ্রীচরণসমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।···আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ-কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে—তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত—তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।' চিঠির উপসংহারে ছিল নির্মলার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব।

প্যারী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মুকুন্দলালের এক দাসী।

প্রতাপাদিত্য ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। ঐতিহাসিক যশোহরপতি। আকবরের অধিকারে হিন্দু রাজারা তখন মোগলের ঘরে কন্যাদান করছিল। বাংলাদেশের রাজাদের নিজের অধীনে এনে প্রতাপাদিত্য আর্যধর্মরক্ষায় সচেষ্ট ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্যকে বালকবয়সেই হোসেনখালি পরগনার ভার দিয়েছিলেন; কিন্তু প্রজাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতায় রাজস্বের ক্ষতি হওয়াতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বিবাহ দিলেন। কিন্তু তাঁর বধূ সুরমার পিতা শ্রীপুররাজ যশোহর-ছত্রের অধীনতা স্বীকার না-করায় বধূর উপরেও তিনি প্রসন্ন ছিলেন না।

এদিকে রায়গড়পতি পিতৃব্য বসন্ত রায় মোগলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে নৃত্যগীতে মগ্ন; এবং উদয়াদিত্য তাঁরই অনুরক্ত। প্রতাপাদিত্য বলতেন, 'ও-কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্ত রায়ের মতো হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে।' পিতৃব্যকে যশোহরে আমন্ত্রণ করে তিনি কৌশলে পথিমধ্যে হত্যার চক্রান্ত করলেন। মন্ত্রী এ-বিষয়ে পরামর্শ দিতে গেলে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ওই বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়-বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।···

পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না?' মন্ত্রী দিল্লীশ্বরের ভয় করলে বললেন, 'দিল্লীশ্বর তো আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে…কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিয়ো না।' কিন্তু উদয়াদিত্যের জন্য তাঁর পিতৃব্য-হত্যার কৌশল ব্যর্থ হল। প্রতাপাদিত্য ক্রুদ্ধ হয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে বললেন, 'মহিষী, রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি। উদয়াদিত্য…যখন-তখন বাহির হইয়া যায়।…আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। এ-সকলের অর্থ কী?'

জামাতা রামচন্দ্র রায় যশোহরে এলে তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন হল সংক্ষিপ্ত-রকমের। মূর্খতাবশে তিনি তাঁর বিদূষককে অন্তঃপুরে আনায় প্রতাপাদিত্য তাঁর বধের আদেশ দিলেন। বসন্ত রায় সেই আদেশ শুনে ব্যাকুল হয়ে বললেন, এ-কি কখনো সম্ভব? প্রতাপাদিত্য জ্বলে উঠলেন: 'দেখো পিতৃব্যঠাকুর, যশোহরের রায়-বংশের কিসে মান-অপমান হয় সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে ওই পাকা চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার।' পরদিন জামাতার পলায়নবৃত্তান্ত শুনে তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বসন্ত রায় উদয়াদিত্যের নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করায় বললেন, 'যদি জানিতাম উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে…তাহা হইলে, তাহার আজ আর রক্ষা ছিল না। আমি যেখানে ওই-পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নিচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে!…সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোনো, পিতৃব্যঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর, তবে তাহার প্রাণ বাঁচানো দায় হইবে।'

রাত্রের প্রহরীরা কর্মচ্যুত হল। উদয়াদিত্য তাদের সাহায্য করায় সুরমাকে পিত্রালয়ে পাঠাবার আদেশ হল। কিন্তু সুরমার মৃত্যু হল আকস্মিকভাবে। অতঃপর রাজদ্রোহের সন্দেহে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটল। বসন্ত রায় গোপনে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে প্রতাপাদিত্য তাঁকে হত্যা এবং উদয়াদিত্যকে বন্দী করতে সসৈন্য মুক্তিয়ারকে পাঠালেন।

বসন্ত রায়ের ছিন্নমুণ্ডের সঙ্গে উদয়াদিত্য বন্দী হয়ে এলে তাঁকে বিগ্রহ স্পর্শ করিয়ে প্রতাপাদিত্য শপথ করালেন: তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সমরাদিত্যই হবে যশোহর রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী।

প্রতুল সেন ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক সন্ত্রাসবাদী।

প্রভাস মিত্তির ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। জনৈক দেশকর্মী। রমেনকে গুরুর কাছে দীক্ষা দিতে নিয়ে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হন।

ফটিক ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

ফতে খাঁ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। জনৈক রাজানুচর।

ফরু সর্দার ॥ 'গোরা' উপন্যাস। চর-ঘোষপুর গ্রামের মুসলমানদের সর্দার। নীলের জমি নিয়ে নীলকুঠির সাহেবদের সঙ্গে বিরোধে ফরুর দলের লোক নত হয় নি। ফরু পুলিসকে ঠেঙিয়ে দু-বার জেল খাটে। একবার নদীর কাঁচি-চরে চাষ দিয়ে গ্রামের লোক কিছু বোরো-ধান পেয়েছিল। নীলকুঠির ম্যানেজার সেই ধান লুঠ করতে এলে তাঁর হাতে সে এমন লাঠি বসালে যে ডাক্তারখানায় গিয়ে তাঁর হাতখানা কেটে বাদ দিতে হল। এই দুঃসাহসিক ব্যাপারে ফরু সর্দার আর গ্রামের সমস্ত লোক আটক হল। ফরুর নিরন্ন স্ত্রীর এমন দশা হল যে, কাপড়ের অভাবে সে ঘর থেকে বেরোতে পারত না।

ফর্নাণ্ডিজ ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের সেনাপতি। রামচন্দ্রের প্রধান আমোদ ছিল রমাই ভাঁড়ের সামনে তাকে স্থাপন করা। অনবরত হাসির গোলাগুলি খেয়ে ফর্নাণ্ডিজ কাতর। রাজা হাসতেন, হা-হা-হা-হা ; মন্ত্রী হাসত, হোহোহোহোহো। ফর্নাণ্ডিজ তার কোর্তার বোতাম খুলতে-খুলতে এবং পরতে-পরতে হিঃ-হিঃ করে টুকরো-টুকরো হাসি টেনে-টেনে বার করত। ফর্নাণ্ডিজের চোখে চশমা ছিল। রমাই বলত, 'সেনাপতি-মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর-কোনো আপত্তি নাই, কেবল পাছে চশমার কাঁচে কামানের গোলা লাগে ও কাঁচ ভাঙিয়া চোখ কানা হইয়া যায়, এই-যা ভয়।'

রামচন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহের উদ্‌যোগ করায় রাজসভায় মহিষীর সম্বন্ধে পরিহাসে ফর্নাণ্ডিজ বিরক্ত হত। রাজমহিষী বিভা সেই দ্বিতীয় বিবাহের উৎসবের রাত্রে রাজপুরীতে এল। দ্বারী তাকে বাধা দিতে গেলে ফর্নাণ্ডিজ বিলক্ষণ শাসন করলে।

বক্তা ॥ 'করুণা' উপন্যাসের বক্তা। নরেন্দ্রের এক পরিচিত। বালকবয়সে নরেন্দ্রের সুখ্যাতি সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর ভালো লাগত না। তখনই বলতেন, 'নরেন্দ্র, তুমি বড়ো ভালো-ছেলে নও।' পরে তাঁর এই-কথা সত্য প্রমাণিত হয়।

বক্তা ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের বক্তা। জনৈক নবীন লেখক। সংখ্যায় তাঁর পাঠক স্বল্প। অমিত রায় তাদের মধ্যে যোগ্যতায় সেরা। অক্সফোর্ডের এই বি. এ.-র মতে বিশ্বাসবশত নিজের লেখার স্টাইল আছে বলে বক্তার বিশ্বাস—তাই তাঁর সকল-বইয়ের এক-সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি—'ন

পুনরাবর্তন্তে।' বক্তার শালক নবকৃষ্ণের মতান্তর সত্ত্বেও নবকৃষ্ণের সহোদরা অমিতেরই মতানুবর্তী। স্ত্রীলোকের এই আশ্চর্য স্বাভাবিক-বুদ্ধি বক্তার পক্ষে ছিল পরম সন্তোষের বিষয়।

বঙ্কু ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক বুড়ো ফরাশ। অন্দরমহলের নিচের তলায় অন্ধকার ছোটো-কুঠুরিতে প্রত্যহ দীপগুলি ঝাড়ামোছা এবং ঘরে-ঘরে পৌঁছে দেওয়াই বঙ্কুর কাজ ছিল। নববধূ কুমুদিনী স্বেচ্ছায় কিছুকাল সে-কাজ করার পরে বঙ্কুর ডাক পড়ল। বঙ্কু দ্রুতহস্তে কাজ সমাধা করে জিজ্ঞাসা করলে: আগের মতো আসতে হবে কিনা। বঙ্কু সরল প্রকৃতির—কিন্তু সেই-প্রশ্নের মধ্যে শ্লেষ ছিল-বা।

বটু ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। সন্ত্রাসবাদী দলের জনৈক কর্মী। এলার প্রতি এক ক্লেদাক্ত আসক্তিতে বটু অক্টোপাশের মতো তাকে কাছে টানতে চেষ্টা করত—কখনো ড্যাবা-ড্যাবা চোখের লালায়িত দৃষ্টিতে তার অনুসরণ করে ফিরত। এলার প্রেমাস্পদ অতীনের সম্বন্ধে তার অন্ধ ঈর্ষা সাপের মতো কুটিল। একদিন সে 'এলাদি'র বাড়িতে এসে দেখা করবার জেদ করতে লাগল। অতীন বললে, সে স্নানের ঘরে—কেউ উপরে আসে এ তার ইচ্ছা নয়। বটু স্পষ্ট বাঁকা হাসি হাসলে: 'আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্যপ্রয়োগে।'

তার পরে বটুর অন্ধ আসক্তি লালসা-সিদ্ধির উপায় খুঁজল বক্রপথে। পুলিসের কানাকানি-বিভাগে জানিয়ে দিলে সে অতীনের অজ্ঞাতবাসের নিশানা—এলাকেও সেইসঙ্গে টেনে তোলবার মতলবে তাকেও দিলে নেই-ঠিকানা। কোনোরকমে সে-যাত্রা সংকট কাটল। দলের সঙ্গে অতীন একটা খুনের ব্যাপারে লিপ্ত হলে আবার গোয়েন্দা বিভাগে বটু ফাঁস করে দিলে তার নাম। পাছে প্রমাণাভাবে সে শাস্তি না-পায়, তাই মকদ্দমা যাতে ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে না-হয়ে জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে সে-সম্বন্ধেও সাহেবের হুকুম আনাবার মন্ত্রণা করলে। এলাকে একটি পত্রে জানালে: এলা তাকে বিবাহ করতে রাজি হলে সে জামিন হয়ে দায় গ্রহণ করবে। সে-চেষ্টাও নিষ্ফল হওয়াতে সে পুলিসের সঙ্গে রফা করে তাকে কুমিরের গর্তে টেনে তোলবার ষড়যন্ত্র করলে।

বনমালী ভট্টাচার্য ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। জনৈক ঘটক। চিরকুমার-সভার সভ্য-দুটির উপরে বনমালীর দৃষ্টি নিবদ্ধ। একদিন আলাপের ছলে এসে সে কাজের কথা পাড়লে: কুমারটুলির দুটি পরমাসুন্দরী কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে। কিন্তু সভ্যদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী। বনমালী

বললে, 'সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।'

বরদাশংকর ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। যোগমায়ার স্বামী। সমাজ-বিদ্রোহী জ্ঞানদাশংকরের নাতি হয়েও বরদাশংকর এক-দৌড়ে পৌঁছেছিলেন উলটো-দিকের টর্মিনসে। মনসাকে হাতজোড় করতেন, মাদুলি-ধোওয়া জল খেতেন, সহস্র দুর্গনাম-লেখায় তাঁর দিনের পূর্বাহ্ণ কাটত। 'হিন্দুত্ব-রক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফ্লেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অলপকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে-তপে, আসনে-আচমনে, ধ্যানে-স্নানে, ধূপে-ধূনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন।'

যোগমায়ার সঙ্গে বিবাহের পরে বরদাশংকর 'সনাতন সীমান্তরক্ষা-নীতির অটল শাসনে' স্ত্রীর 'গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট-প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' করলেন। দেবী সরস্বতী যখন অন্তঃপুরে আসতেন, 'তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি-বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত, প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলাসাহিত্যের পরবর্তী রচনা…চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট-বাঁধাই বাংলা-অনুবাদ যোগমায়ার শেল্ফে' অপেক্ষমাণ ছিল। 'অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায়-পিতৃদায়-মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।'

বরদাসুন্দরী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর স্ত্রী। বুড়ো-বয়স পর্যন্ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মতো কাটিয়ে হঠাৎ একসময়ে আধুনিক কালের সঙ্গে সমান-তালে চলবার জন্য বরদাসুন্দরী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই তাঁর সিল্কের শাড়ি বেশি খসখস, উঁচু-গোড়ালির জুতো বেশি খটখট করত। পৃথিবীতে কোন্-জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তারই ভেদ নিয়ে তিনি সর্বদা সতর্ক হয়ে থাকতেন। তাঁর এক আত্মীয় জামাইষষ্ঠীর উপহার পাঠালে তিনি তা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার অঙ্গ মনে করে ফেরত পাঠিয়েছিলেন; কোনো ব্রাহ্মপরিবারে মাটিতে আসন পেতে খেতে দেখে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ পৌত্তলিকতার অভিমুখে পিছিয়ে পড়ছে।

বরদাসুন্দরীর তিনটি কন্যা। তাঁর প্রথম সন্তান মনোরঞ্জন ন-বছর বয়সে মারা যায়। কোনো যুবক কোনো বড়ো পাস করেছে বা বড়ো পদ পেয়েছে শুনলে তাঁর মনে হত, মনু বেঁচে থাকলে তার দ্বারাও তেমনটি ঘটত। উপস্থিত সে যখন নেই, তখন জনসমাজে মেয়েদের গুণপনা প্রচারই তাঁর

কর্তব্যের মধ্যে ছিল। পরেশবাবু ঢাকায় থাকতে পিতৃহীনা রাধারানী তাঁর আশ্রিত। নামটি অব্রাহ্ম বোধ হওয়াতে বরদা তার নাম করেন সুচরিতা। পড়াশুনার খ্যাতিতে তাঁর মেয়েরা সেকালের সব বিদুষীকেই ছাড়িয়ে উঠবে, বরদাসুন্দরীর এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। সুচরিতা তাঁর মেয়েদের সঙ্গে মানুষ হয়ে একই ফললাভ করবে, এ তাঁর সুখকর ছিল না। সেজন্য ইস্কুলে যাবার সময় সুচরিতার নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটতে থাকত।

অবশেষে তাঁরা কলকাতায় এলে ব্রাহ্মসমাজের হারানবাবু সুচরিতার দিকে আকৃষ্ট হলেন। এতে তাঁর সম্বন্ধে বরদাসুন্দরীর পূর্বতন শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেল এবং তাঁকে সামান্য ইস্কুলমাস্টার বলে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। নিজের ভাবী-জামাতাদের তিনি ডেপুটিগিরির লক্ষ্যবেধরূপ দুঃসাধ্য-পণে আবদ্ধ বলে কল্পনা করতেন। প্রতিবেশী বিনয়ের সঙ্গে আলাপ হলে তিনি তাঁর মনুর জন্য যথারীতি দুঃখ প্রকাশ করে মেয়েদের গুণপনার পরিচয় দিলেন—তাঁর মেয়েরা খুব পড়াশুনা করছে, মেম তাঁর মেয়েদের বুদ্ধি ও গুণপনা সম্বন্ধে কী বলেছিল, মেয়ে-ইস্কুলে প্রাইজ দেবার সময় লেফ্‌টেনান্ট গভর্নর কী মিষ্টবাক্য বলেছিলেন। এদিকে হারানের সম্বন্ধে সুচরিতার বিরূপতা দেখে তিনি পরেশ-বাবুকে বললেন, 'তুমি সুচরিতার বিয়ে দেবে না নাকি?' পরেশবাবু সুচরিতার মতের অপেক্ষা করায় বললেন, 'দেখো, ওইগুলো আমার ভাল লাগে না।··· উনিই-বা কী এমন অসামান্য! পানুবাবুর মতো বিদ্বান ধার্মিক লোক যদি ওকে পছন্দ করে থাকে, সেটা কি উড়িয়ে দেবার জিনিস?' সেইদিনই তিনি সুচরিতাকে বললেন, 'তুমি যে তোমার বাবাকে ভাবিয়ে তুলেছ।···পানুবাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ একরকম স্থির—এ-অবস্থায় যদি তুমি—।' হারানবাবুকেও আড়ালে ডেকে নিয়ে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, পানুবাবু, আপনি আমাদের সুচরিতাকে বিবাহ করবেন এই-কথা সকলেই বলে···তা-হলে স্পষ্ট করে বলেন না কেন?'

ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউন্‌লোর সঙ্গে পরেশবাবুর আলাপ ছিল। বরদা তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যে নিজের মেয়েদের পারদর্শিতার উল্লেখ করলেন। সাহেবের স্ত্রী কৃষিপ্রদর্শনীর মেলা উপলক্ষে তাঁর মেয়েদের দিয়ে একটি ছোটোখাটো ইংরেজি কাব্যনাট্য অভিনয়ের প্রস্তাব করলেন। বরদাসুন্দরী উৎসাহিত হয়ে বিনয়কেও অভিনয়ে নিতে চাইলেন। বিনয় অভিনয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করায় বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না—আমরা আপনাকে শিখিয়ে ঠিক করে নিতে পারব। ছোটো-ছোটো মেয়েরা পারবে, আর আপনি পারবেন না!' তিনি নিজে ইংরেজি অতি সামান্যই শিখেছিলেন—দলের দু-একজন পণ্ডিতের প্রতি তাঁর ভরসা ছিল। কিন্তু পরে বিনয়ের বিদ্যাবুদ্ধি দেখে তাকে গড়ে নেবার সুখ থেকে বঞ্চিত হলেন। মেজোমেয়ে ললিতা নিজের মতে চলত বলে তাকে তিনি মনে-মনে ভয় করতেন। বিনয় তার প্রশংসা করায় বিনয়ের বিদ্যাবুদ্ধির সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা দৃঢ় হল। কিন্তু অভিনয়ে গিয়ে

বিনয়ের বন্ধু গোরার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের অবিচারে বিনয়-ললিতা রাগ করে চলে এল। সংকটে পড়ে বরদাসুন্দরী মিনতি করেও ব্যর্থ হলেন। শেষে অভিনয় এমন অঙ্গহীন হল-যে তাঁর ক্রোধের সীমা রইল না।

বরদার অনুপস্থিতিতে তাঁর পরিবারে সুচরিতার মাসি হরিমোহিনীর আগমন। বাড়ি এসে তিনি এই অভাবনীয় প্রাদুর্ভাবে একেবারে হাড়ে-হাড়ে জ্বলে গেলেন। জানতেন, স্বামীর কাণ্ডজ্ঞান কিছুমাত্র নেই—হঠাৎ এক-একটা কাণ্ড করে বসেন, তার পরে রাগই করো, বকো আর কাঁদো, একেবারে পাষাণের মূর্তি। প্রয়োজন হলে যার সঙ্গে ঝগড়া করাও অসম্ভব তার সঙ্গে ঘর করতে কোন্ স্ত্রীলোক পারে? মাসির প্রতি সুচরিতার ভক্তিও তাঁর অসহ্য হল: 'মেয়েটির রকম দেখো। যেন আমরা কোনোদিন উহার কোনো আদর-যত্ন করি নাই। বলি, এতদিন মাসি ছিলেন কোথায়!···আমি কর্তাকে বরাবর বলিয়া আসিয়াছি, ওই-যে সুচরিতাকে তোমরা সবাই ভালো-ভালো কর, ও কেবল বাহিরে ভালোমানুষি করে, কিন্তু উহার মন পাবার জো নাই।' স্বামীর কাছে বিরক্তি প্রকাশ করলে খাটো হবার ভয়ে সমাজের সকলের কাছে তিনি হরিমোহিনীর হিঁদুয়ানি, তাঁর ঠাকুরপুজা, ছেলেমেয়েদের কাছে তার কুদৃষ্টান্ত—ইত্যাদি অভিযোগ করতে লাগলেন। নিজের ব্রাহ্মিকাবন্ধুদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে তিনি হরিমোহিনীকে গায়ে পড়ে অপমান করতে লাগলেন। এই-ব্যাপারে হারানের সঙ্গেও তাঁর খুব মতের মিল হল। বললেন, 'যিনি যাই বলুন-না কেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শকে রাখিবার জন্য যদি কাহারও দৃষ্টি থাকে-তো সে পানুবাবুর।'

হারানের সঙ্গে সুচরিতার বিবাহের জন্য বরদাসুন্দরী উঠে-পড়ে লাগলেন। পরেশ সুচরিতার মনের ভাব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করায় বললেন, 'বুঝ'ত পার নি! এতদিন পরে স্বীকার করলে! ওই-মেয়েটিকে বোঝা বড়ো সহজ নয়। ও বাইরে এক-রকম—ভিতরে এক-রকম।' হারানবাবুকে ডাকিয়ে তিনি বললেন, 'পানুবাবু, আপনি ভালোমানষি করলে চলবে না।···ব্রাহ্মসমাজ-সুদ্ধ সকলেই যখন এই-বিয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছে তখন ও আজ মাথা নাড়ল ব'লেই যে সমস্ত উলটে যাবে এ কখনোই হতে দেওয়া চলবে না।···দেখি ও কী করতে পারে।' বরদাসুন্দরীর সন্দেহ ছিল না যে, বিনয় তাঁদের প্রভাবে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করবে—তাকে নিজের হাতে গড়ে তুলছেন বলে বন্ধুদের মধ্যে তিনি গর্ব করতেন। সেই বিনয়কেও শত্রুপক্ষের শিবিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখে তাঁর দাহ উপস্থিত হত। একদিন অগ্নিমূর্তি হয়ে তিনি উপরে গিয়ে হরিমোহিনীকে বললেন, 'দেখো, তুমি আমাদের এখানে যতদিন খুশি থাকো, আমি তোমাকে আদর-যত্ন করেই রাখব। কিন্তু আমি বলছি, তোমার ওই ঠাকুরকে এখানে রাখা চলবে না।' অগত্যা সুচরিতার পৈতৃক-অর্থে অর্জিত একটি বাড়িতে তাদের যাবার কথা হল। সুচরিতার নিজের যে কিছু সংগতি

আছে এই-সংবাদে বরদাসুন্দরীর অভিমান উপস্থিত। সুচরিতার অন্য-কোনো গতি নেই, এই মনে করে এতকাল তাকে আপন পরিবারের আপদ বলে করুণা করতেন; কিন্তু তার ভার-লাঘবের সংবাদে বিন্দুমাত্র প্রসন্নতা অনুভব করলেন না। সুচরিতা ব্যথিতচিত্তে যতই তাঁর কাছে-কাছে ফিরতে লাগল, তিনি ততই দূরত্ব রক্ষা করে চলতে লাগলেন।

এদিকে পানুবাবু ললিতা ও বিনয়ের স্টিমারে আসা নিয়ে কুৎসা রটালেন। বরদাসুন্দরী বিনয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিনয়বাবু, আপনি তো হিন্দু?···হিন্দুসমাজ আপনি-তো ত্যাগ করিতে পারিবেন না?···তবে কেন আপনি—'। বিনয়ের মুখের ভাব দেখে ললিতা ঘরে এসে বললে, 'মা।' বরদাসুন্দরী মনে-মনে শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি হিসাবের খাতাটার মধ্যে নিরুদ্দেশ হবার চেষ্টা করলেন: 'রোস্ বাছা, আমি এই—'। পরে ললিতাকে বিনয়ের বিবাহের প্রস্তাব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন: সে কি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নেবে? বিনয়কে দ্বিধা করতে দেখে বললেন, 'তাহলে এ-কথা নিয়ে আলোচনা করাই আপনার অন্যায় হয়েছে। আপনি কি আমাদের উপকার করবার জন্যে দয়া করে আমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন?' অবশেষে বিনয় দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হলে তাঁর মনে একটা জয়লাভের গর্ব উপস্থিত হল বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষে বিশুদ্ধ প্রীতিকর হল না। ভিতরে-ভিতরে তাঁর ইচ্ছা ছিল, পরেশবাবুর যেন একটা শিক্ষা হয়। তাঁর স্বামীকে প্রচুর অনুতাপ করতে হবে—এই ভবিষ্যদ্বাণী তিনি খুব জোরের সঙ্গে বারবার ঘোষণা করছিলেন।

বিনয়ের দীক্ষার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালেন হারানকে। কিন্তু হারান এসে ব্যাপারটা পণ্ড করতে বসায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বিদায় দিলেন। মুশকিল এই-যে, পরেশবাবুকেও তিনি নিজের পক্ষে পেলেন না, হারানকেও না। হারানের সম্বন্ধে তাঁর পুনরায় মত-পরিবর্তনের সময় এল। অগত্যা নিজেই তিনি বিনয়ের বাসায় গিয়ে তাকে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাছে একটা চিঠি লিখিয়ে নিলেন। চিঠি নিয়ে বাড়ি এসে ভাবলেন, ললিতাকে খুশি করে দেবেন—ললিতা বিনয়কে সিধে করতে পারে নি, তার বাপও সমস্ত মাটি করতে বসেছিলেন। নিজের কৃতিত্ব প্রচারের জন্য তার কাছে কিছু অত্যুক্তি করেই বললেন, সে-চিঠি কি বিনয়ের হাত দিয়ে সহজে বেরোত—ইত্যাদি। পরদিন সকালে দেখা গেল চিঠিখানি ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

বিনয়-ললিতা নিজের-নিজের মতে অবিচল থেকেই বিবাহ করতে ইচ্ছুক। সে-কথা শুনে বরদাসুন্দরী ঝড়ের মতো ঘরে এসে বললেন, 'বিনয়, শুনলুম নাকি তুমি দীক্ষা নেবে না?···তোমাদের এ-সব ষড়যন্ত্র, এ-সব প্রবঞ্চনার মানে কী?···ললিতার তুমি কী সর্বনাশ করতে বসেছ সে-কথা একবার ভেবে দেখলে না!···যাও, তুমি যাও! এ-বাড়িতে তুমি এসো না!' পরেশবাবু এই-সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও বিনয়-ললিতার বিবাহের উদ্‌যোগ করলেন। অবশেষে

ব্রহ্মসুন্দরীর প্রতি সমবেদনা প্রকাশের জন্য তাঁর বন্ধুবান্ধবদের দলে-দলে আসতে দেখে অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা হল। ললিতা বিদায় নেবার সময় মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কঠোর কর্তব্য স্মরণ করে মুখ ফিরিয়ে রইলেন—পরে ললিতা চলে গেলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

বসন্ত ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। বিহারীর আশ্রিত একটি বালক। প্রতিবেশী রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিস্ফুট গৌরসুন্দর আট-বছরের ছেলে।

বসন্ত ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার জনৈক অনুচর। গোরার সঙ্গে পায়ে হেঁটে বসন্ত দেশভ্রমণে গিয়েছিল—কিন্তু তার উৎসাহের সঙ্গে তাল রাখতে না-পেরে অসুস্থতার ছুতোয় সরে পড়ে।

বসন্ত রায় ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। ঐতিহাসিক রায়গড়পতি। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্যকে মানুষ করেন। বার্ধক্যে উপনীত হয়ে তিনি মোঘলের সঙ্গে সদ্ভাবস্থাপন করে রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন; সৈন্যরা তলোয়ার ছেড়ে লাঙল ধরে। গেয়ে-বাজিয়ে-নেচে তিনি চারদিক পূর্ণ করে রাখতেন। প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য এবং মেয়ে বিভা তাঁর প্রিয়পাত্র। যেদিন রায়গড়ে তালগাছটার উপরে মেঘ জমত, বসন্ত রায়ের মন আনন্দে নেচে উঠত—সেদিনই তিনি নাতি-নাতনীদের দেখবার জন্য চলে আসতেন যশোহরে।

মোগলের সঙ্গে তাঁর এই সদ্ভাবে প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। একবার যশোহরের পথে তাঁর প্রেরিত দুটি পাঠান বসন্ত রায়কে হত্যা করতে এল। একজন গ্রামে বিপদের ছল করে তাঁর অনুচরদের চেয়ে নিয়ে গেল। আর-একজন তাঁকে শোনালে দুটি বয়েত। বসন্ত রায় পালকি থেকে তাঁর টাকবিশিষ্ট মাথাটি বের করলেন: 'খাঁ সাহেব, তুমি বড়ো ভালো লোক।...সাহেব, যে-দুইটি বয়েত আজ বলিলে, ওই-দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।...তোমার যে-রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে-তো তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।...আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে...তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়ো হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়...এখন তলোয়ারের পরিবর্তে আর-একজন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে।'—এই বলে তাঁর পার্শ্বশায়িত সেতারটিকে ঝংকার দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে তিনি বাইরে এসে গান ধরলেন। বললেন, 'বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকলগুলিরই একটি-না-একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যতগুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি-না-একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভালো লাগে এমন দুটো

অর্বাচীন আছে।' চুপিচুপি বললেন, 'কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।' এমন সময়ে উদয়াদিত্যের আগমনে তিনি ষড়যন্ত্রের কথা শুনলেন; তবুও যশোহরে যেতে নিবৃত্ত হলেন না। তাকে বললেন, 'আমি-তো ভাই, ভবসমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল। কিন্তু এই পাপকার্য করিলে প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে-হানি হইত তাহা ভাবিয়া আমি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?'

যশোহরের রাজসভায় তাঁকে দেখেই প্রতাপাদিত্যের ভাবান্তর ঘটল। বসন্ত রায় তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বললেন, 'আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করতে পারি এমন শক্তি আমার নাই···যদি দৈবাৎ এমন-একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সংকোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিয়ো না।···এস বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি।' সন্ধ্যার সময়ে তিনি বিভার ঘরে এসে গান ধরলেন। বললেন, 'আমি গোটা-পনেরো গান ও একমাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সেগুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না।' বিভা বললে, 'তোমার আধমাথা-বই চুল নাই-যে দাদামহাশয়।' বসন্ত রায় টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'সে একদিন গিয়াছে-রে ভাই। যেদিন বসন্ত রায়ের মাথায় একমাথা চুল ছিল, সেদিন কি আর এত-রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোশামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মতো পাঁচটা রূপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত।' বিভার প্রশ্ন: যখন তাঁর একমাথা চুল ছিল তখন কি তিনি আরো ভালো দেখতে ছিলেন? বসন্ত রায় বললেন, 'সে-বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাঁহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনো একটা মত স্থির করিতে পারে নাই।'

বিভার মলিন মুখ দেখে বসন্ত রায় জামাতাকে আনাবার ব্যবস্থা করলেন। জামাতা এলে এক সামান্য অপরাধে সহসা তার বধের আদেশ হল। অর্ধরাত্রে উদয়াদিত্যের কাছে সমস্ত শুনে বসন্ত রায় ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না দাদা না, এ-কি কখনো হয়? এ-কি কখনো সম্ভব?' বিছানা থেকে উঠে যেতে-যেতে বললেন, 'দাদা, এ কি কখনো হয়? এ কি কখনো সম্ভব?' প্রতাপাদিত্যকে বোঝাতে তাঁর কক্ষে এসেও বললেন, 'বাবা প্রতাপ, এ-কি কখনো সম্ভব?··· ছেলেমানুষ, অপরিণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্যপাত্র?···প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে-ছুরি একজনের উপর পড়িতেই চায়।···তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক।···এ-মুখে যৌবনের রূপ নাই। যম নিমন্ত্রণলিপি পাঠাইয়াছে, সে-সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে।'—বলে কেঁদে

উঠলেন। পরদিন জামাতার পলায়ন-সংবাদে যশোহর থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হল। বিদায়কালে তিনি অশ্রুচোখে উদয়াদিত্যকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না।'

সীতারাম রায়গড়ে এসে সংবাদ দিলে : উদয়াদিত্য কারাগারে। বসন্ত রায় তার হাত ধরে দুই-চোখ ঊর্ধ্বে তুলে বললেন, 'তাহা-হইলে দাদা এখন কোথায়?···তাহা হইলে দাদা এখন কী করিতেছে?···তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না?' অবশেষে নিজের মনেই বলে উঠলেন, 'দাদা, তুই আমার কাছে আয়-রে, তাকে কেহ চিনিল না'—বলে আবার তিনি রওনা হলেন যশোহরে। সেখানে এসে উদয়াদিত্যের সঙ্গে দেখা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। তখন সীতারাম কৌশলে যুবরাজকে মুক্ত করে আনলে। বিস্মিত উদয়াদিত্যের হাত ধরে বসন্ত রায় বললেন, 'হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি। এ-যে পাষাণ-হৃদয়ের দেশ—এরা তোকে ভালোবাসে না।' উদয়াদিত্যকে নিয়ে তিনি নৌকায় রায়গড়ে এলেন। সেখানে তাকে সুখী করবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। একদিন রাত্রে তিনি দুঃস্বপ্ন দেখলেন। উদয়াদিত্যকে বললেন, 'দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড়ো দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি।···তোতে-আমাতে যেন জন্মের মতো ছাড়াছাড়ি হইতেছে।···এ বুড়াবয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস নে ভাই।'

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বসন্ত রায় আহ্নিকে বসেছেন—হঠাৎ ঘরের মধ্যে দেখলেন যশোহরের সেনাপতি মুক্তিয়ারকে। দেখে তিনি আতিথ্যের আয়োজনে উদ্যত। কিন্তু সেনাপতির ব্যস্ততায় শেষে প্রতাপাদিত্যের অমঙ্গল-আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হলেন। পরে দেখলেন তার হাতে নিজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। বসন্ত রায় মুক্তিয়ারের কাছে এসে প্রশ্ন করলেন, 'এ-কি প্রতাপের লেখা?···খাঁ-সাহেব, এ-কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?···প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম, সে আমাকে একমুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না।···সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে এই লেখা লিখিয়াছে খাঁ সাহেব?' পরে বললেন, 'দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?' উদয়াদিত্য বন্দী শুনে তিনি সাশ্রুনেত্রে সেনাপতির হাত ধরলেন : 'একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ-সাহেব!' পরমুহূর্তে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'এ-সংসারে কাহারও দয়ামায়া নাই, এস সাহেব, তোমার আদেশ পালন করো।' মুক্তিয়ারকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করে বললেন, 'প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখো খাঁ-সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম। সে নিরপরাধ—দেখিয়ো অন্যায়-বিচারে সে যেন আর কষ্ট না-পায়।' এই বলে তিনি ইষ্টদেবতার কাছে ভূমিষ্ঠ হয়ে খাঁ-সাহেবকে ইঙ্গিত করলেন। গৃহে রক্তস্রোত বইল।

বাবা (মহেন্দ্রের) ॥ 'করুণা' উপন্যাস। মহেন্দ্রের বাবা। অর্থলোভে শ্রীহীনা রজনীর সঙ্গে তিনি ছেলের বিবাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু মহেন্দ্রের গতিক দেখে ভাবলেন : তাঁরই বোঝার ভুল—কলেজে পড়লে ছেলেরা অবাধ্য হবে, এ-তো কথাই আছে। মহেন্দ্র নিরুদ্দিষ্ট হলে আবার তিনি দোষারোপ করলেন রজনীকেই : 'রাক্ষসী! তুই এ-সংসার ছারখার করিয়া দিলি।' মহেন্দ্র বাড়ি এসে যখন স্ত্রীর প্রতি সদয় ব্যবহার করতে লাগল, তিনি চশমা-সহযোগে নিরীক্ষণ করে দেখলেন : সে-তো ঝুটা মহেন্দ্র নয় ?

বাবু ॥ 'গোরা' উপন্যাস। জনৈক বাবু। রাস্তা দিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে বাবুর সামনে পড়ল এক বৃদ্ধ ঝাঁকাওয়ালা। কোনোমতে বৃদ্ধের প্রাণ বাঁচল—কিন্তু ঝাঁকাসমেত জিনিসগুলো রাস্তায় গড়াগড়ি। ক্রুদ্ধ বাবু কোচবাক্স থেকে নেমে 'ড্যাম-শুয়ার' বলে তার মুখে চাবুক বসিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তে গোরাকে পিছনে ছুটতে দেখে ঘোড়াদুটোকে চাবুক কষিয়ে অদৃশ্য।

বাবু ॥ 'গোরা' উপন্যাস। জনৈক বাঙালিবাবু। ত্রিবেণীগামী এক স্টিমারের ফারস্ট্-ক্লাসের আরোহী। স্টিমারে ওঠার সময় স্থানাভাবজনিত ব্যাকুলতায় যাত্রীদের মধ্যে ঠেলাঠেলি। বাবু চুরুটমুখে তা নিয়ে এক ইংরেজের সঙ্গে হাস্যালাপ করছিলেন। গোরা এসে ধিক্কার দিতে বললেন, 'লজ্জা! দেশের এই-সমস্ত পশুবৎ মূঢ়দের জন্যই লজ্জা।' গোরা বললে, 'মূঢ়ের চেয়ে বড়ো পশু আছে—যার হৃদয় নেই।' বাঙালি রাগ করে বললেন, 'এ তোমার জায়গা নয়—এ ফারস্ট্ ক্লাস।' বলে এ-দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে নিজের পার্থক্য প্রমাণের জন্য তিনি খানসামাকে ডেকে মুরগির খোঁজ করলেন। পরে টেবিল থেকে সাহেবের খবরের কাগজ পড়ে যেতে কুড়িয়ে দিলেন। কিন্তু থ্যাংক্স্ পেলেন না।

বিক্রমসিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। সম্রাট শাজাহানের আমলের জনৈক বিজয়গড়পতি। বিক্রমসিংহ পরম ধর্মনিষ্ঠ—দেবতা-ব্রাহ্মণ এবং অতিথিসেবায় নিযুক্ত। শাজাহানের শেষবয়সে তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে দারার প্রেরিত সৈন্যদের প্রতিরোধের জন্য সুজা বিজয়গড়ে আশ্রয় চাইলেন। বিক্রমসিংহ বললেন, 'আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি। সুজা কে, আমি তাহাকে জানি না।' সুজা দু-দিন যুদ্ধ করেও দুর্গ অধিকারে অক্ষম হলেন। দারার সেনাপতি জয়সিংহ তাঁকে বন্দী করায় বিক্রমসিংহ তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পরে খড়্গসিংহের নিবুদ্ধিতায় সুজা পলায়ন করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তার নির্বাসন দিলেন। অবশেষে জয়সিংহের অনুরোধে তাকে মার্জনা করেন।

বিধু ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। গাজিপুরের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর বড়ো-মেয়ে।

বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায় ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার আবাল্যবন্ধু বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সে সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালির মতো নম্র, অথচ উজ্জ্বল। স্বভাবের সৌকুমার্যে, বুদ্ধির প্রখরতায় বিশিষ্ট মুখশ্রী। কলেজে সে বরাবরই বেশি নম্বর ও বৃত্তির অধিকারী। পাঠ্যবিষয়ে গোরাকে সাহায্য করে সে-ই তাকে পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ করেছিল। বিনয়ের বাপ-মা ছিল না, খুড়া ছিলেন দেশে। ছেলেবেলা থেকে পড়াশুনা নিয়ে সে কলকাতার বাসায় একলা মানুষ। গোরার সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে তার মা আনন্দময়ীই ছিলেন মায়ের মতো। বাল্যকালে ইস্কুল থেকে ফিরে গোরাদের বাড়ির ছাদে উভয়ে খেলা করত; কলেজে পাস করা যখন একটাও-আর বাকি ছিল না, তখনও মাসে-মাসে সেখানেই তাদের হিন্দুহিতৈষী সভা বসত।

শ্রাবণ মাসের সকালে পাশের বাড়ির ছাদে কয়েকটা কাক আর চড়ুইদম্পতির কোলাহল। আলখাল্লা-পরা এক বাউল গাইছিল: 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়'। সবসুদ্ধ মিলিয়ে বিনয়ের মনে একটা অস্পষ্ট ভাবাবেশ। সহসা তার বাড়ির সামনে এক জুড়িগাড়ির আঘাতে কাত হয়ে পড়ল একটা ঠিকাগাড়ি। গাড়ি থেকে নামল সতেরো-আঠারো বছরের একটি মেয়ে। আর একটি বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামতে গিয়ে সহসা মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বিনয় তাঁকে বাসায় এনে সুস্থ করলে। নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্র স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিনয়ের কোনোদিন পরিচয় ছিল না—টেবিলের আয়নায় মেয়েটির স্নেহে আনত উদ্‌বিগ্ন মুখখানি দেখে তার মনে হল সৃষ্টির সদ্যঃপ্রকাশিত এক বিস্ময়ের মতো। বৃদ্ধের নাম পরেশ ভট্টাচার্য। মধ্যাহ্নে মেয়েটির ভাই সতীশ ডাক্তারের জন্য টাকা নিয়ে এলে বিনয় স্নেহে-আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। সতীশ তার দিদি সুচরিতার সঙ্গে পরেশবাবুর আশ্রিত।

বিনয়ের হৃদয়বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল। তর্কের সময় কোনো-মতকে উচ্চস্বরে প্রচার করলেও সে মানুষকে মানত তার চেয়ে বেশি। গোরার প্রচারিত মতগুলি সে গ্রহণ করেছিল মতের জন্য নয়, গোরার সম্বন্ধে অসামান্য ভালোবাসার টানে। আনন্দময়ী তার মা এবং মাতৃভূমির প্রতিমাস্বরূপা। খাওয়া-ছোঁওয়ার বাদ-বিচার তাঁর না-থাকায় গোরা তাঁর হাতেও খেতে বাধা দিতে লাগল। দেশকে উদ্ধার, সমাজকে রক্ষা, এই-সমস্ত কর্তব্যকে বিনয় তখন মনের মধ্যে সত্য করে অনুভব করতে পারলে না। ব্যথিতচিত্তে আনন্দময়ীর মুখখানি স্মরণ করে সে বললে, 'তোমার অন্ন যে আমার অমৃত নয় এ-কথা কোনো শাস্ত্রের প্রমাণেই স্বীকার করিব না।' ব্রাহ্ম পরেশের বাড়ি গোরার অসন্তোষের ভয়ে বিনয় যেতে পারত না। একদিন তিনি নিজেই এলে বিনয়ের মনে হল, তার ভারতবর্ষ যেন নিষেধেরই প্রতিমূর্তি। সমস্ত

সংকোচ দূর করে তখনই সে আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করলে। তার পরে গেল পরেশের বাসায়। সুচরিতার সঙ্গে অকুণ্ঠিত আলাপ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না ; কিন্তু সতীশ মাঝখানে থাকাতে সংকোচ ভাঙতে তার দেরি হল না। কথাপ্রসঙ্গে গোরার অসামান্য প্রতিভা, তার হৃদয়ের বিশালতা ও হিন্দুসমাজের প্রতি তার শ্রদ্ধার আলোচনায় সে উৎসাহিত হয়ে উঠল। এমন সময়ে পিতার নির্দেশে গোরা একটা সংবাদ নিতে এসে সেই ব্রাহ্ম-পরিবারে অসংকোচে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করতে লাগল। বিনয় পীড়িত হয়ে তাকে দেখাবার জন্যই যেন জোর করে সেখানে চা পান করলে।

বিনয় জীবনে এমন আনন্দের স্বাদ কখনো পায় নি। কিন্তু গোরার বন্ধুত্ব তার জীবনেরই অঙ্গীভূত। এতকাল সে শুধু বই পড়েছে, গোরার সঙ্গে তর্ক করেছে এবং তাকেই ভালোবেসেছে। পরদিন অনুতপ্ত হয়ে সে গেল গোরার কাছে। গোরার দাদা মহিম তাঁর মেয়ে শশিমুখীর সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করায় গোরার সঙ্গে এই উপলক্ষে পরামর্শের সুযোগ পেয়ে খুশি হল। রাত্রে গোরার কাছে এসে সে পরিপূর্ণভাবে মনের কথাকে বাধামুক্ত করে দিলে। বললে, 'ভাই গোরা, আমার বুক ভরে উঠেছে।···ঠিক যেন ছবিতে জল দেখে মনে করতুম সাঁতার দেওয়া খুব সহজ—কিন্তু আজ জলের মধ্যে পড়ে এক-মুহূর্তে বুঝতে পেরেছি, এ-তো ফাঁকি নয়।' বিনয় বলতে লাগল : তার দিনরাত্রির মধ্যে কোথাও আর ফাঁক নেই—সমস্ত আকাশের মধ্যে কোনো রন্ধ্র নেই, সমস্তই নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ—বসন্তকালের মউচাক যেমন মধুতে ভরা, সমস্ত বিশ্বচরাচর যেন তেমনই অর্থময়। গোরার মত ছিল গার্হস্থ্য প্রয়োজনের বাইরে মেয়েদের স্থান দেওয়ার বিপক্ষে। বিনয় তা অনুভব করে বললে, 'দেখো, গোরা···আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা করে দেখি।···দেশকে তুমি যেন নারীহীন করে জান—সেরকম জানা কখনোই সত্য জানা নয়।···মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্ধসত্য হয়ে আছে—আমাদের হৃদয়ে পূর্ণপ্রেম এবং পূর্ণশক্তি দিতে পারছে না।' শশিমুখীর সঙ্গে বিবাহে মত দিয়ে বিনয় নিজেকে যেন জামিন রেখে অসংকোচে পরেশের বাড়ি যাতায়াত করতে লাগল। গোরার প্রতি তার আনুগত্য পরেশের মেয়েদের পরিহাসের বস্তু ছিল। পরেশের মেজো-মেয়ে ললিতার বারংবার আঘাতে বিনয়ের মনের মধ্যে গোরার সম্বন্ধে একটা বিদ্রোহ জাগল। শশিমুখীর সঙ্গে তখন বিবাহের কথা উঠলে হঠাৎ সে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। পরে অনুতপ্ত হয়ে আবার সে মহিমের কাছে গিয়ে মত দিলে।

পরেশবাবুদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে বিনয় গোরাকে সেখানে নিয়ে গেল। পরেশের স্ত্রী বরদাসুন্দরীর অনুরোধে ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউন্‌লোর বাড়ি ইংরেজি নাটকের অভিনয়ে যেতে বিনয় রাজি ছিল না—সেজন্য ললিতার

বিদ্রূপ তাকে সহ্য করতে হল। বিনয় ললিতাকে দেখেছিল সুচরিতার পশ্চাদ্‌বর্তিনীরূপে। কিন্তু অংকুশাহত হাতি যেমন তার মাহুতকে ভোলবার অবকাশ পায় না, ললিতার সম্বন্ধে তার দশা হল তেমনই। পরদিন সতীশের হাতে ললিতার দুটি বসোরা-গোলাপ পেয়ে ফুল-দুটি আনন্দময়ীর পায়ে ঠেকিয়ে সে প্রসাদী করে নিলে। অপরাহ্ণে ললিতার সঙ্গে সন্ধির চিহ্নস্বরূপ নিয়ে এল একগুচ্ছ শ্বেতকরবী। ললিতাকে অপ্রতিভ দেখে সে ভাবলে, অভিনয় সম্বন্ধে তার বিরুদ্ধতাই তার মনে লেগে আছে। তাই তাকে খুশি করতে অভিনয়ে মত দিলে। নিজের আবৃত্তিতে সে যেমন সবাইকে মুগ্ধ করলে, ললিতার জড়তাহীন স্পষ্ট উচ্চারণেও সে বিস্মিত। ললিতার মনের বিরোধ ইতিমধ্যে অপসৃত হওয়াতে তার বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল।

গোরা তখন দেশভ্রমণে গিয়েছিল—আর দূরে সরে গিয়েছিল সুচরিতা। ললিতাকে কাছে পেয়ে বিনয় এই আঘাত সহজেই উত্তীর্ণ হয়ে গেল। বরদাসুন্দরীর দলের সঙ্গে সে এল অভিনয়ে। গোরাও দৈবক্রমে সেখানে এসে একদল পাহারাওয়ালার সঙ্গে মারপিট করে ব্রাউন্‌লোর বিচারে গেল জেলে। তখন ম্যাজিস্ট্রেটের অতিথি হয়ে স্নানাহারে অক্ষম বিনয় কলকাতাগামী স্টিমারে এসে উঠল। পরে তাকে অনুসরণ করলে ললিতা। গোরার অপমানের প্রতিকার-চেষ্টায় প্রবৃত্ত সেই স্বাধীন-বুদ্ধিশালিনী নারীকে বিনয় নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করলে। বিনয়ের জীবনে স্ত্রী-মাধুর্যের নির্মল দীপ্তি নিয়ে প্রথম সন্ধ্যাতারাটির মতো উদিত হয়েছিল সুচরিতা। ইতিমধ্যে উঠেছিল আরও-একটি তারকা; এবং সেই জ্যোতিরুৎসবের ভূমিকা করে দিয়ে প্রথম তারাটি দিগন্তে অবতরণ করেছিল। ললিতা সকলকে ছেড়ে এসে তারই পাশে দাঁড়িয়েছে—এই নৈকট্যের পুলকপূর্ণ স্পন্দনটুকু বিনয়ের বুকের মধ্যে গুরুগুরু করে উঠতে লাগল। ললিতা ঘুমোতে গেলে বাইরের ডেকে সে পায়চারি করতে লাগল। শুক্তির মধ্যে মুক্তাটুকু যেমন, সেই গ্রহতারাখচিত নিঃশব্দ তিমিরবেষ্টিত আকাশমণ্ডলের মাঝখানটিতে ললিতার সুডোল সুন্দর বিশ্রামটুকু তেমনই যেন সে রক্ষকতার ভার নিলে।

পরেশবাবুর বাড়ি সুচরিতার বিধবা মাসি' হরিমোহিনীকে দেখে তাঁর অশ্রুমার্জিত পবিত্র মুখশ্রীতে মুগ্ধ হয়ে বিনয় তাঁকে সম্বোধন করলে মাসি বলে। সহসা ললিতার বিরক্তির আভাস পেয়ে তার স্বাভাবিক সহাস্যতা এক-ফুৎকারে গেল নিভে। তখনি আনন্দময়ীর কাছে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল—আনন্দময়ীর কাছে আশ্রয় নিয়ে সে নিজের খাওয়াদাওয়া-সেবাশুশ্রূষার ব্যাপারে নানা আবদার করতে লাগল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁর প্রসারিত পায়ের তলায় মাথা রেখে সে বললে, 'মা, ইচ্ছা করে আমার বিদ্যাবুদ্ধি বিধাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শিশু হয়ে তোমার ওই কোলে আশ্রয় গ্রহণ করি—কেবল তুমি, সংসারে তুমি ছাড়া আমার আর কিছুই না থাকে।' আনন্দময়ীর প্রশ্নে

তাঁর কাছে ক্রমে-ক্রমে সে পরেশবাবুদের সমস্ত নিবেদন করে ভারমুক্ত হল। একদিন ললিতার সঙ্গে সুচরিতা এসে তার স্বেচ্ছারচিত দূরত্বের অনুযোগ করায় বললে, 'দিদি···তুমি নিজে কত দূরে চলে গিয়েছ, এখন অন্যকে দূর বলে মনে করছ।' এদিকে ললিতার সঙ্গে তার স্টিমারযাত্রার প্রসঙ্গ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের হারানের কুৎসায় তাকে তিরস্কৃত হতে হল বরদাসুন্দরীর কাছে। বিনয় যেন কিছুদিন স্বর্গলোকে স্থান পেয়েছিল দেবদূতের ভুলক্রমে—অনধিকারপ্রবেশের সমস্ত লজ্জা বহন করে আবার তাকে হতে হল নির্বাসিত। ললিতার অবমাননায় তার বেদনার সীমা রইল না—কিন্তু সেই ধিক্কারের মধ্যেও তার চিত্তের একপ্রান্ত থেকে অন্য-প্রান্তে সঞ্চরণ করে ফিরতে লাগল একটি গভীর সূক্ষ্ম আনন্দ। উদ্‌বেলিতচিত্তে সে গেল আনন্দময়ীর কাছে।

আনন্দময়ীর কথায় পরেশের কাছে গিয়ে তাঁর সংকটের উল্লেখ করে বিনয় ললিতাকে বিবাহ করতে চাইলে। পরেশবাবু এই সামাজিক অশান্তিকে গুরুত্ব দিলেন না। বিনয় তাতে উল্লসিত না-হয়ে বললে, 'আমাকে যদি আপনারা যোগ্য মনে করেন তবে তার চেয়ে আনন্দের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না।' কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষার কথায় সে সংকুচিত হল: 'আমি-যে হিন্দুসমাজের কেউ নই এ-কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।' গোরা জেল থেকে ফিরে এলে বিনয় জানালে: অনিবার্য ঘটনাক্রমে ললিতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তাকে তার বিবাহ করা কর্তব্য। গোরা সমাজের প্রতি কর্তব্যের উল্লেখ করায় সে উত্তেজিত হয়ে উঠল: 'সমাজ যদি আমার কোনো ন্যায়সংগত ধর্মসংগত স্বাধীনতায় বাধা দেয় তা-হলে সেই অসংগত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের প্রতি কর্তব্য করা হয়।' সমাজের সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় আগে সে ছিল কাতর—কিন্তু এই তর্কের ফলে তার প্রবৃত্তি কর্তব্যবুদ্ধিকে সহায় করে উদ্বেল হয়ে উঠল।

বিনয়ের আত্মবিশ্লেষণ-শক্তির অভাব ছিল না, অভাব ছিল শক্তির। একদিন সুচরিতার আহ্বানে সে সেখানে যেতে ললিতা উঠে গেল। বিনয় ভাবলে: ললিতার এই-অবজ্ঞা তার প্রাপ্য—তাকে গোরা-গ্রহের উপগ্রহমাত্র মনে করে সে ধিক্কার দিয়ে গেল। বাড়ি ফেরার পথে পরেশকে দেখে মুহূর্ত-পূর্বে যে-সংকল্প তার মনে স্পষ্ট ছিল না, তাই বলে বসল: 'আপনার কাছে দীক্ষাগ্রহণ করি এই আমার বাসনা।' কিন্তু দীক্ষার প্রসঙ্গে হারানকে দেখে তার চিত্ত আবার বিমুখ হল। আনন্দময়ী বোঝালেন, এই বিবাহের জন্য তার হিন্দুসমাজ ত্যাগ করা অনাবশ্যক। ললিতাও তাঁকে সমর্থন করায় উভয়ের মধ্যে আর সংকোচ রইল না—দুটি হৃদয় যেন গঙ্গা-যমুনার মতো একটি পুণ্যতীর্থে মিলনের জন্য অগ্রসর হল। ললিতার সঙ্গে এসে পরেশবাবুকে প্রণাম করে বিনয় বললে, 'আমরা দুজনে একত্রে আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছি। সেই আমাদের জীবনের সত্যদীক্ষা হবে।···বাঁধা-নিয়মে বাঁধা-কথায় সমাজে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ আমি

করব না।···হিন্দুসমাজ তো বরাবরই নূতন-নূতন সম্প্রদায়কে আশ্রয় দিয়েছে, হিন্দুসমাজ সকল ধর্মসম্প্রদায়েরই সমাজ হতে পারে।' পরে শালগ্রামশিলা সম্বন্ধে ললিতার সংকোচ দেখে বিবাহকালে তাও বাদ দেওয়া স্থির হল।

গোরার সঙ্গে দেখা হলে আবার তর্ক বেধে উঠল—কথার উপরে কথা বাণের উপরে বাণের মতো পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করতে লাগল। বিনয় বললে, 'গোরা, তোমার এবং আমার প্রকৃতির মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ আছে।···তোমার বন্ধুত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি চিরদিনই নিজের প্রকৃতিকে খর্ব করে এসেছি। আজ বুঝতে পারছি এতে মঙ্গল হয় নি এবং মঙ্গল হতে পারে না।' বিনয় তার বন্ধুকে হারালে—তার খুড়োও তাকে ত্যাগ করলেন। বিবাহের দিন প্রত্যুষে আবার সে এল বন্ধুর কাছে: 'ভাই গোরা, আজ সোমবার।···তুমি হয়তো যাবে না, জানি—কিন্তু আজকের দিনে তোমাকে একবার না-বলে এ-কাজে আমি প্রবৃত্ত হতে পারব না।' তার হৃদয়ের পঞ্চম-সুরে বাঁধা তারটি সহসা গানের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: জীবনের এ-কী অপূর্ব অভিজ্ঞতা—এই অনির্বচনীয় বস্তুটিকে হৃদয় পূর্ণ করে কি সকলে পায়? অন্য সবার সঙ্গে গোরা যেন তার তুলনা না-করে। সবার জীবনে এমনটি ঘটতে পারলে বসন্তের পুষ্পবনের মতো সমস্ত সমাজ প্রাণের হিল্লোলে চারিদিকে চঞ্চল হয়ে উঠত। সে বললে, 'গোরা, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, মানুষের সমস্ত প্রকৃতিকে এক-মুহূর্তে জাগ্রত করিবার উপায় এই প্রেম—যে-কারণেই হউক, আমাদের মধ্যে এই-প্রেমের আবির্ভাব দুর্বল—সেইজন্যই আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত···সেইজন্যই চারিদিকে এমন নিরানন্দ, এমন নিরানন্দ! সেইজন্যই আমাদের নিজের মধ্যে যে কোনো মাহাত্ম্য আছে···সাধারণের চিত্তে তাহার কোনো চেতনা নাই।'

বিনোদিনী ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মীর বাল্যসখী হরিমতী[*] কন্যা। বিনোদিনী তার দরিদ্র পিতার একমাত্র সন্তান, তবু মিশনারি মেমের কাছে পড়াশুনা ও কারুকার্য শিখেছিল। হঠাৎ অকালে পিতার মৃত্যুতে তার বিধবা মা পাত্রের সন্ধানে অস্থির হয়ে উঠলেন। অর্থের অভাব—তাতে কন্যার বয়সও বেশি। মহেন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহ-প্রস্তাব ব্যর্থ হল। পরে তার বন্ধু বিহারীও বিমুখ হতে রাজলক্ষ্মীর দূরসম্পর্কের এক ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনের সঙ্গে তার বিবাহ হল।

তিন-বছর পরে আশার সঙ্গে মহেন্দ্রের বিবাহ। সেই-বধূকে উপলক্ষ করে নানা ঘাতপ্রতিঘাতে রাজলক্ষ্মী বিহারীর সঙ্গে এলেন বারাসাতে। বিনোদিনী তখন বিধবা হয়ে সেই ঘনজঙ্গল নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো কষ্টে জীবনযাপন করত। পিসশাশুড়িকে সে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললে, 'আহা, কতদিন পরে জন্মভূমিতে আসিয়াছ, এখানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে

আদর করিব।' রাজলক্ষ্মীর সেবায় তার আলস্য রইল না। বিহারী মহেন্দ্রের একখানা চিঠি রাগ করে ফেলে দিলে। রাজলক্ষ্মী সেটি তাকে পড়তে দিলেন। মহেন্দ্র রঙ্গে-রহস্যে মাতাল হয়ে আশার কথা লিখেছিল। দ্বার রুদ্ধ করে বিনোদিনী চিঠিখানা পড়তে লাগল—পড়তে-পড়তে তার দু-চোখ মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলতে লাগল। মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, এই তার মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। পরে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সে এল কলকাতায়। বিনোদিনী তার জোড়া-ভ্রূ, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি, নিখুঁত-মুখ আর নিটোল-যৌবন নিয়ে আশার গলা জড়িয়ে বললে, 'ভাই, তোমার সৌভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি দুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।' বিনোদিনী সর্বগুণশালিনী। দাসদাসীদের কাজে নিয়োগ করতে, ভর্ৎসনা করতে, আদেশ করতে তার প্রভুত্ব স্বভাবসিদ্ধ। আশার সঙ্গে তার প্রণয় অচিরে পল্লবিত হয়ে উঠল। আশা কিছু-একটা পাতাতে চাইলে বিনোদিনীর পছন্দ হল—'চোখের বালি'।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী আশার নবপ্রেমের ইতিহাস জ্বালাময় মদের মতো কান পেতে পান করত। মহেন্দ্র কলেজে গেলে বুকের নিচে বালিশ টেনে তার গুনগুন-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হয়ে যেত। আশা পরিহাস করে বলত, 'একবার মনে করিয়া দেখো-দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত।' বিনোদিনীও ভাবত: 'এমন সুখের ঘরকন্না—এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ-স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তখন কি এ-ঘরের এই দশা, এ-মানুষের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কিনা এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।' আশাকে সে গৃহকাজে প্রবৃত্ত করাত। অপরাহ্নে তার চুল বেঁধে সাজিয়ে স্বামি-সম্মিলনে পাঠাত। তার কল্পনাও যেন সেই সজ্জিতা-বধূর পিছনে-পিছনে অবগুণ্ঠিতা হয়ে মুগ্ধ যুবকের অভিসারে যেত। আশা স্বামীর সঙ্গে তার পরিচয় করাতে চাইলে বিনোদিনী রাজি হল না—অবশেষে একদিন সরল-নিরীহের মতো যেন সেই ফাঁদের মধ্যে ধরা দিলে। অতঃপর উভয়পক্ষের আলাপ বহুদূর অগ্রসর হল। আমোদের প্রলোভনে ছুটি-নেওয়া কোনোমতে বিনোদিনী প্রশ্রয় দিত না—রান্নাবাড়া-ঘরকন্না আর রাজলক্ষ্মীর সেবা নিঃশেষে সমাধা করে তবে সে যোগ দিত আমোদে। আশার অনভ্যস্ত হাত থেকে সে মহেন্দ্রের সেবার ভার নিলে। একদিন বিহারী খোঁজ নিতে এলে মহেন্দ্র মাথা-ধরার ভান করলে। বিনোদিনী উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওডিকোলন বেঁধে দিলে। বিহারী এই বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হতে সে বুঝলে: বিহারী সমস্ত মাটি করতে এসেছে—তার সামনে তাকে সশস্ত্রে থাকতে হবে। অবশেষে দু-বন্ধুতে মনোমালিন্যের উপক্রম হওয়াতে বিনোদিনী বাড়ি যেতে উদ্যত। বিহারী মিনতি করতে এলে সে দু-চোখ নত করে বললে, 'আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া

আমার পক্ষে কঠিন—কিন্তু আপনারা বড়ো অন্যায় করিতেছেন।'

একদিন দমদমে চড়িভাতির প্রস্তাব হল। বিনোদিনী রাজি ছিল না—পরে তার অনুরোধে বিহারীকেও সঙ্গে নিতে হল। সেখানে আশার সঙ্গে সে ফুল কুড়োলে, ফল পাড়লে, দিঘির জলে স্নান করলে; শেষে বিহারীর উদ্যোগে সমস্ত-কিছু সম্পূর্ণ হলে করুণ-চক্ষের কৃপা বর্ষণ করে সে রান্নাবাড়ায় প্রবৃত্ত হল। আহারান্তে বিহারীর অনুরোধে সে তার বাল্যকালের কথা, বাপমায়ের কথা, বাল্যসঙ্গীদের গল্প করলে—বলতে-বলতে অলস মধ্যাহ্ন-বাতাসে কখন তার মাথার কাপড়টুকু খসে পড়ল। সন্ধ্যাবেলায় ফেরার পথে আশা দেখলে তার চোখে জল। আশার প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, 'আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আসিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।'

রাজলক্ষ্মী অসুখে পড়লে বিনোদিনী অনলস সেবা করতে লাগল। কিন্তু রুগ্ণ-মাতার শয্যার পাশেও মহেন্দ্রের কাঙালপনা তার সহ্য হত না। রোগীর চিকিৎসা-ব্যাপারে বিহারীর প্রতি তার নির্ভরতায় মহেন্দ্র হল গৃহত্যাগী। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ বিনোদিনীর প্রণয়-বঞ্চিত চিত্তকে বেদনার উত্তেজনায় জাগরিত করে রাখত। যে মহেন্দ্র তাকে জীবনের সার্থকতা থেকে ভ্রষ্ট করেছে, তাকে সে ভালোবাসে কি বিদ্বেষ করে, তাকে কঠিন শাস্তি দেবে না হৃদয়সমর্পণ করবে, কিছুই সে বুঝে-উঠতে পারল না। কিন্তু দগ্ধ হতেই হোক বা দগ্ধ করতেই হোক, মহেন্দ্রকে তার প্রয়োজন। আশা স্বামীকে একটা চিঠি লিখতে চাইলে সে সহায়তা করে লেখালে, 'প্রিয়তম···তুমি যেমন করিয়া ভুলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভুলিবার একটা উপায় বলিয়া দাও।··· আমার জন্যও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল।···আমার কি কোথাও যাইবার পথ ছিল না। ভাসিয়া আসিয়াছি, ভাসিয়া যাইতাম।'

গৃহাগত মহেন্দ্রের প্রকাশ্য নিরাসক্তিতে বিনোদিনী আবার বিদায় নিতে উদ্যত। মহেন্দ্র বোঝাতে এলে নতমস্তকে সেলাইয়ের দিকে মনোনিবেশ করে সে বললে, 'আমি থাকিলেই কী, আর না-থাকিলেই কী। আপনার তাহাতে কী আসে যায়।' মহেন্দ্রের অনুনয় উন্মত্তের মতো। মুহূর্তেই সেই অসংযমকে সহাস্য-চটুলতায় পরিণত করে বিনোদিনী থাকতে সম্মত হল। সহসা বাইরে বিহারীর কণ্ঠস্বর শুনে সে বললে, 'ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে বলিতে পার?···চোখের বালির জন্যে আমার কেবলি ভাবনা হয়।' বিহারী তাকে 'দেবী' বলে অভিহিত করায় তার সর্বশরীর পুলকিত হয়ে উঠল—ঘরে এসে রোদনোচ্ছ্বসিত শিশুর মতো সে আশাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে: 'ভাই চোখের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো অলক্ষণা।···আমি যেখানে থাকিব সেখানে কেবল মন্দই হইবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাই।' মহেন্দ্রের অনুতাপ গেল না—উপরন্তু

একদিন আশার প্রতি বিহারীর আসক্তির ইঙ্গিত করে সে বিনোদিনীর প্রতি নিজের অনুরক্তি অস্বীকার করলে। পাংশুমুখ বিহারীর পিছনে ছুটে এসে বিনোদিনী আর্তকণ্ঠে বললে, 'আমি দেবী নই ঠাকুরপো, শুনিয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে কাহারও ভালো হইবে না।' বিহারীকে একখানা সান্ত্বনার চিঠি লিখলে সে; কিন্তু চিঠিখানা মহেন্দ্রের হাতে দেখে বিহারীকেই ভুল বুঝে চারিদিকের সংসারকে জ্বালাবার জন্য প্রস্তুত হল। বিনোদিনীকে কেউ ভালোবাসে না বটে—সবাই ভালোবাসে ননির পুতুলটিকে।

আশা তার মাসির কাছে গেল কাশীতে। রাজলক্ষ্মীর অনুরোধে বিনোদিনী মহেন্দ্রের সেবার ভার নিলে। মহেন্দ্র কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখলে: চন্দনগুঁড়া আর ধুনার গন্ধে আমোদিত সুসজ্জিত শয়নগৃহ, নাগকেশরের রেণু আর আতর-মিশ্রিত শুভ্র বিছানা, বিনোদিনীর বহু-অধ্যবসায়জাত রেশম ও পশমের বিবিধ কারুকার্য; আহারে-অশনে-স্বাদে-গন্ধে-দৃশ্যে সমস্তই রমণীয়। মান-অভিমান ও দ্বিধার মধ্যে তবুও সে আন্দোলিত। পরদিন শিয়রে বসে বিনোদিনী তার মাথা টিপে দিতে লাগল; তার ঘন-নিঃশ্বাস মহেন্দ্রের চুলগুলি কাঁপাতে লাগল—বিহ্বল যৌবনের ভারে তার আনত কেশাগ্রভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করলে। মহেন্দ্রের দ্বিধা তবুও গেল না—এমন-কি, বিহারীর সম্বন্ধে সেদিন তাকে পরিহাস করে বসল। ঘরের মধ্যে যে-ফুলশর খেলা করছিল, মুহূর্তে গেল তা ভস্ম হয়ে। বিনোদিনী অগ্নিশিখার মতো উঠে দাঁড়িয়ে দু-চোখে বিদ্যুৎ-বর্ষণ করে বললে, 'যদি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার যোগ্য হইতে, তবে তাঁহাকে পরিহাস করিলে সহ্য করিতাম। তোমার ছোটো মন, বন্ধুত্ব করিবার শক্তি নাই, অথচ ঠাট্টা।' এমন সময়ে বিহারীর আগমনে মহেন্দ্র আশার সম্বন্ধে তাকে কটাক্ষ করলে। বিনোদিনী বলে উঠল, 'বিহারী-ঠাকুরপো, তুমি কোনো উত্তর দিয়ো না।…ওই-লোকটি যাহা মুখে আনিল, তাহাতে উঁহারই মুখে কলঙ্ক লাগিয়া রহিল, সে-কলঙ্ক তোমাকে স্পর্শ করে নাই।'—বলে তার কাছে এসে হাত চেপে ধরলে। বিহারী তাকে ভুল বুঝে ঠেলে দিলে—পড়ে গিয়ে বিনোদিনীর বাম কনুইয়ের কাছে রক্ত পড়তে লাগল। মহেন্দ্র বেঁধে দিতে চাইলে সে বললে, 'না-না কিছুই করিও না…এ-কাটা আমার থাক।'

অতঃপর বিনোদিনী গৃহকাজের অন্তরালে অদৃশ্য হল। রাজলক্ষ্মীকে বলে একদিন সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালে। কিন্তু তাতে তার উপেক্ষাই প্রাপ্য হল। এদিকে একরাত্রে মহেন্দ্র তার সন্ধানে মার ঘরে উপস্থিত। পরদিন তার একখানা চিঠি পেয়ে বিনোদিনী উত্ত্যক্ত হয়ে লিখলে, 'আমাকে তুমি কি জগতে কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।…আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাসা? তোমার এ-ভিক্ষাবৃত্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাসাই পাইয়া আসিতেছ, তবু তোমার লোভের অন্ত নাই। …তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাস।…এক সময় মনে করিতে, তুমি আশাকে

ভালোবাসিতেছ, সেও মিথ্যা; এখন মনে করিতেছ, তুমি আমাকে ভালোবাসিতেছ, এও মিথ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাস। ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিয়াছে—সে-তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল তোমার হাতে নাই…চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ—সে-কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে—তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম।' সেই রাত্রের ব্যাপারে রাজলক্ষ্মীকে একটা কৈফিয়ত দিতে গেলে তিনি তাকে বললেন, 'মায়াবিনী'। বিনোদিনী বললে, 'সে-কথা ঠিক পিসিমা…আমরা মায়াবিনীর জাত…ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না-জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ—আমরা মায়াবিনী।' অনতিপরে মহেন্দ্রকে নিজের ঘরে দেখে সে বিদ্যুদ্‌বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'যাও, আমার এ-ঘর হইতে চলিয়া যাও।… ভীরু কাপুরুষ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না-জান ভালোবাসিতে, না-জান কর্তব্য করিতে।…লুকোচুরি, ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক—তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘৃণা জন্মিয়া গেছে।' পরমুহূর্তে ক্রুদ্ধা রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে তার সেই-ভাব পরিবর্তিত হল—অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরে সে গৃহত্যাগে সম্মত হল।

সন্ধ্যাবেলায় অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে বিনোদিনী বিহারীর কাছে এসে বললে, 'ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্জ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র…নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না।…আমাকে ভালোবাসিতে তোমার কী বাধা ছিল।…যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন সার্থক হইত, তাহার কাছে এই-রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম।' ভূমিতে লুটিয়ে বারবার পদচুম্বন করে সে বিহারীর কণ্ঠলগ্ন হল: 'জীবনসর্বস্ব…আজ এক-মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তারপরে আমি…কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ-পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা-কিছু দাও।'—এই বলে নিমীলিতচক্ষে সে ওষ্ঠাধর এগিয়ে দিলে। মুহূর্তকালের জন্য দু-জনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হয়ে রইল। বিহারীর সহায়তায় বিনোদিনী রাত্রেই এল বারাসাতে। কিন্তু সেই নিরানন্দ পল্লীতে চারদিকে কুৎসা আর কৌতূহল-দৃষ্টিতে তার অন্তঃপ্রকৃতি চুপড়ির ভিতরকার মাছের মতো আছাড় খেতে লাগল। বিহারীর কোনো চিঠি না-পেয়ে সে লিখলে, 'প্রভু, জেলখানার কয়েদি কি আহারও পায় না। শৌখিন আহার নহে—যতটুকু না-হইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না, সেটুকুও তো বরাদ্দ আছে।' শুনেছিল: একাগ্রমনে কাউকে ডাকলে সে না-এসে থাকতে পারে না—তাই সে চক্ষু মুদে দু-হাত জোড় করে বিহারীকে ডাকতে লাগল। এমন সময়ে তার অন্ধকার দ্বারে আঘাত পড়ল। ভূমিতল

থেকে দ্রুতবেগে উঠে সে অসংশয়-বিশ্বাসে দ্বার খুলে দেখলে মহেন্দ্রকে। দেখে অপরিসীম ঘৃণাভরে প্রচণ্ড ধিক্কারে তাকে দূর করে দিলে। পরদিন দিদিশাশুড়ির তিরস্কারে তবুও অস্নাত-অভুক্ত মলিনবেশে সে উঠে বসল গাড়িতে।

মহেন্দ্রের সঙ্গে পটলডাঙায় এসে বিনোদিনী সহসা নিজের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে। মহেন্দ্রের শপথ ছিল সে তার স্বাধীন-ইচ্ছায় বাধা দেবে না—তবু সেই সংকীর্ণতার মধ্যে অন্তরালের অবকাশ কোথায়। বিহারীর প্রতি দুর্বার প্রেম তাকে আত্মরক্ষার শক্তি দিলে। যে-উদ্যত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ থেকে সে ফিরিয়ে এনেছিল, প্রতিদিন পূজার অর্ঘ্যের মতো সে বহন করছিল মনে-মনে। তার মন বলছিল: বিহারীকে তার পূজা গ্রহণ করতেই হবে। মহেন্দ্রকে সে ভালো করেই জানত—নারীর পক্ষে একান্ত বিশ্বস্ত নিরাপদ আশ্রয় একমাত্র বিহারীই দিতে পারে। মহেন্দ্রকে সে জোর করে বাড়ি পাঠালে। কিন্তু স্বহস্তে খুঁড়ে তার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে যে লোলজিহ্ব-লোলুপতার ক্লেদাক্ত-সরীসৃপকে সে বার করছে, সমাজভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কশয্যায় তার সঙ্গে ভাবী-সংঘর্ষের কল্পনায় ভিতরে-ভিতরে পীড়িত হতে লাগল। বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করে অন্তরে তপস্যার হোমাগ্নি জ্বালিয়ে সে কৃশপাণ্ডুর মূর্তি ধারণ করলে। একদিন মহেন্দ্রের হাত থেকে পেল সে বিহারীকে-লেখা নিজের সেই চিঠিখানি। চিঠিখানা টুকরো-টুকরো করে সে তার বুকের কাপড় ছিঁড়ে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে-করতে রুদ্ধদ্বারে মেঝের উপরে লুটিয়ে বাণাহত জন্তুর মতো আর্তস্বরে কাঁদতে লাগল। সমস্ত-রাত্রি মূর্ছিতের মতো থেকে সে সকালে দাসীকে পাঠিয়ে সংবাদ পেল, বিহারী আছে পশ্চিমে।

অবশেষে বাদানুবাদ-ক্লান্ত মহেন্দ্র একদিন কোথাও বেরিয়ে পড়তে চাইলে। বিনোদিনী উৎসাহিত হয়ে বললে, 'চলো, এখনই চলো—পশ্চিমে যাই।' সমস্ত ভোগসুখ থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করেছিল; গাড়িতে এসে উঠল ইণ্টারমিডিয়েট-ক্লাসে মেয়েদের কামরায়। আগে সেই-দারিদ্র্যের লক্ষণ তার পক্ষে প্রীতিকর ছিল না। মহেন্দ্রকে সে শনিগ্রহের মতো নানা-জায়গায় ঘোরাতে লাগল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ভাব করে সবই জেনে নিত এবং মহেন্দ্রের অপেক্ষা না-করেই সমস্ত দেখে নিত। একদিন এলাহাবাদ স্টেশনে পোস্ট-আপিসের কাচের বাক্‌সে তার চোখে পড়ল বিহারীর নামাঙ্কিত একখানা চিঠি। ঠিকানাটি মুখস্থ করে নিয়েই সে একটা ভাড়া-গাড়িতে চেপে বসল। গাড়ি শহরের বাইরে একটি বাগানে এসে পৌঁছল। বিহারী কিছুকাল আগে সেখানেই ছিল। তারই অদৃশ্য সঞ্চার যেন বিনোদিনী ঘ্রাণের মধ্যে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগল। সন্ধ্যাবেলায় যমুনাতীরে মেঘজাল ভেদ করে তৃতীয়ার চাঁদ উঠল। মহেন্দ্র শয়নগৃহে এসে দেখলে: ঘর ফুলে-ফুলে পরিপূর্ণ—বিনোদিনী বাগান থেকে ফুল তুলে মালা গেঁথে খোঁপায় পরেছে, গলায় পরেছে, কটিতে বেঁধেছে; বসন্তের পুষ্পভারলুণ্ঠিত লতাটির মতো সে

বিছানায় শায়িত। মহেন্দ্র কাছে এলে সে দক্ষিণবাহু প্রসারিত করে বলে উঠল, 'যাও-যাও, তুমি এ-বিছানায় বসিও না।'

মৃত্যুপথবর্তিনী রাজলক্ষ্মীর অনুরোধে পরদিনই বিহারী সেখানে উপস্থিত। বিনোদিনী তাকে সংকুচিত দেখে পায়ের কাছে বসে বললে, 'একদিন তুমি আমাকে দূর করিয়া দিয়া নিজের যে-পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই-তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে-মূল্য নষ্ট হয় নাই।' বিহারী সহসা তাকে বিবাহ-প্রস্তাব করায় বিনোদিনী চমকে উঠল—তার বুকের সমস্ত রক্ত তোলপাড় করতে লাগল। লজ্জিত হয়ে সে বললে, 'যে-কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। এ কি ঠাট্টা।...এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে ইহার বেশী আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না।...ছি-ছি, এ-কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।...তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমি যদি এ-কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।' বিহারীর পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে সে পদাঙ্গুলি চুম্বন করলে: 'পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব—এ-জন্মে আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক দুঃখ দিয়াছি, অনেক দুঃখ পাইয়াছি...কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি—এ-আশ্রয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।'

কলকাতার পথে বিনোদিনী কিছুই স্পর্শ করলে না। অবশেষে রাজলক্ষ্মীর ক্ষমা লাভ করে তাঁর সেবায় নিঃশেষে আত্মনিবেদন করলে—আশার কাছে কয়েকদিনের এই-অধিকারটুকু চেয়ে নিলে। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে তার আগ্রহ হল বিহারীর জনসেবায় যোগ দিতে। তাতে তার অমত দেখে আশার মাসি অন্নপূর্ণাকে বললে, 'মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।' বিহারী স্মরণের জন্য তার একগুচ্ছ চুল চাইলে। বিনোদিনী বললে, 'ছি-ছি, কী ঘৃণা! আমার চুল লইয়া কী করিবে! সেই অশুচি মৃতবস্তু আমার এমন কিছুই নহে...আমি হতভাগিনী তোমার কাছে থাকিতে পারিব না—আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে—বলো, তুমি লইবে?' বিহারীকে দরিদ্রসেবার জন্য সে রাজলক্ষ্মীর কাছে পাওয়া দু-হাজার টাকার নোট দিলে। বিহারী কিছু স্মরণচিহ্ন দিতে চাইলে দেখালে সে তার হাতের কাটাদাগ: 'তোমার চিহ্ন আমার কাছে আছে, তাহা আমার অঙ্গের ভূষণ—তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না।'

বিন্দু ॥ 'করুণা' উপন্যাস। করুণার এক প্রতিবেশিনী।

বিপিন ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মীর পিত্রালয়ের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র। পরে বিনোদিনীর স্বামী। বিপিনের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল প্রবল—সেই-প্লীহার অতিভারেই অল্পকালের মধ্যেই তার জীবনান্ত হয়।

বিপিন ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার এক সভ্য। বিপিন কলেজের ছাত্র। এদিকে ফুটবল খেলে, শরীরে অসামান্য বল—পড়াশুনা কখন করে কেউ বুঝতে পারে না, অথচ চটপট একজামিন পাস করে। শ্রীশের সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। তার সর্বপ্রকার পাগলামিকে সে স্নেহের চোখে দেখত। চিরকৌমার্যব্রতীর পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয়, এই তার মত ছিল। এদিকে সে ন্যায়পরায়ণ। তার প্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকায় কোনো শ্রেণীবিশেষের সম্বন্ধে একদিক-ঘেঁষা হতে পারত না। তাই কুমারসভার সভ্যপদে সভাপতির ভাগ্নী নির্মলাকে নেওয়ার প্রস্তাবে তার অমত দেখা গেল না।

বিপিনকে দেখলে মনে হয় না যে সে কিছু দেখে—কিন্তু তার চোখে কিছুই এড়ায় না। সভাটি একটি গৃহস্থবাড়িতে স্থানান্তরিত হলে প্রথমদিনেই তার খটকা লাগল, কিন্তু নূতন-সভ্য অবলাকান্তের কোমল মুখভাবে তার বিপুল-বলশালী চিত্ত স্নেহাকৃষ্ট হল। একদিন তারই হাতে একখানি গানের খাতায় নারীহস্তের লেখা পড়তে-পড়তে বললে, 'এই-গানগুলো মানিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মুক্তো! যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন।' অবলাকান্তকে বললে, 'আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন—খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী?' এই-খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন?' অতঃপর খাতাখানিকে কেন্দ্র করেই শুরু হল জল্পনা : 'আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না···দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।···শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন;···এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে···খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন?' রসিকের প্রশংসাসূচক উক্তিতে : 'আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু।··· ইংরাজিতে বলে দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।···দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন!' খাতাখানির গুণপনাতেই সে মুগ্ধ : 'বুঝেছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচন-চাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে-কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটা সৌকুমার্য আছে।'

এদিকে ওস্তাদ রেখে তার বেসুরো গলায় চলছিল সংগীত-চর্চা। সেই সংগীতের আসরে একদা রসিকের অভ্যাগম। বিপিন তাঁর জলযোগের আয়োজনে শশব্যস্ত। কিন্তু দুঃসংবাদ এই যে : নীরবালাদের জন্য একজোড়া

পাত্র স্থির। কন্যাদের প্রতি এই-অন্যায়ের প্রতিকারে বিপিন তখনই উদ্যত: 'যদি বলেন-তো সেই ছেলে-দুটোকে পথের মধ্যে'। কিন্তু বিধাতার বরে অপাত্র অনেক—তাদের হাত থেকে রক্ষার উপায় কী? কাজেই পাত্র সেজে যেতে হল তাদেরই। অতঃপর রসিক তাদের বিরক্ত করতে অনিচ্ছুক। বিপিন তাতে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত: 'আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত? আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?'

বিপিন ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ছোটো-মেয়ে শৈলজার স্বামী। বিপিন নিঃস্ব। শ্বশুরালয়ে থেকে গাজিপুরেই অহিফেন-বিভাগে কাজ করত। শৈলজার সঙ্গে তার মিলনে কোথাও ছেদ ছিল না। বিবাহের পরে বালক-বিপিন গুরুজনের ব্যূহ ভেদ করে বালিকা-বধূর সাক্ষাৎলাভের জন্য বিবিধ কৌশল উদ্‌ভাবন করত। দিবাসাক্ষাৎকারের নিষেধ-দুঃখ লাঘবের জন্য মধ্যাহ্নভোজনকালে আয়নার মধ্যে উভয়ের দৃষ্টি-বিনিময় হত। আপিসের পালা আরম্ভ হলে সে যখন-তখন আপিস পালাতে আরম্ভ করলে।

একবার শ্বশুরের ব্যবসায়ের খাতিরে কয়েকদিনের জন্য তার পাটনায় যাবার কথা হল। শৈলজা জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি পাটনায় গিয়া থাকিতে পারিবে?' বিপিন স্পর্ধা করে বললে, 'কেন পারিব না, খুব পারিব।' কিন্তু পরদিন যাত্রার আয়োজন যখন সমস্তই স্থির, তখন হঠাৎ তার মাথা ধরে কী-এক-রকমের অসুখে যাত্রা বন্ধ করতে হল। শেষে ওষুধের শিশি গোপনে নর্দমার মধ্যে শূন্য করে ব্যাধির উপশম হয়।

বিপ্রদাস চাটুজ্যে ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর দাদা। 'যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন। বীরের মতো তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মতো শান্ত মুখশ্রী, সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা।' চাটুজ্যেরা নূরনগরের পুরনো জমিদার—শৌখিনতা, দানদাক্ষিণ্য ও ঔদ্ধত্যদলনে বিখ্যাত। শরিকানি-বিবাদে বিপ্রদাসের পিতার আমলেই ঐশ্বর্যের অবশেষ। বাপের মৃত্যুর পর ছোটো-ভাই সুবোধ অধ্যয়নের জন্য গেল বিলেতে। বিপ্রদাস দেখলেন, বিষয়-সম্পত্তি ঋণের চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে। মহাজনের তাগিদে পুরনো-দেনা শোধের জন্য মধুসূদন ঘোষালের কাছে ধার হল এগারো-লক্ষ টাকা! তখন ছোটো-বোন কুমুদিনীর পণ-জোটানো পাত্র-জোটানোর কথা কল্পনাতীত। তবু চাঁদের আলোর মতো দৈন্যের অন্ধকারকে মধুর করে রাখে সে—তাঁরা যেন দুটি-ভাইয়ের মতো। চালচলন খাটো করবার জন্য বিপ্রদাস অবশেষে এসে উঠলেন বাগবাজারে।

পিতা-বর্তমানেই বিপ্রদাসের বিবাহ স্থির হয়—গায়ে-হলুদের দিনে জ্বর-বিকারে মেয়েটি যায় মারা। ঘটকালির অনুকূল-লগ্ন পরে আর কখনো

আসে নি। সংস্কৃত সাহিত্যে বিপ্রদাসের অনুরাগ। কুমুকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়ালেন—দীক্ষিত করে তুললেন ফোটোগ্রাফে, বন্দুক-চালনায়, এসরাজে। কুমুর বিবাহের জন্য তিনি গায়ের রক্ত জল করে টাকা জমাচ্ছিলেন; সহসা সুবোধের দাবি এল পাঁচ-সংখ্যার অঙ্কে। বিপ্রদাস তাঁর পিতামহের কাছ থেকে জন্মকালে দানসূত্রে-পাওয়া করিমহাটি তালুকটি পত্তনি দিলেন। বললেন, 'নিজের সম্পত্তি আর আমার সম্পত্তিতে ও যখন আজ ভেদ করে দেখতে পেরেছে, তখন আমার তালুক আমি কি আর আলাদা করে রাখতে পারি? আজ ওর বাপ নেই, বিপদের সময়ে আমি ওকে দেব না তো কে দেবে?'

কুমুর বিবাহের প্রস্তাব এল মধুসূদন ঘোষালের কাছ থেকে। পূর্ব-আমলে উভয়-বংশের রেষারেষির কথা বিপ্রদাস জানতেন না—তবু কুমুর সঙ্গে বয়সের অমিল দেখে অমত করলেন। কুমু বললে, 'যাঁর কথা বলছ নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঠিক হয়েই গেছে।' বিপ্রদাস বুঝলেন, কী-একটা দৈবসংকেত সে মনের মধ্যে বানিয়ে বসেছে—এখানেই ভাইবোনের মধ্যে অসীম প্রভেদ। যেখানে কার্যকারণের যোগাযোগ নেই সেখানে তর্ক করবেন কী নিয়ে—তাকে বোঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। পাত্রপক্ষের ইচ্ছায় দেশের বাড়ি থেকে বিবাহে মত দিতে হল। কিন্তু সেখানে বরযাত্রদের থাকার ব্যবস্থায় পাত্রপক্ষ অসম্মত। আত্মীয়স্বজনেরা খুঁতখুঁত করতে লাগল; প্রজারা বললে, কর্তাবাবুদের উপর টেক্কা দেবার চেষ্টা। বিপ্রদাস কুমুর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'লোকের কথায় কান দিস নে বোন।' ঘোষালদের সাবেক ভিটেয় গড়ে উঠল মায়াপুরী। বিপ্রদাস আড়ম্বরে পাল্লা দেবার চেষ্টা না-করে নিজের লোকদের সাত্ত্বিকভাবে কাজ করতে উপদেশ দিলেন। বিবাহের দিন-দশেক আগে লোক-মুখে রাজার আগমনবার্তা পেয়ে তিনি একাই ঘোড়ায় চড়ে অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে গেলেন; কিন্তু অপমানিত হয়ে অনেক রাত্রে এসে শয্যা নিলেন।

অক্লান্ত উৎসাহে পাত্রপক্ষের শিকার-পিকনিক চলল। বিপ্রদাস বাঘ-শিকারে জেলার মধ্যে সেরা। কোনো-একবার পাখি মেরে এমন ধিক্কার হয় যে, সেই-অবধি নিজের এলাকায় পাখি মারা নিষিদ্ধ করেন। একবার জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে পর্যন্ত ঠেকিয়েছিলেন। তবু পাত্রপক্ষের অত্যাচার নীরবে সহ্য করলেন। শেষে জনসাধারণকে খাওয়ানোর ব্যাপারে অবস্থা চরমে উঠল। বিবাহের দিনে বর যখন বাড়িতে এল বিপ্রদাসের তখন পাঁচ-ডিগ্রি জ্বর। কুমু প্রণাম করতে এসে কেঁদে ফেললে। বিপ্রদাস তার মাথায় হাত রেখে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'সর্বশুভদাতা কল্যাণ করুন।' সমস্ত রাত্রি কঠিন রোগের সঙ্গে লড়াই করে ভোরের দিকে মন তখন বৈরাগ্যশিথিল। কুমু কাছে এলে তাঁর মনের মধ্যে ভিতরে-ভিতরে যে-চিন্তার ধারা চলছিল তা-ই অসংলগ্নভাবে বলে উঠলেন, 'দিদি, আসলে কিছুই নয়,—কে বড়ো কে ছোটো কে উপরে কে নিচে, এ-সমস্তই বানানো কথা।...পশ্চিমের মেঘ যায় পূবে, পূবের মেঘ যায়

পশ্চিমে···সংসারে সেই-হাওয়া বইছে। মেঘের মতোই অমনি সহজে এটাকে মেনে নিস দিদি।···যেখানে যাচ্ছিস সেখানে লক্ষ্মীর আসন তুই জুড়ে থাকিস,—এই আমার সকল মনের আশীর্বাদ।' বিদায়ের আগে স্বামীস্ত্রী প্রণাম করতে এল। মধুসূদনের সঙ্গে কুমুর সেই আঁচলে-চাদরে-বাঁধা দৃশ্যটি তাঁর বড়ো বীভৎস বোধ হল। পূজার্চনায় কোনোদিন বিপ্রদাসের উৎসাহ ছিল না—তবু হাতজোড় করে সেদিন কী যেন মনে-মনে প্রার্থনা করলেন।

কুমু যাবার পরে বিপ্রদাসের ইনফ্লুয়েঞ্জা নুমোনিয়ায় দাঁড়াল। স্বামিগৃহে কুমুর আত্মনিবেদনের ব্রতও হল নিষ্ফল। বিপ্রদাস রোগশয্যায় মূল দেনার একাংশ শোধ করতে কালু মুখুজ্যেকে দিয়ে তাঁর আংটি বিক্রির টাকা পাঠালেন—কিন্তু আংশিক বলে তা অগ্রাহ্য হল। তখন অন্য-কোনো মহাজনের কাছে টাকা-ধারের ব্যবস্থা করতে বিপ্রদাস অসুস্থ শরীরে এলেন কলকাতায়। কুমু এসে তখন কিছুদিন তাঁর সেবার ভার নিলে। বিপ্রদাস স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় জানতে চাইলেন। কুমু তাঁর প্রশস্ত বুকের উপর মুখ রেখে কেঁদে উঠল। বিপ্রদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'আমি তোকে ঠিকমতো শিক্ষা দিতে পারি নি। মা থাকলে তোকে তোর শ্বশুর-বাড়ির জন্যে প্রস্তুত করে দিতে পারতেন।' বিবাহ-অনুষ্ঠানের সূচনা থেকেই তিনি বুঝেছিলেন: মধুসূদন ভিন্ন-জগতের মানুষ। এই-দিঙ্‌নাগের স্থূল-হস্তাবলেপ থেকে কুমুকে রক্ষা করবার জন্য উদ্বেগে কিছুতেই তিনি সুস্থ হতে পারছিলেন না। সবচেয়ে মুশকিল এই-যে, তার কাছেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ঋণে-বাঁধা। বিপ্রদাসের একার সইয়ে টাকা ধার পাওয়া সম্ভব ছিল না—তাই সুবোধকে ফিরে আসতে তার করা হল। ভাইবোনে আবার পুরনো দিনের মতো গানবাজনায় দুঃখবেদনার কথা ভুলে রইলেন।

মধুর মেজোভাই নবীনের কাছে বিপ্রদাস কুমুর সংসারে তার অনাদরের আভাস পেলেন। পরে সংবাদ পেলেন বড়ো-ভাজ শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের অসংযত আসক্তির। বিপ্রদাসের চোখে আগুন জ্বলে উঠল: যেন দৃষ্টির সম্মুখে যুগে-যুগে শক্তিহীন-নিরুপায় নারীর অপমানকে প্রত্যক্ষ করে বলে উঠলেন, 'কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়। সমস্ত স্ত্রীলোকের হয়ে তোমাকে তোমার নিজের সম্মান দাবি করতে হবে, এতে সমাজ তোমাকে যত দুঃখ দিতে পারে দিক।···আজ যখন মন বলছে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লড়াই করতে হবে···এই-বাড়িতে তোর জায়গা আছে, সে সম্পূর্ণ তোর নিজের···এইখানেই তুই নিজের জোরে থাকবি।' নবীনের স্ত্রী নিস্তারিণী কুমুকে ফেরাতে এলে তিনি অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, 'না—মানুষের এত লাঞ্ছনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। সমাজ যাকে এতদূর নামিয়ে দিলে সমাজকেই সে প্রতিদিন নামিয়ে দিচ্ছে।···স্ত্রী যদি···অন্যায় মেনে নেয় তবে সকল স্ত্রীলোকের প্রতিই তাতে-করে অন্যায় করা হবে। এমনি করে প্রত্যেকের

দ্বারাই সকলের দুঃখ জমে উঠেছে।' অবশেষে মহারাজ মধুসূদন স্বামিত্বের দাবি নিয়ে এসে প্রকাশ্যেই শাসিয়ে গেল। দীর্ঘকায়-শীর্ণদেহ-পাণ্ডুমুখ বিপ্রদাস জ্বালাময় চোখে কুমুকে ডাকলেন নিজের ঘরে। বললেন, 'দেখ কুমু, ওরা উৎপাত করবে। সমাজের জোরে, আইনের জোরে উৎপাত করবার ক্ষমতা ওদের আছে। সেইজন্যই সেটাকে অগ্রাহ্য করা চাই।'

সহসা কুমুর সন্তান-সম্ভাবনা প্রকাশ পেতে আইনের ভাষায় একটা চিঠি পৌঁছল। সেদিন সন্ধ্যার পরে কুমুকে ডাকিয়ে বিপ্রদাস বললেন, 'কুমু··· আর-কিছুদিন পরেই তোর মন উঠবে ভরে।···তোর সন্তানকে তার নিজের ঘরছাড়া করব কোন্ স্পর্ধায়?' কুমু স্বামীর হাতে তাঁর বিপদের আশঙ্কা করায় বললেন, 'ওরা যা করতে পারে তা করা শেষ হলেই আমার উপর ওদের ক্ষমতাও শেষ হবে।···তাকে তুই বিপদ বলছিস কেন?' পরের দিনই কুমুর যাত্রার কথা। ভোরবেলা কুমুকে ডেকে তিনি আলাপ আরম্ভ করলেন ভৈরোঁ রাগিণীতে: 'গম্ভীর শান্ত সকরুণ; সতীবিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো।' বাজাতে-বাজাতে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখার অন্তরালে হল সূর্যোদয়। বিপ্রদাস বললেন, 'কুমু, তুই মনে করিস আমার কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্মকে কথায় বলতে গেলে ফুরিয়ে যায় তাই বলি নে। গানের সুরে তার রূপ দেখি, তার মধ্যে গভীর দুঃখ, গভীর আনন্দ এক হয়ে মিলে গেছে···তুই আজ চলে যাচ্ছিস, কুমু, আর হয়তো দেখা হবে না, আজ সকালে তোকে সেই সকল বেসুরের সকল অমিলের পরপারে এগিয়ে দিতে এলুম।···দুষ্মন্তের ঘরে যখন শকুন্তলা যাত্রা করে বেরিয়েছিল, কণ্ব কিছুদূর পর্যন্ত তাকে পৌঁছিয়ে দিলেন।···মাঝখানে ছিল দুঃখ-অপমান।···তাও পেরিয়ে শকুন্তলা পৌঁছেছিল অচঞ্চল শান্তিতে। আজ সকালের ভৈরোঁর মধ্যে সেই শান্তির সুর, আমার সমস্ত অন্তঃকরণের আশীর্বাদ তোকে সেই নির্মল পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিক; সেই পরিপূর্ণতা তোর অন্তরে তোর বাহিরে, তোর সব দুঃখ তোর সব অপমানকে প্লাবিত করুক।'

বেলা দশটায় কুমু চলে গেল। বিপ্রদাস ধীরে-ধীরে চৌকি থেকে উঠে শুয়ে পড়লেন। তাঁর বিছানার নিচে টম-কুকুরটা গুমরে-গুমরে কাঁদতে লাগল।

বিভা ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা। বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়কে অনেকদিন যশোহরে আনা হয় নি। অভিমানী বিভা তাই রাজান্তঃপুরে ছায়ার মতো ফিরত। পিতার পিতৃব্য বসন্ত রায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিল সে। দাদামশায় ছাড়া কারো কাছে মুখ খুলতে পারত না। দাদামশায়ের টাকটি, তাঁর পাকা আমের মতো ভাবটি তার কল্পনা অধিকার করে থাকত। বসন্ত রায় যশোহরে এলে জামাতার প্রসঙ্গ উঠল। বিভা তাঁর পাকা চুলের দিকে মনোনিবেশ করে বললে, 'দাদা-

মহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিও না।'

বসন্ত রায়ের চেষ্টায় জামাতা অবশেষে নিমন্ত্রিত হয়ে এল। বিভা তার নথ, তার বাহুপূর্ণ চুড়ি, আর হৃদয়পূর্ণ আনন্দের ভার নিয়ে নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়ল। চন্দ্রদ্বীপের ভৃত্য রামমোহনকে দেখে সে আনন্দিত হয়ে বললে, 'মোহন, তুই এতদিন আসিস নাই কেন?' রামমোহনের কাছে চন্দ্রদ্বীপের গল্প শুনে তার ছোটো হৃদয়টি কল্পনায় ভরে উঠল। আনন্দে-লজ্জায়, একটি অনির্দেশ্য শঙ্কায় তার মুখ আরক্ত, হাত-পা শীতল হয়ে এল। কিন্তু মিলনের লগ্নটি তার কল্পনার অনুরূপ হয়ে এল না। অর্ধরাত্রে সেই মুহূর্তটি যখন সত্যই আসন্ন, তখন এক আকস্মিক বজ্রপাতে তার স্বপ্নের সৌধটি ভেঙে পড়ল। জামাতার এক সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। বিভা শুনে কাঁপতে-কাঁপতে তার দাদার কাছে এসে ভেঙে পড়ল কান্নায়। উদয়াদিত্যের চেষ্টায় তার স্বামী রওনা হল চন্দ্রদ্বীপে। তখন এক গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মূর্ছিত হল সে।

উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমা বিভার সুখদুঃখের অংশভাগিনী। তাকে পিত্রালয়ে পাঠানোর প্রস্তাবে বিভা তার গলা জড়িয়ে বললে, 'তুমি যদি যাও, তবে এ-শ্মশানপুরীতে আমি কী করিব?' কিন্তু আকস্মিকভাবে একদিন তারও মৃত্যু হলে বিভার সমস্ত অন্ধকারে লিপ্ত হল। যেন এক মর্মভেদী দুঃখ, চরাচরগ্রাসী এক শুষ্ক সীমাহীন নিরাশা। সঙ্গীহীন বিভা শীর্ণ ছায়ার মতো ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়ায়—সুরমা একেবারে নেই, কিছুতেই ভাবতে পারত না। উদয়াদিত্য কসে সুখে থাকেন তাই তার একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে তাঁর সমস্ত কাজকর্ম করত। চন্দ্রদ্বীপের কোনো সংবাদ না-পেয়ে এক-একদিন বুক ফেটে তার কান্না আসত। এক-একদিন আকুল হয়ে কেঁদে উঠত: 'আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার নিকট কী-অপরাধ করিয়াছি?··· মা গো মা, দিন কী করিয়া কাটিবে?' অবশেষে একদিন তার মাথায় সুখের আকাশ ভেঙে পড়ল: রামমোহন তাকে নিতে এল। তাকে দেখে হাসতে-হাসতে বিভার দু-চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু যাত্রার যখন সমস্তই স্থির, সে রামমোহনকে বললে, 'দাদাকে আমি একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট এত দুঃখ···মহারাজকে বলিও, আমাকে যেন মার্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট।'

অনতিপরে রাজদ্রোহের সন্দেহে উদয়াদিত্যের কারারোধ। সেদিন আর থাকতে না পেরে বিভা সন্ধ্যার পরে পালিয়ে এল বাগানে। অনেক রাত্রে রাজবাড়ির দীপগুলি যখন একে-একে নিভে গেল, চরাচরব্যাপী অন্ধকারে যেন সে দেখলে তার অদৃষ্টলিপি। সেই বায়ুহীন-শব্দহীন-দিনরাত্রিহীন জনশূন্য-অন্ধকারের মাঝখানে দিগ্‌বিদিকের বাতাস হু-হু করে বইতে লাগল; মনে হল যেন দূর-দূরান্তের সমুদ্রের পার থেকে হাত বাড়িয়ে কাঁদছে তার

স্নেহের শিশুগুলি। পরদিন থেকে কারাগারে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে সেও উদয়াদিত্যের সঙ্গে কারাবাসিনী হয়ে উঠল। এমন সময়ে একদিন বসন্ত রায় এলেন। বিভা তাঁকে দেখে নিস্পন্দ হয়ে রইল; অবশেষে তাঁর হাত ধরে বললে, 'দাদামশায় এস, তোমার পাকা-চুল তুলিয়া দিই।'

বসন্ত রায় হঠাৎ উদয়াদিত্যকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বিভা অভিভূত হয়ে পড়ল ভয়ে। এদিকে রামমোহনকে বিদায় দিয়ে অবধি তার মনে স্বস্তি ছিল না। রাজমহিষী জামাতার দ্বিতীয়-বিবাহের সংকল্প জেনে মিথ্যা করে রাষ্ট্র করে দিলেন যে, বিভাকে পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে চিঠি এসেছে। বিভা অধীর হয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে বললে, 'মা, তুই আমাকে কবে পাঠাইবি মা?' স্বামীর ভালোবাসার উপরে অপরিসীম বিশ্বাসে তার লজ্জার সংকোচ দূরে হয়ে গেল—প্রস্ফুট প্রভাতের মতো তার প্রফুল্ল হৃদয়টি সর্বাঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠল। উদয়াদিত্য বন্দীভাবে যশোহরে নীত হয়ে নির্বাসিত হলেন। বিভা চন্দ্রদ্বীপে যাত্রার আশ্বাসে গুরুজনদের পদধূলি নিয়ে তাঁর সঙ্গে নৌকায় উঠল। নদীতীরে যাকেই সে দেখলে তাকেই তার ভালো লাগল। দু-একজন গরিবকে দেখে ভাবলে, 'আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকিয়া পাঠাইব।' চন্দ্রদ্বীপের ঘাটে যেদিন নৌকা লাগল, সেদিন রামচন্দ্রের দ্বিতীয়-বিবাহের উৎসব। সহসা নদীতীরে রামমোহনকে দেখে বিভা উচ্ছ্বসিত: 'মোহন, মহারাজ কি ইহারই মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস?' রামমোহনের অনুরোধ না শুনে সে রাজপুরীতে এল। আর তখনই তার সুখের স্বর্গ মরীচিকায় পরিণত হল। অন্যান্য দাসদাসীর মতো প্রাসাদে এসে সে অশ্রুচোখে স্বামীর মুখে চাইলে। পরমুহূর্তে তাঁর ব্যবহারে লজ্জায় নীল হয়ে কাঁপতে-কাঁপতে নিমীলিতনেত্রে মূর্ছিত হল।

উদয়াদিত্যের সঙ্গে অবশেষে বিভা এল কাশীতে। চন্দ্রদ্বীপের যে-ঘাটে নৌকা লেগেছিল, তার নাম হল—'বউ-ঠাকুরানীর হাট'।

বিমলা ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের অন্যতম বক্তা। নিখিলেশের স্ত্রী। বিমলার গায়ের রঙ তার মায়ের মতো শ্যামল। ছেলেবেলায় আয়নার উপরে রাগ করে ভাবত, সে যেন অন্যায়। কিন্তু মায়ের মতো যেন সতীর যশ পায়, এই প্রার্থনা ছিল মনে।

বিমলার বিবাহ হয় রাজার ঘরে। সেখানে বাদশাহী আমলের সম্মান। রূপকথার রাজপুত্রের ছবি ছিল তার কল্পনায়—কিন্তু নিখিলেশের রঙ তারই মতো। চিত্তাকাশে ভোরবেলার অরুণরাগরেখার মতো ছিল তার মায়ের পুণ্যের দীপ্তি। চোখের পাহারা এড়িয়ে কখন স্বামীর রূপ দেখা দিল অন্তরে। ভোরবেলায় অতি সাবধানে উঠে তার স্বামীর পায়ের ধুলো নিত সে। সাজসজ্জা-দাসদাসী-জিনিসপত্রের মধ্য দিয়ে তার অকলংক স্বামীর কুল-ছাপানো

ভালোবাসা বইত। বিমলা নিজেকে দান করবার অবকাশ পেত না; মনে-মনে বলত, 'প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাও নি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাইনি তা দিয়ে ভালোবেসেছ···এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ।···পুরুষ বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই-কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সে গর্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা।' বিমলার রূপের অভিমান ছিল না, অভিমান ছিল সতীত্বের—সেখানে স্বামীকেও তার হার মানাবার পণ ছিল।

স্বামী তাকে বাইরে আনতে চাইলে বিমলা ভাবত: ঘরের মধ্যেই সে অশেষ, বাইরে কী প্রয়োজন। সেই শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ির চোখের জলে-গলানো শূন্য সিংহাসন, সমস্ত প্রজা-আমলা, আশ্রিত-অভ্যাগত-পরিবৃত রাজসংসার তো সেখানেই। সেই সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ছিল তার বিধবা জায়েদের প্রতি ঈর্ষা। নিখিল কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেশের কাজে অর্থব্যয় করত, সাহায্য করত তার পূর্বসহাধ্যায়ী দেশনেতা সন্দীপকে। বিমলা রাগ করে বলত, 'এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্ছে।' সন্দীপের ফোটোগ্রাফ সে দেখেছিল—কী কারণে তার মনে হত, চেহারাটা যেন অনেকখানি খাদে-মিশিয়ে গড়া। এমন সময়ে দলবলসহ একদা সেখানেই সন্দীপের অভ্যাগম। বিকেলে নাটমন্দিরের সভায় বিমলা নিজের অগোচরে চিকের আড়াল সরিয়ে তাকে দেখলে। মনে হল, সে যেন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর প্রতিনিধি, আর সন্দীপ বাংলাদেশের বীর। সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করে সে নিজে উপস্থিত থেকে খাওয়ালে। আগে স্বামীর অনুরোধেও তার কোনো বন্ধুর সামনে কখনো বেরোয় নি। সুদীর্ঘ এলোচুল জড়ালে রেশমের লাল ফিতেয়, পরলে সাদা শাড়ি আর জরির পাড়-দেওয়া হাতকাটা জ্যাকেট। মন বললে, 'ঈশ্বর কেন আমায় আশ্চর্য সুন্দর করে গড়লেন না?···রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে।'

সন্দীপের চোখের আলোয়, ভক্তদলের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে বিমলার অভিষেক হল মৌচাকের মক্ষিরানীত্বে। বৈঠকখানায় তার 'সভা বসল—নিখিলেশের পরিবারের ব্যবস্থায় যা নিয়ম-বহির্ভূত। একদিন দরোয়ানের সঙ্গে সন্দীপের সংঘর্ষের পরে আর তার ছুতাটুকুমাত্র রইল না। শুধু দেশের কথাই নয়, স্ত্রী-পুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে বাস্তব ইংরেজি বই, ইংরেজি আর বৈষ্ণব কবিতার মাধ্যমে চর্চা আরম্ভ হল মোটা সুরের। এই সুরের স্বাদ বিমলা কখনো পায় নি—তাই তাকেই তার মনে হল পৌরুষের প্রবলের সুর। এই প্রচণ্ড ইচ্ছার প্রলয়-মূর্তি তাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করত। যে-মানুষকে ভালো করে জানে না, যে-মানুষকে কখনো নিশ্চয় করে সে পাবে না, যে-মানুষের ক্ষমতা

প্রবল, যে-মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় দীপ্যমান—সে কী প্রচণ্ড, কী বিপুল! যে-সমুদ্র ছিল শুধু বইয়ের পাতায়, সেই-সমুদ্রের ক্ষুধিত বন্যা তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ল। সন্দীপের প্রতি তার ভক্তিশ্রদ্ধার লেশমাত্র আর ছিল না, তুলনায় স্বামীকেই তার শ্রেষ্ঠ মনে হত—তবু রক্তে-মাংসে ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটি বাজতে লাগল তারই হাতে।

বিমলা নিজের উপর রাগ করে দু-দিন বাইরে গেল না। মনে হল, যেন তার পায়ের নখ থেকে মাথায় চুল পর্যন্ত উৎকর্ণ। অবশেষে সন্দীপের একটা চিঠি পেয়ে তাড়াতাড়ি এল বাইরে। নিজের অগোচরে ভিতরে-ভিতরে ছুরি চলছিল তার জীবনের সব-চেয়ে বড়ো সম্বন্ধটির মধ্যে। তার ন-বছর-বয়সকালের শয়নকক্ষ চেয়ে থাকত তার মুখের দিকে। জানালায় টাঙানো ছিল তার স্বামীর এম. এ.-পাসের উপলক্ষে আনা ভারতসাগরের কোনো-এক দ্বীপের দামি অর্কিড। বিমলা তাতে জল দিত; ফুল দিয়ে প্রণাম করত কুলুঙ্গিতে রাখা স্বামীর ছবিকে। তার গহনার বাক্সে হীরে-মানিক-মুক্তোর মধ্যে ছিল আর-এক ছবি। সে-ছবিকে পুজো করা চলত না, প্রণাম করাও নয়—তবু জানলা-দরজা বন্ধ করে কেরোসিনের প্রদীপের আলোয় সে-ছবি খুলে দেখত। রোজই ইচ্ছা হত প্রদীপের শিখায় চিরদিনের মতো চুকিয়ে দেয়, কিন্তু দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সে মণিমুক্তো চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করত। এক-একদিন মনে হত, 'কিসের পরগাছা, কিসের ওই কুলুঙ্গি···ওই পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই, ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি, প্রলয়শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতার প্রকাশ হোক।' কিন্তু বুকের মধ্যে অসহ্য বেদনা মোচড় দিয়ে উঠত, মেঝের উপর উপুড় হয়ে শেষে পড়ে-পড়ে কাঁদিত: 'কী হবে, আমার কী হবে! আমার কপালে কী আছে!'

বিমলা জানত, তার প্রতি স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সন্দীপের কথায় একদিন সে স্বামীকে অনুরোধ করলে শুকসায়রের হাট থেকে বিলেতি পণ্য উঠিয়ে দিতে; সেদিন সাজসজ্জাও ছিল তার স্বামীর পছন্দমতো। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষে সন্দীপের কাছে তার অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙার উপক্রম। সহানুভূতির উপলক্ষে সন্দীপের স্পর্শে তার দেহবীণার ছোটোবড়ো তারগুলি ঝংকার দিয়ে উঠল। অপরাহ্ণে আবার তার স্তব শুরু হল। বিমলা পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বললে, 'ওগো প্রলয়ের পাথক, তুমি পথে বেরিয়েছ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারও নেই।···রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম।···সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে।'—বলতে-বলতে মাটিতে পড়ে তার পা জড়িয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। দেশের কাজে সন্দীপের পাঁচ হাজার টাকার দাবি। উচ্ছ্বসিত-স্বরে

তখনই সে গানের মতো বলে উঠল, 'পাঁচ-হাজার তোমাকে এনে দেব।'

কিন্তু টাকা কোথায়? কল্পতরু কোথায়? কোথায় মালখানা? অর্ধেক রাত্রে বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বিমলা চেয়ে রইল দপ্তরখানার দিকে। শেষে সন্দীপের বালক ভক্ত অমূল্যকে ডাকিয়ে বললে, 'দেশের জন্যে টাকার দরকার, খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ-টাকা বের করে আনতে পারবে না?' অমূল্যর হাতে একটা পিস্তল দেখে তার বুক কেঁপে উঠল। সন্দীপের বুলি-শেখা এই ছোটো ছেলেটিকে বাঁচাবার জন্য তার সমস্ত প্রাণ ব্যগ্র হল। বললে, 'তোমাকে কিছু করতে হবে না···আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু···আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।' প্রণামী হিসেবে সে চেয়ে রাখলে তার পিস্তলটি। পরদিনই সন্দীপের সঙ্গে দেখা হতে প্রেয়সী নারী আবার মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে। হঠাৎ টাকার একটা হদিস পাওয়া গেল: স্বামীর সিন্দুকে তাঁর ভাজেদের জন্য ছ-হাজার টাকার গিনি ছিল। রাত্রে সিন্দুক খুলে বিমলা কুড়িটি গিনির মোড়ক আঁচলে বাঁধলে। তারপর জপতে লাগল, 'বন্দেমাতরং, বন্দেমাতরং! দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ! সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারো নয়!' সারারাত অন্তঃপুরের খোলা ছাদে সেই আঁচলে-বাঁধা গিনির উপরে সে পড়ে রইল বুক পেতে; সকালে সর্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে চুরির ভারে অবনতদেহে এল বাইরে। কিন্তু সন্দীপের লোলুপতায় রাগে-লজ্জায় তার ইচ্ছা হল, সেই সোনার বোঝা তাকে ছুঁড়ে মারে। কাঁচ-মুখ স্নিগ্ধ-চোখ অমূল্যকে দেখে সে ভাবলে, কেমন করে তার হাতে বিষ তুলে দেবে? গিনি দেখে সন্দীপ প্রায় উন্মত্তের মতো। অমূল্যর দিকে চেয়ে অপ্রতিভ বিমলা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। অমূল্য দীপ্তচোখে পায়ের ধুলো নিতে সে ভেঙে পড়ল কান্নায়: এই শ্রদ্ধাটুকুই তার শূন্যপাত্রে শেষ সুধাবিন্দু।

অনতিপরে চুরির কথা প্রকাশ হবার ভয়ে বিমলা অমূল্যকে ডেকে পাঠালে। তাকে দিলে তার গহনার বাক্স: 'লক্ষ্মী ভাই আমার···আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পরশুর মধ্যে ছ-হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।··· আমার এই গয়না-বিক্রির কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।' পরমুহূর্তেই সন্দীপ এসে অমূল্যকে ব্যঙ্গ করলে তার প্রতিধ্বনি বলে। বিমলা বললে, 'যেখানে ও আপনার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে আপনার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।' চুরির টাকা সন্দীপের হাতে দেওয়ার পর থেকেই উভয়ের সম্বন্ধের মধ্যে যেন বেসুর বাজছিল। এদিকে অমূল্যকে বিপদের মধ্যে পাঠিয়ে তার স্বস্তি রইল না। এতদিন বিমলা তার মেজো-জাকে অবজ্ঞাই করত। সেদিন তাঁর কাছে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'অনেক অপরাধ করেছি—করো দিদি, আশীর্বাদ করো, আর যেন কোনোদিন তোমাদের দুঃখ না দিই। আমার ভারি ছোটো মন।' অমূল্যর

প্রতীক্ষায় বাইরে এসে সন্দীপকে দেখে আবার তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। এদিকে গহনা বিক্রি না করে অমূল্য তার স্বামীর কাছারি লুঠ করে। বিমলা সসংকোচে বললে, 'এ-টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেছ এখনই সেখানে দিয়ে এসো।···কী কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে। সন্দীপও তোমার যতবড়ো অনিষ্ট করতে পারে নি, আমি তাই করলুম।' অমূল্য চলে গেলে আবার সন্দীপের বক্তৃতা শুরু হল। বিমলা উত্ত্যক্ত হয়ে বললে, 'আপনি গল্-গল্ করে এত কথা বলে যান কেমন করে···খাতা দেখে আসুন ; এ কথাগুলো ঠিক হচ্ছে না।'

সন্দীপের অত্যাচারে প্রজারা ক্ষেপে উঠতে তাকে নিয়ে নিখিলেশের কলকাতা যাবার প্রস্তাবে আবার তার শুরু হল প্রিয়াস্তোত্র। কিছুক্ষণ আগে যে-মানুষটিকে বিমলার যাত্রাদলের রাজা মনে হয়েছিল, আবার তাকে মনে হল সত্যকারের রাজা। গহনার বাক্সটি আবার তারই হাতে দিয়ে বললে, 'আমার এই গয়না আমি তোমার হাতে দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পেঁছে দিয়ো।' এদিকে কলকাতা যাবার আয়োজনের মধ্যে টাকার কথা উঠবে—তাই অমূল্যকে পাঠিয়েও তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। এই-একদিনের ইতিহাস তার জীবনে সবচেয়ে জটিল হয়ে উঠল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ—জানাশোনা, হাসাহাসি, কান্নাকাটি, প্রশ্ন। লোকজনের খাওয়ানো শেষ করে অনেক রাত্রে মশারি তুলে বিমলা তার মাথাটি রাখলে স্বামীর পায়ের কাছে। অর্ধরাত্রে বারান্দায় মেঝেয় পড়ে তার কান্না আর বাধা মানল না : 'এবারকার মতো একবার আমাকে মাপ করো, হে আমার প্রভু। যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে, সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি।···আর-একদিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও···সেই-বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো।··· আমি দিনরাত ধর্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু, আমি খাব না, আমি জলস্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পেঁছয়।'

বিমলা অমূল্যর জন্য পিঠে তৈরি করে রেখেছিল। পরদিন সে এলে তাকে পেট ভরে খাওয়ালে। অবশেষে টাকাটার কথা উঠতে নিজেই স্বীকার করলে, সে-টাকা সে খরচ করে ফেলেছে। নিখিল তাকে হাত ধরে ঘরে আনতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। রাত্রেই কলকাতা যাবার কথা—তখন দু-জনে সাজানো-গোছানো চলছিল। এমন সময়ে প্রজাদের উত্তেজনায় বিদায় নিয়ে গেল সন্দীপ। তখনই লুঠপাট এবং মেয়েদের লাঞ্ছনার সংবাদে হঠাৎ বেরিয়ে গেল নিখিলেশ। দিন-শেষে নেমে এল অন্ধকার ; বিমলা জানলার সামনে নিশ্চল হয়ে বসে রইল। দূরদিগন্তে কলরবের ঢেউ অন্ধকারের বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল। রাজবাড়ির দেউড়িতে তখন দশটা। রাস্তায় অনেকগুলো আলো, মস্ত কালো এক অজগরের মতো আঁকাবাঁকা

জনতা। গেটের মধ্যে পেঁছিল এক ডুলি আর এক পাল্কি। পাল্কিতে নিখিলেশের অচৈতন্য দেহ।

বিমি বোস ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিত রায়ের বন্ধুনীদের অন্যতমা। অমিতের জীবনসঙ্গিনী হবার জন্য পথ চেয়ে ছিল। বিমি বোস এম. এ-তে বটানিতে ফার্স্ট—অথচ অমিতের মতে তার কালচার নেই। গ্রীষ্মাবকাশে বিমি গেল দার্জিলিঙে। অমিত সেখানে না-যাওয়াতে সে চারদিকে চেয়ে আবিষ্কার করলে: দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

বিল্বন ঠাকুর ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার ভুবনেশ্বরী-দেবীমন্দিরের নূতন পুরোহিত। মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের জীববলি নিষেধ উপেক্ষা করে পুরোহিত রঘুপতি এবং রাজভ্রাতা নক্ষত্রের নির্বাসনের পরে পৌরোহিত্যে নিয়োজিত হয়ে তিনি এক নূতন অনুষ্ঠানে দেবীর পূজা করতেন। বিল্বন কোন্-দেশী লোক কেউ জানত না। ব্রাহ্মণ হয়েও তিনি উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। এদিকে সকলে তাঁর বশ—সকলের বাড়ি গিয়ে সংবাদ নিতেন, রোগীকে ওষুধ দিতেন। বিপদে-আপদে পরামর্শ দিতেন এবং মধ্যবর্তী হয়ে বিবাদ মিটিয়ে দিতেন।

গোবিন্দমাণিক্য তাঁর প্রিয় বালক ধ্রুবকে নিয়ে সুখের খেলায় ব্যাপৃত। বিল্বন বলতেন, 'মহারাজ…বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে।' হঠাৎ উত্তর দিক থেকে পালে-পালে ইঁদুর এসে শস্য নষ্ট করতে লাগল। প্রজারা ভাবলে: মায়ের বলি বন্ধ হওয়াতে এই অমঙ্গল। বিল্বন উপহাসচ্ছলে বললেন, 'কৈলাসে কার্তিক-গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্তিকের ময়ূরের নামে গণেশের ইঁদুরগুলো ত্রিপুরার ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে।' রাজাকে বলে তিনি প্রজাদের খাজনা মকুব করিয়ে দিলেন। রাজার সন্দেহ: বলি বন্ধ হওয়াতে ঈশ্বরের এই অভিশাপ। বিল্বন হেসে বললেন, 'মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে হইয়াছে।…কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা না-ই বুঝিলাম। আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তারপরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন'।

রঘুপতি ও নক্ষত্র ত্রিপুরা আক্রমণ করায় বিল্বন চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে দ্রুতগামী দূত পাঠিয়ে কুকি গ্রামপতিদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। দেখতে-দেখতে কুকির স্রোত ত্রিপুরার শৈলশৃঙ্গে এসে পড়ল। গ্রামে-গ্রামে জুম থেকে বেছে তিনি সাহসী যুবকদের সংগ্রহ করলেন। গোবিন্দমাণিক্যের বিশ্বাস: রাজ্যত্যাগের জন্য এ দৈবাদেশ। বিল্বন বললেন, 'এ কখনোই ভগবানের

আদেশ নহে। ঈশ্বর তোমার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন ; যতদিন রাজকার্য নিঃসংকট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছ, যখনই রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি স্বাধীন হইতে চাহিতেছ।' নক্ষত্রকে যুদ্ধ থেকে বিরত করবার জন্য বিল্বন তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করলেন, কিন্তু ফল হল না। ফিরে এসে বললেন, 'অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া তুমি পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোনোমতেই প্রসন্নমনে বিদায় দিতে পারি না, মহারাজ। বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তিলাভ করিলেন—ইহা কি কল্পনা করা যায়।' রাজা তাঁকে নক্ষত্রের কাছে থেকে রাজ্যের হিতসাধন করতে অনুরোধ করায় বললেন, 'তুমি যেখানে রাজা নও সেখানে আমি অকর্মণ্য।···কোথায় আমার কাজ আছে আমি তাহাই অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। আমি কাছে থাকি আর দূরে থাকি তোমার প্রতি আমার প্রেম কখনো বিচ্ছিন্ন হইবে না জানিয়ো।'

নোয়াখালির নিজামতপুরে মড়ক দেখা দিলে বিল্বন সন্ন্যাসী এসে মুসলমানদের সেবা করতে লাগলেন। হিন্দুরা আশ্চর্য হলে তিনি বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী, আমার কোনো জাত নাই। আমার জাত মানুষ।' পাঠানের ছোটোছোটো ছেলেদের সঙ্গে একটি ভাঙা মন্দিরে তিনি আশ্রয় নিলেন। প্রত্যূষে ভিক্ষায় বেরোতেন—শ্রান্ত হলে ছেলেদের গান শোনাতেন। গোবিন্দমাণিক্যও চট্টগ্রামে এই-কাজে যেখানে ছিলেন অনুতপ্ত রঘুপতি সেখানে উপস্থিত। বিল্বনও অবশেষে সেখানে এসে বললেন, 'মহারাজ, আপনাকে জয় করিয়াছেন বলিয়া···আপনার দ্বারে শত্রুমিত্র সকলে একত্র হইয়াছে।···শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে কেবল জানিতে পাই না। ভগবান এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন···আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে তবে অনেক সময়ে সুধার আস্বাদ পাই।'

নক্ষত্রের মৃত্যুর পরে বিল্বন সেখানে গোবিন্দমাণিক্যের আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে রাজ্যে পাঠালেন।

বিশ্বম্ভর ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের তথাকথিত এক সমাজহিতৈষী বন্ধু।

বিষণ ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের গাজিপুরের এক বেহারা। কমলা যেদিন রমেশের আশ্রয় ত্যাগ করে, অপরাহ্নে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে বিষণ জিজ্ঞাসা করে, 'মাজি, কোথায় যাইতেছ ?' কমলা বলে, গঙ্গাস্নানে। পাহারা দেবার জন্য বিষণ বাগানের গেটের কাছে বসেছিল। এমন সময়ে সদ্যঃসঞ্চিত ফেনোচ্ছল তাড়ির কলস বাঁকে করে তাড়িওয়ালাকে সে সামনে দিয়ে যেতে দেখে। তারপরে বিশ্বসংসারে কী-যে ঘটল তার কাছে আর কিছুই স্পষ্ট ছিল না।

বিহারী ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের পরম বন্ধু। মহেন্দ্রকে সে দাদা এবং তার মা রাজলক্ষ্মীকে মা বলত। আহারলোলুপতা দেখিয়ে বিহারী রাজলক্ষ্মীর হৃদয় কেড়ে নিত। এম. এ.-পাস মহেন্দ্র তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র। বিহারীর উদ্যম অশেষ—কলেজে ডিগ্রি নিয়ে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গিয়েছিল; যতটুকু জানতে কৌতূহল ছিল, সেইটুকু সমাধা করেই এল মেডিকেল কলেজে। কলেজের ছাত্ররা ঠাট্টা করে তাদের দুই বন্ধুকে শ্যামদেশীয় জোড়া-যমজ বলত।

রাজলক্ষ্মী তাঁর বাল্যসখীর মেয়ে বিনোদিনীকে বিবাহের জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করে ব্যর্থ হয়ে বিহারীকে ধরলেন। বিহারী বললে, 'মা, যে-মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি, কিন্তু কন্যার বেলা সেটা সহিবে না।' মহেন্দ্রের বিধবা কাকী অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করত। তাঁর অনাথা বোনঝি আশার সঙ্গে মহেন্দ্র তার সম্বন্ধ করায় বললে, 'নিজেকে হাল্‌কা রাখিয়া পরের স্কন্ধে এরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।...যখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব—দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।' অন্নপূর্ণার অনুরোধে তবু পাত্রী দেখতে হল। দেখে বললে, 'মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাসিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষ্মী হইবে।' কিন্তু মেয়েটি মহেন্দ্রের মনঃপূত হওয়াতে গম্ভীরভাবে বললে, 'মহিনদা, সত্য বলিতেছ?...তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন—তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।' রাজলক্ষ্মীর আপত্তির জন্য পরে বিহারীই বিবাহে দৃঢ়মনস্ক হল। অবশেষে মহেন্দ্রের সঙ্গেই আশার বিবাহে অন্নপূর্ণার মত দেখে বললে, 'বুঝিয়াছি, কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে, তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর-কখনো কাহারো সঙ্গে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়ো না।'

বিবাহের পরে পড়াশুনায় শৈথিল্য করে মহেন্দ্র বিহারীর সঙ্গে এসে এক শ্রেণীতে মিলল। বিহারী মাঝে-মাঝে এসে তাকে শয়নগৃহের বিবর থেকে টেনে বার করত। আশাকে বলত, 'বউঠান...এখন সমস্ত অন্ন এক-গ্রাসে গিলিতেছ, ইহার পরে হজমি-গুলি খুঁজিয়া পাইবে না।' রাজলক্ষ্মী অভিমানে পিত্রালয়ে যেতে চাইলে মহেন্দ্রের আলস্য দেখে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল বিহারী। বারাসাতের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে তাঁকে ছেড়ে আসতে পারল না। দু-দিনেই সে পাড়ার কর্তা হয়ে উঠল। কেউ রোগের ওষুধ, কেউ-বা মকদ্দমার পরামর্শ, কেউ দরখাস্ত লিখিয়ে নিতে আসত। বৃদ্ধদের তাসপাশার বৈঠক থেকে বাগ্‌দিদের তাড়িপানসভা সর্বত্রই তার সকৌতুক কৌতূহল। বিনোদিনী তখন বিধবা। বিহারী অন্তরাল থেকে তার নীরব পরিচর্যা লাভ করত—পল্লীগ্রামের

প্রচলিত আতিথ্যের সঙ্গে তার পার্থক্যে প্রশংসা না-করে সে পারত না। রাজলক্ষ্মী বলতেন, 'এই-মেয়েকে কিনা তোরা অগ্রাহ্য করিলি।' বিহারী হেসে বলত, 'ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি।' অন্নপূর্ণা আশাকে কেন্দ্র করে নানা অশান্তিতে কাশীবাসের সংকল্প করে বিদায় নিতে এলেন। বিহারী গদাই ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ছুটে এল: 'কাকীমা…আমাদের তুমি নির্মম হইয়া ফেলিয়া যাইবে?…মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে সে বিদায় করিয়া দিল।' অনতিপরে কলকাতায় এসে মহেন্দ্রকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিয়ে সে রাজলক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনলে। বিনোদিনী তাদের সঙ্গে কলকাতায় এলে মহেন্দ্র বিরক্ত হল। বিহারী বুঝেছিল, সে-নারী খেলা করবার নয়।

বিহারীর আগের আদর আর রইল না। একদিন খোঁজ নিতে এসে দেখলে, মহেন্দ্র বিনোদিনী আর আশায় মিলে একটা তাল পাকিয়ে তুলেছে। বিনোদিনীর সম্বন্ধে মহেন্দ্রের আবিষ্টতা লক্ষ করে সে ভাবলে, 'আর দূরে থাকিলে চলিবে না…ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে।' বিনোদিনীকে বললে, 'বিনোদ-বোঠান, এই ছেলেটিকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাটি করিতেছে—তুমিও সেই-দলে না ভিড়িয়া একটা নূতন পথ দেখাও'। মহেন্দ্রকে বললে, 'মহিনদা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও, করো… কিন্তু যে সরলহৃদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না।' কিন্তু পরদিনই মহেন্দ্রের কাছে বিনোদিনীর রাগের কথা শুনে সে এল ক্ষমা চাইতে—বিনোদিনীর চোখে জল দেখে তার ধারণা পরিবর্তিত হল। অনতিপরেই একদিন চড়িভাতির আয়োজন হল। বিহারী মস্ত-একটা বাক্সে জিনিসপত্র এনে কোচবাক্সে চড়ে বসল। মহেন্দ্রের জিনিসপত্র যথাসময়ে পৌঁছল না—তখন সে তার সরঞ্জাম বের করলে। নিজের সমস্ত কাজ তাকে নিজের হাতেই করতে হত। বিনোদিনীর দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে একটি সুধাসিক্ত পূজারতা নারীকে দেখে সেদিন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলে, 'প্রকৃত-আপনাকে মানুষ আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিপাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।'

রাজলক্ষ্মী অসুখে পড়লেন। তাঁর চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিত বিহারী। অল্পক্ষণের জন্য ঘরে এসে সে কোথায় কী প্রয়োজন বুঝতে পারত এবং মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে দিত। মহেন্দ্র গূঢ় অভিমানে ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠল। বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার করুণমূর্তি দেখে তাকে ফেরাতে গিয়ে বিহারী আর অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। বিনোদিনী পরে বিদায় নিতে চাইতে সে বললে, 'বোঠান, তোমাকে থাকতেই হইবে।…এই সরলা মেয়েটিকে সুখে-দুঃখে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও…লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী…আমিও সংকীর্ণ-হৃদয় সাধারণ ইতর লোকদের মতো মনে-মনে তোমার সম্বন্ধে অন্যায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম…

তারপরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি।' মহেন্দ্র কিছুকাল কাশীতে অন্নপূর্ণার কাছে থেকে এল। সে ফেরার পরেই আশা কাশী যেতে চাইলে। বিহারী ভাবলে, তাদের মধ্যে কী-একটা গুরুতর ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই মহেন্দ্র আশার সম্বন্ধে তাকে কটাক্ষ করে বসল। অত্যন্ত বেদনার স্থানে দু-পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি পাংশুমুখে বিহারী মহেন্দ্রের দিকে ধাবিত হল—পরে বহুকষ্টে নিজেকে সংবরণ করলে। কিন্তু কথাটা যখন একবার উচ্চারিত হয়েছে, তার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল দেখতে-দেখতে তা অংকুরিত হয়ে উঠল। কন্যা দেখবার উপলক্ষে একদিন যে সুকুমার মুখখানি নিতান্ত আপনার মনে করে সে বিগলিত অনুরাগে দেখেছিল, বারবার তাই মনে করে একটি কঠিন বেদনা তার বুকের কাছ পর্যন্ত ঠেলে উঠতে লাগল। নিজের অজ্ঞাত এই ব্যথার পরিচয় পেয়ে সে মহেন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইতে গেল। আশা সেখানেই আছে জেনে একবার, শেষবারের মতো, সহজভাবে কথা বলে আসতে তার মন উন্মুখ হল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে সংযত করে সে-রাত্রেই সে চলে গেল পশ্চিমে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় অন্নপূর্ণার মঙ্গলচরণাশ্রয়ে মাথা রাখতে গেল বিহারী—জানত না, আশা সেখানে আছে। আশার অমূলক আশঙ্কায় সহসা জননী অন্নপূর্ণার সংহার-খড়্গ উদ্যত হল। সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হয়ে সে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। কলকাতায় ফিরে না-জেনে কাশী যাওয়ার জন্য সে মার্জনা চাইতে এসে দেখলে : মহেন্দ্র বিনোদিনীর পদলুণ্ঠিত। স্থির দৃষ্টিপাতে উভয়কে দগ্ধ করে ক্ষমা চাইতে গিয়ে সে অপমানিত হল—বিনোদিনী ছুটে এসে সান্ত্বনা দিতে এলে অপরিসীম ঘৃণায় তাকে ঠেলে দিলে। আর-একদিন রাজলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে মহেন্দ্রের কাছে মিটমাটের প্রস্তাব করে সে ব্যর্থ হল। এতদিন বিহারী মেডিকেল কলেজে পড়ছিল। সবাই জানত, ভালোভাবে পাস করে সে সম্মান এবং পুরস্কার পাবে—কিন্তু তার আর পরীক্ষা দেওয়া হল না। প্রতিবেশী রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটো ছেলে বসন্তকে চেয়ে নিয়ে সে নিজের প্রণালীমতো শিক্ষা দিতে লাগল। বন্ধুরা পরীক্ষা না-দেবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললে, 'পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।'

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিহারী নানা পরীক্ষায় বসন্তের ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষ-সাধনে ব্যাপৃত। এমন সময়ে বিনোদিনী উপস্থিত। মহেন্দ্র তার সঙ্গে গৃহত্যাগে উদ্যত শুনে গর্জন করে বললে, 'এ কিছুতেই হইতে পারে না।···যে-কথাগুলো বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো-আনাই নাটক এবং নভেল।···সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যা বলে তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।' কণ্ঠলগ্না বিনোদিনীর আকুল প্রেমভিক্ষায় মুহূর্তের আবিষ্টতা ছিন্ন করে বিহারী রাত্রেই তাকে

দেশে পেঁছে দিলে। কোনোদিন বিহারী নিজেকে নিয়ে ধ্যান করতে বসে নি—পড়াশুনা-কাজকর্ম বন্ধু-বান্ধব নিয়েই থাকত। পরদিন সান্ত্বনার জন্য, সঙ্গের জন্য, প্রীতিসুধাস্নিগ্ধ পূর্বজীবনের জন্য তার হৃদয় মাতৃপরিত্যক্ত শিশুর মতো ঊর্ধ্বে দুই-বাহু তুলে দাঁড়ান্। মহেন্দ্রের সঙ্গে বাল্যকালের প্রণয়কাহিনীর নানাবর্ণ-রঞ্জিত মানচিত্রখানি সে মনের মধ্যে প্রসারিত করে ধরলে। প্রথমে দুই-বন্ধুর মাঝখানে রক্তিমচ্ছটায় আভাসিত আশার লজ্জারুণ মুখখানি তার হৃদয়ে গূঢ় বেদনা সঞ্চারিত করলে; পরে যে-শনিগ্রহ বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ছারখার করে দিলে—তাকে সে ঘৃণার সঙ্গে দূরে ফেলতে চাইলে। তবু সেই পরমাসুন্দরী প্রহেলিকা দুর্ভেদ্যরহস্যপূর্ণ অনিমেষ দৃষ্টি মেলে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল—তারপরে সেই অপরূপ মায়ালতা নিমেষের মধ্যে তাকে বেষ্টন করে বেড়ে উঠে পুষ্পমঞ্জরিতুল্য একটি নিবিড় চুম্বন তার ওষ্ঠের কাছে এগিয়ে দিলে। প্রেমবঞ্চিত নিঃস্ব ভিখারির কাছে প্রেমের অন্নপূর্ণা যে সোনার থালি পাঠিয়ে দিলেন, বিহারী তা প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। অবশেষে শান্তিলাভের জন্য সে বেরিয়ে পড়ল পশ্চিমে। পরে বুঝলে, কোনো-একটা কাজে আবদ্ধ না হলে তার শান্তি নেই। কলকাতায় ফিরে বালিতে গঙ্গার ধারে একটা বাগান নিয়ে সে দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও সেবার ভার নিলে।

নিভৃত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে বিহারী তার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে ধূপের মতো নিজেকে দগ্ধ করছিল। সুখস্বপ্নজাল ছিন্ন হবার ভয়ে সে বিনোদিনীর খবর নেয় নি। সহসা সেখানে অন্নপূর্ণার আগমন। তাঁর কাছে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পলায়ন-বার্তা শুনে তার কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত রস মুহূর্তে তিক্ত হয়ে গেল। অবশেষে শয্যাশায়িনী রাজলক্ষ্মীর ইচ্ছায় বন্ধুর খোঁজে সে এল এলাহাবাদে। মহেন্দ্রের লালসাকে ঠেকিয়ে তখন বিনোদিনী তারই অন্বেষণে রত। বিহারী ভেবেছিল, নিজের প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর সমস্ত পঙ্কিলতা অনায়াসে ধুয়ে দিতে পারবে—তবু সেখানে এসে তার অন্তরের মোহিনীচ্ছবি আহত হল। অনতিপরে সমস্ত শুনে সে ভক্তিনম্রা পূজারিণীকে বিশ্বাস করে বললে, 'বোঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি।...তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।' মহেন্দ্র বিনোদিনীকে অপমান করতে উদ্যত হলে সে তার হাত চেপে ধরল: 'বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব...অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও।'

মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে সে নিয়ে এল কলকাতায়। রাজলক্ষ্মীকে বললে, 'বিনোদিনীর জন্য তুমি আর কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না মা।...তোমার সেবা করিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া আছে।' বিনোদিনী ও অন্নপূর্ণার সঙ্গে সে রাজলক্ষ্মীর সেবা করতে লাগল। চিকিৎসা ও সাংসারিক ব্যাপারে সে-ই

আশার নির্ভরস্থল। দুই-বন্ধুতে আবার মিলন ঘটল। বিনোদিনীর বিবাহে মত ছিল না—রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে মহেন্দ্র-আশার সঙ্গে সে যোগ দিতে চাইলে বিহারীর সেবাব্রতে। বিহারী বললে, 'বোঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন… একটি-একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে।…এখন হৃদয় যাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না।…যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত…এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে-আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে!'

বুধিয়া ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নবীনকালীর জনৈকা দাসী।

বৃন্দাবন চক্রবর্তী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীদের পুরনোকালের পুরোহিত।

বৃন্দাবন নন্দী ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শশাঙ্কের এক কর্মচারী।

বেঙ্কট শাস্ত্রী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। জনৈক মাদ্রাজি গনৎকার। বেঙ্কট শাস্ত্রীর 'সামনের মাথা কামানো, ঝুঁটিওয়ালা, কালো বেঁটে রোগা' চেহারা। কলকাতার কোনো-এক সরু গলিতে বাসা। অন্ধকার একতলায় ভ্যাপসা ঘর; নোনাধরা দেয়াল ক্ষতবিক্ষত। তক্তপোশের উপরে ছিন্নমলিন শতরঞ্চ, একপ্রান্তে এলোমেলো জড়ো-করা পুঁথি, দেয়ালে শিবপার্বতীর পট।

নববধূ কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিরোধ। নবীন জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে তার দাদাকে ভাগ্যবিচার করাতে নিয়ে এল। ময়লা ছিটের বালাপোশ গায়ে শাস্ত্রীজি ঘরে এসে ঠিকুজি অগ্রাহ্য করে হাত দেখতে চাইলেন। কাগজ-কলম বের করে চক্র এঁকে বললেন, পঞ্চম বর্গ। পরে আঙুলের পর্ব গণনা করে বললেন, পঞ্চম বর্ণ। সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল আবৃত্তি: প, ফ, ব, ভ, ম। শেষে বলে উঠলেন, পঞ্চাক্ষরবং। অর্থাৎ 'পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ ম, তার পরে পঞ্চ অক্ষর ম-ধু-সূ-দ-ন। জন্মগ্রহের অদ্ভুত কৃপায় তিনটে পাঁচ এক-জায়গায় মিলেছে।' অবশেষে সংস্কৃত ভাষায় মধুসূদনের জীবনের সংক্ষিপ্ত অতীত ইতিহাস ব্যাখ্যানের পর শাস্ত্রীজির শেষ কথা এই-যে, মধুসূদনের ঘরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে বলেই সৌভাগ্যের সূচনা; তিনি এসেছেন নববধূকে আশ্রয় করে—তিনি যদি মনঃপীড়া পান, ভাগ্য কুপিত হবেন।

পরে একবার কারবারে সুলক্ষণ দেখা দিতে মধুসূদন নিজেই শাস্ত্রীজির কাছে উপস্থিত। নবীন অগত্যা দাদার সঙ্গ নিয়ে অপ্রস্তুত শাস্ত্রীকে বললে,

'মহারাজের সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে, কবে গ্রহশান্তি হবে বলে দাও শাস্ত্রীজি।' বেঙ্কটস্বামী রাশিচক্র কেটে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলেন, মধুসূদনের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি পড়েছে। মধুসূদন নাম চাইলে তিনি মুগ্ধবোধের সূত্র আবৃত্তি করেন, আর তার মুখের দিকে চান—হঠাৎ বলে উঠলেন, শত্রুতা করছে একজন স্ত্রীলোক। ক-বর্গের বর্ণমালা শুরু করে অদৃশ্য ভৃগুমুনির দিকে কান পেতে তিনি কটাক্ষে মধুসূদনকে দেখতে লাগলেন। ক-বর্গে কুমু। নবীন পিছন থেকে ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ল। মাদ্রাজে এ-সংকেতের অর্থ বিপরীত। বেঙ্কটস্বামী জোরগলায় ব্যাখ্যা করে বললেন: ক-এর মধ্যেই মধুসূদনের সমস্ত কু। মানবচরিত্রবিদ্যার চর্চাও তিনি করেছিলেন। বললেন, 'কণ্টকেনৈব কণ্টকং—অর্থাৎ উদ্ধার করবে অন্য একজন স্ত্রীলোক।' নবীন অস্থির হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'স্বামীজি, ঘোড়দৌড়ে মহারাজের ঘোড়াটা কি জিতেছে?' মধুসূদনের ঘোড়াটির জিত হয়েছিল। বেঙ্কটস্বামী জানতেন, অধিকাংশ ঘোড়াই জেতে না। হিসেবের ভান করে বললেন, 'লোকসান দেখতে পাচ্ছি।' নবীন জিজ্ঞাসা করলে, 'স্বামীজি, আমার কন্যাটার কী গতি হবে?' নবীনের কন্যা ছিল না। বেঙ্কটস্বামী নবীনের চেহারা দেখে বুঝলেন: মেয়েটি অপ্সরা নয়। তাই বললেন, 'পাত্র শীঘ্র মিলবে না, অনেক টাকা ব্যয় করতে হবে।'

বৈকুণ্ঠ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বাল্যকালে বিপ্রদাস যে-ইস্কুলে পড়তেন, সেই ইস্কুলের সংলগ্ন ঘরে বৈকুণ্ঠ বই-খাতা কলম-ছুরি চীনাবাদাম বেচত। যতরকম অদ্ভুত খোশগল্পে তার জুড়ি ছিল না। অনেককাল পরে সে বিপ্রদাসের কাছে এল তার দুর্দশা জানাতে। 'কিছুকালের না-কামানো কণ্টকিত জীর্ণ মুখ, হাড়-বের-করা শির-বের-করা হাত, মোটা…চাদর, খাটো একখানা ধুতি, ছেঁড়া একজোড়া চটি-পরা'। সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে মেয়ের বিবাহ দিয়েছিল সে। পাত্রপক্ষের পণ ছিল বারো-শো টাকা নগদ আর আশি ভরি সোনার গহনা। একমাত্র মেয়ে বলেই সে রাজি হয়। সমস্ত সম্বল শেষেও আড়াই-শো টাকা বাকি। স্বামিগৃহের অপমান অসহ্য হওয়াতে মেয়েটি আসে পালিয়ে। আড়াই-শো টাকা দিয়ে বৈকুণ্ঠ মেয়েটিকে বাঁচাতে চায়। বিপ্রদাসের সাহায্য তার যথেষ্ট বোধ হল না—তাঁর অক্ষমতায় অবিশ্বাস করে সে অপ্রসন্নভাবে বিদায় নিলে।

ব্রজ ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নলিনাক্ষ চাটুজ্যের এক ভৃত্য।

ব্রজমোহন চৌধুরী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের বাবা। বাল্যবন্ধু ঈশানের সহায়তাতেই ব্রজমোহনের উন্নতি। ঈশানের মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর কন্যা বিবাহযোগ্যা হলে তার সঙ্গেই তিনি রমেশের বিবাহ স্থির করলেন। মেয়েটির রূপের সম্বন্ধে অনেকে আপত্তি করায় বললেন, 'ও-সকল কথা আমি

ভালো বুঝি না—মানুষ তো ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভালো দেখার বিচারটাই সর্বাগ্রে তুলিতে হইবে। মেয়েটির মা যেমন সতীসাধ্বী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে।'

রমেশের পরীক্ষার পরে তার সম্বন্ধে নানা-কথা শুনে ব্রজমোহন একেবারে দিন স্থির করে তাকে বাড়ি আসতে লিখলেন। দেরি দেখে শেষে তাকে নিজেই নিতে এলেন। রমেশ প্রশ্ন করলে: বিশেষ কোনো কাজ আছে? তিনি বললেন, 'এমন-কিছু গুরুতর নহে।' কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে তিনি রাত্রে আরামে নিদ্রা দিলেন; পরদিন ভোরে উঠে রমেশকে নিয়ে রওনা হলেন। বাড়ি এসে রমেশের অন্যত্র বিবাহের প্রতিশ্রুতির কথা শুনে বললেন, 'বল-কী। একেবারে পানপত্র হইয়া গেল?' কথাবার্তা পাকা হয় নি শুনে বললেন, 'তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর-কটা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে।' অন্য-কোনো কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা রমেশের অন্যায় বোধ হল। ব্রজমোহন বললেন, 'না-করা তোমার পক্ষে আরও বেশি অন্যায় হইতে পারে।' দৈবের জন্য যথেষ্ট পথ ছেড়ে দিয়ে এক সপ্তাহ আগে শুভদিনে তিনি বিবাহবাড়ি যাত্রা করলেন। সেখানে এসেই বন্ধুপত্নীকে স্বগ্রামে এনে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখবার জন্য তার ঘরকন্না তুলে নেবার উদ্যোগ করলেন।

বিবাহান্তে পথিমধ্যে সন্ধ্যাবেলায় মাঝিরা এক জায়গায় নৌকা বাঁধতে চাইলে। ব্রজমোহন বিলম্ব করতে চাইলেন না। অনতিকাল পরে এক প্রচণ্ড ঘূর্ণি-বাতাসে নৌকাগুলোকে কোথায় কী করে দিলে।

ব্রাউন্‌লো ॥ 'গোরা' উপন্যাস। জনৈক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট। গার্ডন্‌-পার্টিতে মাঝে-মাঝে ব্রাউন্‌লো বাঙালি ভদ্রলোকদের নিমন্ত্রণ করতেন। জেলার স্কুলে প্রাইজ-বিতরণ উপলক্ষ্যে সভাপতির কাজ করতেন। সম্পন্ন লোকের বাড়ি ক্রিয়াকার্যে আহূত হলে গৃহকর্তার অভ্যর্থনা গ্রহণ করতেন। এমন-কি, যাত্রাগানের মজলিসেও কেদারায় বসে ধৈর্যসহকারে গান শুনতে চেষ্টা করতেন। পরেশবাবুর মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার চর্চা দেখে সাহেবের স্ত্রী উৎসাহ দিতেন—দূরে থাকলেও চিঠিপত্র চালাতেন এবং ক্রিস্‌মাসের সময় ধর্মগ্রন্থ উপহার পাঠাতেন। জন্মদিনে প্রতিবৎসর তিনি কৃষিপ্রদর্শনীর মেলা করতেন।

মেলা উপলক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের অনেক ইংরেজ বন্ধু এবং বাছা-বাছা বাঙালি ভদ্রলোক আহূত। দিবাবসানে ব্রাউন্‌লো নদীতীরে পদচারণ করছিলেন; এমন সময়ে গোরা উপস্থিত। চরঘোষপুর গ্রামে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে বিবাদে সাতচল্লিশ-জন প্রজা ছিল হাজতে। গোরা ঘোষপুরের কথা বলতেই সাহেব শিস দিলেন। আপাদমস্তক তীক্ষ্ণভাবে নিরীক্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার যোগ আছে বুঝি?…চর-ঘোষপুরের লোকগুলো অত্যন্ত বদমায়েস সে-কথা তুমি জান?' গোরা বললে: তারা

নির্ভীক। ম্যাজিস্ট্রেট মনে-মনে ঠিক করলেন : নব্যবাঙালি ইতিহাসের পুঁথি পড়ে কতকগুলো বুলি শিখেছে—ইনসাফারেবুল। ধমক দিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি তুমি যদি ঘোষপুরের ব্যাপার সম্বন্ধে কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ কর তা-হলে খুব সস্তায় নিষ্কৃতি পাবে না।' গোরার স্পর্ধিত উত্তরে গর্জিতস্বরে তিনি থমকে দাঁড়ালেন : 'কী! এত বড়ো স্পর্ধা!' গোরা প্রস্থান করলে তিনি পার্শ্বস্থিত হারানবাবুকে বললেন, 'হারানবাবু, আপনাদের দেশের লোকদের মধ্যে এ-সকল কিসের লক্ষণ দেখা যাইতেছে?…খৃষ্টকে স্বীকার না-করিলে ভারতবর্ষে ধর্মবোধ কখনো পূর্ণতা লাভ করিবে না।'

পরদিন গোরা আসামিদের জামিনের দরখাস্ত করায় ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে একবার কটাক্ষ করে দরখাস্ত অগ্রাহ্য করে দিলেন। গোরা অনতিপরে কয়েকজন ছাত্রের উপর পুলিসের পীড়নে প্রতিবাদ করে গেল হাজতে। পরের দিন মেলায় ছোটোলাট আসবেন বলে ম্যাজিস্ট্রেট তাড়াতাড়ি বিচারকর্ম শেষ করে ফেলতে চেষ্টা করলেন। ছাত্রদের পক্ষের উকিল গতিক দেখে ছেলেদের অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বয়স এবং অপরাধের তারতম্য অনুসারে পাঁচ থেকে পঁচিশ বেতের আদেশ করে দিলেন। গোরা পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করতেই তীব্র তিরস্কার করে তার মুখ বন্ধ করে দিলেন, এবং পুলিসের কাজে বাধা দেওয়ার অপরাধে তার একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়ে সেই লঘুদণ্ডকে বিশেষ দয়া বলে কীর্তন করলেন।

ভজহরি ॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীর স্বামিগৃহের এক বালক।

ভজু ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। বিহারীর এক বেহারা।

ভবি ॥ 'করুণা' উপন্যাস। করুণার এক পুরনো দাসী। করুণা তারই হাতে মানুষ। ভবি তাকে প্রাণের মতো ভালোবাসত—নিজের কেউ না থাকায় তারই জন্য যথাসর্বস্ব সে ব্যয় করত, এবং করুণার উপরে তার স্বামীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করে প্রায়ই নির্যাতিত হত।

ভবেশ ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। সন্ত্রাসবাদী দলের জনৈক সদস্য। ভবেশ হারমোনিয়াম না-থাকলে হাঁ করতে পারত না। অতীনের জন্মদিনের উৎসবে হারমোনিয়াম ছিল না, তাই রক্ষা।

ভাগবত ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের এক প্রহরী। একরাত্রে রাজজামাতার প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে যুবরাজ উদয়াদিত্যের

হাতে বাঁধা পড়ল ভাগবত। মিনতি-সত্ত্বেও, ঘুষের টাকা ট্যাঁকে পুরেও সে মহারাজের কাছে নাম করলে উদয়াদিত্যের। তবু চাকরি রক্ষা হল না। পরে উদয়াদিত্যের বৃত্তি পেয়েও সে নানা-ভঙ্গিতে মুখ বাঁকালে।

রাজাদেশে অবশেষে বৃত্তি বন্ধ হলে মনোযোগ দিয়ে সে তামাক ফুঁকতে লাগল। তাকে তামাক ফুঁকতে দেখলে প্রতিবেশীদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হত। এদিকে সে শান্তপ্রকৃতির, ধর্মনিষ্ঠ—কারও সঙ্গে মিশত না, পরচর্চায় থাকত না, কেউ বিপদে পড়লে তার মতো পরামর্শ দিতে কেউ পারত না। কিন্তু কেউ অনিষ্ট করলে সে ইহজন্মে ভুলত না, শোধ তুলে তবে হুঁকো নামিয়ে রাখত। দুরবস্থায় পড়ে তাকে ঘটিবাটি বেচতে হল। অন্য-এক প্রহরী সীতারাম তাকে সাহায্য করতে চাইলে। সে স্পষ্টই বললে, 'আমাকে গোটা-দশেক দিয়া ফেলো। আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই।' উদয়াদিত্যকে রাজপদে বসাবার জন্য দিল্লীশ্বরের কাছে একটা দরখাস্ত নিয়ে যাবার প্রস্তাবে সীতারামের উপরে সে মারমুখী। তারপরে সমস্ত দিন মনোযোগ দিয়ে ভেবে পরদিন গেল সীতারামের কাছে: 'কাল যে-কথাটা বলিয়াছিলে বড়ো পাকা কথা বলিয়াছিলে।...আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।'

দরখাস্তটি নিয়ে সে দিল্লির দিকে গেল না—সরাসরি প্রতাপাদিত্যের কাছে এসে বললে, 'উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লির দিকে যাইতেছিল, আমি কোনসূত্রে জানিতে পারি, ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজের নিকট আসিতেছি।' ফলে ভাগবতের আবার চাকরি হল এবং উদয়াদিত্যের কারারোধ।

ভাদু পরামানিক। 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের এক প্রজা।

ভুবন বিশ্বাস ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। ঘোষাল-বংশের কোনো-এক পূর্ব-পুরুষের নায়েব। গল্প ছিল: চাটুজ্যেদের বিখ্যাত দাশু সর্দারকে ভুবন বিশ্বাস এক রাত্রে বিলুপ্ত করে দেয়। পুলিস তল্লাসিতে এলে বলে, 'হাঁ, সে কাছারিতে এসেছিল তার নিজের কাজে, হাতে পেয়ে বেটাকে কিছু অপমানও করেছি, শুনলেম নাকি সেই ক্ষোভে বিবাগী হয়ে চলে গেছে।' হাকিমের সন্দেহ গেল না। ভুবন বললে, 'হুজুর, এই-বছরের মধ্যে যদি তার ঠিকানা বের করে দিতে না পারি তবে আমার নাম ভুবন বিশ্বাস নয়।' পরে দাশু সর্দারের মাপের এক গুণ্ডাকে দিলে ঢাকায় পাঠিয়ে। সে ঘটি চুরি করে পুলিসে নাম দিলে দাশরথি মণ্ডল। এক-মাসের জেল খেটে যেদিন সে বের হল, ভুবন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খবর দিলে, দাশু সর্দার আছে ঢাকার জেলখানায়। তদন্তে জেলের বাইরের মাঠে তার একটা দোলাই পাওয়া গেল।

ভূপেন ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নলিনাক্ষ চাটুজ্যের এক বন্ধু। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভূপেন একদা মফঃস্বল-ভ্রমণে বেরিয়েছিল। বন্দুক-হাতে শিকারে বেরিয়ে নৌকারোহী নলিনাক্ষকে দেখে বললে, 'শিকার খুঁজিতে আসিয়া খুব বড় শিকারই মিলিয়াছে।' নলিনাক্ষকে সে সহজে ছাড়লে না। ধোবাপুকুর বলে এক জায়গায় তাঁবু পড়ল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে তারা তারিণী চাটুজ্যের বাড়িতে উপস্থিত। সেখান থেকে ফেরার পথে ভূপেন বললে, 'ওহে তোমার কপাল ভালো, তোমার একটা বিবাহের সম্বন্ধ আসিতেছে।···কিন্তু যাই বল, মেয়েটি নামেও কমলা, সকল বিষয়েই একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা।' অতঃপর দু-দিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের বিবাহ সম্পন্ন হল।

ভূষণ রায় ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। জনৈক মহাজন। ভূষণ রায়ের বিশ-পঁচিশ-লক্ষ টাকার তেজারতি। জন্মগ্রাম বলে সে করিমহাটি পত্তনি চায়। করিমহাটির মালিক বিপ্রদাস অর্থসংকটে রাজি হবার উপক্রম করেন—প্রজারা বলে, 'ওকে আমরা কিছুতেই জমিদার বলে মানতে পারব না।' শেষে ভূষণের ইচ্ছাই ফলবতী হয়।

ভোগীলাল ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক দেশকর্মী। ভোগীলাল নিষ্কণ্টক ভালোমানুষ। বাঙালির মেয়ে-মাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানত। এই মুগ্ধ স্বভাবের জন্যই দলপতির নির্দেশে উমার সঙ্গে তার বিবাহ এবং জঞ্জালের ঝুঁড়িতেই পরমাগতি।

মণিভূষণ ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের সম্বন্ধে অমিতের বিরূপ মন্তব্যে মণিভূষণ চশমায় ঝলক লাগিয়ে বলে, 'সাহিত্য থেকে লয়ালটি উঠিয়ে দিতে চান।' পরে শাসিয়ে যায়, লিখে জবাব দেবে।

মতিলাল ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার এক ভক্ত। গোরার সঙ্গে দেশ-ভ্রমণে বেরিয়ে গ্রাম্য-ভারতবর্ষের দীনতার পরিচয় পেয়ে মতিলাল লেশমাত্র বিচলিত নয়—ছোটোলোকদের পক্ষে এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে, তার কল্পনাও তার পক্ষে বাড়াবাড়ি। এদিকে পথশ্রমে শারীরিক ক্লেশে তার কষ্টের সীমা ছিল না। কাজেই বাড়ি থেকে অসুখের সংবাদ পাওয়ার ছলে সরে পড়তে তার দেরি হল না।

মতিলাল ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক দেশোদ্ধারব্রতী। অতীনের জন্মদিনে চিঁড়ে-ভাজা কড়াইশুঁটি-সিদ্ধ আর ডিমের বড়া কাড়াকাড়ি করে

খেয়ে মতিলালের উৎসাহের আবেগ উঠল চড়ে : 'নবযুগে অতীনবাবুর নবজন্মের দিন…'। বাধ্য হয়ে তার মুখ চেপে ধরতে হল।

মতিলাল (হাবলু) ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের মেজো-ভাই নবীনের সাত-বছরের ছেলে। মতিলালের ডাক-নাম হাবলু। 'বড়ো-বড়ো কালো চোখ, তেমনি জল-ভরা মেঘের মতো সরল শামলা রং, গাল দুটো ফুলো-ফুলো, প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।'

বিবাহের পরে বিস্বাদে-ভরা মন নিয়ে স্বামিগৃহে এসে কুমুদিনী সান্ত্বনা পেল তার মেজো-জা নিস্তারিণীর কাছে। তখন ফুলকাটা-জামা-গায়ে জরির-পাড়-ধুতি-পরা হাবলু এসে বড়ো-বড়ো স্নিগ্ধ চোখে বললে, 'জ্যেঠাইমা।' কুমু নাম জিজ্ঞাসা করায় সে দেশকালপাত্র অনুযায়ী তার পিতৃদত্ত নামটুকু সুসম্পূর্ণ করে বললে, 'শ্রীমোতিলাল ঘোষাল।' কুমুর মুখে 'গোপাল' সম্বোধনে সে কিছু বিস্মিত হল—কিন্তু এমন সুর কানে পৌঁছল যে আপত্তি এল না। নিস্তারিণী তাকে 'বাঁদর'-সম্বোধনে বিছানায় নিয়ে যেতে চাইলে তার সম্মান বিপর্যস্ত হল। নালিশ-ভরা চোখ তুলে সে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল—ডান হাতে জ্যাঠাইমার আঁচল। পরদিন কুমুর টিপাইয়ের উপরে দেখা গেল তার গোপন ত্যাগের অর্ঘ : এক-শিশি লজেঞ্জস। কুমু তাকে ধরে এনে নানাভাবে প্রলুব্ধ করায় তার কাচের একটি কাগজচাপা ভারি পছন্দ হল—কাচের ভিতরে রঙিন ফুল, তাতেই তার বিস্ময়। সেটা উপহার পেয়ে লাফাতে-লাফাতে আনন্দিত হয়ে প্রস্থান করলে। তখনই চৌর্য-অপবাদে জ্যাঠার কাছে মার খেল সে—তবু জ্যাঠাইমার নাম করলে না।

দু-দিন হাবলু জ্যাঠাইমার কাছে যায় নি। অবশেষে তার আহ্বান পেয়ে পাতলা ছিটের জামা গায়ে ভয়ে-ভয়ে এসে গলা জড়িয়ে কানে-কানে বললে, 'জ্যেঠাইমা, তোমার জন্যে কী এনেছি বলো দেখি?' তারপরে পকেট থেকে ব্রাউন কাগজের একটা মোড়ক রেখেই পালাবার উপক্রম। মায়ের বরাদ্দ জল-খাবারের থেকে লোভনীয় বস্তুটিই সে যত্ন করে এনেছিল : কতকগুলি এলাচদানা। জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা জ্যেঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেছ?… একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার ঘরে সন্ধ্যের সময় চামচিকের পিঠে চড়ে সে আসে।…কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো লুকিয়ে রেখেছে। সেই-সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জান?' কুমু বললে, 'ভোরবেলাকার মেঘের ভিতর থেকে।' হাবলুর বিশেষ সংবাদদাতা বলেছিল সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা। কিন্তু তর্ক উত্থাপন না-করে সে বললে, 'যে-মেয়ে সেই কৌটো খুঁজে বের করে সিঁদুর-টিপ কপালে পরবে সে হবে রাজরানী।…সেজোপিসিমার মেয়ে খুদি জানে। ঝুড়ি নিয়ে ছন্নু যখন সকালে কয়লা বের করতে যায়, রোজ খুদি সেইসঙ্গে যায়—ও একটুও ভয় করে না।' কুমু তাকে তার পুজোর ফুলগুলি উপহার

দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোন ফুল তার ভালো লাগে। হাবলু বললে, 'জবা'। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল ; পরে বললে, 'জ্যেঠাইমা, জবাফুলের রং ঠিক তোমার শাড়ির এই লাল পাড়ের মতো।'

একদিন রাত্রে কুমু এসরাজে আলাপ আরম্ভ করায় হাবলু আর বিছানায় শুয়ে থাকতে পারল না। মধুসূদনকে সে যমের মতো ভয় করত—তবু দরজার পাশে এসে পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে রইল। প্রথম থেকে জ্যেঠাইমাকে সে আশ্চর্য বলেই জানত—সেদিন আর তার বিস্ময়ের অবধি রইল না। মধুসূদন বাইরে যেতেই সে মনের উচ্ছ্বাসে ঘরে এসে কুমুর গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'জ্যেঠাইমা…কেমন করে বাজাতে পারলে জ্যেঠাইমা ?… আমাকে শিখিয়ে দেবে ?'

কুমু তার দাদার কাছে যাবার দিনে সমস্তক্ষণ হাবলু তার কাছে-কাছে রইল। পরে মার সঙ্গে সেখানে দেখা করতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল।

মথুর ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

মথুর ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। গুজুরপাড়া গ্রামের জনৈক অধিবাসী।

মথুর ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের ডাক্তার।

মথুরবাবু ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শর্মিলার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক দাদা। মথুরবাবু কলকাতার বড়ো কনট্রাকটর। শর্মিলার অনুরোধে তার স্বামীর সঙ্গে যৌথ ব্যবসায় শুরু করেন। পরে তার গাফিলতিতে কোম্পানির লোকসান ঘটায় আপসে কাজ ভাগ করে নেন।

মধু অধিকারী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। যাত্রাদলের এক অভিনেতা।

মধুসূদন ঘোষাল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষাল রজবপুরের আড়তদারের মুহুরির ছেলে। আগের পুরুষে বাস ছিল হুগলী জেলার শেয়াকুলি। ছিল জমিজমা, গোরুবাছুর, জনমজুর, পাল-পার্বণ। নুরনগরের চাটুজ্যে-জমিদারের সঙ্গে মামলায় ভিটাত্যাগী। তাই তাদের রক্তে চাটুজ্যেদের বিরুদ্ধে মানসিক লাঠির খেলা অব্যাহত।

মধুসূদনের প্রথম শিক্ষা মফঃস্বল ইস্কুলে—সঙ্গে-সঙ্গে অবৈতনিক শিক্ষা নদীর ধারে, আড়তের প্রাঙ্গণে, যাচনদার-খরিদ্দার-গোরুরগাড়ির গাড়োয়ানদের ভিড়ের মধ্যে : বাপের ক্ষীণ সর্বস্বের উপর ভর করে সে বাসা নিলে কলকাতার

মেসে। কলেজে অধ্যাপকেরা তার সম্বন্ধে আশান্বিত ছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ পিতার মৃত্যুতে কলেজের বই বিক্রি করে সে রোজগারের পণ করলে। ছেলেবেলা থেকে মধুসূদন যেমন মাল-বাছাইয়ে পাকা, তেমনি বন্ধু-নির্বাচনে। ছাত্রবন্ধু কানাই গুপ্তের বোনের বিবাহে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়ে সে পেয়ে গেল একটা কেরোসিনের এজেন্সি। জমার ঘরে মোটা-মোটা অঙ্কের পা ফেলে ব্যবসা চলল গলি থেকে সদর রাস্তায়, খুচরো থেকে পাইকারিতে, দোকান থেকে আপিসে। মধুর সতর্কতায় রজবপুরের পাটের নাম দাঁড়িয়ে গেল। নদীর ধারের সমস্ত পোড়ো-জমি সস্তায় কিনে ইঁট-কাঠ-চুণ-লোহা আমদানি করলে। চিমনির কুণ্ডলায়িত ধূমকেতু উঠল আকাশে। শেষে কারবারের আপিস স্থানান্তরিত হল কলকাতায়। নাতি-নাতনির দর্শনসুখে বঞ্চিত হয়ে মধুর মা ইহলোক ত্যাগ করলেন। ঘোষাল-কোম্পানির নাম তখন দেশ-বিদেশে—তার বিভাগে-বিভাগে ইংরেজ ম্যানেজার। চারদিক থেকে কুলবতী, রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী, বিদ্যাবতীদের খবর পৌঁছয়। মধু চোখ পাকিয়ে বললে, 'ওই চাটুজ্যেদের ঘরের মেয়ে চাই।' শরিকানি বিবাদে চাটুজ্যে-বংশের বিপ্রদাস তখন তারই খাতক—তাঁরই ছোটো-বোন কুমুদিনীই লক্ষ্য।

যদিচ অগ্রহায়ণে বিবাহ, আশ্বিনের পূজার পরেই তাঁবু এবং সাজসরঞ্জামসহ ঘোষাল-কোম্পানির ওভারশিয়র শেয়াকুলিতে রাজাবাহাদুরের ভিটেয় উপস্থিত। ঘোষালদিঘির জঙ্গল সাফ হয়ে নিঁখুতভাবে জমি সমতল হল। ঘাটের উপর কাঠের ফলকে লেখা হল, 'মধুসাগর'; জলে দুটি নৌকো—'মধুমতী', 'মধুকরী'। তাঁবুর নাম, 'মধুচক্র'; গেটের নিশানে লেখা, 'মধুপুরী'। নানা-আকারের চানকায় ফুলের সমারোহ; নানারঙের কাপড়ে-কানাতে-নিশানে চাঁদোয়ায়-চীনালণ্ঠনে গড়ে উঠল মায়াপুরী। চাপরাশ-ঝোলানো উর্দিপরা চাপরাশির দল জুতো-পায়ে তলোয়ারের খোঁচায় বন্দুকের আওয়াজে নূরনগরের পাঁজরের মধ্যে ঘোষালদের জয়পতাকা উড়িয়ে দিলে। বিবাহের দশদিন আগে দলবলসহ মধুসূদনের আগমন। বিপ্রদাস অভ্যর্থনায় গিয়ে শুনলেন, 'একটা কথা মনে রাখবেন, এসেছি আমার পূর্বপুরুষের জন্মভূমিতে—আপনাদের দেশে না। বিয়ের দিনে সেখানে যাবার কথা।' অতঃপর উৎসাহের সঙ্গে চলল শিকার, পিকনিক। সন্ধ্যাবেলায় ব্যাণ্ডের সঙ্গীত-সহযোগে ইংরেজ অভ্যাগতদের নাচ; বিকালে টেনিস, দিঘির নৌকোয় পালের খেলা; রাত্রে ডিনারের পরে চিৎকার: 'ফর হী ইজ এ জলি গুড ফেলো।'

মধুসাগরের তীরে মধুপুরীতে ঘটা করে সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ হল। কিন্তু যথোচিত লোকসমাগম না-হওয়াতে পালটা জবাবে বিবাহের দিন বর এল নিঃশব্দে—সঙ্গে শুধু পুরোহিত। 'মধুসূদন···কুশ্রী নয়, কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে, সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড়ো বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে-পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে,

প্রশস্ত/ গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত। সেই ভ্রূর ছায়াতলে সংকীর্ণ তির্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীব্র। গোঁফদাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারি। কড়া-চুল কাফ্রিদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁষে ছাঁটা। খুব আঁটসাঁট শরীর···রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে। বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান, হাত দুটো রোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট ; মাথা থেকে পা-পর্যন্ত সর্বদাই কী-একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে। যেন ভাগ্যদেবতার কামান থেকে নিক্ষিপ্ত···একটা একগুঁয়ে গোলা।'

মধুপুরীতে সামিয়ানার নিচে ওয়েডিং-কেক কনগ্রাচুলেশন-যোগে কুশণ্ডিকা সম্পন্ন হল। ইংরেজ বন্ধুমহলে মধুসূদনের মাধুর্য অতি-গদগদ ভদ্রতায় বিকশিত, অন্যদিকে সে দুর্গম, দুর্দশ্য, দুর্ভেদ্য। বরযাত্রের দল এল কলকাতায়—সেলুনগাড়িতে ইংরেজ বন্ধুদের মধ্যে মধুসূদন, অন্য-গাড়িতে মেয়েদের দলে কুমু। মধুসূদনের পক্ষে কুমু নতুন আবিষ্কার। মেয়েদের সে অতি সংক্ষেপে দেখেছিল ঘরের বৌ-ঝিদের মধ্যে, প্রাচীরের আড়ালে কর্তাদের কটাক্ষ-চালিত। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারের কলানৈপুণ্য তার অগোচর। হাওড়ায় গাড়িতে উঠে কুমুর সঙ্গে নিজের পায়ের উপরে কম্বল বিছিয়ে সে এক-আবরণের সহযোগিতা স্থাপনের চেষ্টা করলে। হঠাৎ কুমুর হাতে একটা নীলা দেখে চমকে উঠল—একসময়ে তার ক্ষতি ঘটিয়েছিল নীলা। আংটিটা খুলে নেবার চেষ্টায় নিজের কর্তৃত্বের গর্ব ক্ষুণ্ণ হওয়াতে ঝেঁকে উঠল : 'এ আংটি তোমাকে দিলে কে ?···দাদা !' কুমুর কাছে দাদাই বেশি ভেবে জ্বালা ধরল তার গায়ে। 'মধুসূদনের আওয়াজটা খরখরে ; কানে বাজে, যেন বেলে-কাগজের ঘর্ষণ।'

রাজা-উপাধি পাবার পর থেকে মধুসূদনের বাড়ির নাম, 'মধুপ্রাসাদ'। কলকাতায় এসে প্রথমে যে-বাড়িটা কেনা হয়, এখন তা অন্তঃপুরমহল। ঘরগুলো অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, ধোঁয়ায়-ঝুলে আচ্ছন্ন। সামনের দিকে হালফেশানের মস্ত এক বৈঠকখানা—সেখানে মারবেলের মেঝে, বিলেতি কার্পেট, অয়েলপেটিং, চৌকি-সোফার অরণ্য। অন্তঃপুরের তেতলায় কুমুদিনীর শয়নকক্ষ। ফুল-শয্যার রাতে ন'টা বাজতেই হুকুম-মতো ঘণ্টা বাজল—সহসা যেন আকাশে এক বাজপাখির ছায়া দেখে মূর্ছিত হল কুমু। মধুসূদন দপ করে জ্বলে উঠল : 'বাপের বাড়ি থেকে মূর্ছো অভ্যেস করে এসেছ বুঝি ?···তোমাদের ঐ নূরনগরি চাল ছাড়তে হবে।···হিস্টিরিয়াওয়ালি মেয়ের খেদমদগারি করবার ফুরসত আমার নেই।···তুমি তোমার দাদার চেলা, কিন্তু জেনে রেখো, আমি তোমার সেই দাদার মহাজন, তাকে এক হাটে কিনে আর-এক হাটে বেচতে পারি।' রাত্রেই সে চুরি করলে সেই নীলার আংটি। পরদিন সে সেজো-ভাই নবীনের ছেলে হাবলুর হাতে একটা কাগজ-চাপা দেখে আরও উত্তেজিত—তাকে নির্দয়-

ভাবে প্রহার করে বললে, 'আমার হুকুম ছাড়া জিনিসপত্র কাউকে দেওয়া চলবে না।...এ-বাড়িতে তোমার স্বতন্ত্র জিনিস বলে কিছু নেই।' সেদিন সে আর কুমুর দেখা পেল না। অনেক রাত্রে বিনিদ্র লণ্ঠন-হাতে খুঁজতে-খুঁজতে নিচের তলার অন্ধকার বাতি-ঘর থেকে তাকে নিয়ে গেল উপরে। কুমুর সুপ্ত মুখ, শালের উপরে তার এলায়িত হাতখানির স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারল না। কুমুর কাছে বিপ্রদাসের একটি টেলিগ্রাম দেখে তাকে বাঁধবার একটিমাত্র পথের কল্পনায় সে সান্ত্বনা-আহরণের চেষ্টা করলে—সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা।

মধুর অন্তঃপুরের ব্যবস্থায় ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল না। পুরনো অভ্যাস-মতো মোটা-চালের ভাত, কলাইয়ের ডাল, মাছের ঝোল, তেঁতুলের অম্বল, কাঁটাচচ্চড়ি আর একবাটি দুধ আহারের দ্রব্যসামগ্রী। আহারান্তে তামাক সহযোগে পান, তৎপরে আপিসে প্রস্থান—অপেক্ষাকৃত দৈন্যদশা থেকে এই তার প্রাত্যহিক নিয়ম। প্রতিভার জোরে সম্পদ-সৃষ্টির তপস্যায় সে গভীরভাবে মগ্ন ছিল। আপিসের যে-রেজেস্টারি-বইয়ে আসা-যাওয়ার হিসাবে কর্মচারীদের জরিমানার অঙ্ক ওঠা-নামা করত, সেখানে নিজের সম্বন্ধেও পক্ষপাত ছিল না। পরদিন আহারের পরে সে অপেক্ষা করলে কিছুক্ষণ—আপিসের পরেও কাজ ফেলে চলে এল। রাত্রি নটায় সে শুতে যেত। সেদিন দেউড়িতে এগারোটায় ঘণ্টায় উঠল চমকে। রাগ চড়ে উঠল নবীনের স্ত্রী নিস্তারিণীর উপরে। তখনই নবীনের কাছে গিয়ে বললে, 'বড়োবউয়ের কানে মন্ত্র ফোসলাবার কেউ থাকে এটা আমি পছন্দ করিনে।' রাত যখন দুটো সে আর থাকতে পারল না—বিপ্রদাসের একখানা টেলিগ্রাম পকেটে নিয়ে দুরু-দুরু বক্ষে এল ফরাশখানায়। কুমুর কানের কাছে মুখ রেখে বললে, 'বড়োবউ, তোমার দাদার টেলিগ্রাম এসেছে।' কিন্তু দাদার সম্বন্ধে কুমুর ব্যগ্রতায় আবার মোচড় দিল তার হৃৎপিণ্ডে—বিপ্রদাসের চিঠির কথা সহসা অস্বীকার করে বসল।

অতঃপর সাজসজ্জায়-বেশভূষায় মধুসূদনের উন্নতি: সুগন্ধি তেল, আর দামি এসেন্সের ব্যবহারে, চুল-আঁচড়ানোয়। কিন্তু বিপ্রদাসের চিঠিখানি কুমুর চোখে পড়ায় সে নৌকোর পাল গেল ফেটে। সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গেল আপিসে—তবু কাজে মন দিতে পারল না। কুমুকে কঠিনভাবে শাসন করবার শক্তি আর তার ছিল না, তার মনও তার মুঠি থেকে কেবলই খসে পড়ছিল। চাটুজ্যেদের এমন মেয়েকেই সে পেল, বিধাতা আগের থেকেই যার কাছে তাকে হার মানিয়ে রেখেছেন। নিজের বয়স আর গায়ের রঙটা এখন তাকে পীড়া দিতে আরম্ভ করেছে। একটা বিষয়ে তবু সে হার মানাতে পারে—সে তার ধনে। কুমুর মন পাবার আশায় তাই নিয়ে এল সে চুনি, পান্না আর হীরার আংটি। কুমু আংটি পরলে যেন আদেশ-পালনের ভঙ্গিতে। মধুসূদন আরক্ত-মুখে সেগুলো ফিরিয়ে নিলে। রাত্রে তার ভিতরকার উপবাসী জীবটা

বেরিয়ে এল অন্ধকারে। বৈঠকখানায় এসে নবীনকে ঠেলা দিয়ে বললে, 'বড়োবউকে বল্‌গে, আমি তাকে শোবার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছি।' কুমু এলে তার পায়ের কাছে বসে বললে, 'আমাকে মাপ করো, আমি দোষ করেছি।' যা চেয়েছিল তা পাবার জন্য আর তার সবুর সইল না। কুমু কিছু সময় চাইতে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'সময় দিলে কী সুবিধে হবে। তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামীর ঘর করতে চাও!···তোমার দাদা তোমার গুরু!' কুমু গমনোদ্যত হলে সে গর্জে উঠল: 'যেয়ো-না বলছি।···এখনই কাপড় ছেড়ে এস!' কুমু কাপড় ছেড়ে এলে তার মনে হল সে যেন রণসাজ—হতাশ হয়ে চৌকিতে বসল। লক্ষ না করে পারল না, কুমুর সে শাড়িটি সেখানের দেওয়া নয়—তবু সেই ডুরেশাড়ি-পরা তনুদেহটি কী সুন্দর, কী আশ্চর্য সুন্দর!

যে-ভিক্ষুকের ঝুলিতে শুধু তুষ জমেছে, তারই মতো মন নিয়ে পরদিন সে বাইরে গিয়েছিল। নবীনের ছেলে হাবলুর হাতে কুমুর রুমালখানা দেখে হঠাৎ তার রাগ উঠল চড়ে। 'তুমি তো দানসত্র খুলে বসেছ, ফাঁকি কি আমারই বেলায়? এ-রুমাল রইল আমারই; মনে থাকবে কিছু পেয়েছি তোমার কাছ থেকে।' কুমুর হাতে ছিল হাবলুর দেওয়া কিছু এলাচদানা—কাগজে কী মোড়া আছে, সে বলতে চাইল না। 'কী! আস্পর্ধা তো কম নয়।'—বলে জোর করে মোড়ক খুলে মধুসূদন অবাক। তখনি সোনায়-রুপোয়-মিনে-করা ফলদানিতে নিয়ে এল এলাচদানা: 'এলাচদানা লুকিয়ে খাবার কী দরকার? এতে লজ্জা কী বলো।···অসম্ভব দাম নাকি এর।···তোমার দাদা পার্সেল করে পাঠিয়েছেন বুঝি।' মধুসূদন যা চায় তা পাবার বাধা ছিল তার স্বভাবের মধ্যেই।

সেদিন আপিসের একটা মিটিঙ-এ মধুসূদনের প্রথম হার। সেদিন সে প্রস্তুত ছিল না—যেটা তার একান্তই স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের উপরে তার বিশ্বাস ছিল অগাধ। এমন সময়ে এক জ্যোতিষীর উপরে নবীনের ভক্তি দেখে তার চালাকি ধরতেই বুঝি বেরিয়ে পড়ল। নবীনের চক্রান্তে জ্যোতিষ-বচনে তার বিষয়-বুদ্ধির সঙ্গে সন্ধি ঘটল ভালোবাসার—তার কাজকর্মের উপর দিয়ে উপচে পড়ল ভালোবাসা। রাত্রে সে নিয়ে এল সেই নীলার আংটি—আংটিটা কুমুকে পরিয়ে হাতখানি তুলে ধরে চুমু খেলে। তারপর আহারান্তে একটি মুক্তোর মালা আর বিপ্রদাসের পাঠানো এসরাজখানা নিয়ে এল: 'বাজাও-না বড়োবউ, আমার সামনে লজ্জা কোরো না।···তোমার জন্যে যে-মুক্তোর মালা এনেছি, এটা পেয়ে ততখানিই খুশি হবে না?' সংগীতের রস মধুসূদন বুঝত না—কিন্তু কুমুর আত্মবিস্মৃত মুখের উপরে সুরের খেলা, তার আঙুলের ছোঁয়ায় ছন্দের নৃত্যে তার মন উদ্বেল হয়ে উঠল দাক্ষিণ্যে। বললে, 'বড়োবউ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও। যা চাও তাই পাবে।' কুমু শুধু বেহারাকে একখানা শীতের কাপড় দিতে চাইলে। কুমুর আলোয়ানখানি নিজের

গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে বেহারাকে দিলে একটা একশো-টাকার নোট। আত্ম-ত্যাগের যে-ঢেউ তার সংকীর্ণ-চিত্তের কূল ছাপিয়ে উঠেছিল, হঠাৎ গেল নেমে।

পরদিন আপিসে কোম্পানির একটা বড়ো ক্ষতিতে শাবকের বিপদের সম্ভাবনায় সিংহিনীর মতো তার মনের অবস্থা হল। প্রৌঢ় বয়সে যে-ভালোবাসা খুব জোরের সঙ্গে সে অনুভব করেছিল, তা হঠাৎ ঢিলে হয়ে পড়ল। অনেকরাত্রে একরাশ কাগজপত্রের বোঝা নিয়ে সে বসে গেল কাজে। নবীন তখনই বৌরানীর কথা উল্লেখ করায় ঢেউয়ের উপরে সংকটাপন্ন জাহাজের মাস্তুলে যেন এসে বসল একটি ছোটো ডাঙার পাখি। বললে, 'বড়োবউ এখন কিছুদিন তাঁর দাদার ওখানে গিয়েই থাকবেন, তুমি তার জোগাড় করে দিয়ো।' দিনের বেলায় মধুসূদন আগেকার মতো নিজের উপরে একাধিপত্য ফিরে পেয়ে আনন্দিত; কিন্তু রাত যতই গভীর হতে লাগল আবার ফিরে এল সেই অদৃশ্য শত্রু। শেষে কাজ ফেলে উঠে পড়ল। সহসা উপরে গিয়ে ঘর অন্ধকার দেখে অধৈর্যের সঙ্গে বলে উঠল: 'আমাকে কোনমতেই সইতে পারছ না, না?··· অনুগ্রহ করেছিলাম, মর্যাদা বুঝলে না। এখন অনুতাপ করতে হবে।' নিচে যাবার পথে তার বিধবা বড়ো-ভাজ শ্যামা প্রাত্যহিক নিয়মমতো বারান্দায় শায়িত ছিল—তাকে শালের একাংশে আবৃত করে পৌঁছে দিলে তার ঘরে।

মধুসূদন আগে কখনো শ্যামাসুন্দরীর কাছে হার মানে নি। ব্যবসায়ের ভরা-মধ্যাহ্নে তার অবকাশমাত্র ছিল না। কঠিন পরিশ্রমের মাঝখানে চোখে-দেখায় কানে-শোনায় শ্যামার নিঃশব্দ সঙ্গটুকু তার ক্লান্তি দূর করত; কিন্তু তার বেশি সে এগোতে গেলেই দিয়েছে ধাক্কা। পরদিন কুমু দাদার কাছে গেলে মধুসূদন শ্যামাকে ডেকে পাঠালে। মনের মধ্যে বহুকালের প্রবৃত্তির আগুন যত জোরে চাপা ছিল, তত জোরেই অবারিত হল। শ্যামার সম্বন্ধে তার আসক্তি মোটা রকমের—তাকে সামলে চলবার একটুও দরকার ছিল না। কুমু যে আত্মমর্যাদায় ঘা দিয়েছিল শ্যামার সঙ্গে তা সুস্থ ছিল। কিন্তু সে কর্তৃত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলে প্রহার করত—তাকে সকলের সামনেই বলত, 'দূর হয়ে যা, বজ্জাত, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে।'

এমন সময়ে এক অপঘাত। কুমুর একটি ফোটোগ্রাফ এনেছিল নবীন। প্রসন্নভাবে মধুসূদন শ্যামার জন্যও একটি ফটোগ্রাফেব ফ্রেম আনলে। তা দেখে হঠাৎ শ্যামার ভাবান্তরে ধমক দিয়ে উঠল। শ্যামা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার এই আস্পর্ধায় মধুসূদন ছুটে এল তার ঘরে: 'উঠে এস বলছি, শীঘ্র উঠে এস। ন্যাকামি ক'রো না।' পরদিনই সাজসজ্জা করে এল সে বাগবাজারে—কুমুকে দেখে ইচ্ছা হল তখনই সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কুমু ফিরতে অনিচ্ছুক হলে উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে বললে, 'কী! যাবে না? যেতেই হবে!···দাদার স্কুলে নূরনগরি কায়দা-শিক্ষা আবার আরম্ভ হয়েছে?···জান, এই-মুহূর্তেই ওকে পথে বার করতে পারি?' বিপ্রদাসকে বললে, 'মনে থাকবে তোমার এই

আস্পর্ধা। তোমার নুরনগরের নুর মুড়িয়ে দেব তবে আমার নাম মধুসূদন।'

বিপ্রদাসের কাছে ইংরেজিতে লেখা তার একখানা চিঠি পেঁছিল : ভাষাটা ৎ কালতি-ধাঁচের। অনতিপরেই কুমুদিনীর সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদে মধুসূদন পুলকিত হল—ধনের মহিমাকে ভাবী-বংশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাই তার চরম লক্ষ্য। বিপ্রদাসকে দ্বিতীয় একখানা চিঠি পাঠালে : Whereas দিয়ে তার শুরু—Your obedient servent দিয়ে শেষ।

মনোরঞ্জন ॥ 'গোরা' উপন্যাস। পরেশবাবুর প্রথম সন্তান।

মনোরমা ॥ 'গোরা' উপন্যাস। হরিমোহিনীর মেয়ে। মনোরমার স্বামী নেশার বশীভূত হয়ে মিথ্যা অভাব জানিয়ে হরিমোহিনীর কাছে টাকা নিত। মনোরমা বলত, 'তুমি অমনি করিয়া উঁহাকে টাকা দিয়া উঁহার অভ্যাস খারাপ করিয়া দিতেছ, টাকা হাতে পাইলে উনি কোথায় যে কেমন করিয়া উড়াইয়া দেন তাহার ঠিকানা নাই।' হরিমোহিনী কর্ণপাত না করায় একদিন সে মার কাছে কেঁদে স্বামীর কলঙ্কের কথা জানালে। তখন সে সন্তান-সম্ভাবিতা। সে অবস্থাতেও তার লাঞ্ছনায় আকস্মিক বিপৎপাতের ভয়ে তার শাশুড়ি তাকে হরিমোহিনীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মনোরমা মার কাছে তার লাঞ্ছনার কথা গোপন করলে। মা তাকে নিজের হাতে তেল মাখিয়ে স্নান করাতে চাইলে সে নানা-ছুতোয় কাটিয়ে দিত—তার কোমল অঙ্গের আঘাতের চিহ্নগুলি মার কাছেও প্রকাশ করতে সে কুণ্ঠিত ছিল। স্বামী তখনও অর্থের আবদার করায় মনোরমা মার সমস্ত চাবি-বাক্স দখল করে বসল।

একদিকে মনোরমা যেমন নরম অন্যদিকে তেমনি শক্ত ছিল। জামাই একদিন রাগ করে পালকি পাঠালে হরিমোহিনী ভীত হয়ে তাকে স্বামিগৃহে যেতে বললেন। মনোরমা বললে, 'না মা, আজ নয়—আমার শ্বশুর কলকাতায় গিয়েছেন, ফাল্গুনের মাঝামাঝি তিনি ফিরে আসবেন, তখন আমি যাব।' হরিমোহিনীর দ্বিধায় অবশেষে সে পালকিতে উঠল—যাবার সময় তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'মা, আমি তবে চলিলাম।' সে-রাত্রেই গর্ভপাত হয়ে তার মৃত্যু।

মন্ত্রী (গোবিন্দমাণিক্যের) ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দ-মাণিক্যের মন্ত্রী। দেবীর মন্দিরে বলির রক্তে আতঙ্কিত একটি বালিকার মৃত্যুতে রাজা জীববলি নিষেধ করেন। মন্ত্রী জানতেন, সহজে তাঁকে সংকল্পচ্যুত করা যায় না। তবু ধীরে-ধীরে যুক্তি-সহকারে আপত্তি-খণ্ডনের চেষ্টা করলেন। তখন সেই বালিকার ছোটো ভাইটির আগমনে প্রতিবাদ করা তাঁর নিরর্থক বোধ হল। গোবিন্দমাণিক্য পরে সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন—কিন্তু সংকল্পচ্যুত হন নি।

মন্ত্রী (প্রতাপাদিত্যের) ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী। তাঁর প্রতি রাজার দুটি আদেশ ছিল : যতক্ষণ মতের অমিল হবে ততক্ষণ তা প্রকাশ করবে; দ্বিতীয়ত, বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করে নিরস্ত করবার চেষ্টা না হয়। মন্ত্রী এ-দুই আদেশের ঠিকমতো সামঞ্জস্য করতে পারেন নি। রাজা পিতৃব্য-হত্যার সংকল্প করায় তাঁর মনে হল : উপস্থিত বিষয়ে সংকোচ দেখালে রাজা আপাতত রুষ্ট হবেন বটে, কিন্তু পরিণামে সন্তুষ্ট হবেন। বস্তুত ধর্ম-অধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কোনো মতামত ছিল না। তিনি দিল্লীশ্বর ও প্রজাদের বিষয় উল্লেখ করলেন। প্রতাপাদিত্য তবুও রুষ্ট হওয়াতে বললেন, 'মহারাজ, মার্জনা করিবেন…আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোকের পক্ষে অন্তত স্পর্ধার বিষয়। তবে আপনি নাকি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, সেই-সাহসেই ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে যাহা মনে হয় আপনাকে মাঝে-মাঝে বলিয়া থাকি।'

মন্মথ ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদলের এক সভ্য। কর্মীদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মন্মথ তার গ্রাম-সম্পর্কে চেনা এক বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বুড়ি তার পরিচয় অবগত হওয়াতে ধরা পড়ার ভয়ে তাকে সে বাঁচতে দেয় না।

মহম্মদ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক সম্রাট ঔরংজীবের পুত্র। ঔরংজীব দারাকে নিহত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করায় মহম্মদ তাঁর ষড়যন্ত্রপ্রবণ নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে স্পষ্ট-মত প্রকাশ করে বিরাগ-ভাজন ছিলেন। তবুও পিতৃ-আদেশে সুজার বিরুদ্ধে অভিযান করে তাঁকে আসতে হল মুঙ্গেরে।

মহম্মদ তাঁর পিতৃব্য-কন্যার প্রণয়াসক্ত ছিলেন। তোণ্ডার শিবির থেকে প্রিয়তমার একটি পত্র পেয়ে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে সম্রাটের নিষ্ঠুরতায় বিরাগ প্রকাশ করে বললেন, 'আমি তোণ্ডায় আমার পিতৃব্যের সহিত যোগ দিতে যাইব। তোমরা যাহারা আমাকে ভালোবাস, আমার অনুবর্তী হও।' তারা স্বীকৃত হলে নদী পার হয়ে তিনি সুজার সঙ্গে মিলিত হলেন। অনতিপরে নৃত্যগীতের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হল। নৃত্যগীত শেষ না-হতেই তাঁর সৈন্যরা নিকটবর্তী হল। মহম্মদ উৎফুল্ল হয়ে ভাবলেন : সম্রাট-সৈন্য তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেবে। কিন্তু কাছে এসে তারা গোলাবর্ষণ করলে। সেই-রাত্রে মহম্মদ সুজার সঙ্গে সপরিবারে দ্রুতগামী নৌকায় ঢাকায় পেঁছিলেন।

ঢাকায় ঔরংজীবের এক পত্রবাহক চর ধরা পড়ল। অনুতপ্ত পুত্রকে ঔরংজীবের মার্জনা সেই-পত্রের বার্তা। মহম্মদ বারবার বোঝালেন : এ-সমস্তই তাঁর পিতার কৌশল। তবুও অশ্রু বিসর্জন করে তাঁকে বিদায় নিতে হল।

মহিম ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার পালকপিতা কৃষ্ণদয়ালের প্রথম পক্ষের ছেলে। পিতার মুরুব্বিবদের অনুগ্রহে মহিম সরকারি খাজাঞ্চিখানায় তেজের সঙ্গে কাজ চালাতেন। গোরা শিশুকালেই ইংরেজ-বিদ্বেষী হওয়াতে তাকে 'পেট্রিয়ট-জেঠা' বলে নানাভাবে দমন করবার চেষ্টা করতেন। পরিপুষ্ট নধরশরীর মহিমের চাকুরি-জীবন ছিল ছকে বাঁধা, স্ত্রী লক্ষ্মীমণির শাসনে সংকীর্ণ পরিধি। দিনে আপিস, অপরাহ্ণে জলযোগ সেরে বাটায় পান নিয়ে রাস্তার ধারে বসে তাম্রকূট-সেবন, সন্ধ্যায় পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরের ঘরে প্রমারার আড্ডা। প্রবল ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করা তাঁর মতে বোকামি; তার চেয়ে মিথ্যা-কথার ঘানির বিনি-পয়সার তৈল-প্রয়োগে কাজ আদায় করা তিনি বুদ্ধিমানের যোগ্য মনে করতেন।

দশ-বছরের মেয়ে শশিমুখীর বিবাহের জন্য মহিম অত্যন্ত ভাবিত। গোরার বন্ধু বিনয়কে অতিপরিচয়ে পাত্র হিসেবে দেখতেই পান নি। লক্ষ্মীমণি সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সহধর্মিণীর বুদ্ধির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে উঠল। রবিবার-দিন গৃহিণী তাঁর সাপ্তাহিক দিবানিদ্রাটি সম্পূর্ণ হতে দিলেন না। বিনয়ের বাড়ি এসে মহিম গোটা-দুই পান বিনয়কে দিয়ে বাকি-তিনটে নিজের মুখে পুরে বললেন, 'আমার শশিমুখীকে তো তুমি জানই।…বয়স প্রায় দশের কাছাকাছি হল, এখন ওকে পাত্রস্থ করবার সময় হয়েছে। কোন লক্ষ্মীছাড়ার হাতে পড়বে এই ভেবে আমার তো রাত্রে ঘুম হয় না।' বিনয় পাত্রের সন্ধান দেখতে চাইলে বললেন, 'আর বেশিদূর খোঁজ করবার কী দরকার বাপু? ও-মেয়ে তোমারই হাতে সমর্পণ করব।…অবশ্য, কুলে তোমরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো—কিন্তু বিনয়, এত পড়াশুনা করে যদি তোমরা কুল মানবে তবে হল কী!' বিনয়কে কিছু ভাববার সময় এবং তার খুড়াকে বলবার অবকাশ দিয়ে তিনি কথাটা যেন পাকাপাকি হয়ে গেছে এমনি ভাব করে উঠলেন।

মহিম গোরাকে মনে-মনে ভয় করতেন। অপরাহ্ণে তার কাছে এসে বাজারে পাত্রের মূল্য যে কী চড়া এবং ঘরে অর্থের অবস্থা কী অসচ্ছল তারই আলোচনা করে বিনয়ের কথাটা পাড়লেন। গোরা বিনয়ের দিক থেকে সন্দেহ প্রকাশ করায় বললেন, 'এই বুঝি তোমাদের হিঁদুয়ানি। হাজার টিকি রাখ আর ফোঁটা কাট…শাস্ত্রের মতে বিবাহটা যে ব্রাহ্মণের ছেলের একটা সংস্কার তা জান?' মহিম নিজে শাস্ত্রের ধার ধারতেন না; কিন্তু যস্মিন দেশে যদাচারঃ—তাই গোরার কাছে শাস্ত্রের দোহাই পাড়লেন। রাত্রেই আবার হাঁপাতে-হাঁপাতে এলেন গোরার কাছে। গোরা ব্রাহ্মপরিবারে বিনয়ের ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ করায় একেবারে উত্তেজিত: 'ঢের-ঢের হিদুঁয়ানি দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখলুম না, কাশী-ভাটপাড়া ছাড়িয়ে গেলে!…কোন্‌দিন বলবে, স্বপ্নে দেখলুম খৃষ্টান হয়েছে, গোবর খেয়ে জাতে উঠতে হবে।' তখনি আনন্দময়ীর কাছে এসে অনুযোগ করলেন, 'মা, তোমার গোরাকে তুমি ঠেকাও।…শশিমুখীর সঙ্গে

বিনয়ের বিবাহ আমি একরকম পাকা করেই এনেছিলুম।…ইতিমধ্যে গোরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে বিনয় যথেষ্ট-পরিমাণে হিঁদু নয়—মনু-পরাশরের সঙ্গে তার মতের একটু-আধটু অনৈক্য হয়ে থাকে।…গোরা বাঁকলে কেমন বাঁকে সে-তো জানই।…এখন তুমি যদি গতি করে দাও তো মেয়েটা তরে যায়।'

এদিকে মহিম বিনয়কেও তাগিদ দিতে লাগলেন। বিনয়ের সঙ্গে গোরার তর্ক বেধে উঠল। তিনি গোরাকে বললেন, 'তোমার কাছে আমার মিনতি এই-যে, তুমি বাধাও দিয়ো না, অনুরোধও কোরো না। কুরুপক্ষে নারায়ণী সেনাতেও আমার কাজ নেই, আর পাণ্ডবপক্ষে নারায়ণেও আমার দরকার দেখি নে। আমি একলা যা পারি সেই ভালো—'। গোরা হঠাৎ পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে হাজতে আটক হল। তার অবিবেচনা ও ঔদ্ধত্য নিয়ে মহিম বিস্তর গাল দিলেন—তার সম্পর্কে কোনদিন তাঁর চাকরিটা-সুদ্ধ যাবে। কিন্তু অন্তরে গোরার প্রতি তাঁর স্নেহও ছিল—পরান ঘোষালকে ডেকে উকিল-খরচার টাকা দিয়ে পাঠালেন। এদিকে অগ্রহায়ণ মাসের প্রায় অর্ধেক হয়ে এল; গৃহিণীর তাড়নায় একদিন আনন্দময়ীর সামনেই কথাটা তুললেন। আনন্দময়ী বিনয়ের দ্বিধার উল্লেখ করার মুখ অন্ধকার করে তিনি বললেন, 'মা, তুমি যদি বিনয়ের মন ভাঙিয়ে না-দিতে তা-হলে ও এ-কাজে আপত্তি করত না।' মনে-মনে এই বলতে-বলতে উঠে গেলেন যে, 'বিমাতা কখনো আপন হয় না।'

গোরা জেলে থাকতে বিবাহের প্রসঙ্গ তুলে মহিম সুবিধে করতে পারলেন না। গোরা মুক্তি পেয়ে বাড়ি আসতেই আর কালবিলম্ব না-করে বললেন, 'এবার দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলা যাক। কী বলো গোরা?…তুমি ভাবছ, আজও দাদা সে-কথাটা ভোলে নি। কিন্তু কন্যাটি তো স্বপ্ন নয়, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ সে একটি সত্য পদার্থ—ভোলবার জো কী!' এমন সময়ে কুৎসাতাড়িত বিনয়ের পরেশবাবুর মেয়ে ললিতাকে বিবাহের সংকল্প। খবরের কাগজ-হাতে মহিম বিনয়ের এই ছদ্ম-ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করলেন: স্পষ্টবাক্যে শশিমুখীকে বিবাহে প্রতিশ্রুত হয়ে সে যখন নড়চড় করতে লাগল, তখনই তাঁর বোঝা উচিত ছিল। গোরার ভক্ত অবিনাশ তখনি তাঁর নজরে পড়ল; এবং কালবিলম্ব না-করে তিনি মাঘ মাসেই দিন স্থির করে এলেন। বৃদ্ধবয়সে কৃষ্ণদয়াল এক সন্ন্যাসীর কাছে হঠযোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতে-থাকতে তাঁর পেনসনের টাকাটা সন্ন্যাসীর হাতে পড়বার আগেই মহিম কাজটা সেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। কৃষ্ণদয়ালের কাছে সুবিধে করতে না-পেরে শেষে সন্ন্যাসীটিকেই গাঁজা খাইয়ে কাজ উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। সেই সন্ন্যাসীকে পাকড়া করে তিনি করযোড়ে অবহিত হয়ে বসলেন। মুক্তি তাঁর নিতান্তই চাই, কোনোমতে কন্যাটার বিবাহ দিতে পারলেই সন্ন্যাসীর পদসেবা করে মুক্তির সাধনায় উঠে-পড়ে লাগবেন, কিন্তু কন্যার বিবাহ তো সহজ ব্যাপার নয়—এক, বাবা যদি দয়া করেন।

পরেশবাবুদের সঙ্গে গোরারও আলাপ হল। মহিম বললেন, 'রাগ কোরো না, ভাই…তোমাকেও বিনয়ের ছোঁয়াচ লেগেছে নাকি?…তুমি ভাবছ, ওটা একটা খাদ্যদ্রব্য…কিন্তু বঁড়শিটি ভিতরে আছে সে তোমার বন্ধুর দশা দেখলেই বুঝতে পারবে।…ওদিকে ব্রাহ্মমেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে তো একেবারে পাকা…তারপর কিন্তু ওর সঙ্গে আমাদের কোনোরকম ব্যবহার চলবে না…আমাদের বেহাই যতটুকু পরিমাণ মেয়ে ঘরে নেবেন সোনা তার চেয়ে বেশি না-নিয়ে ছাড়বেন না; কারণ, তিনি জানেন মানুষ নশ্বর পদার্থ… বেহাই বললে তাঁকে খাটো করা হয়, একেবারে বেহায়া।…লোকটার কাছে আমার অনেক শিক্ষা হল…ভারি লোভ হচ্ছিল আর-একবার এ-কালে জন্মগ্রহণ করে বাবাকে মাঝখানে বসিয়ে রেখে নিজের বিয়েটা একবার বিধিমতো পাকিয়ে তুলি—পুরুষজন্ম যে গ্রহণ করেছি সেটাকে একেবারে ষোলো-আনা সার্থক করে নিই।…আমার তিনকড়েটার বয়স এখন সবে চৌদ্দমাস—গোড়ায় কন্যা জন্ম দিয়ে শেষে তার ভ্রম সংশোধন করতে সহধর্মিণী দীর্ঘকাল সময় নিয়েছেন। যা-হোক, ওরই বিবাহের সময়টা পর্যন্ত, গোরা, তোমরা সকলে মিলে হিন্দুসমাজটাকে তাজা রেখো—তারপর দেশের লোক মুসলমান হোক, খ্রীষ্টান হোক, আমি কোন কথা কব না।'

কৃষ্ণদয়ালের হঠাৎ অসুস্থতায় মহিম দিশাহারা। পরে গোরার মুখে তাঁর সুস্থতার সংবাদ পেয়ে বললেন, 'বাঁচালে, পরশু একটা দিন আছে—শশিমুখীর বিয়ে আমি সেইদিনই দিয়ে দেব।…বিনয়কে কিন্তু আগে-থাকতে সাবধান করে দিয়ো…আর-একটি কথা তোমাকে বলে রাখি ভাই, সেদিন আমার আপিসের বড়োসাহেবদের নিমন্ত্রণ করে আনব, তুমি যেন তাদের তেড়ে মারতে যেয়ো না।…বুঝেছো ভাই, ওরা রাজার জাত, ওখানে তোমার অহংকার একটু খাটো করলে তাতে অপমান হবে না।'

মহেন্দ্র ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের কাশীপুরের এক প্রতিবেশী। মহেন্দ্র সহৃদয়, মৃদুস্বভাব, বন্ধুবৎসল—বি. এ. পাস ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র। পিতাকে সে ভক্তি করত, কিন্তু কুরূপা রজনীর সঙ্গে বিবাহের পরে তাঁকে ভর্ৎসনা করে কলেজ ছাড়লে। অনতিপরেই সে প্রতিবেশিনী বিধবা মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট। একরাত্রে এক বন্ধুর প্ররোচনায় মোহিনীর বাড়িতে প্রবিষ্ট হল। পরে তার নবযৌবনের মহান আদর্শ, লোকাপবাদ-কলঙ্কিত ঘৃণিত ভবিষ্যৎ স্মৃতিপথে উদিত হল—বিশেষত এক নিরপরাধা বিধবাকে কলঙ্কলেপনের গ্লানিতে তার অশ্রুসংবরণ করা দুঃসাধ্য হল। অবশেষে গৃহত্যাগ করে সে আজীবন পরোপকার-ব্রতে দুঃখ ভোলবার সংকল্প করলে।

প্রবাসে নানা-দেশ ভ্রমণ করে মহেন্দ্র লাহোরে এসে ডাক্তারিতে প্রভূত আয় করতে লাগল। এতদিন যে-কথা একদিনের জন্যও ভাবে নি, দূর বিদেশে এসে

তার সেই হতভাগিনীর কথা মনে হল ; অর্জিত সমস্ত অর্থই সে স্ত্রীর কাছে পাঠাতে লাগল। পরে মোহিনীর এক পত্রে রজনীর দুঃখের কথা জেনে ফিরে এসে রজনীকে বললে, 'আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করিয়াছি···তাহা কি ক্ষমা করিবে না?' মনে-মনে তখনও সে মোহিনীকে ভালোবাসত ; মনকে বোঝাত : 'মানুষকে ভালোবাসিতে দোষ কি?···আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভালোবাসি—সকলের অপেক্ষা ভালোবাসি—আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মতো ভালোবাসি।'

নরেন্দ্রের পরিত্যক্তা স্ত্রী করুণাকে মহেন্দ্র কাশী থেকে উদ্ধার করে এনেছিল। করুণার দুঃখে বিচলিত হয়ে সে নরেন্দ্রকেও সাহায্য করত। পরে নিজেই একটা বাড়ি ভাড়া করে তাকে স্বামীর সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করলে।

মহেন্দ্র ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে কাঙারু-শাবকের মতো তার মা রাজলক্ষ্মীর বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই মহেন্দ্রের অভ্যাস ছিল। বাইশ-বছর বয়সে এম. এ. পাস করে সে ডাক্তারি পড়ছিল। কিন্তু বাল্যকাল থেকে সর্ববিষয়ে প্রশ্রয় পেয়ে তার ইচ্ছার বেগ ছিল উচ্ছৃংখল। রাজলক্ষ্মীর বাল্যসখীর মেয়ে বিনোদিনীকে বিবাহে মত দিয়েও সে আসন্নকালে বিমুখ হয়ে বসল। তিন-বছর পরে আবার বিবাহের কথা উঠতে সে মাকে বললে, 'আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না।···বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বসেই। তখন এত কষ্টের এত স্নেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি-বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।' তার সন্তানহীনা বিধবা কাকী অন্নপূর্ণার মতে : এ বাড়াবাড়ি। এ-নিয়ে বড়ো-জার ভর্ৎসনায় তিনি ব্যথিতা। মহেন্দ্র কাকীর প্রতি সমবেদনায় তাঁর বোনঝি আশালতার সঙ্গে সম্বন্ধ করলে তার পরমবন্ধু বিহারীর। কিন্তু পাত্রী দেখে নিজেই বিবাহ করতে উদ্যত হল। রাজলক্ষ্মীর গঞ্জনায় অন্নপূর্ণার তাতে অমত দেখে সে একটা দীনহীন ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠল। এই নিগূঢ়-নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আশার সঙ্গে তার বিবাহ হল।

বিবাহের পরে গৃহকার্যে নববধূর সমস্ত মিষ্টরস পিষ্ট হতে দেখে মহেন্দ্র উত্তেজিত : 'বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো খাটিতে দিতে পারিব না।··· তাহাকে আমি লেখাপড়া শিখাইব।' এই বলে সে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। তার কলেজ-একজামিন-বন্ধুকৃত্য সমস্ত গেল ভেসে। আশার অধ্যাপন-কার্যও যে-ভাবে নির্বাহ হত, কোনো স্কুলের ইনস্পেক্টর তা অনুমোদন করবেন না। নিজেও সে পরীক্ষায় ফেল করলে। এই সমস্ত অশান্তিতে অন্নপূর্ণা তাঁর পিসতুত ভাইয়ের বাসায় গেলে মহেন্দ্রও সেখানে যেতে উদ্যত হল। রাজলক্ষ্মী অভিমান করে তাঁর পিত্রালয়ে যেতে চাইলে সে সঙ্গে দিলে বাড়ির সরকারকে। বিহারী লজ্জিত হয়ে তাঁর সঙ্গে গেল। মহেন্দ্র ভাবলে, সে যেন

দেখাতে চায় তার মাকে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর পরে অন্নপূর্ণাও চলে গেলেন কাশীতে। ঘরের কাজে বিশৃঙ্খলা ও শূন্যগৃহের অকল্যাণের মধ্যে প্রেমোৎসবের সমস্ত বাতিগুলিই একসঙ্গে জ্বালিয়ে সে তার মিলনের আনন্দ সমাধা করবার চেষ্টা করলে।

রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে বিধবা বিনোদিনী এল কলকাতায়। হৃদয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের আদর্শ সাধারণের চেয়ে কিছু কড়া। মার অধিকার ক্ষুণ্ণ হবার ভয়ে সে বিবাহে নারাজ ছিল—বিবাহের পরে অন্য-স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহলও মনে স্থান দিত না। বিহারীকে সে বন্ধু বলত—তাই অন্য-কাউকেই সে বন্ধু বলে স্বীকার করত না। সেই-মহেন্দ্রের মনও যখন অনিবার্য ব্যগ্রতা এবং কৌতূহলের সঙ্গে বিনোদিনীর দিকে ধাবিত হত, তখন সে নিজের কাছে খাটো হয়ে পড়ত। বিশেষত, আশাকে বিনোদিনীর গৃহকাজে প্রবৃত্ত করানোর চেষ্টায় তার সম্বন্ধে সে বিমুখ ছিল। এদিকে আশার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মিলনে ভিতরে-ভিতরে ক্লান্ত তার মন। আশা বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করাতে চাইলে সে মনে-মনে অসন্তুষ্ট হল : তাকে অন্য সাধারণ-পুরুষের মতো জ্ঞান করা! কিন্তু বিনোদিনীও আলাপে অনিচ্ছুক শুনে সে অতিরিক্ত-মাত্রায় ঔদাসীন্য দেখিয়ে সম্মত হল। আশা তার অনুপস্থিতির ছল করে বিনোদিনীকে উপরে আনলে, এবং প্রথম আলাপের পরে ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের ছলে সেই-পরিচয় বহুদূরে অগ্রসর হল। বিনোদিনীর সেবাহস্তের স্পর্শে সৌন্দর্যে-আনন্দে অভিভূত হয়ে সে বিহারীকেও এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলে। একদিন বিহারী এসে তিরস্কার করায় অসন্তুষ্ট মহেন্দ্র তার বাড়ি গিয়ে বললে, 'বিহারী, বিনোদিনী হাজার-হউক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়—তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।' বিনোদিনী তা শুনে বাড়ি যেতে চাইলে মহেন্দ্র কাতর-অনুনয়ে তাকে নিরস্ত করলে। অবশেষে এই মনোমালিন্যটুকু মুছে ফেলতে একদিন সে চড়িভাতির প্রস্তাব করলে। বিনোদিনীর অনুরোধে বিহারীকেও সঙ্গে নিতে হল। পথিমধ্যে বিহারীর অসুবিধায় তাকে চিন্তিত দেখে মহেন্দ্র সমস্ত পথ গম্ভীর হয়ে রইল। বিহারীর চেষ্টায় সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হল। মহেন্দ্র তাতে আশ্বস্ত হয়েও বললে, 'বিহারীর সমস্ত বাড়াবাড়ি। চড়িভাতি করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দস্তুরমতো আয়োজন করিয়া আনিয়াছে।'

রাজলক্ষ্মী অসুখে পড়লেন। রুগ্না মাতার শয্যাপার্শ্বেও সেবাপরায়ণা বিনোদিনীর জন্য মহেন্দ্রের লুব্ধতার অবধি ছিল না। অন্যদিকে সাংসারিক বিশৃঙ্খলায় আশার সম্বন্ধে তার বিরক্তি। বিনোদিনীর অসন্তোষ ও রোগীর চিকিৎসায় বিহারীর প্রতি নির্ভরতায় অসন্তুষ্ট হয়ে সে কড়া নিয়মে কলেজে যেতে লাগল। পরে রোগীর সম্বন্ধে বিহারীকে লেখা বিনোদিনীর একটি চিঠি দেখে রাগ করে নাইট-ডিউটির অজুহাতে সে চলে গেল কলেজের বাসায়। যাবার আগে আশাকে বুকে টেনে বললে, 'চুনি, আমার রত্ন, তোমাকে আমার

হৃদয়ে সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ তোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।' দু-একদিনের মধ্যে মহেন্দ্রের মন থেকে দীর্ঘ-মিলনের অবসাদ দূর হয়ে সরলা বধূর নবপ্রেমে উদ্ভাসিত সুখস্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমন সময়ে আশার একখানি পত্র পেল সে। সারাদিন চিঠিখানি বুকের পকেটে রাখলে—যেন একটি ভালোবাসার পাখি বুকের কাছটিতে ঘুমিয়ে। কিন্তু অনতিপরেই এল বিপরীত ধাক্কা: সে-চিঠির ভাষা বিনোদিনীর। মহেন্দ্রের জীবনাকাশে যে-ধূমকেতুটা এতকাল ছায়ার মতো ছিল, এক-মুহূর্তে তার উদ্যত পুচ্ছ সহসা দীপ্যমান হয়ে উঠল। বিনোদিনীর উপরে রাগ করবার চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হল। সেই প্রচ্ছন্ন অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ-মধুর প্রেম অবিলম্বে তাকে মাতাল করে তুলল। অনতিপরে বিহারীর অনুরোধে যেন অনুগ্রহ করেই সে ফিরে এল বাড়িতে। ফিরে এসে আবার মনকে শক্ত করতে চাইলে—আশাকে বুকে টেনে চুম্বন করলে। কিন্তু বিনোদিনী বাড়ি যেতে চাইলে মার অনুরোধে তাকে বোঝাতে এসে সে ধরলে তার হাত চেপে। পরমুহূর্তে নিজের অপরাধী জিহ্বাকে সবলে দংশন করে বিহারীকে দেখে বলে উঠল, 'ভাই বিহারী, আমার মতো পাষণ্ড আর জগতে নাই।' পরদিন অনুতপ্তচিত্তে সে কাশীতে অন্নপূর্ণার কাছে চলে গেল। বিদায়ের পূর্বরাত্রে আশার ললাটে-মস্তকে করতল চালনা করে বললে, 'চুনি, তোমার উপর তোমার পুণ্যবতী মাসিমার আশীর্বাদ আছে···তোমার কখনো কোনো অকল্যাণ হইতে পারে না।'

কিছুকাল অন্নপূর্ণার স্নেহমুখচ্ছবির সম্মুখে থেকে মহেন্দ্রের নিজের সঙ্গে বিরোধ দূর হয়ে গেল। খুব জোরের সঙ্গেই সে মনে-মনে বললে, 'আশাকে আমার হৃদয় হইতে একচুল সরাইয়া বসাইতে পারে, এমন-তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।' অন্নপূর্ণার পায়ের ধুলো নিয়ে সে সহজ মনে বাড়ি ফিরল। আশাও তার জ্যাঠার সঙ্গে একবার মাসিকে দেখতে যেতে চাইলে। এ-বিষয়ে মার শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্র অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল—বিহারী আবার তাতে প্রশ্ন করায় গর্জন করে বললে, 'বিহারী···আমি জানি, তুমি মনে-মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না।···আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ।' অনতিপরেই তার হাতে পড়ল বিহারীকে লেখা বিনোদিনীর একটি চিঠি। চিঠিখানি পড়ে সেটি সে বিনোদিনীর হাতেই ফিরিয়ে দিলে। বিনোদিনী তার দিক থেকে অপমানিত হয়েই বিহারীর দিকে মন দেবার চেষ্টা করছে, মুহূর্তের মূঢ়তায় সে তার অধিকার-চ্যুত হয়ে যাবে—এই আশঙ্কায় ধৈর্য রক্ষা করা তার পক্ষে অসম্ভব হল। বিনোদিনীর সঙ্গে সন্ধির জন্য বাধাহীন অবসর-কামনায় সে আশাকে আরো কাশী যেতে প্ররোচিত করলে। আশার অবর্তমানে নানা-ছুতোয় সে মার ঘরে উপস্থিত হতে

লাগল। রাজলক্ষ্মী তার এই শূন্যভাব দেখে বিনোদিনীকে যত্ন করতে অনুরোধ করলেন। মহেন্দ্র অশনে-ভূষণে-আহারে-আচ্ছাদনে তার রমণীয় স্পর্শে আবিষ্ট হতে লাগল। মান-অভিমানে একসময়ে সে বিনোদিনীর হাত চেপে ধরল: 'বন্ধন যখন স্বীকার করিয়াছ তখন যাইবে কোথায়?' পরমুহূর্তেই অনুতপ্ত হয়ে সে দ্বার রুদ্ধ করলে। রাত্রে বারংবার আহারের অনুরোধে কিছুতেই দ্বার খুলল না: 'না না, আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।··· তুমি যাও।' তারপরে বাতি জ্বালিয়ে সে আশাকে লিখলে, 'আশা, আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি—তুমি না-থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁড়িয়া আমাকে কোন দিকে টানিয়া লইতে চায়··· ।' পরদিন সকালে সেই চিঠিখানি ছিঁড়ে সে সংযত ভাষায় তাকে আসতে লিখলে। মধ্যাহ্নে এক নিবিড় মুহূর্তেও নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল কলেজে। কলেজ থেকে ফিরে আবার সে বিনোদিনীকে বিহারীর সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বসল। বিনোদিনী অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠতে তার পা বেষ্টন করলে। সহসা বিহারীর আগমনে, তার অবজ্ঞায়, বিনোদিনীর প্রশ্রয়ে সে গদগদকণ্ঠে বললে, 'বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না?···তবে এসো আমার ঘরে।'—তখনই হাতে-হাতে সে ভালোবাসার নিদর্শন পেতে ব্যগ্র হল।

অতঃপর একটা মধুর আবেশে মহেন্দ্রের দিন কাটতে লাগল—কিন্তু বিনোদিনীর প্রশ্রয় পেল না। একদিন বিহারী বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে এলে সে ছল করে বাইরে যেতে উদ্যত হল—কিন্তু ঈর্ষাবশত পারল না। বিহারীর দিক থেকে সদ্ভাব-স্থাপনের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। আশা ফিরে এল—তখনও সে অন্যমনস্ক-উদ্‌ভ্রান্ত। একটা অস্বাভাবিক আভ্যন্তরিক ক্ষুধা প্রতিদিন তাকে লেহন করছিল। বিনোদিনী-আশা কাউকে ত্যাগ না করে তার দুই চন্দ্র-সেবিত গ্রহের মতো কাল কাটাবার সংকল্প। একদিন জ্যোৎস্না-বিহ্বল নির্জন রাত্রে মোহাবিষ্টের মতো বিনোদিনীর সন্ধানে এসে সে মার চোখে প ল। পরদিন খেমি দাসীর হাত দিয়ে বিনোদিনীকে একটি চিঠি পাঠালে। মা তাকে ডেকে পাঠাতে তাড়াতাড়ি চলে গেল কলেজে। কলেজ থেকে ফিরেই আবার সে বিনোদিনীর ঘরে উপস্থিত। বিনোদিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে তাকে বুকে চেপে বললে, 'তুমি আমাকে ঘৃণা কর, বিনোদ?···আমি যদি আর দ্বিধা না করি, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছ?' বিনোদিনী সেদিনই চলে গেল বারাসতে। মহেন্দ্র তাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে লিখেছিল। বাড়ি ফিরে তাকে না দেখে মাকে তিরস্কার করে সে এল বিহারীর কাছে। সেখানে সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড করে বিনোদিনীকে না পেয়ে সে নিজেরই একটা যুগলমূর্তির ফোটোগ্রাফ পা দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিহারীর গায়ে ছিটিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বারাসতে এসে সে বিনোদিনীর দীপশূন্য অন্ধকার দ্বারে আঘাত করলে। কিন্তু, বিনোদিনীর তিরস্কারে ফিরে এল স্টেশনে। পরদিন অনাহারে-অনিদ্রায় শুষ্কমুখ-রক্তনেত্রে আবার শেষ চেষ্টা করতে এল। গ্রামের কৌতূহলী লোকগুলির প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করে বললে, 'বিনোদ, লোকনিন্দার মুখে তোমাকে একলা ফেলিয়া যাইব, এমন কাপুরুষ আমি নহি।…তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজ শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যখন যেমন ইচ্ছা কর তাহাই হইবে—দয়া যদি কর তবে বাঁচিব; না যদি কর তবে তোমার পথ হইতে দূরে চলিয়া যাইব।' স্বগ্রামে কুৎসার আঘাতেই বিনোদিনী গাড়িতে উঠল—আর মহেন্দ্র নতশিরে মাঠের পথ দিয়ে স্টেশনে এল। বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় রেখে রাত্রে সে এল বাড়িতে। সেই রাত্রে হঠাৎ ছাদে এসে তার এতদিনের ঘরকন্না, শান্তি, সেই বাধাহীন দাম্পত্যমিলনের নিভৃত-রাত্রি মনে হল বড়ো আরামের। কিন্তু বিনোদিনীকে আর-কোথাও ফিরিয়ে-দেবার জায়গা নেই—এই কথাটি তাকে ভিতরে-ভিতরে পীড়া দিতে লাগল। আশাকে আর সে সহজভাবে কিছুই বলতে পারল না—শুধু জিনিসপত্রগুলো নিয়ে বেরিয়ে এল। পটলডাঙার বাসার কাছে এসে যেন সে ভাবীজীবনের ক্লান্তি অনুভব করলে। একটা অদ্ভুত সংকোচে-শ্রান্তিতে তার এতদিনের অনিদ্রায়-অনিয়মে উত্তেজিত অবস্থা যেন এক সার্থকতার উপকূলে এসে ভেঙে পড়ল। মাতার আদরের ধন মহেন্দ্র চিরদিন বিলাস-উপকরণের মধ্যে পালিত—কিন্তু এই শূন্য গৃহস্থালীর সমস্ত আয়োজনের ভার তারই। তবু বিনোদিনীর প্রতি নিজের প্রেম স্মরণ করে সে জিনিসপত্র ও ডাক্তারি বইগুলি এনে তার পায়ের কাছে রাখলে।

পরক্ষণে নিষেধের প্রতিরূপ সেই আত্মসমাহিত-মূর্তিটি আবার তাকে মোহাবিষ্ট করে তুলল। মুহূর্তে তার পা জড়িয়ে বারবার চুম্বন করে বললে, 'নিষ্ঠুর, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর। আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।' ইচ্ছা হল, সেই দীপালোকে কর্মরত অটল মূর্তিটিকে যেন সে বজ্রবলে পিষ্ট করে ফেলে—পরমুহূর্তে সেই দারুণ-ইচ্ছার হাত এড়াতেই যেন সে ছুটে বেরিয়ে গেল। এক গূঢ় সন্দেহে পীড়িত হয়ে সে বিহারীর বাড়িতে উপস্থিত। বিহারী তখন পশ্চিমে—তার টেবিলে বিনোদিনীর একটি পত্র দেখে কশাহত হল। যেন বিহারী সেটি ফেরত দিয়েছে এইভাবে চিঠিখানি পটলডাঙায় দিয়ে নিজের জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি এসে সে নিভৃত শান্তিতে মগ্ন হতে চাইলে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর অসুখে আশা বিহারীর খোঁজ করায় আবার তার হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়ল। পরদিন বিহারীর সন্ধানে এসে শুনলে: সে আছে বালিতে। বিনোদিনীর সঙ্গে হয়তো তার দেখা হয়েছে—এই ভেবে তখনি এল পটলডাঙায়। সেখানে হঠাৎ খবরের কাগজে চোখে পড়ল: বিহারী দরিদ্রসেবার ভার নিয়েছে। বিহারীকে 'হাম্বাগ' এবং তার কাজকে 'হুজুগ' বলে সে কাগজখানা গোপন করলে। বিনোদিনী বিহারীর খোঁজ করায় হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললে, 'গুরুদেবের

ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে-তো বলিয়া দাও, এ-বয়সে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আসি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।' তর্ক ক্রমেই উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল—পরমুহূর্তে কাতর হয়ে সে বিনোদিনীর সঙ্গে কোথাও বেরিয়ে পড়তে চাইলে। বিনোদিনীও বিহারীর সন্ধানের আশায় পশ্চিমে যেতে সম্মত।

বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র কোথাও বিশ্রাম পেল না—বিনোদিনীর উপগ্রহের মতো ঘুরতে-ঘুরতে নিজেকে তার বড়ো হতমান বোধ হল। শুধু টিকিট কিনে দেওয়া ছাড়া আর তার কোনো কাজ ছিল না। বাকি সময়টা তার প্রবৃত্তি তাকে এবং সে নিজের প্রবৃত্তিকে দংশন করতে থাকত। পৌরুষাভিমানে প্রতিদিন আহত হতে-হতে তার মন বিদ্রোহী—এমন সময়ে এলাহাবাদে এসে কিছুকাল স্থিতির সম্ভাবনায় কিছু স্বস্তি লাভ করলে। বিনোদিনীর ইচ্ছায় যমুনাতীরে এক নির্জন বাগানে আশ্রয় হল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যমুনাতীরে জ্যোৎস্নার মায়ামন্ত্রে তার শিরায়-শিরায় মোহরস সঞ্চারিত হল। বিনোদিনীর সন্ধানে শয়নগৃহে এসে দেখলে: সে ফুলে-ফুলে সজ্জিতা। মনে হল: সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা ও যৌবনভার নিয়ে সে যেন পদাবলীর বর্ষাভিসার। দ্বিগুণতর মোহে মাতাল হয়ে সে শয্যায় বসতে গেল। কিন্তু প্রত্যাখ্যানে স্তম্ভিত হল: 'তবে তুমি কাহার জন্য সাজিয়াছ।…সে কে। সে বিহারী?' সেই পুষ্পাভরণা বিরহবিধুর মূর্তিতে প্রবলবেগে আকৃষ্ট হয়ে সে মুষ্টি বন্ধ করে বললে, 'ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।…যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না…আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে…তুমি আমার এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোখের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।' অবশেষে সংসার-ত্যাগের গভীর পরিতাপে, ধর্মত্যাগের গ্লানিতে সেই ধিক্কৃত মোহচক্র থেকে নিজেকে ছিন্ন করে সে বাড়ি ফেরার জন্য ব্যগ্র হল।

পরদিন বিহারী উপস্থিত। রাজলক্ষ্মীর অসুখের সংবাদে তারা এল কলকাতায়। বহুদিন পরে মার পরিচর্যায় বিহারীর সহায়তায় আশার কর্ত্রীত্ব দেখে মহেন্দ্র আশ্চর্য হল—যে-জায়গাটি একদিন সে ছেড়ে গিয়েছিল সেটি তেমনটি আর নেই। মৃত্যুপথবর্তিনী মায়ের অনুমতিতে তাঁর পায়ের উপরে মাথা রেখে সে বললে, 'মা, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ করো।' রোগশয্যায় আশার সঙ্গে সে মার আশীর্বাদ গ্রহণ করলে—পরে সে আলিঙ্গন করলে বিহারীকে। পরদিন সে অন্নপূর্ণার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে।… আমার এ-ধুলা কিছুতেই মুছিবে না, কাকীমা।' বিহারীর সঙ্গে দেখা হতে বললে, 'বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয়।'

রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পরে আশার সঙ্গে সে বিহারীর জনসেবায় যোগ দিলে।

মহেশ ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শশাঙ্কের এক পুরনো ভৃত্য। 'শশাঙ্ক হয়তো বন্ধুমহলে গেছে। রাত…দুপুর হল, ব্রিজ খেলা চলছে। হঠাৎ বন্ধুরা হেসে উঠল, "ওহে, তোমার সমনজারির পেয়াদা। সময় তোমার আসন্ন।" সেই চিরপরিচিত মহেশ চাকর। পাকা গোঁফ, কাঁচা মাথার চুল, গায়ে মেরজাই পরা, কাঁধে রঙিন ঝাড়ন, বগলে বাঁশের লাঠি। মা ঠাকরুন খবর নিতে পাঠিয়েছেন, বাবু কি আছেন এখানে।…পাছে ফেরবার পথে অন্ধকার রাতে দুর্যোগ ঘটে।'

মাতঙ্গিনী ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহর-রাজবাড়ির এক দাসী। মঙ্গলা-নাম্নী এক তন্ত্রমন্ত্রাভিজ্ঞা রমণীর সঙ্গে মাতঙ্গিনীর আলাপ ছিল। রাজজামাতা রামচন্দ্র রায় এক রাত্রে স্বকৃত অপরাধের জন্য পলাতক। পরে একদা শাকসবজির চুপড়ি-হাতে মঙ্গলার কুটিরে মাতঙ্গিনীর আগমন: 'আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেকদিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসি গে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।'—বলে চুপড়ি রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। 'তা দিদি, তুমি-তো সব জানই…সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?'

রাজবাড়ির খবরের কথায় মাতঙ্গিনী হাত ওলটালে: 'সে-সব কথায় আমাদের কাজ কী ভাই?' মঙ্গলা বললে, 'ঠিক কথা।' সহসা এ-বিষয়ে তারও মতের ঐক্য হওয়াতে মাতঙ্গিনী ফাঁপরে পড়ল: 'তা, তোমাকে বলিতে দোষ নাই। তবে আজ আমার বড়ো সময় নাই…দেখো ভাই, সেদিন আমাদের ওখানে রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা তিনি যেদিন আসিয়াছিলেন সেই-রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।…আসল কথা কী জান? আমাদের যে বউ-ঠাকরুনটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষে কাহারো ভালো দেখিতে পারেন না। তিনি কী মন্তর জানেন, সোয়ামিকে একেবারে ভেড়ার মতো করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি—না ভাই, কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে…তিনি আমাদের দিদি-ঠাকরুনের নামে জামাইয়ের কাছে কী-সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদি-ঠাকরুনকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।'

মাধব কবিরাজ ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক কবিরাজ। মাধবের জ্বরাশনি-বটিকার বারো-আনা উপাদান কুইনীন।

মাধব চাটুজ্যে ॥ 'গোরা' উপন্যাস। চরঘোষপুর গ্রামের নীলকুঠির এক তহশিলদার। মাধব চাটুজ্যের স্বভাবটা যমদূতের মতো—যেমন কৌশলী তেমনই সে নির্দয়। নীলের জমি নিয়ে প্রজাদের উপরে তার উৎপীড়নের অন্ত ছিল না। দারোগা এবং দলবল ছিল ঘরে পোষা—খরচার দায় প্রজাদের, উপরন্তু তার মুনাফা ছিল।

গোরা দেশ-পর্যটনে এসে তাকে ভর্ৎসনা করায় দারোগা মারমুখী। মাধব তার হাত চেপে বললে, 'আরে কর কী, ভদ্রলোক, অপমান কোরো না।···যা বলেছেন, সে তো মিথ্যে বলেন নি, তা রাগ করলে চলবে কী করে? নীলকুঠির সাহেবের গোমস্তাগিরি করে খাই, তার চেয়ে আর তো কিছু বলবার দরকার করে না। রাগ কোরো না দাদা, তুমি যে পুলিসের দারোগা, তোমাকে যমের পেয়াদা বললে কি গাল হয়? বাঘ মানুষ মেরে খায়, সে বোষ্টম নয়, সে-তো জানা কথা। কী করবে, তাকে তো খেতে হবে।' বিনা প্রয়োজনে মাধব কোনোদিন রাগ করত না—কোন্ মানুষের দ্বারা কী অপকার হতে পারে তা বলা যায় কি? রাগ করে পরকে আঘাত করে সে ক্ষমতার বাজে খরচ করত না। গোরা গমনোদ্যত হলে সে তার পিছনে-পিছনে চলল: 'মশায়, যা বলেছেন সে কথাটা ঠিক—আমাদের এ কসাইয়ের কাজ—আর ওই-যে বেটা দারোগা দেখছেন ওর সঙ্গে এক-বিছানায় বসলে পাপ হয়—ওকে দিয়ে কত যে দুষ্কর্ম করিয়েছি তা মুখে উচ্চারণ করতেও পারি নে। আর বেশি দিন নয়—বছর দুতিন কাজ করলেই মেয়ে-কটার বিয়ে দেবার সম্বল করে নিয়ে তারপরে স্ত্রী-পুরুষে কাশীবাসী হব। আর ভালো লাগে না মশায়, এক-এক সময় ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরি! যা হোক, আজ রাত্রে যাবেন কোথায়? এখানেই আহারাদি করে শয়ন করবেন। ও দারোগা-বেটার ছায়া মাড়াতেও হবে না, আপনার জন্যে সমস্ত আলাদা বন্দোবস্ত করে দেব।'

গোরা রাগ করে চলে গেল। মাধব ঘরে গিয়ে দারোগাকে বললে, 'দাদা, ও-লোকটা সদরে গেল। এইবেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটা লোক পাঠাও।··· একবার কেবল জানিয়ে আসুক, একজন ভদ্রলোক কোথা থেকে এসে সাক্ষী ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে বেড়াচ্ছে।'

মাধবী ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলালতার কাকী। মাধবী যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে মেয়েদের পরিমিত পড়াশুনাই প্রচলিত। কর্মোপলক্ষে স্বামী দূরে-দূরে থাকতেন বলে বাইরের নানালোকের সঙ্গে তাঁকে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে নিমন্ত্রণে-আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা-পালনে অভ্যস্ত হয়েছিলেন; এমন-কি গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

পিতৃহীন এলা কাকার আশ্রয়ে এলে মাধবী মিথ্যা আরামের ভান করলেন: 'বাঁচা গেল—বিলিতি কায়দায় সামাজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু। আমার না-আছে বিদ্যে, না-আছে বুদ্ধি।' এলা তাঁর মেয়েকে পড়ানোর ভার নিলে স্বামীকে বললেন, 'এলার কাছে ফস করে মেয়েকে পড়তে দিলে। কেন, অধর মাস্টার কী দোষ করেছে?···দুটো নোটবই মুখস্থ করে পাস করলেই বিদ্যে হয় না।' একটা কথা বলতে পারলেন না: 'সুরমার

বয়স তেরো পেরোতে চলল, আজ-বাদে-কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোখে যে ফ্যাকাসে কটা-রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর?' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন: পুরুষেরা যে সংসারকানা। এলার বিবাহ দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্য তিনি উঠে-পড়ে লাগলেন। এলা দেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করায় কাকা মর্মাহত। স্বামীর অবিবেচনায় মাধবীর বিরক্তির সীমা রইল না: 'ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়…তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে। তুমি যা-ই মনে কর না কেন, আমি বলে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।'

মানিক ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের এক ভৃত্য।

মা (মহেন্দ্রের) ॥ 'করুণা' উপন্যাস। মহেন্দ্রের মা। মহেন্দ্র বিবাহের পরে ঘর ছেড়ে গেলে তিনি বধূকে বললেন, 'পোড়ামুখী, ভাল এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম।' ছেলেকে আশ্বস্ত করে তিনি লিখে পাঠালেন যে, একটি পরমাসুন্দরী কন্যার সন্ধানে তাঁরা চেষ্টিত।

কিন্তু পরে গৃহাগত মহেন্দ্রের সদয় ব্যবহারে বধূকে গৃহকাজে উৎসাহিত দেখে বললেন, 'হোয়েছে, হোয়েছে, ঢের হোয়েছে, আর গিন্নিপনা কোরে কাজ নেই, দু-দিন উপোস করে আছেন…ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচি নে।'

মায়াময়ী ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলালতার মা। 'মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংযত ঝাপটায় সংসারকে…যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ স্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস।' পরিবারের আশ্রিত অন্নজীবীদের আনুকূল্যেই তাঁর অন্ধ প্রভুত্বচর্চা অপ্রতিহত ছিল—মন যুগিয়ে যারা চলত তাদের প্রতিই ছিল পক্ষপাত। স্বামীর উদারতা ও বিষয়-বুদ্ধির ত্রুটিকেও তিনি ক্ষমা করতেন না—নালিশের কারণ অতীত-কালবর্তী হলেও দাহকে দিতেন উসকিয়ে। ভাষায় ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধি-বিবেচনায় তিনি স্বামীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাঁর আর-একটি উপসর্গ ছিল, শুচিবায়ু।

মিরজান ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। শুকসায়রের হাটের জনৈক ব্যাপারী। নৌকো করে যারা মাল আনত মিরজান তাদের সেরা। সে-হাটে বিলেতি পণ্য নিষিদ্ধ হলে কিছুতেই সে বশ মানল না। শেষে তার নৌকো কৌশলে ডুবিয়ে দেওয়া হলে সে পা-জড়িয়ে 'গোস্তাকি' স্বীকার করে।

মীরজুমলা ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক সম্রাট ঔরংজীবের এক সেনাপতি। শাজাহানের শেষবয়সে সুজার বিরুদ্ধে ঔরংজীব জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদকে প্রেরণ করেন। মীরজুমলা বসন্তপুরে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। পিতার অন্যায়ের প্রতিবাদে মহম্মদ পিতৃব্যের সঙ্গে যোগ দিতে চাইলে দীর্ঘ সেলাম করে তিনি বললেন, 'শাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহা অতি যথার্থ, কালই দেখিবেন অর্ধেক সৈন্য···শাহজাদার সহিত মিলিত হইবে।' মীরজুমলা জানতেন, মহম্মদ ইচ্ছাপূর্বক বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন—তাঁর দলভুক্ত হতে যাওয়া বাতুলতা। অনতিপরেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি সসৈন্যে সুজা ও মহম্মদকে আক্রমণ করলেন।

মুকুন্দলাল ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর বাবা মুকুন্দলাল। 'দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি-কাটা চুল, বড়ো-বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ভারি গলায় যখন হাঁক পাড়েন, অনুচর-পরিচরদের বুক থরথর করে কেঁপে ওঠে।···পালোয়ান রেখে নিয়মিত কুস্তি করা তাঁর অভ্যাস, গায়ে শক্তিও কম নেই, তবু সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই। পরনে চুনট-করা ফুরফুরে মসলিনের জামা, ফরাসডাঙ্গা বা ঢাকাই ধুতির বহুযত্নবিন্যস্ত কোঁচা ভূলুণ্ঠিত, কর্তার আসন্ন আগমনের বাতাস ইস্তাম্বুল আতরের সুগন্ধবার্তা বহন করে। পানের সোনার-বাটা হাতে খানসামা পশ্চাদ্‌বর্তী, দ্বারের কাছে সর্বদা হাজির তকমাপরা আরদালি।···দেউড়ির দেওয়ালে···ঢাল-তলোয়ার, বহুকালের পুরানো বন্দুক-বল্লম-বর্শা।'

পুরনো ধনীঘরের পাকা দুর্গে পুরাতন কালের বাস। মুকুন্দলালও নূতন যুগকে ধরতে পারেন নি। শরিকানি বিবাদে তখন ঐশ্বর্যের অবশেষ—তবু শৌখিনতাই সেকালের আদবকায়দার অঙ্গ। এই 'শৌখিনতার আমদরবারে দানদাক্ষিণ্য, খাসদরবারে ভোগবিলাস···একদিকে আশ্রিত-বাৎসল্যে যেমন অকৃপণতা আর-একদিকে ঔদ্ধত্য-দমনে তেমনি অবাধ অধৈর্য।' 'বৈঠকখানায় মুকুন্দলাল বসেন গদির উপর, পিঠের কাছে তাকিয়া। পারিষদেরা বসে নিচে, সামনে-বাঁয়ে দুই-ভাগে। হুঁকাবরদারের জানা আছে···কার সম্মান কোন-রকম হুঁকোয় রক্ষা হয়···কর্তা-মহারাজের জন্যে বৃহৎ আলবোলা, গোলাপ-জলের গন্ধে সুগন্ধি।···বাড়ির আর-এক মহলে বিলিতি বৈঠকখানা, সেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলিতি আসবাব।···দেওয়ালে পূর্বপুরুষের অয়েলপেন্টিং আর তার সঙ্গে বংশের মুরুব্বি দু-একজন রাজপুরুষের ছবি।···বিশেষ ক্রিয়াকর্মে জিলার সাহেবসুবাদের নিমন্ত্রণোপলক্ষ্যে এই ঘরের অবগুণ্ঠন মোচন হয়। বাড়িতে এই একটা-মাত্র আধুনিক ঘর, কিন্তু মনে হয় এইটেই সবচেয়ে প্রাচীন, ভূতে-পাওয়া, অব্যবহারের রুদ্ধ ঘনগন্ধে দম-আটকানো'।

'পুরাতন কালের ধনবানদের প্রথামতো মুকুন্দলালের জীবন দুই-মহলা।

এক-মহলে গার্হস্থ্য, আর-এক মহলে ইয়ারকি। অর্থাৎ এক-মহলে দশকর্ম, আর-এক মহলে একাদশ অকর্ম। ঘরে আছেন ইষ্টদেবতা আর ঘরের গৃহিণী।... ইয়ারমহল গৃহসীমার বাইরেই, সেখানে নবাবী আমল...এইখানে আনাগোনা চলত গৃহের প্রত্যন্তপুরবাসিনীদের।' অন্যবার রাসের সময় তামসিক আয়োজনটা হত বৈঠকখানায়; সেবার বাইনাচের ব্যবস্থা হল বজরায় নদীতে। উৎসব-শেষেও মুকুন্দলাল ঘরে ফিরলেন না; অভিমানিনী স্ত্রী গেলেন পিত্রালয়ে। মুকুন্দলাল ঘরে ফিরলেন যেন মাস্তুল-ভাঙা, পালছেঁড়া, আছাড়-লাগা জাহাজ। 'বড়োবউ, মাপ করো অপরাধ করেছি, আর কখনও এমন হবে না'—মনে-মনে বলতে-বলতে অন্তঃপুরে এলেন। শয়নকক্ষে স্ত্রীকে না দেখে বুঝলেন, প্রায়শ্চিত্তটা হবে অন্যবারের চেয়ে দীর্ঘ এবং কঠিন। পরে সমস্ত শুনে খানসামাকে বললেন, 'ব্রাণ্ডি লে আও।'

নির্জলা ব্রাণ্ডি আর প্রচণ্ড অনিয়মে বিকারের সঙ্গে রক্তবমন শুরু হল। যাকে দেখেন ক্ষেপে ওঠেন; শুধু শিশু কুমুদিনী এলে নির্নিমেষে তার মুখের দিকে চান—নন্দরানীর সঙ্গে যেন কোথায় তার একটা মিল দেখতে পান। কখনো বুকের উপরে তার মুখ টেনে চোখ বুজে থাকেন, চোখের কোণ দিয়ে জল পড়ে। যেদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝড় উঠল, মুকুন্দলাল প্রলাপের ঘোরে বলতে লাগলেন, 'মা কুমু, ভয় নেই, তুই তো কোনো দোষ করিস নি। ওই শোন দাঁতকড়মড়ানি, ওরা আমাকে মারতে আসছে।... এতই-কী দোষ করেছি, তুই বল মা।...কার বাঁশী ঐ বাজে বৃন্দাবনে, সই লো সই ঘরে আমি রইব কেমনে।...রাধু, ব্রাণ্ডি লে আও।' হঠাৎ কুমুদিনীকে দেখে চুপ করলেন। রাত তিনটেয় আবার রক্ত উঠল। মুকুন্দলাল বিছানার চারদিকে হাত বুলিয়ে জড়িতস্বরে বললেন, 'বড়োবউ, ঘর যে অন্ধকার। এখনও আলো জ্বালবে না?' বজরা থেকে ফেরার পরে এই প্রথম স্ত্রীকে সম্ভাষণ—আর এই শেষ।

মুকুন্দলাল দত্ত ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নবীনকালীর স্বামী। গাজিপুরের সিদ্ধেশ্বরবাবুদের এক আত্মীয়।

•

মুক্তিয়ার খাঁ ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। ঐতিহাসিক যশোহরপতি প্রতাপাদিত্যের এক পাঠান সেনাপতি। প্রতাপাদিত্যের আদেশে মুক্তিয়ার খাঁ তাঁর পিতৃব্য বসন্ত রায়কে হত্যা এবং পুত্র উদয়াদিত্যকে বন্দী করতে গিয়েছিল। রায়গড়ে এসে সে বিনীতভাবে উদয়াদিত্যকে সেই আদেশপত্র দেখালে। উদয়াদিত্যের প্রলোভনে তার সংকল্প টলল না—তাঁকে বন্দী করে ছদ্মবেশে এল গড়ের মধ্যে। বসন্ত রায়কে তখন আহ্নিক করতে দেখে সে অপেক্ষা করে রইল। পরে সমস্ত শুনে বসন্ত রায় বিচলিত। মুক্তিয়ার মাটি ছুঁয়ে সেলাম করে

বললে, 'মহারাজ, আমাকে মার্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোনো দোষ নাই।'

মনু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের এক পিসতুত বোন। মনু মাতাল স্বামীর কাছে মার খেত—তবু তার গরিবের ঘরটিকে হৃদয়ের অমৃতে স্বর্গ করে রেখেছিল।

মুরলী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক বেহারা। একদিন মুরলী এল বিছানা করতে। শীতে তার হাত কাঁপছিল—গায়ে একখানি জীর্ণ মলিন র‍্যাপার। 'মাথায় টাক, রগ টেপা, গলা বসা, কিছুকালের না-কামানো কাঁচা-পাকা দাড়ি।' ম্যালেরিয়ায় ভুগে তার শরীরে রক্ত ছিল না, গায়ে ছিল না গরম কাপড়। পরিবারের নিয়ম উপেক্ষা করে কুমু একটি পুরনো আলোয়ান দিতে চাইলে। সে গড় হয়ে বললে, 'মাপ করো মা, মহারাজা রাগ করবেন।' কুমুর রাগ দেখে হাতজোড় করে বললে, 'রানীমা, তুমি মা লক্ষ্মী, রাগ কোরো না। গরম কাপড়ে আমার দরকার হয় না। আমি থাকি হুঁকাবরদারের ঘরে, সেখানে গামলায় গুলের আগুন, আমি বেশ গরম থাকি।'

পরে কুমুর প্রার্থনায় মনিবের হাত থেকে বড়ো-অঙ্কের বকশিস পেয়ে তার ভয়ের সীমা রইল না।

মুরাদ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক সম্রাট শাজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র। মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। নৃপবালা-নীরবালাদের জনৈক পাণিপ্রার্থী। মৃত্যুঞ্জয় বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতো-পরা ; ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি—চোখের নিচে কালি, ম্যালেরিয়া রোগীর মতো চেহারা। বয়স বাইশ থেকে বত্রিশ হওয়া সম্ভব।

মধুমিস্ত্রির গলিতে পাত্রী দেখতে এসে ভাবী শ্যালীপতি অক্ষয়ের করমর্দনে মৃত্যুঞ্জয়ের প্রায় প্রাণান্ত। যদিচ তার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সদ্যস্থাপিত ইয়ারকির খাতিরে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কোনোগতিকে কাসি চেপে টান দিলে। পরে বিলেতিখানার প্রসঙ্গে ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হয়ে ভাবতে লাগল। শেষে সাহস সঞ্চয় করে বললে, 'মটনচাই-বা মন্দ কী ভাই! চপ!' ইতিমধ্যে অন্য পাত্র দারুকেশ্বরের সঙ্গে অক্ষয়ের পরিহাস জমে উঠতে তাকেও প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য তামাশায় যোগ দিতে হল। কিন্তু, খ্রিশ্চানমতে বিবাহের কথায় শেষে ত্রস্ত হয়ে বললে, 'মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না।' *

মেসোমশায় (আদিত্যের) ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। আদিত্যের এক মেসোমশায়। ফুলের ব্যবসায়ে তাঁর নামডাক, ফুলের চাষে ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর প্রধান শখ ছিল অর্কিডে—নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি চীন থেকেও অর্কিড আনাতেন। নিজের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করত। তাই নিজের হাতে বাগানের কাজ শেখালেন তাঁর অনাথা ভাইঝি সরলাকে। বলতেন, 'ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গরু দোওয়ানো।' কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না—যে-বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন, সন্দেহ ছিল না, তারাই টাকা শোধ দিয়ে তাঁর বাগানটিকে দায়মুক্ত করবে। আদিত্যকেও বাগানের কাজ শিখিয়ে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন, তখন তাঁর ব্যবসায়ের অবস্থা সংকটাপন্ন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে বাগানটি গেল বিকিয়ে।

মোধো ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার এক প্রজা।

মোহিনী ॥ 'করুণা' উপন্যাস। জনৈকা বালবিধবা। উজ্জ্বল চোখ, প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, মিষ্ট মুখশ্রী। রজনীর সঙ্গে বিবাহের পরে মহেন্দ্র তার দিকে আকৃষ্ট হলে মোহিনী লজ্জিত হয়ে মুখ লুকোত। কিন্তু তার মনের কথা এই : 'আজকাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে···আচ্ছা, না-হয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন? লোকে কী বলিবে?···মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু কেনই-বা না যাইব?···বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কী?···আমি-তো না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে তাহাকে ভালোবাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুশি তাহাই করিবে।'

একদিন অর্ধরাত্রে দরজায় শব্দ শুনে মোহিনী প্রদীপ-হাতে বাইরে এল। সহসা মহেন্দ্রকে দেখে আলো নিভিয়ে তাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বললে। কথাটা দিদিমার কানে যেতে নিগৃহীত হতে হল তাকেই—তবু কারও নাম করলে না। মহেন্দ্র অনুতাপে গৃহত্যাগ করলে মোহিনী রজনীকে বুকে টেনে সান্ত্বনা দিলে। মহেন্দ্রকে একটি চিঠিও দিলে ফিরে আসতে। মহেন্দ্র ফিরে এলে সে বললে মনে-মনে, 'সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।' অতঃপর সে চলে গেল কাশীতে।

যতিশংকর ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যর ছাত্রী সুরমার ভাই। যতিশংকর কলেজের ছাত্র। শিলঙে অবস্থানকালে লাবণ্যের যোগে অমিতের সঙ্গে তার আলাপ। যতি তার কাছে ইংরেজি পড়ার ব্যবস্থা করে।

যতির বয়স বিশের কোঠায়। সাহিত্যানুরাগের চেয়ে লাবণ্যর প্রতি অমিতের অনুরাগ গাঢ়তর হওয়াতে তার মনের চাঞ্চল্য যতির মনকেও স্পর্শ

করত। লাবণ্যকে এতদিন সে শিক্ষকজাতীয় বলে মনে করত—অমিতের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলে, সে নারীজাতীয়। একদিন অমিতের কাছে তার অ্যান্টনি ও ক্লিয়োপ্যাট্রা পড়বার কথা ছিল। কিন্তু অমিতের মুখের ভাব দেখে বুঝলে, জীবের প্রতি কৃপাবশত সেদিন তার ছুটি নেওয়া কর্তব্য। বললে, 'অমিতদা, কিছু যদি মনে না-করো, আজ আমি ছুটি চাই, আপার-শিলঙে বেড়াতে যাব।' তখন হঠাৎ অমিতকুমার ছুটিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় মেতে উঠতে তার খুব মজা লাগল।

যতিশংকর থাকত কলকাতায়—কলুটোলায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। শিলঙ থেকে কলকাতায় ফিরে অমিত তাকে বাড়ি আনত, চা খাওয়াত—একসঙ্গে বই পড়ত, মোটরে করে নিয়ে বেড়াত। তারপর কিছুকাল তারা অমিতের খোঁজ পেল না। শুনলে, অমিত নৈনিতালের সরোবরে কেতকীকে নিয়ে নৌকো ভাসিয়েছে। যতি বুঝলে, অমিতের মন পাল-তুলে ভেসেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়। অমিত কলকাতায় ফিরলেও মোটরে বেড়াবার জন্য তাকে ডাক পড়ল না। যতির পক্ষে বোঝা কঠিন ছিল না যে, অমিতের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পার্টিতে আর তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব। সে তখন অমিতের ছোটো-বোন লিসির স্বহস্তে-ঢালা চা মধ্যে-মধ্যে পান করে আসছিল। তাই অপরাহ্নে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে বেড়ানো বন্ধ হলেও অমিতকে সে ক্ষমা করলে।

যাদব ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। দক্ষিণ-চট্টগ্রামের আলমখালের এক দরিদ্র যুবক। একে-একে সব-কটি সন্তানকে হারিয়ে সে একটিমাত্র রুগ্ন ছেলেকে নিয়ে গ্রামোপান্তের কুটিরে বাস করত। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য সেখানে এলে সে সন্ন্যাসীজ্ঞানে তাঁর পদধূলি নিয়ে ছেলেটির গায়ে মাখিয়ে দিলে। রাত্রে রুগ্ন ছেলেটি একটি শাল চাইলে তার দীর্ঘশ্বাস পড়ল: 'আমার যে কিছু নেই, মানিক আমার…কেবল তুমি আছ।' পরদিন রাজা একটি শাল এনে দিতে তাঁর পা জড়িয়ে কেঁদে উঠে বললে, 'প্রভু, তুমি আনিয়াছ, তুমিই দাও।'

যোগমায়া ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যলতার ছাত্রী সুরমার মা। যোগমায়ার পিত্রালয়ে মেয়েরা লেখাপড়া করতেন, বাইরে যেতেন—মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখতেন। পিতৃবন্ধুর ছেলে বরদাশংকরের সঙ্গে যখন তাঁর বিবাহ হয়, তখন পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। পিতার মৃত্যুর পরে যখন তাঁর স্বামী আচার-অনুষ্ঠানে প্রাচীনত্ব গ্রহণ করলেন তখন তাঁর চোখের উপরে ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ-ডিপোজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। তাঁর একমাত্র

আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন—স্বামিগৃহের সভাপণ্ডিত। নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলে-বাঁধা দিনগুলির অনুবর্তনেও নিতান্ত অল্প বয়সেই তিনি বিধবা হলেন।

ছেলে যতিশংকর কলকাতায় কলেজে পড়ত। মেয়ে সুরমার জন্য কোনো মেয়ে-স্কুল পছন্দ হয় নি—বহু সন্ধানে লাবণ্যকে পেলেন গৃহশিক্ষয়িত্রী। শীতের সময় তাঁরা কলকাতায়, আর গরমের সময় কোনো পাহাড়ে কাটাতেন। সেবার শিলঙে লাবণ্যের সঙ্গে এক মোটর-সংঘর্ষের পরে অমিত এল দেখা করতে। যোগমায়া তখন 'চল্লিশের কাছাকাছি···কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি···গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস-টস করছে। বৈধব্য-রীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ, হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান-চাদরে মাথা বেষ্টন করে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতো নেই; দুটি-পা নির্মল সুন্দর।' পরিচয়ের পর যোগমায়ার স্মরণ হল, অমিতের কাকা অমরেশ ছিলেন তাঁদের উকিল—যোগমায়াকে তিনি বউদিদি বলতেন। তখনি স্থির করলেন, লাবণ্যের সঙ্গে অমিতের বিবাহ হওয়া চাই। প্রথম-প্রথম যোগমায়া অমিতের সাহিত্য-আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করতেন—কিন্তু শীঘ্রই তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, অন্যপক্ষের উৎসাহ তাতে কুণ্ঠিত হয়। লাবণ্য-অমিতের আলোচনার আসরে এর পরে তাঁর অনুপস্থিতির উপলক্ষ দেখা দিতে লাগল।

অমিতের ছেলেমানুষি যোগমায়ার ভারি ভালো লাগত—লাবণ্যকে ভালোবেসে তার দুরন্ত প্রকৃতির পরিবর্তনে তাঁর এই-স্নেহ আরও বেড়ে উঠল। লাবণ্য যখন তর্ক করত, বুঝতেন সে অনেক-বই-পড়া মেয়ে। তবু একদিন রাত্রে তাকে টেবিলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে দেখে বুঝলেন, মন-প্রাণ দিয়ে সেবা করতে না-পারলে সে বাঁচবে না। কিন্তু লাবণ্য অমিতকে বিবাহ করতে অনিচ্ছুক। তার মতে: অমিতের মন অসহিষ্ণু, অন্যের মনের মতো নিজেকে সে গড়ে নিতে পারে না। যোগমায়া বললেন, 'ও তোমাকে ভালোবাসে।···তবে আর ভাবনা কিসের।···দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না।···আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা-মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখ-দুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।'

অমিত তাঁদের বাসার কাছে এক জরাজীর্ণ অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নিলে। সেদিন যোগমায়া দেখে চমকে উঠে বললেন, 'বাবা, নিজেকে নিয়ে এ-কী পরীক্ষা চলেছে।' প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, 'আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো'—কিন্তু থেমে গেলেন। বিধাতা যে কাণ্ড ঘটিয়ে তুলেছেন, তাতে মানুষের হাত পড়লে

অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠবে। অমিতের জন্য তিনি বাসা থেকে কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন। লাবণ্যকে বারবার বললেন, 'মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।' একদিন বর্ষণের অন্তে তিনি অমিতের খোঁজ করতে গেলেন। অমিতের দুর্দশা দেখে লাবণ্যের উপর রাগ হল : 'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন।...যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্-গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে।' তখনি লাবণ্যকে নিয়ে গেলেন অমিতের বাসায়। অমিতের পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে লাবণ্যের সোনার হারগাছি বেঁধে দিলেন দুজনের হাতে : 'তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।' পরে কিছু সূর্যমুখী ফুল এনে বললেন, 'মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।'

স্থির হল, অগ্রহায়ণে বিবাহ—যোগমায়া কলকাতায় ফিরে সমস্ত আয়োজন করবেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্যরূপ।

যোগেন্দ্র ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের এক সহাধ্যায়ী। যোগেনের মধ্যস্থতায় তার বোন হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের পরিচয়। তাদের বিবাহ স্থির হবার পরে কোনো-কারণে বিবাহ গেল পিছিয়ে। যোগেন অধীর-প্রকৃতির লোক। আইন-পরীক্ষায় ফেল করে সে পশ্চিমে হাওয়া খেতে গিয়েছিল—বাড়ি ফিরেই তার অক্ষম বাপের উপরে বিরক্ত হয়ে উঠল। এক-পেয়ালা চা তাড়াতাড়ি শেষ করেই দ্রুতপদে গেল রমেশের বাসায়—রমেশকে না-দেখে হেমনলিনীকে দিন-পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে। সদুত্তর না-পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে কারণ বার করতে উদ্যত হল। হেমনলিনী নিষেধ করায় তার সংকল্প আরও দৃঢ় হল। যোগেনের আর-এক বন্ধু অক্ষয় রমেশের আশ্রিতা কমলার সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ। অক্ষয়ের প্ররোচনায় রমেশের বাসায় এসে যোগেন কমলার পরিচয় জানতে চাইলে। কমলার সামনে তার আলোচনায় রমেশ কুণ্ঠিত। ক্ষিপ্ত হয়ে যোগেন বললে, 'ইহার পরে আমাদের বাড়িতে যদি প্রবেশের চেষ্টা কর, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।' বাড়ি এসে পিতা অন্নদাবাবুকে আর-একদফা ভর্ৎসনা করে সে নির্ধারিত দিনে হেমনলিনীর অন্য-কোথাও বিবাহ দেবার জিদ করলে। অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করায় অধৈর্য হয়ে বললে, 'বাবা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ো না। এখনকার মতো কষ্ট বাঁচাইতে গিয়া উহাকে দ্বিগুণ কষ্টে ফেলা হইবে।' মেয়েদের বুদ্ধির প্রতি যোগেনের যথেষ্টই অবজ্ঞা। তবু রমেশের উপরে হেমনলিনীর বিশ্বাস দেখে সে অক্ষয়কে রমেশের স্বীকারোক্তি আদায়ে পাঠালে।

ঘরের মধ্যে দিনরাত্রি শোকের ছায়া যোগেনকে বাড়ি-ছাড়া করে তুলল। বাইরে বন্ধুবান্ধবের কাছে জবাবদিহি করতে গিয়ে দু-একজনের সঙ্গে হাতাহাতি

করে সে মনে-মনে নভেল-পড়া মেয়েদের সম্বন্ধে হাড়ে-হাড়ে জ্বলতে লাগল। একদিন সে অন্নদাবাবুকে বললে, 'বাবা, তুমি-সুদ্ধ হেমকে খেপাইবার চেষ্টায় আছ।···সমাজে অত্যন্ত কানাকানি চলিতেছে, ইহা লইয়া কাঁহাতক সকল লোকের সঙ্গে আমি একলা ঝগড়া করিয়া বেড়াইব।···সেদিন অখিলকে চাবকাইয়া আসিতে হইয়াছিল।···শীঘ্র যদি হেমের বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত চুকিয়া যায়'। অন্নদাবাবু পাত্রের সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বললে, 'যে-কাণ্ড হইয়া গেল···কেবল বেচারা অক্ষয় রহিয়াছে···তাহাকে পিল খাইতে বল পিল খাইবে, বিবাহ করিতে বল বিবাহ করিবে।' অন্নদা হেমনলিনীর অমতের উল্লেখ করায় বললে, 'তুমি যদি গোল না-কর তো আমি তাহাকে রাজি করিতে পারি।'

সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় সে হেমনলিনীকে ডেকে বললে, 'ঘরের মধ্যে কথায়-কথায় নভেল তৈরী হইতে থাকিলে তো লোকের প্রাণ বাঁচে না।···অবশ্য, তুমি যদি বল স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রদেবকে না হইলে তোমার পছন্দ হইবে না, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসিনী-ব্রতই গ্রহণ করিতে হয়। পৃথিবীতে মনের মতো ক'টা জিনিসই বা মেলে···জীবনে যত লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একজন···সুখে-দুঃখে মানে-অপমানে তোমার প্রতি হৃদয় স্থির রাখিয়াছে।' হেমনলিনী ত্যক্ত হয়ে বললে : বাবা যেমন আদেশ করবেন তাই হবে। যোগেন তখনই পিতার কাছে গিয়ে জানালে : হেমনলিনী রাজি—শুধু তাঁর অনুমতির অপেক্ষা। তৎপরে অক্ষয়ের কাছে এসে বললে বিবাহের দিন স্থির করতে। পরদিন চায়ের টেবিলে অক্ষয়কে দেখে হেমনলিনীর ভাবান্তরে আবার সে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। অক্ষয় নিজের সম্বন্ধে আশা ছেড়ে নলিনাক্ষের সঙ্গে তার আলাপ করাবার পরামর্শ দিলে। কাজেই নলিনাক্ষের ভূয়সী প্রশংসা করে যোগেন হেমনলিনীকে তার বক্তৃতা শুনতে নিয়ে গেল। রমেশের পরিত্যক্ত বাসায় সে নলিনাক্ষের থাকার ব্যবস্থাও করলে। হেমনলিনী ক্রমে নলিনাক্ষের অনুকরণে বিবিধ নিয়ম-পালনে প্রবৃত্ত হল। যোগেন বললে, 'এ-সমস্ত কী হইতেছে? তোমরা যে সকলে মিলিয়া বাড়িটাকে ভয়ংকর পবিত্র করিয়া তুলিলে—আমার মতো লোকের এখানে পা-ফেলিবার জায়গা নাই।'

অবিলম্বে ময়মনসিঙের জমিদার-স্থাপিত হাই-স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে যোগেন চলে গেল বিশাইপুরে। সেখানেও কয়েকদিনে তার প্রাণ কণ্ঠাগত হল। জমিদারবাবু তাকে দিয়ে ইংরেজি খবরের কাগজে নকিবি করিয়ে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন। যোগেন এমনই মেজাজের পরিচয় দিলে যে, তিনি আর হস্তক্ষেপ করতে ভরসা পেলেন না। সেক্রেটারির সঙ্গেও হাতাহাতির উপক্রম। শুধু জয়েণ্ট-সাহেবের আনুকূল্যে তার হেডমাস্টারি-সূর্য বিশাইপুরের আকাশে কোনোমতে টিকে রইল। রমেশ একদা সেখানে এলে যোগেন লাফিয়ে উঠে তাকে পাকড়া করে নিয়ে গেল—সারাদিন তিলমাত্র আর তার কথা উত্থাপন করতে দিলে না। সন্ধ্যার পর আহারান্তে দু-জনে কেদারা টেনে বসল।

রমেশের আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনে যোগেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এই-সকল কথা যদি সেদিন বলিতে আমি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।' পরে বললে, 'আমি কোনোখানে এক-পা নড়িব না, আমি এই কেদারাটার উপরে অটল হইয়া বসিয়া তোমার কথার প্রত্যেক-অক্ষর বিশ্বাস করিব। তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করা আমার চিরকালের অভ্যাস; জীবনে একবার-মাত্র তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে।...প্রস্তুত হও, দুই বন্ধু মিলিয়া সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।...রোসো আমার ক্রিস্টমাসের ছুটিটা আসুক।...এখানে ঝগড়া করিবার যতগুলা লোক ছিল সব আমি একটি-একটি করিয়া শেষ করিয়াছি। এখন মুখের তার বদলাইবার জন্য একজন বন্ধুর প্রয়োজন হইয়াছে, এ-অবস্থায় তোমাকে ছাড়িবার জো নাই।'

ক্রিস্টমাসের ছুটিতে যখন তারা কাশীতে এল, নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহ স্থির। যোগেন বললে, 'বল-কী বাবা, বিবাহ একেবারে পাকাপাকি স্থির হইয়া গেছে? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতেও নাই।' অবশেষে রমেশের একটি চিঠি পেয়ে অন্নদা তার খোঁজ করলেন। সে বললে, 'তাহার প্রথম দিনের অভ্যর্থনাটাই কি ভদ্রলোকের পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই।... এ-সব কবিত্ব আমার কোনকালে অভ্যাস নাই। সুতরাং আমাকেও এখান হইতে পালাইতে হইল, আমার হেডমাস্টারিই ভালো, তাহাতে সমস্তই খুব স্পষ্ট—ঝাপসা কিছুই নাই।' অন্নদাবাবু কিছু একটা স্থির করতে চাইলেন। সে বললে, 'আর কেন? আমিই কেবল স্থির করিব, আর তোমরা অস্থির করিতে থাকিবে, এ-খেলা বেশি দিন ভালো লাগে না।...আমি যাহা ভালো বুঝিতে পারি না, সেটা আমার ধাতে সয় না।'

রঘুনাথ সার্বভৌম ॥ 'করুণা' উপন্যাস। নরেন্দ্রের পণ্ডিতমশায়। রঘুনাথের নিজের টোলটি উঠে গেলে জমিদার অনুপের পাঠশালায় নিযুক্ত হন। অনুপের পালিত নরেন্দ্রকে তিনি অপরিমিত স্নেহ করতেন—অনুপের মৃত্যুর পরে তাঁর কন্যা করুণার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। রঘুনাথ নিজের বয়স বলতেন, চল্লিশ—কিন্তু আটচল্লিশের কম ছিলেন না। উদরের পরিধিতে, নস্যের ডিবে এবং টিকিতে অন্যান্য পণ্ডিতেরই তুল্য। সন্দেশের লোভে পাঠশালার ছেলেরা তাঁর সঙ্গ ছাড়ত না—তবু খোয়া যেত তাঁর নস্যের ডিবে, চটিজুতো—ইত্যাদি। তাঁর গৃহের অবস্থাও তথৈবচ।

পণ্ডিতমশায় বিপত্নীক। পূর্বকালে উগ্রচণ্ডা প্রথমা স্ত্রীকে অত্যধিক মান্য করতেন। স্ত্রী-বিয়োগের পরে প্রাত্যহিক ভর্ৎসনার অভাবে অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগল, তখন তাঁকে মন দিতে হল দ্বিতীয়পক্ষে। সংগ্রহ হল ফুলমোজা, জরির পোশাক, পাগড়ি—কিন্তু পাড়ার লোকে গতিক দেখে বেশ-পরিবর্তন করালে। বিবাহের আগের রাত্রে সাবেককালের ঝাঁটাগাছটি স্বপ্নে দেখে

শুভলক্ষণ বুঝে তিনি নদীপথে রওনা হলেন। নৌকায় উঠতে পণ্ডিতের বড়ো ভয়—তাই অনেক চিন্তা করে প্রতিবেশী নিধিকে সঙ্গে নিলেন। বিবাহ-বাসরে তাঁকে শ্যালীদের কর্ণপীড়নে গাইতে হল: 'কোথায় তারিণী মাগো বিপদে তারহ সুতে।'

বিবাহান্তে পণ্ডিতের বেশভূষায় উন্নতি এবং পত্নী কাত্যায়নীর সঙ্গে রসিকতায় প্রকৃতি-পুরুষ প্রমা-অহংকার অবিদ্যা-প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণা হতে লাগল। ফল হল বিপরীত—কাত্যায়নী দেবী একরাত্রে নিরুদ্দেশ। পণ্ডিতমশাই অশ্রুচোখে নিধির সঙ্গে কলকাতায় এসে তাঁর দেখা পেয়েও নিষ্ফল হলেন।

ঋণগ্রস্ত নরেন্দ্রকে রঘুনাথ অনেক কষ্টে রক্ষা করেন। কাত্যায়নীর ভর্ৎসনা সত্ত্বেও তিনি অর্থসাহায্য করতেন করুণাকে। পরে তীর্থদর্শনে এসে গৃহচ্যুতা করুণাকে দেখে বললেন, 'মা…পৃথিবীতে আমার আর কেহই নাই, যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি ততদিন আমার কাছে থাক, ততদিন আর তোমার কোন ভাবনা নাই।' কিন্তু নিধির প্রতিবন্ধকতায় তাকে সঙ্গে নিতে পারলেন না।

রঘুপতি ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার ভুবনেশ্বরী-দেবীমন্দিরের পুরোহিত; ত্রিপুরার ভাষায়, চোনতাই। দেবীর মন্দিরে বলির রক্ত দেখে ব্যথিতহৃদয়া একটি বালিকার মৃত্যুতে ত্রিপুরাধিপতি গোবিন্দমাণিক্যের বোধ হল, জীবরক্তপানে জননীর অনিচ্ছা। চতুর্দশ-দেবতার পুজার বলির জন্য রাজসভায় এসে রঘুপতি আগুন হয়ে বললেন, 'দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।…আপনি পাষণ্ড-নাস্তিকের মতো কথা কহিতেছেন।' কম্পিতদেহে উপবীত স্পর্শ করে তিনি অবিচলিত নৃপতিকে বললেন, 'তুমি উচ্ছন্নে যাও…তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে! বটে! কী তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পুজার ব্যাঘাত কর দেখিব।'

রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে রঘুপতি ডাকিয়ে বললেন, 'কুমার, তুমি রাজা হইবে।…মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।… তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে, এই আমার আদেশ।' মন্দিরের সেবক জয়সিংহ রঘুপতির সন্তানস্নেহে পালিত। সে বললে: এসব চক্রান্ত করা পাপ। রঘুপতি তাকে এক নূতন শিক্ষা দিলেন: 'শোনো বৎস…পাপপুণ্য কিছুই নাই। কেই-বা পিতা, কেই-বা ভ্রাতা, কেই-বা কে।…কে বলে হত্যা পাপ। হত্যা তো প্রতিদিনই হইতেছে।…কেহ-বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া…কেহ-বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে…কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন…জগতের চতুর্দিক হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে…।' তখন জয়সিংহ নিজেই রাজরক্ত আনতে চাইলে তিনি শঙ্কিত হলেন: 'তবে সত্য করিয়া বলি, বৎস।… আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না।…তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল তো

তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।' সরলস্বভাব জয়সিংহ দেবীপ্রতিমার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলে: সত্যই কি রাজরক্তে তৃষ্ণা তাঁর। প্রতিমার পিছনে লুকিয়ে রঘুপতি বললেন, 'হাঁ।' পরে গোবিন্দমাণিক্যের কাছে গিয়ে তাঁর এই কৌশল বুঝে জয়সিংহ প্রশ্ন করতে এল। রঘুপতি উদ্বেল ক্রোধ দমন করে তাকে মন্দিরে এনে দেবীর পাদস্পর্শ করালেন: 'মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করো—বলো যে ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই-চরণে উপহার দিব।'

জয়সিংহকে রক্ষার জন্যই রঘুপতি প্রজাদের উত্তেজিত করলেন। মন্দিরে যাত্রীসমাগম হলে প্রতিমার মুখ পিছনে ফিরিয়ে রেখে বললেন, 'ঠাকরুন কোথায়। ঠাকরুন এ-রাজ্য থেকে চলে গেছেন।…তোরা মায়ের জন্য এক-ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে। এই-তো তোদের ভক্তি।…এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্।…আর তিন-বৎসর পরে এতবড়ো রাজ্যে তোদের…বংশে বাতি দিবার কেহ থাকিবে না।' ২৯শে আষাঢ় জয়সিংহকে আবার তিনি শপথের কথা স্মরণ করালেন। অর্ধরাত্রে রঘুপতি রক্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন—এমন সময়ে জয়সিংহ আবৃতদেহে মন্দিরে এলে তার কানের কাছে মুখ রেখে বললেন, 'রাজরক্ত আনিয়াছ?' জয়সিংহ নিজের বুকে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করে প্রতিমার পদতলে পড়ে গেল। রঘুপতি আর্তচিৎকারে জয়সিংহের উপরে পড়ে তাকে তোলবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। সারারাত্রি তিনি সেই রক্তাপ্লুত দেহ আলিঙ্গন করে রইলেন।

পরদিন নক্ষত্র মন্দিরে এলে রঘুপতি জ্বলন্ত চোখে বজ্রমুষ্টিতে তাঁর হাত চেপে ধরলেন: 'রক্ত কোথায়।…তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়।…আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়, আমি তাহাকেই চাই। তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই…সে-রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না।'—বলে তাঁর রক্তলিপ্ত বক্ষ দেখালেন: 'সে কে?…কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে…সে কে? সে কি তুমি?' নক্ষত্র রায় ভীত হয়ে ধ্রুবের কথা তুললেন—সে গোবিন্দমাণিক্যের পালিত। রঘুপতি বললেন, 'তাহাকে আনিতেই হইবে—আজই আনিতে হইবে—আজ রাত্রেই চাই।…এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান?…যদি না-আনিতে পার তো ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে।…যে-মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর, ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনি ছিঁড়িয়া-ছিঁড়িয়া খাইবে।'

রাত্রে অপহৃত বালককে তিনি নক্ষত্রের কোল থেকে কেড়ে নিলেন। বলির লগ্নের জন্য প্রতীক্ষাকালে ধ্রুব কাঁদতে আরম্ভ করায় তিনি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। অতর্কিতে গোবিন্দমাণিক্যের আগমনে তাঁরা হলেন বন্দী। পরদিন রাজাদেশে নক্ষত্রের সঙ্গে নির্বাসিত হয়ে রঘুপতি বললেন, 'অপরাধ!

অপরাধ কিসের। আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম···তুমি তাহার ব্যাঘাত করিয়াছ···এখন আমি তোমার বিচার করিব···চতুর্দশ দেবতা পূজার দুই রাত্রে যে-কেহ পথে বাহির হইবে, পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম।···আমি তোমার দুই-লক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি।'

দণ্ডস্বরূপ গোবিন্দমাণিক্যের কাছে দু-লক্ষ মুদ্রা পেয়ে রঘুপতি চললেন পশ্চিমে। মনে-মনে বললেন, 'কলিতে ব্রহ্মশাপ ফলে না—দেখা যাক ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়।' কিছুকাল ঢাকায় থেকে তিনি উর্দুভাষা শিখলেন। শাজাহান-পুত্র সুজা তখন দিল্লি অভিমুখে ধাবমান। রঘুপতি দগ্ধকুটির পরিত্যক্ত গ্রাম এবং মর্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করে তাঁর অনুসরণ করলেন। কোনো-উপায়ে সুজাকে হস্তগত করে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই উদ্দেশ্য। সুজা পথিমধ্যে বিজয়গড় দুর্গ আক্রমণ করায় তিনি ব্রাহ্মণ-পরিচয়ে দুর্গে আশ্রিত হলেন। অতঃপর সহসা দারার আক্রমণে সুজা বন্দীভাবে দুর্গে আনীত হলেন। কৌশলে দুর্গের সুড়ঙ্গপথ জেনে অর্ধরাত্রে রঘুপতি তাঁকে মুক্ত করে দিয়ে নিজেও অপসৃত হলেন। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী এক গ্রামে তখন নক্ষত্র সুখের খেলায় মত্ত। শীর্ণ-দীর্ণ রঘুপতি সেখানে উপস্থিত। নক্ষত্র রায় দাদার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে অনিচ্ছুক। রঘুপতি ব্যঙ্গভরে বললেন, 'হরি-হরি কী প্রেম। তাই বুঝি নির্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন—পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননির পুতলি স্নেহের ভাই কখনো ব্যথিত হইয়া পড়ে।' তীব্র বাক্যে ও তীক্ষ্ম কটাক্ষে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে নক্ষত্র রায় ভালো নেই।

কোথাও নদী, কোথাও অরণ্য, কোথাও ছায়াহীন প্রান্তর—রঘুপতি যেন তাঁর কেশ ধরে নিয়ে চললেন। রৌদ্রের মতো দীপ্তভাবে তিনি অবিশ্রাম চলতে লাগলেন—নক্ষত্র তাঁর ছায়ার মতো, পথশ্রমে কাতর, মৃতপ্রায়। তাঁকে শুষ্কহাস্যে বলেন, 'এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে।' অবশেষে রাজমহলে পৌঁছে যথোচিত নজরানা দিয়ে সুজার কাছে সৈন্য এবং নক্ষত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানা সংগ্রহ হল। নক্ষত্র রায়কে মানুষের মতো শক্ত করার জন্য রঘুপতি তাঁকে রাজসম্মান দেখাতে লাগলেন। পাছে বিনাযুদ্ধে তিনি দাদার কাছে ধরা দেন, এই ভয়ে তাঁকে উত্তেজিত করে বললেন, 'গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।···বিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন—ছোটো ভাই আমার, এস ঘরে এস, দুধ-সর খাওসে।' দাদার সঙ্গে তাঁর দেখা করবার চেষ্টাও বারংবার তিনি ব্যর্থ করলেন।

গোবিন্দমাণিক্য স্বেচ্ছায় রাজ্যত্যাগ করায় রঘুপতির কাজ শেষ হল। এতদিন নানা-কৌশলে বাধাবিপত্তি কাটিয়ে দিনরাত্রি উদ্দেশ্যে-সাধনে নিযুক্ত থেকে তিনি এক মাদক-সুখ অনুভব করছিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে আর তাঁর আনন্দ রইল না। মন্দিরে গিয়ে দেখলেন, জয়সিংহ নেই। এক মাস পরে

রাজসভায় গিয়ে দেখলেন, চারিদিকে অবিচার-উৎপীড়ন-বিশৃংখলা। পরামর্শ দিতে গিয়ে নক্ষত্রের ভাবান্তর দেখে জ্বলন্ত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আবার এলেন মন্দিরে। দেখলেন, কোনো প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে নেই—পাষাণমন্দিরে হৃদয়ের লেশমাত্র নেই। জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিগাছে অসংখ্য ফুল ফুটেছিল—দেখে তার সরল-সুন্দর মুখখানি মনে পড়ল। জয়সিংহের উপর ভক্তিতে সেই মহৎচরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে তিনি বিবাদ-বিদ্বেষ ভুলে গেলেন। অর্ধরাত্রে প্রদীপ জ্বালিয়ে আবার তিনি এলেন মন্দিরে; দেখলেন সেই বুদ্ধিহীন-হৃদয়হীন দেবতা ঠিক তেমনি আছে দাঁড়িয়ে। শেষে চিৎকার করে বললেন, 'মিথ্যা কথা। সমস্ত মিথ্যা। হা বৎস জয়সিংহ, তোমার অমূল্য হৃদয়ের রক্ত কাহাকে দিলে। এখানে কোনো দেবতা নাই, কোনো দেবতা নাই, পিশাচ রঘুপতি সে-রক্ত পান করিয়াছে'—বলতে-বলতে কালীর প্রতিমা গোমতীর জলে নিক্ষেপ করে তিনি সে-রাত্রেই ত্রিপুরা ত্যাগ করলেন।

চট্টগ্রামের দক্ষিণে গোবিন্দমাণিক্য গ্রামবাসী ছেলেদের সেবায় মগ্ন ছিলেন। রঘুপতি সেখানে এসে বললেন, 'আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব, নহিলে আমার শান্তি নাই।...আমি সমস্ত দেখিয়াছি, কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে-পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি...তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।...আমি জগতের রক্তপাত করিয়া যে-পিশাচীকে এতকাল সেবা করিয়া আসিয়াছি...সেই শোণিত-পিপাসী জড়তা-মূঢ়তাকে আমি দূর করিয়া আসিয়াছি...এখন সে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।...মহারাজ...তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি...আমার আর দুঃখ নাই—আমি শান্তি পাইয়াছি।'

গোবিন্দমাণিক্যের সঙ্গে তিনি সমস্ত গ্রামকে জাগিয়ে তুললেন। অবশেষে নক্ষত্রের মৃত্যুর পরে উভয়ে ফিরে এলেন ত্রিপুরায়। পুনর্বার মন্দিরে এসে রঘুপতি ধ্রুবের মধ্যে ফিরে পেলেন জয়সিংহকে।

রঘুবীর ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। কানাই গুপ্তের দূরসম্পর্কের এক নাতি। রঘুবীরের তিন-পুরুষে পশ্চিমে বাস—থানার রাইটর-কনস্টেবল। কানাই গুপ্তের ভাষায় 'রাঘব বোয়াল'। বাঙালিমাত্রই যে শ্যালক-সম্প্রদায়ভুক্ত রঘুবীরের হিন্দিভাষায় এ-তত্ত্বটি সর্বদাই প্রকাশ পেত।

রজনী ॥ 'করুণা' উপন্যাস। মহেন্দ্রের স্ত্রী। রজনী কুরূপা—কিন্তু স্নিগ্ধ-স্বভাব, সুন্দর স্নেহচক্ষু, মুখখানি কোমল। রূপের অভাবে সে পিত্রালয়ে এবং

পরে স্বামীর কাছেও উপেক্ষিতা। প্রকাশ্যে স্বামীর যত্নও করতে পারত না।

একদিন প্রতিবেশিনী মোহিনীর প্রণয়াসক্ত স্বামীকে অশ্রুসিক্ত দেখে তার মনে হল: 'তোমার কি হইয়াছে বল, যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয়, তবে আমি তাহাও দিব।' স্বামীর গৃহত্যাগের পরে অহরহ তিরস্কৃত হয়ে সে গেল মোহিনীর কাছে—অনুরোধ করলে স্বামীকে একখানি চিঠি লিখতে। একদিন মোহিনীর গলা জড়িয়ে বললে, 'দিদি—আর আমি বেশীদিন বাঁচিব না।...যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে এই টাকাগুলি দিও।' মহেন্দ্র ফিরে এলে রজনী বিদায় নিতে উদ্যত হল। মহেন্দ্র বোঝাতে এলে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল: এ-সময়ে মৃত্যু হলে যেন তার পক্ষে সুখের হত। সন্ধ্যাবেলায় মোহিনীর কাছে গিয়ে সে বলতে লাগল সেই সুখের কথা।

এদিকে স্বামিত্যক্তা করুণা তাদের আশ্রিতা হলে রজনীর সঙ্গে তার ভাব জমে উঠল। দুজনের মনের কথা আর ফুরোতে চাইত না—তাদের কতদিনের কত সামান্য স্বামিস্নেহের কথা। বিষণ্ণ সখীকে নানাভাবে রজনী বোঝাবার চেষ্টা করত—সাধ্যসাধনা করে খাওয়াত। করুণা অবশেষে বিদায় নিয়ে গেলে তার সংসার শূন্য হয়ে গেল।

রজনী গুপ্ত ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদনের এক ছাত্রবন্ধুর পিতা। রজনী গুপ্ত ছিলেন নামজাদা কেরোসিন-কোম্পানির উচ্চ-আসনে। তিনি কেজোমানুষ চিনতেন। নিজ কন্যার বিবাহকালে মধুসূদনের বিষয়বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি নিজের টাকা জমা দিয়ে তাকে কেরোসিনের এজেন্সিতে বসিয়ে দেন।

রণজিৎ সিং ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের কথিত গল্পের চরিত্র।

রতন ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক অনুচর।

রতিকান্ত ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের খাতাঞ্চি।

রমাই ঠাকুর ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের এক বিদূষক। চন্দ্রদ্বীপের সভায় অহরহ রমাইয়ের রসিকতার গোলাগুলি বর্ষিত হত। সেই মান্ধাতার আমলের ঠাট্টাগুলো শুনে যে-দুর্ভাগ্য না হাসত, রমাই তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ত।

রামচন্দ্রের শ্বশুরালয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে সে মুখভঙ্গি করে বললে, 'অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং।...শ্বশুর-মন্দিরের সকলই সার,—আহারটা, সমাদরটা...সকলি সার পদার্থ। কেবল সর্বাপেক্ষা অসার ঐ স্ত্রীটা।' রমাই

রাজসভায় এক-রকম ভঙ্গিতে দাঁত দেখাত, ঘরে এসে ব্রাহ্মণীকে দাঁত দেখাত অন্যভাবে। তার ব্রাহ্মণী অত্যন্ত কৃশাঙ্গী এবং দিনে-দিনে আরো ক্ষীণ হচ্ছিলেন। শ্বশুরালয়ে রামচন্দ্রের পরিহাসের আশঙ্কায় রমাই বললে, 'মহারাজ, জয়ের ভাবনা কী ? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন তবে স্বয়ং শাশুড়ি-ঠাকুরানীকে পর্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।' রমাইয়ের একমাত্র ভীতির কারণ রাজানুচর রামমোহন। সেই রামমোহনের যশোহর যাত্রার প্রস্তাবে বিড়ালচক্ষু রমাই সংকুচিত হয়ে পড়ল।

যশোহরের প্রান্তে জামাতার জন্য যে-হাতিটি এল, রমাই ভাঁড়ের মতে, যশোহরপতি প্রতাপাদিত্যের স্থূলকায় দেওয়ানজি তার চেয়ে বৃহত্তর। দেওয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে, 'মহাশয়, উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ।' প্রতাপাদিত্যের উদ্দেশ্যে বললে, 'অমন ঢের-ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন-তো মহারাজ, আদিত্যকে যে-ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে-ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।' সন্ধ্যার সময়ে প্রৌঢ়া রমণীর বেশে রমাই এল রাজান্তঃপুরে—এসে রুচিবিগর্হিত বাক্যবাণে পুররমণীদের বিদায় করলে। তৎপরে রাজমহিষীর কাছে এসে বললে, 'এই-যে নিকষা জননী।' রামমোহন তৎক্ষণাৎ তাকে ঊর্ধ্বে তুলে পাক দিতে লাগল। রমাই কাতরস্বরে বললে, 'দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস না।' কথাটা রাষ্ট্র হয়ে পড়ায় যুবরাজ উদয়াদিত্যের সাহায্যে রামচন্দ্র পলাতক। খর্বকায় রমাই ভাঁড় সকালেও গুটিসুটি বসেছিল—প্রতাপাদিত্য ঘৃণাভরে তাকে দূর করে দিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের সভায় অতঃপর রমাই বলত, 'প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, কেঁচোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত খাইয়া-খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই জোঁকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া-খুঁড়িয়া মাথাটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের মত চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানুক্রমে রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, আমরা বেদে, আমরা জাতসাপ চিনি না ?···আপনি তো চলিয়া আসিলেন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে পড়িলেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বিধবা হইলে হাতের লোহা ও বালা-দুগাছি বিক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। যুবরাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা লইয়া তম্বি কত।' রামচন্দ্রের দ্বিতীয়-বিবাহের প্রস্তাবে 'সে উৎসাহিত হয়ে উঠল : 'প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক।···এ-শুভকার্যে আপনার বর্তমান শ্বশুরমহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কী-জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন।···বরণ করিবার নিমিত্ত এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ি-ঠাকরুনকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা-রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন।'

রমাপতি ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। ঐতিহাসিক যশোহরপতি প্রতাপাদিত্যের শ্যালক্।

রমাপতি ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার জনৈক ভক্ত। গোরার সঙ্গে রমাপতি পর্যটনে বেরিয়েছিল। অন্যান্য ভক্তরা পথশ্রমে ভঙ্গ দিলেও গোরার প্রতি নিতান্ত ভক্তিবশত সে ছেড়ে যেতে পারে নি।

চলতে-চলতে তারা চরঘোষপুরে মুসলমান-পাড়ায় উপস্থিত। আতিথ্য-গ্রহণের জন্য গ্রামে একঘরমাত্র হিন্দু নাপিত। সেই নাপিতের গৃহে একটি মুসলমান-ছেলে আশ্রিত। রমাপতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে বললে, 'হিন্দুর পানীয় জল পাই কোথায়?' নাপিতের একটি কাঁচা কূপ ছিল—সেই ভ্রষ্টাচারের কূপ থেকে জল খাওয়া যায় না। গোরা নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিবরণ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হল। তখন এক-এক মুহূর্ত রমাপতির এক-যুগ বোধ হচ্ছিল। গ্রামের লোকদের উপরেই সে চটে গেল: বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চায়—এই জাতের লক্ষ্মীছাড়া-বেটাদের উপরে পুলিসের উৎপাত ঘটেই থাকে এবং তা ঘটতেই বাধ্য; মনিবের সঙ্গে মিটমাট করে নিলেই তো হয়, ফেসাদ বাধাতে যায় কেন. তেজ এখন রইল কোথায়! বস্তুত তার সহানুভূতি ছিল নীলকুঠির সাহেবদের দিকেই। ক্রোশ-দেড়েক দূরে নীলকুঠির তহশীলদার মাধব চাটুজ্যের বাড়ি। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে চলতে-চলতে গোরা হঠাৎ নাপিতের বাড়িতেই চলল। অত্যাচারী মাধবের গৃহে অন্নগ্রহণে অনিচ্ছুক হয়ে সে রমাপতিকে আহারান্তে কলকাতা ফিরতে বললে। রমাপতির শরীর কণ্টকিত হল—গোরা ম্লেচ্ছের ঘরে ফেরার কথা কোন্ মুখে উচ্চারণ করলে! তার মনে হল, সে পানভোজন পরিত্যাগ করে প্রায়োপবেশনের সংকল্প করেছে। তবু মাধবের গৃহে আহার সমাপন করে কলকাতা ফিরতে তার দেরি হল না।

রমেন ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। আদিত্যের এক খুড়তুতো-ভাই। রমেন রাজনৈতিক কর্মী। আদিত্যের স্ত্রী নীরজা শয্যাশায়িনী হলে দূর-সম্পর্কের সরলা এল তার বাগানের পরিচর্যায়। রমেনের সে 'কল্পনার দোসর···স্বপ্নসঙ্গিনী।' রমেন আদিত্যের একটা খবর দিতে এলে নীরজা বললে, 'তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবু-কুঞ্জবনে, দেখগে যাও।' রমেন বললে, 'কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।···আচ্ছা বউদি···সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে।' সরলাকে হঠাৎ বিবাহ করতে অনুরুদ্ধ হয়ে সে বিস্মিত: 'পুণ্যের লোভ রাখি নে কিন্তু ওই-কন্যার লোভ রাখি···আমার পাঁজিতে তিন-শো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনও

আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও-পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।···ও-রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়।' নীরজা সরলার একটি ছবি দেখিয়ে তার প্রশংসা করায় বললে, 'তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বৌদি। জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।···চিরদিনের দাবি নাই করলেম···তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ওই-হাতের গুণে। সেই রস-গ্রহণে পাণি-গ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।'

সন্ধ্যাবেলায় সরলা বসে ছিল দিঘির ঘাটে। রমেন এসে তার পায়ের কাছে বসল : 'জান, দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে? পাশে জায়গা থাকে-তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি।' হাতখানি চুম্বন করে বললে, 'সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।' তারপরে উঠে আবীর মাখিয়ে দিলে তার কপালে : 'জান-না আজ দোলপূর্ণিমা?···বসন্তে মানুষের গায়ে তো রং লাগে না, লাগে তার মনে। সেই-রংটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিতা হয়ে থাকবে।' কথার ওস্তাদিতে সরলা তার অক্ষমতা জানালে। সে বললে, 'কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে-পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল।' তারপরে অনুমতি নিয়ে রমেন তার পাশে বসল। সরলার প্রতি নীরজার ঈর্ষায় তার নিরাশ্রিত হবার আশংকা জেনে বললে, 'সরি, তাহলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।···তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে-দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনও হতে পারে।···তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্ঠি থেকে তাকে তাড়াব। তারপরে লম্বা ছুটি পাব, এমন-কি কালাপানির পার পর্যন্ত।' সরলা আদিত্যের প্রতি তার প্রচ্ছন্ন প্রেম প্রকাশ করে অন্যায় স্বীকার করলে। রমেন বললে, 'আমি মানি-নে ওসব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের ; তখন কোথায় ছিল বউদি।'

রোগশয্যায় বেদনার্ত নীরজার আহ্বানে সান্ত্বনা দিতে এল রমেন। বললে, 'আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে।···যেমন দিয়েছ তেমনি পেয়েছ···যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তাহলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও।' আদিত্য স্ত্রীর কাছে সরলার সম্বন্ধে তার ভালোবাসা প্রকাশে উদ্যত হল। রমেন বললে, 'সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন। বউদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর-ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা-নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমরাও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।'

এদিকে সরলার আগ্রহ : রাজনৈতিক সভায় যোগ দিয়ে কারারোধের মধ্যে

সরে থাকবে। রমেন বাধা দিলে না—দুজনেই গেল জেলে। কিন্তু যথাকালের আগেই সরলা ছাড়া পেল; রমেন তখনও জেলে।

রমেশ চৌধুরী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশ আইন-পরীক্ষা দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসিয়ে তাকে মেডেল দিয়ে আসছিলেন—স্কলারশিপও ফাঁক যায় নি। তার কলুটোলার বাসার পাশে সহাধ্যায়ী যোগেনের বাসা; তারা ব্রাহ্ম। যোগেন যেদিন তাকে সেখানে চায়ের টেবিলে নিয়ে যায় সেদিন তার বোন হেমনলিনীকে দেখে লাজুক রমেশ বিপন্ন বোধ করছিল। প্রথম পরিচয়ের লজ্জা ভাঙলে কাব্যসাহিত্যে প্রেমের কথা যা-কিছু পড়েছিল সমস্তই সে হেমনলিনীর প্রতি আরোপ করলে।

সহসা পিতার নির্দেশে রমেশ বাড়ি এসে শুনলে: পিতৃবন্ধুর কন্যা সুশীলার সঙ্গে তার বিবাহ। বহুকষ্টে সংকোচ দূর করে সে বললে, 'আমি অন্যস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।…আর-কোনো কন্যাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে।' কিন্তু সে-আবেদন নিষ্ফল হল। নদীপথে কন্যালয়ে যাত্রার আগে সে ভাবলে: দৈবক্রমে সমস্ত ফেঁসে যেতে পারে। বিবাহকালে সে ঠিকমতো মন্ত্র-আবৃত্তি করলে না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজে রইল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরে রইল—প্রত্যূষে বিছানা থেকে উঠে চলে গেল বাইরে। ফেরার পথে সে ছিল অন্য-নৌকায়। সন্ধ্যার পরে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিহাওয়ায় সমস্ত বিপর্যস্ত হয়ে গেল। সংজ্ঞালাভ করে রমেশ দেখলে: সে একাকী নদীতটে শায়িত। চরের উপরে একস্থানে লালচেলিপরা প্রাণহীন নববধূটিকে আবিষ্কার করে সে কৃত্রিম-উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস সঞ্চারিত করলে। সেই নিমীলিত-নেত্র সুকুমার মুখখানি চেয়ে দেখে ভাবলে, 'ইহাকে যে বিবাহসভার কলরব ও জনতার মধ্যে দেখি নাই, সে ভালোই হইয়াছে।…ইহার মধ্যে নিঃশ্বাস সঞ্চার করিয়া বিবাহের মন্ত্রপাঠের চেয়ে ইহাকে অধিক আপনার করিয়া লইয়াছি।' বধূকে নিয়ে ঘরে ফেরার পরে তার পিতা এবং আত্মীয়গণের মৃতদেহ উদ্ধার হল। পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করে রমেশের আর নড়বার জো রইল না। এই অল্পবয়স্কা বধূর সঙ্গে প্রণয় সে অসম্ভব ও অসংগত বলেই জানত—কিন্তু তার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে এক অপরূপ রসে পূর্ণ অবনত হয়ে পড়ল। এই বালিকার মধ্যে ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে কল্পনা করে সে ভাবী-প্রেয়সীকে কল্যাণীকে পূর্ণ মহীয়সীমূর্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলে।

তিন মাস অতীত হল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বালিকার খোঁপা নেড়ে রমেশ বললে, 'সুশীলা, আজ তোমার চুলবাঁধা ভালো হয় নাই।' বালিকা বললে, তার নাম তো সুশীলা নয়। রমেশের বুক ধক করে উঠল। কৌশলে জিজ্ঞাসাবাদে বুঝলে: বালিকার নাম কমলা, ধোবাপুকুরে তার মামা তারিণীচরণের আশ্রিত ছিল—বিবাহের সময় লজ্জাবশে সে স্বামীকে দেখে নি, বিবাহের পরে তারও

নৌকাডুবি। এতদিন স্নেহসিক্ত তুলি দিয়ে যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিখানি সে এঁকেছিল, তাড়াতাড়ি তা মুছে ফেলতে হল। মেয়েটিকে সে কোথায় পাঠাবে, মামার বাড়ি পাঠালে তার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হবে না; সমাজে তার কি গতি হবে—এই সমস্ত চিন্তার মধ্যে তার সঙ্গে সে দূরত্ব রেখে চলতে লাগল। কলকাতার ভিড়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে কিছু-একটা সমাধানের আশায় অবশেষে কমলাকে নিয়ে সে এসে উঠল দরজিপাড়ায়। পড়বার ভান করে সে পৃথক শয্যায় শুত—তবু দূরত্ব রক্ষা করা অসম্ভব দেখে তাকে রেখে এল মেয়েদের স্কুলে। নিজেও সে শামলা মাথায় দিয়ে যেতে লাগল আলিপুর আদালতে। পথিমধ্যে একদিন সকন্যা অন্নদাবাবুর সঙ্গে দেখা। হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধ-গম্ভীর মুখ, চুলবাঁধার পরিচিত ভঙ্গি, হাতের সেই প্লেনবালা দেখাবামাত্র তার বুকের কাছ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। অল্পদিনের মধ্যে সে ফিরে এল আগের বাসায়। হাসিকৌতুক আদর-আপ্যায়ন এবং হেমনলিনীর সহায়তায় তার অপ্রতিহত সংগীতচর্চা আরম্ভ হল। বিচারশক্তির প্রাবল্য এবং কর্তব্যবোধে ভারাক্রান্ত রমেশের মধ্যেও হঠাৎ চলৎশক্তির আবির্ভাব হল। শুষ্ক-কঠিন সৌন্দর্যহীন কলকাতা-শহরে আবার প্রণয়ের দেবতার আনাগোনার বিরাম রইল না।

যোগেনের বন্ধু অক্ষয়ের কাছে সমাজে নিন্দার কথা শুনে রমেশ হেমনলিনীর সঙ্গে নিজের বিবাহ-প্রস্তাব করলে। তার ইচ্ছা ছিল বিবাহের পরে হেমনলিনীকে সমস্ত বলবে। ধোবাপুকুরের সন্ধান করে সে তারিণীচরণকে পত্র দিয়েছিল; তার উত্তরে কমলার স্বামী নলিনাক্ষের ঠিকানা পাওয়া গেল না। সহসা কমলার স্কুল থেকে পুজার ছুটিতে তাকে বাড়ি আনবার নির্দেশ পেয়ে রমেশ তাড়াতাড়ি বিবাহ পিছিয়ে দিতে এল। আহত হেমনলিনীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এক সুগভীর মৌন শান্তিতে অভিষিক্ত হয়ে সে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না।…আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনও অবিশ্বাসী হইব না।' এদিকে একটা গোল পেকে উঠল। কমলা বোর্ডিং থেকে দরজিপাড়ায় এলে যোগেন অক্ষয়ের সঙ্গে এসে তার পরিচয় জানতে চাইলে। রমেশ বললে, 'কমলা-সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিবার গুরুতর বাধা আছে—তোমরা আমাকে সন্দেহ করিলেও সে অন্যায় আমি কিছুতে করিতে পারিব না।' যোগেন কমলাকেই সমস্ত জিজ্ঞাসা করতে উদ্যত। সে বললে, 'আমাকে যদি অপরাধী বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করিতে পার—কিন্তু তোমাদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য নির্দোষী কমলাকে দাঁড় করাইতে পারিব না।' যোগেন তখনই তার সঙ্গে সমস্ত-সম্পর্ক ছিন্ন করে গেল।

কলকাতার পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপারটা কুৎসিৎ আকারে পল্লবিত হয়ে উঠবে কল্পনা করে রমেশ কমলাকে নিয়ে সে-রাত্রেই দেশে যাত্রা করলে। গাড়োয়ানকে অনেকটা পথ ঘুরিয়ে হেমনলিনীর বাড়ির কাছে এসে একবার

মুখ বাড়িয়ে দেখলে। শেয়ালদহে অক্ষয়কেও গাড়িতে উঠতে দেখে, এবং পরে গোয়ালন্দে এসেও তার ভাবে সন্দেহ হল : সে এসেছে তারই অনুসরণে। তখন কালবিলম্ব না করে রমেশ পশ্চিমের স্টিমারে উঠে পড়ল। স্বল্প-আয়োজনে কমলার গৃহস্থালী সেখানেই আরম্ভ হল। উমেশ-নামক একটি বালকের সহায়তায় শুদ্ধাচারে আহারের আয়োজন সম্পূর্ণ হল। রমেশের মনের মধ্যে এক সুখের আন্দোলন উপস্থিত—তার সম্বন্ধে একটি কল্যাণের বিধান স্বতঃই তার অলক্ষ্যে কাজ করে চলেছে, এই গৌরব তাতে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু সেইসঙ্গে এই বেদনাও নিহিত ছিল যে, সমস্তটাই একটা ভ্রমের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যাবেলায় জাহাজের ছাদের উপরে শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় মনে-মনে সে হেমনলিনীর নাম উচ্চারণ করলে : সেই একটিমাত্র নামের শব্দটি অপরিমেয় করুণারসার্দ্র দুটি ছায়াময় চক্ষুরূপে যেন তার মুখের উপরে নিবদ্ধ ছিল। দুই-করতলে মুখ নত করে সে ভাবতে লাগল : সেই দুশ্ছেদ্য সংকটজাল সে কি ছিন্ন করে ফেলবে না ? এই দৃঢ়-সংকল্পের আবেগের মধ্যে মুখ তুলে দেখলে : কমলা তার পাশে দাঁড়িয়ে। তখনই সমস্তটা তার কাছে প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক-বোধে সে কমলাকে একটা গল্প বানিয়ে বললে : গল্পটি তারই জীবনের অনুরূপ। কিন্তু অকপটে সমস্ত প্রকাশ করে তাকে আঘাত করা অসম্ভব হল। অবশেষে অনিচ্ছুক কমলাকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে লাগল, কমলাকে পরিত্যাগ করবার পথ নেই, অতএব হেমনলিনীকে বিদায়।

দ্বিতীয়রাত্রেও অন্ধকারভীরু কমলাকে আশ্বস্ত করে সে পাশের ঘরে পাঠালে। কিন্তু স্বেচ্ছাবৃত এই-ব্যবধানে কমলার ভাব ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। এমন সময় গাজিপুরের বৃদ্ধ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ। সেই বৃদ্ধকে নিয়ে হাসিকৌতুকে কমলাকে কিছুকাল ভুলে থাকতে দেখে রমেশ স্বস্তি অনুভব করলে। চক্রবর্তীর সঙ্গে কমলা গাজিপুরে যেতে চাইলে। 'উভয়ের সম্পর্কের জটিলতা প্রকাশ হবার ভয়ে রমেশের প্রথমে আপত্তি ছিল। কিন্তু কমলার আগ্রহে শেষে হার মেনে ভাবলে : হেমনলিনী এবং তার মধ্যে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়ে আছে, সেই-যুদ্ধ জয় করে তাকে পাবার সম্ভাবনা অল্প— অতএব দ্বিধা না করে তার কমলাকে গ্রহণ করাই শ্রেয়।'

চক্রবর্তীর গৃহে স্থানাভাববশত রমেশকে একা বাইরের ঘরে থাকতে হত। সেখানে ওকালতিতে প্রবেশের ব্যবস্থার জন্য সে একবার এল কলকাতায়। কলকাতা ত্যাগের আগে একটি পত্রে কমলাঘটিত সমস্ত লিখে সে স্পন্দিতবক্ষে এল কলুটোলায়। অন্নদাবাবুরা তখন পশ্চিমে—সেখানে এক যুবাপুরুষের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় জেনে সে ক্ষুণ্ণ-অভিমানে গাজিপুরে ফিরল। কমলা ইতিমধ্যে একটি বাসা পেয়ে সেটি বাসযোগ্য করে তুলতে প্রবৃত্ত ছিল। কমলা তার নিজের ঘরটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবে—তার সলজ্জ স্মিতহাস্যটির সম্মুখে সে তার সম্পূর্ণ হৃদয় নিবেদন করে দেবে এই-ভেবে রমেশ পুলকিত হল। কিন্তু বাসার

কাজ তখনও শেষ না-হওয়াতে আদালত-সম্বন্ধীয় কাজে সে কয়েকদিনের জন্য আবার গেল এলাহাবাদে। চক্রবর্তীও কার্য-উপলক্ষে সেখানে এসে কমলাকে পত্র না-দেওয়ার জন্য তিরস্কার করলেন। রমেশ কালবিলম্ব না করে লিখলে, 'প্রিয়তমাসু—কমলা…আজ তোমাকে এই…সম্বোধন করিয়া আমাদের সংশয়াচ্ছন্ন অতীতকে দূরে সরাইয়া দিলাম…এবারে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিব, হৃদয়লক্ষ্মীকে গৃহলক্ষ্মীর মূর্তিতে দেখিব।' এদিকে হেমনলিনীকে লেখা চিঠিখানি একদা তার স্বভাবশিথিল হাত থেকে কখন ঘরের মধ্যে পড়েছিল। রমেশ এলাহাবাদ থেকে ফিরে এসে দেখলে : কমলা নেই। গঙ্গাতীরে এসে কমলার চাবির গোছা আর তারই-দেওয়া ব্রোচ পাওয়া গেল। তখন বুকের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে উঠে রমেশ ভাবলে, 'একদিন এই কমলা এই-গঙ্গার জল হইতে উঠিয়া আমার পাশে আসিয়াছিল, আবার পূজার পবিত্র ফুলটুকুর মতো আর-একদিন এই গঙ্গার জলের মধ্যেই অন্তর্হিত হইল।'

রমেশ আর কোথাও স্থায়ী হতে পারল না। নৌকায় চড়ে সে কাশীর ঘাটের শোভা দেখলে, দিল্লিতে কুতুবমিনারে চড়লে, আগ্রায় জ্যোৎস্নারাত্রে তাজ দেখলে—অমৃতসরে-রাজপুতানায় ঘুরতে লাগল। এমনি করে সে নিজের শরীর-মনকে বিশ্রাম দিলে না—চিরদিনের জন্য যেন সে সংসারের অযোগ্য হয়ে গেছে। অবশেষে তার ভ্রমণশ্রান্ত হৃদয় ঘরের জন্য হা-হা করতে লাগল। একদিন কলকাতায় ফিরে সে এল কলুটোলায়। প্রতিবেশী চন্দ্রমোহনের কাছে শুনলে : অন্নদাবাবুরা আছেন কাশীতে—সেখানে নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের আলাপ। সে ভাবলে, 'অদৃষ্ট এ-কী বিষম কৌতুকে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিকে আমার সঙ্গে কমলার ও অন্যদিকে নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর এই-মিলন, এ-যে একেবারে উপন্যাসের মতো—সেও কুলিখিত উপন্যাস।' চন্দ্রমোহনের কাছে ঠিকানা নিয়ে সে ময়মনসিঙে যোগেনের কাছে এল—পরে তার সঙ্গে এল কাশীতে। কিন্তু, হেমনলিনীর ভাবান্তর দেখে সে তার টেবিলে একটি চিঠি রেখে অন্তর্হিত হল। তাতে কমলা-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারের উপসংহারে ছিল : 'তোমার সহিত আমার যে-বন্ধন ঈশ্বর দৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন, সংসার তাহা ছিন্ন করিয়াছে।…যদিও আমি একদিনের জন্যও কমলার প্রতি স্ত্রীর মতো ব্যবহার করি নাই, তথাপি ক্রমশ সে-যে আমার হৃদয় আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল, একথা তোমার কাছে আমার স্বীকার করা কর্তব্য।…তুমি সুখী হও, তোমার মঙ্গল হউক। আমাকে তুমি ঘৃণা করিয়ো না, আমাকে ঘৃণা করিবার কারণ তোমার নাই।'

কমলাকে যে কোনো অপরাধ স্পর্শ করে নি নলিনাক্ষের তা জানা প্রয়োজন, কমলার মৃত্যু হলেও তার স্মৃতিকে সে সম্মান করতে পারবে—এই ভেবে নলিনাক্ষের বাসায় এসে রমেশ চক্রবর্তীকে দেখে বিস্মিত হল। চক্রবর্তীর নির্দেশে পরদিন গেল তাঁর বাসায়। কমলা ইতিমধ্যে চক্রবর্তীরই সহায়তায়

ছদ্মপরিচয়ে স্বামিগৃহে আশ্রিত ছিল। সে তার আশীর্বাদ নিতে এল। রমেশ রুদ্ধকণ্ঠে বললে, 'তুমি সুখী হও কমলা—আমি না-জানিয়া এবং জানিয়া তোমার কাছে যা-কিছু অপরাধ করিয়াছি, সব মাপ করিয়ো।' ক্ষণকাল মৌন থেকে বললে, 'যদি কাহাকেও কিছু বলিবার জন্য, কোনো-বাধা দূর করিবার জন্য আমাকে তোমার প্রয়োজন থাকে-তো বলো।' কমলা জানালে তা অনাবশ্যক। রমেশ স্বপ্নাবিষ্টের মতো পথে বেরিয়ে ভাবতে লাগল: 'এখন আমার আবশ্যক কেবল নিজের জীবনটুকু লইয়া, এখন তাহাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে বাহির হইলাম—আমার আর পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার কোনো প্রয়োজন নাই।'

রসিক চক্রবর্তী ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। রসিকের মাথার সম্মুখে টাক, পাকা গোঁফ, গৌরবর্ণ। তিনি নৃপবালা-নীরবালাদের পিতার আমলের আশ্রিত এবং সে-বাড়ির সুখদুঃখের সঙ্গে জড়িত। ফলে কর্ত্রী জগত্তারিণীর অসংগত ফরমাশ খেটে তাঁর দিন কাটত। বাড়ির বিধবা মেজো-মেয়ে শৈলর সহকারিতায় তাঁর সংস্কৃতচর্চা ছিল অব্যাহত।

কর্ত্রীর অঙ্কুশে আহত রসিক নৃপবালা-নীরবালার জন্য একজোড়া পাত্র স্থির করলেন। পাত্র-দুটি অমনোনীত হলে তিনি বড়ো-মেয়ে পুরবালাকে বললেন, 'ভাই, বর ঢের পাওয়া যায় কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।' শৈলবালার ইচ্ছা: পুরুষবেশে তাঁর সঙ্গে কুমারসভায় গিয়ে লঙ্কাকাণ্ড বাধানো। রসিক প্রথমটা হাঁ করে রইলেন—পরে হাসতে লাগলেন, তার পরে রাজি: 'ভগবান হরি নারী-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তাহলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ-বয়সটা কাটাব।' চিরকুমার সভার স্বর্ণলঙ্কায় লেজে করে তিনি আগুন লাগাতে চললেন—শৈল তাঁর আগুন। পুরবালা তাঁর প্রফুল্লতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, 'ভাই, তোর রসিকদাদার মুখের ঐ-রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে—বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে-মনে রাগ করে।'

কুমারসভাটিকে কৌশলে বাড়িতে উঠিয়ে আনা হল। রসিক সভ্যপদে বৃত হলেন: 'আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়…পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়'। পুরুষবেশী শৈলর 'অবলাকান্ত' পরিচয় দিয়ে বললেন, 'নামটি আমাদের সভার উপযোগী নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই…নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন।…অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী, ঠিক করে বলা শক্ত…ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত নাও বলেন ইনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।' উপস্থিত সভাতেই তর্ক উঠল: মেয়েদের কুমারসভার

সভ্যপদে নেওয়া যায় কিনা। অকৃতদার রসিক বললেন, 'অবস্থাগতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই, তবু এটুকু জেনেছি স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়।...একচক্ষু হরিণ যেদিকে কানা ছিল সেইদিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল—কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তাহলে সেইদিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।'

কুমারসভার সভ্য-দুটি রসিকের মুখে বিরহীদের সম্বন্ধে সংস্কৃত-শ্লোক এবং তার বাংলা তর্জমা শুনে মুগ্ধ। রসিক তাঁর টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে-মাঝে এই টাকের উপর খোলাহাওয়া খেতে আসেন...এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।' ঘরের মধ্যে একটা রুমাল দেখে শ্রীশের কৌতূহল জেগে উঠল—রসিক তাতে যেন অধিকতর ব্যগ্র: 'দেখি-দেখি! তাই-তো! দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি! বাঃ, দিব্যি গন্ধ!..."বাসন্তীনবপরিমলোদ্গাররুমালং"! শ্রীশবাবু...দেখেছেন, কোণে একটি ছোট্ট "ন"-অক্ষর লেখা রয়েছে?...অভিধানে যত "ন" আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, "ন"য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে...আমার এই রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু।...প্রেমের বাজারে বড়ো-মহাজনি করবার মূলধন আমার হাতে নেই—আমি খুচরো মালের কারবারী—রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।' সেই রুমালটির জন্য শ্রীশের লুব্ধতা দেখে পরে বললেন শৈলকে, 'ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যে-রকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এঁদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা-রম্ভা-মদন-বসন্ত কারও দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।'

অনতিপরে বিপিনের হাতে একখানি গানের খাতা পড়ায় জিনিস-দুটির অধিকারিণীদের সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে-দিতে রসিকের অবস্থা কাহিল। কখনো সন্ধ্যাবেলায় পথের মধ্যে, কখনো গোলদীঘিতে আসর জমে—এদিকে সর্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে আসে রসিকের। শেষে ত্যক্ত হয়ে বললেন, 'আমি রসিকচন্দ্র—দুই-দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবন-সাগরে ভাসমান।...এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে।...মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন—আর আমি বৃদ্ধ...যৌবনের উত্তাপ বুড়োমানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।' কাজেই অনতিবিলম্বে তিনি সভ্যযুগলের কাছে বহন করে আনলেন দুঃসংবাদ: কন্যা-দুটির জন্য দুটি পাত্র স্থির—এখন আগাছা উৎপাটন করে ফুলগাছ রোপণ করে কে? ছেলে-দুটিকে ভুল ঠিকানা দিয়ে সভা-দুজনকে নিয়ে গিয়ে আপাতত কাজ চালানো যেতে পারে—ইতিমধ্যে দুটি সৎপাত্র দেখে নেওয়া চলে।

সভার অধিবেশনে অতঃপর প্রশ্ন উঠল: সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম

উঠিয়ে দেওয়া যায় কিনা। রসিক বললেন, 'আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ-ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই-ই সমান। আমার পরামর্শ এই-যে উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোনদিন আপনিই উঠে যাবে।'

রাজবল্লভ ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নলিনাক্ষ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা। রাজবল্লভ ফরিদপুর অঞ্চলের ছোটোখাটো জমিদার। ত্রিশ-বছর বয়সে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। স্ত্রী ক্ষেমংকরী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ না-করায় তাঁর পক্ষে সুখকর হয় নি। বৃদ্ধবয়সে তিনি একটি বিধবাকে বিবাহ করবার জন্য হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন: 'যাহার সঙ্গে ধর্মে-মতে-ব্যবহারে ও হৃদয়ে মিল হইয়াছে তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করিলে অন্যায় হইবে।' সর্বসাধারণের ধিক্কারের মধ্যে তিনি সেই বিধবাকে অগত্যা হিন্দুমতে বিবাহ করেন।

রাজলক্ষ্মী ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। মহেন্দ্রের মা রাজলক্ষ্মী। শৈশবে পিতৃহীন মহেন্দ্র তাঁর একমাত্র সন্তান—তিনিই তার অন্তহীন মান-অভিমান আদর-আবদারের পাত্রী। বিধবা বাল্যসখী হরিমতির কন্যা বিনোদিনীর জন্য তাঁর অনুরোধ: 'বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে—তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।' মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারীকে তিনি স্টীমবোটের পিছনে-আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের ভারবহ মনে করতেন এবং সে-হিসেবে স্নেহ করতেন। মহেন্দ্র বেঁকে বসলে তাকে বললেন, 'বাবা, এ-কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়।' বিহারী অসম্মত হওয়াতে তিনি বিনোদিনীর বিবাহ দিলেন তাঁর জন্মগ্রাম বারাসতে।

বউ এসে পাছে মাকে ছাড়িয়ে ওঠে এই-ভয়ে মহেন্দ্র অনেকদিন বিবাহ করলে না। রাজলক্ষ্মী এই নিয়ে তাঁর বিধবা-জা অন্নপূর্ণার কাছে গর্ব করতে গেলেন—কিন্তু সমর্থন না-পেয়ে পুত্রহীনার ঈর্ষা সন্দেহ করলেন: 'আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ-তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আসিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে-শুনিতে পারিব, আর-কাহারো দরকার হইবে না।' মহেন্দ্র সহসা অন্নপূর্ণার বোনঝি আশাকে পছন্দ করায় তার চক্রান্ত সফল হতে দেখে রাজলক্ষ্মী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন: 'বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক-ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এতবড়ো শয়তানি!' বিহারীকে বললেন, 'মেয়েটি লক্ষ্মী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ-মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিস নে।' অবশেষে মহেন্দ্রের জিদ দেখে অন্নপূর্ণাকে ধরে আশার সঙ্গেই তার বিবাহ দিতে হল।

বিবাহের পরে মহেন্দ্রের পড়াশুনার ব্যাঘাতের ভয়ে রাজলক্ষ্মী আশাকে

তার জ্যাঠার কাছে পাঠাতে চাইলেন। ব্যর্থ হয়ে ভাবলেন, 'কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা, এমন বেহায়াপনা তো তখন ছিল না।' অপরিমিত উৎসাহে বধূকে তিনি ঘরকন্নার কাজ শেখাতে গেলেন। মহেন্দ্র তাকে লেখাপড়া শেখাতে চাইলে। রাজলক্ষ্মী দ্রুতপদে বধূর হাত ধরে এনে গলবস্ত্র-জোড়করে অন্নপূর্ণাকে বললেন, 'মাপ করো মেজগিন্নি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি বুঝিতে পারি নাই; উঁহার কোমল হাতে আমি হলুদের দাগ লাগাইয়াছি···উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীবৃত্তি আমি করিব।' অন্নপূর্ণা ত্যক্ত হয়ে অন্যত্র গেলেন। মহেন্দ্রও তাঁর অনুসরণে উদ্যত হলে রাজলক্ষ্মী পালকি চড়ে সেখানে উপস্থিত: 'প্রসন্ন হও মেজবউ, মাপ করো।···তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে-বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।' অন্নপূর্ণাকে ফিরিয়ে এনে তিনি নিজে চললেন বারাসতে—তখন আবার ডাক পড়ল বিহারীর। জন্মস্থান দেখবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন না—গ্রীষ্মকালে নদী যখন শুকিয়ে আসে মাঝি যেমন পদে-পদে লগি ফেলে দেখে, মাতাপুত্রের সম্বন্ধের গভীরতা তেমনিই তিনি মেপে দেখছিলেন। বারাসতে চারদিকে বনজঙ্গল আর শেয়ালের ডাকে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন। তখন বিধবা বিনোদিনী এসে তাঁর সেবার ভার নিলে। যেমন তার পরিপাটি কাজ, তেমন সুন্দর রান্না, তেমনই সুমিষ্ট কথাবার্তা। রাজলক্ষ্মী মনে-মনে ভাবলেন: আহা, এই মেয়ে তো তাঁর বধূ হতে পারত! বিনোদিনীকেও বললেন, 'মা, তুই আমার ঘরের বউ হলি-নে কেন, তা-হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।' ইতিমধ্যে অন্নপূর্ণা এসে বিদায় নিয়ে গেলেন তীর্থবাসে। রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রের একটি অনুনয়-পত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। বিহারী তার একটি চিঠি লিখিয়ে নিয়ে এলে তিনি সমস্তই বুঝলেন, তবু থাকতে পারলেন না—বিনোদিনীকে নিয়ে কলকাতায় ফিরলেন। আশা তাঁর গৃহকাজে সহায়তা করতে এলে তিনি বিনোদিনীর দিকে পক্ষপাত দেখিয়ে তারই প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হতে লাগলেন।

বিনোদিনীর সম্বন্ধে মহেন্দ্রের অসন্তোষে রাজলক্ষ্মী বিহারীকে ডেকে তাকে বুঝিয়ে বলতে অনুরোধ করলেন। বিনোদিনীকে বললেন, 'দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না।···তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।' অনতিপরেই তিনি অসুখে পড়লেন। তখন বিনোদিনীর প্রতি এক লুব্ধতার অভিমানে মহেন্দ্র কিছুকাল বাড়িছাড়া। সে ফিরে এলে বিনোদিনী আবার বাড়ি যেতে উদ্যত। রাজলক্ষ্মী কাঁদো-কাঁদো হয়ে মহেন্দ্রকে বললেন, 'বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।···তুই-তো কাহাকেও খাতির করিতে জানিস না। ভদ্রলোকের মেয়ে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর-যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।' মহেন্দ্র কিছুদিন কাশীতে গিয়ে রইল—সে ফিরে এলে আশা গেল তার মাসির কাছে। মহেন্দ্রের

লক্ষ্মীছাড়া শূন্যভাব দেখে রাজলক্ষ্মী ভাবলেন, 'বউ গিয়াছে, তাই এ-বাড়িতে মহিনের কিছুই ভালো লাগিতেছে না।' বিনোদিনীকে বললেন, 'সেই ইনফ্লুয়েঞ্জার পর হইতে আমার হাঁপানির মতো হইয়াছে ; আমি তো আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘন-ঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাছা, নিজে থাকিয়া মহিনের খাওয়া-দাওয়া সমস্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাস, একজন কেহ যত্ন না-করিলে মহিন থাকিতে পারে না।' বিনোদিনী ইতস্তত করায় তিনি অসন্তুষ্ট হলেন : আজন্মকাল তিনি ছেলেকে দেখে আসছেন, মহেন্দ্রের মতো ভালো ছেলে আছে কোথায়। পুত্রসেবাব্যাপারে বিনোদিনীর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। অনতিপরে মহেন্দ্র বিনোদিনীর মর্যাদা বুঝেছে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন। প্রতিবেশিনী কায়েতঠাকরুন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পরে তাঁর সঙ্গে গল্প করার প্রলোভন ত্যাগ করেও তিনি মহেন্দ্র-বিনোদিনীর বইপড়ার আসরে উপস্থিত থাকবার চেষ্টা করতেন। স্ত্রীকে নিয়ে মহেন্দ্র তার হিতৈষীদের ত্যাগ করেছে—এমন-কি বিহারীকেও, তাই বিহারীকে একদিন নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। আশা ফিরে এলে এক রাত্রে উদ্‌ভ্রান্ত মহেন্দ্র বিনোদিনীর সন্ধানে তাঁর কাছে উপস্থিত। রাজলক্ষ্মী বললেন, 'মহিন, এত রাত্রে তুই এখানে যে!' পরদিন তিনি বিনোদিনীর সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না। বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাণ্ডজ্ঞানহীনতার অভিযোগ করায় বললেন, 'আমার ছেলের দোষগুণ আমি জানি—কিন্তু তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।' বিনোদিনী বললে, 'নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই?' রাজলক্ষ্মী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন : 'হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব খসিয়া পড়িবে না!'

বিনোদিনী বারাসতে চলে গেল। মহেন্দ্র বাড়ি ফিরে তাকে না-দেখে তার অন্বেষণে চলল। রাজলক্ষ্মী তার সঙ্গে চলতে-চলতে বললেন, 'মহিন, যাসনে মহিন, ফিরিয়া যায়, আমার একটা কথা শুনিয়া যা।' রাত্রে সে যখন বাড়ি এল তিনি প্রায়ান্ধকার ঘরে অবসন্নভাবে শায়িত ছিলেন—আশা তাঁর পদতলে সেবার অধিকারিণী। তিনি বললেন, 'মহিন, তোর যেখানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কষ্ট দিস নে।...আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষ্মী বউকে চিনিতে পারি নাই'—বলে কাঁদতে লাগলেন। আশা মহেন্দ্রের খাবার নিতে এলে বললেন, 'খাবারের ব্যবস্থা আমি করিতেছি, বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নূতন ঢাকাই শাড়িখানা শীঘ্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।' পরদিন একাদশী ছিল। আশা দুধ ফল নিয়ে এলে করুণমূর্তি বধূর সেই অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টায় তাঁর দুই চক্ষু প্লাবিত হল—তাকে কোলে নিয়ে কপোল চুম্বন করলেন।

কিন্তু মহেন্দ্র চলে গেছে শুনে তাঁর সেই কোমলতা দূর হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় দৈবজ্ঞ-ঠাকুর আর আচার্য-ঠাকরুনকে ডাকিয়ে তিনি বউমার কোষ্ঠী এবং হাত দেখাবার উদ্যোগ করছেন—এমনসময়ে মহেন্দ্র এলে আশার সংকুচিতভাব দেখে তাকে তীব্র ভৎসনা করলেন। মহেন্দ্রের ভাব দেখে তার পড়াশুনার সুবিধার জন্য ধুমধাম করে তার রাজাসন প্রস্তুত করে দিলেন। দুঃখের দিনে তাঁর হাতে যা-কিছু ছিল তাই দিয়ে তিনি মহেন্দ্রকে বাঁধবার চেষ্টা করলেন। রাত্রে আহারের পরে আশাকে পুতুলের মতো সাজিয়ে তাকে বিছানার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন। কুণ্ঠিতা আশা উপরে গিয়ে দ্বার দিলে বহুকষ্টে হাঁপানি নিয়ে উপরে এসে বললেন, 'বউ, তোমার রকম কী।...এখন কি এইরকম রাগারাগি করিবার সময়! এত দুঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আসিল না। যাও, নিচে যাও।' তখন মহেন্দ্র তাঁর অসুখের কথা জানতে এলে তিনি মনে-মনে খুশি হলেন।

রাজলক্ষ্মী স্পষ্টই দেখলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধতে পারছে না। অন্তত ব্যামো উপলক্ষ করে যদি তাকে ধরে রাখা যায়, এই ভেবে আশাকে ভাঁড়িয়ে তিনি ওষুধ ফেলে দিতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় রোগের কষ্টের সময়ে তাঁর বিহারীর কথা মনে হল। রাত্রে মহেন্দ্রকে ডেকে তিনি তাকে খবর দিতে বললেন। কিন্তু পরদিনই মহেন্দ্র নিরুদ্দেশ। তখন এ-সংসারে প্রশ্ন করবার, চেষ্টা করবার, ইচ্ছা করবার আর তাঁর কিছুই রইল না। অনতিপরে মহেন্দ্রের একটি চিঠি পেয়ে ভাবলেন, হয়তো তার কোনো ব্যামো হয়েছে। অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে তার অন্তর্ধানের সংবাদে আশার উপরেই বিরক্ত হলেন: 'কেন তুমি মহিনকে আমার অসুখের কথা খবর দিতে গেলে।...মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী সুখ হইল।' ডাক্তারকে আর তিনি চিকিৎসা করতে দিলেন না। বললেন, 'ভালো চিকিৎসা ছিল যখন বিধবারা পুড়িয়া মরিত...যাও ডাক্তারবাবু, তুমি যাও—আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না...।' অন্নপূর্ণা সংবাদ পেয়ে কলকাতায় এলে রাজলক্ষ্মী যেন হারানো ধন ফিরে পেলেন। মহেন্দ্রের জন্মেরও আগে যার সঙ্গে তিনি বধূভাবে সংসারে প্রবেশ করেছিলেন, সেকালের সেই ঘনিষ্ঠ সখিত্বে আচ্ছন্ন হয়ে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। রোগের কষ্ট বেড়ে উঠলে তিনি বিহারীর খবর নিতে বললেন।

পরদিন বিহারী এলে রাজলক্ষ্মী তার কণ্ঠে-মস্তকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কতদিন তোকে দেখি নাই।...তুই এমন রোগা হইয়া গিয়াছিস কেন, বিহারি।' আশাকে ডেকে তিনি তার আহারের আয়োজন করতে বললেন—মহেন্দ্রের নাম করলেন না। শেষে বিহারী মহেন্দ্রকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। তখন তিনি প্রত্যাশার সঙ্গে বাইরের দিকে চাইলেন। মহেন্দ্রের স্পর্শে তাঁর সর্বশরীর বারবার শিহরিত হল—বহুকষ্টে উঠে তার ললাট চুম্বন করলেন। আশাকে তার পাশে বসিয়ে বললেন, 'আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গেলাম, মহিন...তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবি নে। মেজবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো—

তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।' সন্ধ্যাবেলায় আবার আগের মতো দুই-বন্ধুকে খাইয়ে তিনি তৃপ্তি অনুভব করলেন। রাত্রে বিনোদিনীর খোঁজ করে বললেন, 'বিহারী, দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।' বিনোদিনী কুণ্ঠিতভাবে ঘরে এসে তাঁর মার্জনা লাভ করলে।

মৃত্যুকালে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে বললেন, 'আমি বড়ো সুখে মরিলাম, মহিন···তুই যখন ছোটো ছিলি, তখন তোকে লইয়া আমার যে-আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে···কাঁদিস নে, মহিন। লক্ষ্মী ঘরে রহিল। বৌমাকে আমার চাবিটা দিস।···আমার বাক্সে দু-হাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম।' বিহারীকে বললেন, 'বাবা, বিহারী···তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্য একটি বাগান করিয়াছিস··· আমার বিবাহের সময় আমার শ্বশুর আমাকে একখানি গ্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস···আমার শ্বশুরের পুণ্য হইবে।'

রাজারামবাবু ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শর্মিলার বাবা। বরিশাল-অঞ্চলে এবং গঙ্গার মোহনায় রাজারামবাবুর মস্ত জমিদারি। জাহাজ-তৈরির ব্যবসায়ে শেয়ার ছিল শালিমারের ঘাটে। 'তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায়, একালের শুরুতে। কুস্তিতে-শিকারে-লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে নাম ছিল প্রসিদ্ধ। মার্চেণ্ট অব ভেনিস, জুলিয়াস সিজার, হ্যামলেট থেকে দু-চার পাতা মুখস্থ বলে যেতে পারতেন। মেকলের ইংরেজি ছিল তাঁর আদর্শ. বার্কের বাগ্মিতায় ছিলেন মুগ্ধ, বাংলা ভাষায় তাঁর শ্রদ্ধার সীমা ছিল মেঘনাদবধ-কাব্য পর্যন্ত। মধ্যবয়সে মদ এবং নিষিদ্ধ ভোজ্যকে আধুনিক চিত্তোৎকর্ষের আবশ্যক অঙ্গ বলে জানতেন···সযত্ন ছিল তাঁর পরিচ্ছদ, সুন্দর-গম্ভীর ছিল তাঁর মুখশ্রী, দীর্ঘ-বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ, মেজাজ ছিল মজলিসি···নিষ্ঠা ছিল না পুজোর্চনায়, অথচ সেটা সমারোহে প্রচলিত ছিল তাঁর বাড়িতে। সমারোহ-দ্বারা কৌলিক-মর্যাদা প্রকাশ পেত, পুজোটা ছিল মেয়েদের এবং অন্যদের জন্য।···গবর্মেণ্ট-হাউসে তাঁর ছিল বিশেষ দেউড়িতে সম্মানিত প্রবেশিকা। কর্তৃপক্ষীয় পদস্থ-ইংরেজ তাঁর বাড়িতে চিরপ্রচলিত জগদ্ধাত্রীপুজোয় শ্যাম্পেনপ্রসাদ ভূরি পরিমাণেই অন্তরস্থ করতেন।'

শর্মিলার বিবাহের পরে তাঁর পত্নীহীন গৃহে ছিল বড়ো-ছেলে হেমন্ত আর ছোটো-মেয়ে ঊর্মিমালা। হঠাৎ হেমন্তের দেহে একটা বিকার ঘটল। এক ইংরেজ ডাক্তারের উপরে রাজারামের ছিল অবিচলিত আস্থা। অস্ত্র-ব্যবহারের অভ্যাসবশত দেহের দুর্গমস্তরে বিপদ অনুমান করে তিনি অস্ত্রের সাহায্যে যেখানটা অনাবৃত করলেন, সেখানে কল্পিত-শত্রুর দেখা পেলেন না।

ছেলেটি গেল মারা। হেমন্তের মৃত্যু রাজারামকে তত বাজে নি—কিন্তু তার সজীব-সুন্দর বলিষ্ঠ দেহকে খণ্ডিত করবার স্মৃতিটা দিনরাত্রি তাঁর মনের মধ্যে কালো-হিংস্র পাখির মতো তীক্ষ্ণ-নখে আঁকড়ে ধরে রইল—মর্ম শোষণ করে টানল তাঁকে মৃত্যুর দিকে।

রাজারামবাবুর আজন্ম সংস্কার, যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার। কিন্তু হেমন্তের এক সহাধ্যায়ী রোগের অন্য-কারণ নির্দেশ করায় তার উপরে শ্রদ্ধান্বিত হলেন : 'ডাক্তারিবিদ্যে কেবল শাস্ত্রগত নয়। কারও-কারও মধ্যে থাকে ওটার দুর্লভ দৈব সংস্কার। নীরদের দেখছি তাই।' ঊর্মিকে বললেন, 'আমি যেন শুনতে পাই, হেমন্ত আমাকে কেবলই ডাকছে, বলছে, "মানুষের রোগের কারণ দূর করো।" স্থির করেছি, তার নামে একটা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করব।···ওই হাসপাতাল হবে দেবত্র সম্পত্তি, তুই হবি সেবায়েত।···আমাদের হাসপাতালে তুই নীরদের সঙ্গিনী হয়ে কাজ করলেই কাজটা সম্পূর্ণ হবে, আর আমিও নিশ্চিন্ত হতে পারব।' একদা হেমন্তের সঙ্গে তিনি তর্ক করেছিলেন, বিবাহ-ব্যাপারটা শুধু ইচ্ছার দ্বারা নয়, অভিজ্ঞতার দ্বারা চালিত হওয়া দরকার—কিন্তু হেমন্তের উপরে গভীর স্নেহে তার ইচ্ছাই জয়ী হল। এমনকি, বনেদি বংশের মেয়ে ডাক্তারি করবে, এও তাঁর সৃষ্টিছাড়া বোধ হল না। আলোচনার জন্য তিনি বড়ো-জামাই শশাঙ্ককেও ডাকলেন—নিমন্ত্রণ-উপলক্ষে পরস্পরের আলাপ করাবার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল।

রাজেন্দ্র চক্রবর্তী ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। বিহারীর এক গরিব প্রতিবেশী। ছাপাখানায় বারো-টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করে রাজেন্দ্র চক্রবর্তী জীবিকা চালাত। তার আট-বছরের ছেলে বসন্তকে বিহারী মানুষ করতে চাইলে সে খুশি হয়ে তার হাতে দেয়।

রাধাগোবিন্দ ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। রাজারামবাবুর ম্যানেজার। তাঁর এক অনতিদূর-সম্পর্কের ভাই।

রাধু ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। জমিদার মুকুন্দলালের এক বেহারা।

রাধু ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের ছোটো-ভাই। কুমুদিনীর সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহকালে পাত্রপক্ষের ভোজের আয়োজনে লোক-সমাগম না-হওয়াতে রাধু বললে, 'দাদা, আর কেন ? চলো।···ফিরে যাই কলকাতায়। এরা-সব বদমাইশি করছে। এদের চেয়ে বড়ো-বড়ো ঘরের পাত্রী তোমার কড়ে-আঙুল নাড়ার অপেক্ষায় বসে। একবার তু-করলেই হয়।'

রানী (প্রতাপাদিত্যের)॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের মহিষী। উদয়াদিত্যের মা। রাজপরিবারে বিশ্বাস ছিল যে, প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায় এবং উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমাই উদয়াদিত্যের সর্বনাশের কারণ। প্রতাপাদিত্য প্রায়ই উদয়াদিত্যের অবাধ্যতায় তিরস্কার করতেন। রাজমহিষী ভীত হয়ে বলতেন, 'মহারাজ, তাহার কোনো দোষ নাই, এ-সমস্ত অনর্থের মূল ওই বড়োবউ।...যেদিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেইদিন হইতে উদয় কেমন-যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।' উদয়াদিত্যকে ডাকিয়ে তিনি বললেন, 'বাবা, বড়োবউ তোকে যা বলে তা শুনিস না।...ও তোকে কখনো ভালো পরামর্শ দেয় না, তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে।' সন্ধ্যাবেলায় স্বামীকে বললেন, 'আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম। বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোখ ফুটিয়াছে।'

জামাতা রামচন্দ্র রায় যশোহরে এলে মহিষী সাজাতে বসলেন মেয়েকে। তাকে আটগাছা করে মোটা চুড়ি আর একগাছি করে বৃহদাকার হীরের বালা পরিয়ে তাঁর বৃদ্ধা দাসীদের ডেকে দেখালেন—পরে বড়ো-আকারের একটি নথ পরিয়ে নিজের পছন্দমতো চুল বেঁধে দিলেন। বিভা গোপনে সুরমার কাছে নূতন করে চুল বেঁধে এল। মহিষী দেখলেন, সুরমা হিংসা করে তার চুল-বাঁধা খারাপ করে দিয়েছে। কাজেই সুরমার এই হীন-উদ্দেশ্যের সম্বন্ধে মেয়ের চোখ ফোটাবার চেষ্টা করলেন। জামাতা সহসা এক হঠকারিতায় প্রতাপাদিত্যের কোপে পড়ে উদয়াদিত্যের সহায়তায় সে-রাত্রেই পলাতক। উদয়াদিত্য সুরমার পরামর্শে চালিত—এই-অজুহাতে তাকে পিত্রালয়ে পাঠাবার আদেশ হল। মহিষী অশ্রুপাত করে বললেন, 'বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠানো যাক।...মহারাজা কখন কী-যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাও বলি বাছা...ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। তা ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক-না কেন, দেখা যাক। কী বল বাছা।' উদয়াদিত্যকে নিরুত্তর দেখে তিনি বুঝলেন, সুরমার বিচ্ছেদ তার পক্ষে দুঃসহ। অগত্যা সুরমার কাছ থেকে উদয়াদিত্যের মনটুকু ফিরিয়ে নিতে দাসীর সাহায্যে মঙ্গলা-নামে এক বিধবার একটি ওষুধ আনিয়ে বধূকে খাওয়ালেন। সেই ওষুধ খেয়ে সুরমার মৃত্যু হল। মহিষী ছুটে এসে বললেন, 'সুরমা মা আমার, তুই এখানেই থাক, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে ?...মা, তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে ?'

রাজদ্রোহের সন্দেহে উদয়াদিত্যের কারারোধে অবশেষে মহিষী ঝালাপালা হয়ে উঠলেন। অনতিপরে একটি পত্রে বিভাকে স্বামীত্যক্তা জেনে বললেন, 'মহারাজ, বিভার তো যাহা-হয় একটা-কিছু করিতে হইবে।...এই মনে করো যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।' প্রতাপাদিত্য অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতে

আবার তাড়াতাড়ি চোখ মুছে তাঁকে বলতে হল, 'তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্যসত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি সত্যসত্যই ত্যাগ করিলাম…তবে কথা এই, যদি কোনোদিন তাই লিখিয়া বসে।' উদয়াদিত্য ইতিমধ্যে বসন্ত রায়ের সঙ্গে পালিয়ে গেলে ভয়ে তিনি আরও অভিভূত হয়ে পড়লেন—মহারাজ না-জানি কী করেন। শেষে সংশয়ে আর থাকতে না-পেরে বললেন, 'মহারাজ, আমার একটা ভিক্ষা রাখো, এবার উদয়কে মাপ করো। বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব।'

বন্দী উদয়াদিত্য যশোহরে এসে চিরনির্বাসন গ্রহণ করলেন। মা বললেন, 'বাছা, এই-বয়সে তুই সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য-সংসার ত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি, তোকে সেখানে কে দেখিবে?'—বলে লুটিয়ে-লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রামকমল ন্যায়চঞ্চু ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। জনৈক ঘটক বনমালী ভট্টাচার্যের বাবা।

রামকৌল ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর এক ভৃত্য।

রামচন্দ্র রায় ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। ঐতিহাসিক চন্দ্রদ্বীপাধিপতি। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের জামাতা। রামচন্দ্র রায় যুদ্ধবিগ্রহের বড়ো-একটা ধার ধারতেন না। প্রত্যহ সভাকক্ষে বিদূষক রমাই ভাঁড়ের ঠাট্টাগুলির অবতারণা হত—রাজা থেকে দ্বারী পর্যন্ত সবাই হেসে অস্থির হত। রাজা ভাবতেন, রমাইয়ের কথায় না-হাসলে অরসিকতা প্রকাশ পায়। ছোটো-খাটো ব্যাপার-গুলিকেই তিনি যুদ্ধবিগ্রহের মতো বড়ো করে দেখতেন। একবার শ্বশুরালয়ের পরিহাসে তিনি বড়ো নাকাল হয়েছিলেন—সেই-কলঙ্কের কথা তাঁর মনে পড়ত। দ্বিতীয়বার যশোহরে নিমন্ত্রিত হয়ে ভাবলেন, রমাই ভাঁড়কে অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন এবং শাশুড়ির সঙ্গে বিদ্রূপ করাবেন—তবে তাঁর নাম রামচন্দ্র রায়।

কিন্তু যশোহরে পেঁাছে রামচন্দ্রের বড়ো অভিমান হল। আগে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য লোক আসত চর্কাদিহিতে, এবার অভ্যর্থনা হল দু-ক্রোশ পরে—দু-শো পঞ্চাশজনের বেশি লোকও ছিল না। এই-সমস্ত খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করে তাঁর মনে হল, প্রতাপাদিত্য তাঁকে অপমান করবারই বিস্তৃত আয়োজন করেছেন—প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্তি তিনি ধারণ করবেন, যাতে তাঁর মহিমা প্রকাশ পায়। রমাইকে অন্তঃপুরে এনেও তিনি শান্ত হতে পারলেন না; রাত্রে শয্যায় এসে গম্ভীর হয়ে রইলেন। প্রতাপাদিত্যকে তিনি অপমান করবেন কী করে? অর্ধরাত্রে সুপ্তোত্থিত রামচন্দ্রের মনে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বাসে বেদনার মোহাবেশ সঞ্চারিত হল—বিভার জ্যোৎস্নালোকিত মুখ, কাঁচ কিশলয়ের মতো

কম্পিত ওষ্ঠাধর এবং নিমীলিত নেত্রে জলের আভাস। বিভাকে কোলে নিয়ে তিনি অশ্রু মুছিয়ে দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়ল—রমাইকে অন্তঃপুরে আনার অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনে তিনি প্রাণভয়ে শিহরিত ঘর্মাক্ত। অবশেষে যুবরাজ উদয়াদিত্য ও নিজ অনুচর রামমোহনের সহায়তায় সে-রাত্রেই যশোহর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রক্ষা পেলেন।

অতঃপর চন্দ্রদ্বীপের রাজসভায় প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠ লক্ষ্যপূর্বক শব্দভেদী বাক্যবাণ বর্ষিত হতে লাগল। উদয়াদিত্যের সম্বন্ধেও রামচন্দ্র কৃতজ্ঞ ছিলেন না—মনে করতেন, তিনি বিপদে পড়লে সবাই তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না তো কী। দিনরাত্রি শত-শত স্তুতিবাদকের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে নিজেকে আর অন্যদিকে সমস্ত জগৎটিকে চাপিয়ে তিনি নিজেকেই ভারী বলে মনে করতেন। এদিকে তিনি ঠিক নিষ্ঠুর ছিলেন না—তিনি লঘুহৃদয় সংকীর্ণপ্রাণ লোক। যেখানে দশজনে মিলে হাসিতামাশা করছে, বিশেষত, রমাই ভাঁড় যাকে বিদ্রূপ করছে, তার প্রতিকূলে যাওয়া তাঁর কল্পনাতীত। বিভার সম্বন্ধে তাঁর একটা আসক্তির মতো ভাব ছিল—শৌখিন বিলাসের সম্বন্ধে যেন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার মতো। এমন সময়ে তিনি এক অনুচরের প্রস্তাবে চকিত : 'বল কী রামমোহন।...প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মানরক্ষা হইবে কী করিয়া।' পরে রামমোহনের আগ্রহাতিশয্যে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, তুমি মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু—দেখো, একথা যেন কেহ শুনিতে না পায়। রমাই কিংবা মন্ত্রীর কানে যেন এ-কথা না উঠে।' উদয়াদিত্যের স্ত্রী-বিয়োগের জন্য বিভা তখনি আসতে পারল না। রামচন্দ্র অগ্নিশর্মা হয়ে রামমোহনকে বললেন, 'তখন তোকে বারবার করিয়া বারণ করিলাম, তখন-যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি...এতবড়ো অপমান আমাদের বংশে আর-কখনও হয় নাই।' একে-তো প্রতিহিংসা তাঁর মনে ছিল, তার উপরে প্রতিহিংসা না নিলে প্রজারা কী মনে করবে, রমাই কী মনে করবে, এই চিন্তার ফলে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহের উদ্‌যোগ।

বিবাহের উৎসবের রাত্রে দীনবেশিনী বিভার আগমনে রামচন্দ্র শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন : 'কে তুই? ভিখারিনী?' রামমোহন পরিচয় দিতে তাঁর প্রাণের মধ্যে কেমন করে উঠল—কিন্তু ভাবলেন, মমতা দেখালে পাছে উপহাসাস্পদ হতে হয়। রমাই হঠাৎ পরিহাস করে রামমোহনের হাতে লাঞ্ছিত হল। রামচন্দ্র বললেন, 'রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদপি করিস।...কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না।'

রামদাস ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। জনৈক কবিরাজ।

রামদীন ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চন্দ্রমাধবের এক বেহারা।

রামদীন ॥ 'গোরা' উপন্যাস। পরেশবাবুর এক ভৃত্য।

রামমোহন মাল ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের এক অনুচর। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মতো—লম্বায় সাড়ে-চার হাত; মাংসপেশীতরঙ্গিত দেহ। রামচন্দ্রের শ্বশুরালয়-যাত্রায় সে গেল সর্দার হয়ে। যশোহরের অন্তঃপুরে এসে চন্দ্রদ্বীপের মহিষীকে প্রণাম করলে: 'মা, তোমায় একবার দেখিতে আসিলাম।...আমি মনে-মনে কহিলাম, মা না ডাকিলে আমি যাব না, দেখি কতদিনে মনে পড়ে। তা-কই, একবারও তো মনে পড়িল না।' বিভার কাছে চন্দ্রদ্বীপের গল্প আরম্ভ হল—বন্যায় তার ঘরখানি ভেসে গিয়েছিল, বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সাঁতার দিয়ে সে আশ্রয় নিয়েছিল মন্দিরের চূড়ায়। গল্প শেষ হতে বললে, 'মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ওই-হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।'

সন্ধ্যাবেলায় রামমোহন একপাশে বসে খাচ্ছিল। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলে, চন্দ্রদ্বীপের বিদূষক রমাই অন্তঃপুরে পরিহাসে লিপ্ত। মুহূর্তে তাকে আকাশে তুলে সে পাক দিতে লাগল—পরে বস্তার মতো ঝুলিয়ে তাকে নিয়ে গেল বাইরে। রাত্রে নিদ্রায় অচেতন রামমোহন যুবরাজের স্পর্শে জেগে উঠল। রমাইয়ের অপরাধে তার প্রভুর বধের আদেশ শুনে সে ক্রোধে স্ফীত হয়ে বললে, 'যুবরাজ, আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি এই লাঠি লইয়া এক-শ জন লোক ভাগাইতে পারি।' অন্তপুরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ থাকায় উদয়াদিত্যের সঙ্গে সে এল ছাদে। সেখান থেকে সত্তর হাত নিচে খালের মধ্যে ছিল নৌকা। রামচন্দ্রকে পিঠে নিয়ে সেই নৌকায় লাফিয়ে পড়ে তখনই সে রওনা হল চন্দ্রদ্বীপে।

চন্দ্রদ্বীপে আর রামমোহনের মন টিকল না—অন্তঃপুর শূন্য, মা-লক্ষ্মীকে দেখতে পায় না। বললে, 'মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ঠাকুরানীকে আনিতে যাই।' রামচন্দ্রের সম্মানহানির অজুহাত শুনে বললে, 'আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোনো অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য-লোক যাহা-ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মানরক্ষা হইতেছে?' যশোহরে এসে সে দেখলে, বিভার মুখ মলিন। বললে, 'কেন মা, তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন?...এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই।...তুমি হাসিমুখে আমাদের ঘরে এস।' কিন্তু যুবরাজকে বিপদের মধ্যে রেখে বিভা আসতে অক্ষম হল। রামমোহন অপরাধীর মতো চন্দ্রদ্বীপে ফিরে এসে আর চোখের জল রাখতে পারল না।

বিভা অবশেষে যেদিন চন্দ্রদ্বীপে এল সেদিন আর-এক বিবাহের উৎসব। নদীতীরে রামমোহনকে দেখে তখনই সে প্রাসাদে যেতে উৎসুক। তার হাসিমুখখানি রামমোহন অনেকক্ষণ চেয়ে-চেয়ে দেখলে: 'আজ সন্ধ্যা হইয়া গেছে—আজ থাক্ মা।' কিন্তু আত্মগোপন করা তার অভ্যাস ছিল না—সহসা কেঁদে উঠল: 'মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই, তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই।…যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা?…বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না।' বিভার আগ্রহে তবু তাকে নিয়ে গেল প্রাসাদে: 'মহারাজ, আপনার মহিষী—যশোহরের রাজকুমারী।' রমাই বিদ্রূপ করায় রামমোহন ঘাড় ধরে তাকে বের করে দিলে ঘর থেকে। কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'মহারাজ…তোমার মহিষীকে—আমার মা-ঠাকুরানীকে বেটা অপমান করিল…আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন।' বিভার সম্বন্ধে অবশেষে তার প্রভুর অপমানকর উক্তিতে জোড়হাত করে সে বললে, 'মহারাজ, আজ চারপুরুষ তোমার বংশে আমরা চাকরি করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মা-ঠাকরুনকে অপমান করিলে, তোমার রাজলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে, আজ আমিও তোমার চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম। আমার মা-ঠাকরুনের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও এ-রাজবাটীর ছায়া মাড়াইব না।'

রামরতনবাবু ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। জনৈক ডাক্তার। কুমারসভার সভ্যদের ডাক্তারিশিক্ষার সহায়ক।

রামলোচন বাঁড়ুজ্যে ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। যোগমায়ার বাবা। রামলোচন বাঁড়ুয্যে এ-দেশের ইংরেজি শিক্ষার প্রথম-যুগে স্কুল-কলেজের হাওয়ায় মানুষ। একই-সঙ্গে কলেজে-পড়া, একই-হোটেলে চপ-কাটলেট-খাওয়া পরমবন্ধুর ছেলে বরদাশংকরের সঙ্গে তিনি যোগমায়ার বিবাহ দিয়েছিলেন।

রামশরণ হালদার ॥ 'গোরা' উপন্যাস। সুচরিতার বাবা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামশরণ ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে পাড়ার লোকের অত্যাচারে আশ্রয় নিয়েছিলেন ঢাকায়। সেখানে পোস্টআপিসের কাজে নিযুক্ত-থাকাকালে ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব। আকস্মিকভাবে তাঁর যখন মৃত্যু হয়, টাকাকড়ি-সমস্ত তিনি ছেলে-মেয়েকে সমানভাবে দান করে পরেশবাবুকে উইলে ভার দিয়েছিলেন।

রামস্বরূপ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের এক বেহারা।

রামহরি ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। জনৈক মাতাল। একদিন রামহরি রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, 'বাবাসকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব।' স্থির না-করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির-করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

রামহরি ঠাকুর ॥ 'গোরা' উপন্যাস। কৃষ্ণদয়ালের গৃহদেবতার পুরোহিত।

রুক্মিণী (মঙ্গলা) ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যুবরাজ উদয়াদিত্যের মনোবাজ্যে অধিকারলোলুপ এক নীচপ্রকৃতির রমণী। রুক্মিণী একাকিনী বিধবা। প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্ত রায়ের রাজ্যের অধিবাসিনী। উদয়াদিত্যের বয়স তখন আঠারো—রুক্মিণীর একুশ। একদিন কী-কৌশলে ভুলিয়ে তাঁর ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে সে কলঙ্কলিপ্ত করে দিলে। যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পেতে সে যশোহররাজ্য শাসন করবার স্বপ্ন দেখতে লাগল। অবশেষে রায়গড় ছেড়ে মঙ্গলা-নামে যশোহরের প্রান্তে এসে আশ্রয় নিলে।

রুক্মিণী ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ—হাসিকান্না তার হাতধরা। তার হৃদয়ের কটাহে গলিত-লৌহের মতো ক্রোধ-ঈর্ষা সাপের মতো আক্রোশে আন্দোলিত। এদিকে লতাপাতা-শিকড় থেকে সে ওষুধ তৈরি করত—স্বামী-হারানো থেকে গরু-হারানোর ওষুধ। বশীকরণের এমন ওষুধ সে জানত যে, রাজবাড়ির বড়ো-বড়ো ভৃত্য তার কুটিরে গড়াগড়ি যেত। প্রতাপাদিত্য আর উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুরমার মরণোদ্দেশে সে নানারকম অনুষ্ঠান করত। প্রতিদিনই তার অধীরতা বেড়ে উঠত ; ভাবত, মন্ত্রতন্ত্র চুলোয় যাক, একবার হাতের কাছে পায় তো মনের সাধ মেটে। রাজপরিবারে সুরমা স্নেহবঞ্চিতা জেনে সে রাজ-বাড়ির দাসী মাতঙ্গিনীকে বললে, 'তোমাদের মা-ঠাকরুনকে বলিয়ো যে, বউ-ঠাকরুনকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁর উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।' পরে পাঁচদিন ধরে রাত-জেগে শিকড়-বেঁটে মন্ত্র-পড়ে সে বিষ প্রস্তুত করে দিলে ; শেষে সুরমার তাতেই মৃত্যু হল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঝড়ের মধ্যে রুক্মিণী প্রদীপ-হাতে উদয়াদিত্যের কক্ষে উপস্থিত। 'কেন-গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না ?…বলি, এখন-তো মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে ?'—বলতে-বলতে কেঁদে উঠল। 'আমি তোমার কী দোষ করিয়াছি…তুমিই-তো আমার সর্বনাশ করিয়াছ।…আমার আর-কিছু চাই না, আমার ভালোবাসা চাই।…কেন-গা, সুরমার চেয়ে কি এ-মুখ কালো ?'—বলে সে শয্যার কাছে এগিয়ে গেল। শেষে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যুবরাজের অঙ্গুরীয় প্রার্থনা করলে। কিছু নগদ টাকা সুদে খাটিয়ে রুক্মিণীর জীবিকা ; রূপ এবং রুপার প্রলোভনে

অনেকে তার বশ। রাজবাড়ির ভৃত্য সীতারামের সঙ্গে পরামর্শে উদয়াদিত্যকে রাজপদে বসাবার জন্য সেই-আংটির মোহরাঙ্কিত করে সে দিল্লীশ্বরের কাছে একটি দরখাস্ত পাঠালে। দরখাস্তটি প্রতাপাদিত্যের হাতে পড়ায় উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটল। তাতে সীতারামের দ্বারা তিরস্কৃত হয়ে রুক্মিণী রুখে উঠল: 'বটে। যুবরাজ তোমারই বটে।...জানিস-না যে সে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভালো করিতে পারি, আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস। দেখিব কেমন তাহা পারিস।'

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সীতারাম কারাগারের কাছে অগ্নিসংযোগ করে যুবরাজকে নৌকায় এনে তুলল। প্রহরীরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত, এমন সময়ে স্খলিতঅঞ্চলে এলায়িতকেশে ছুটে এল রুক্মিণী: 'পোড়ারমুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরি কর সে জ্ঞান নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয়-কাঁটা উপরে-কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল।' ক্রোধে অধীর হয়ে আগুনের শিখায় তার দু-চোখ পিশাচীর মতো জ্বলতে লাগল। নিষ্ফল আক্রোশে পাগলের মতো সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশে উদ্যত—প্রতিহত হয়ে ফিরে এসে ধাবিত হল উদয়াদিত্যের দিকে। কৃতকর্মের নিষ্ফলতায় মরণাহত বৃশ্চিকের মতো সীতারামকে এবং নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলের মধ্যে।

রুক্মিণীর দুরাশা ভেঙে পড়ল। তার তীক্ষ্ণ-শানিত হাসি, বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ, যৌবনের তরঙ্গউচ্ছ্বাস অন্তর্হিত হল। শেষে বলপূর্বক সে প্রতাপাদিত্যের সভায় এসে বললে, 'তোমার ওই প্রহরীদিগকে, সকলকে একে-একে ছয়-মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও, এই আমি দেখিতে চাই।... তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার সঙ্গে পলাইয়াছে।...বুড়া রাজা, সীতারাম আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া উহা করিয়াছে...আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব।' প্রতাপাদিত্যের সৈন্যদলের সঙ্গে সে এল রায়গড়ে। প্রাসাদের বাইরে উদয়াদিত্যকে দেখে বলে উঠল, 'আমাকে চিনিতে পার কি-গা। একবার এইদিকে তাকাও। একবার এইদিকে তাকাও।...এ-সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি।...এ-সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে? আমি আনিয়াছি। আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম, আর তুমি... ।' উদয়াদিত্য ঘৃণায় মুখ ফেরালেন।

রোশনি ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। নীরজার এক পুরনো আয়া। প্রৌঢ়া, কাঁচাপাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপর ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে, শুষ্ক মুখের ভাবে এক স্থায়ী কঠিনতা। নীরজাকে রোশনি শিশুকাল থেকে মানুষ করেছিল, সমস্ত দরদ তারই উপরে—নীরজার স্বামী আদিত্য পর্যন্ত সবার সম্বন্ধে তার সতর্ক বিরূপতা।

নীরজা অসুখে শয্যাশায়িনী হলে তার স্বগত উক্তির বাহন ছিল রোশনি। নীরজার সন্দেহ : সরলাকে নিয়ে বাগানে গিয়েছিলেন তার স্বামী। রোশনি মুখ বাঁকিয়ে উত্তর করত, 'ওঁকে না-নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে?… সেদিন নেই, এখন লুঠ চলছে দু-হাতে।…কলকাতার নতুন-বাজারে কটা ফুলই বা পেঁছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।' নীরজার প্রশ্ন : জামাইবাবুকে বলে না কেন। রোশনি বলত, 'আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো? তুমি বল না কেন। তোমারই তো সব।…কিন্তু তাও বলি খোঁকী, তোমার ওই হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।…জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়…এতটা আবদার ভালো নয় তাও বলি।' হলার কাজে ঔদাসীন্যই তার বিরক্তির একমাত্র কারণ নয়—নীরজার অসংগত স্নেহই তার কারণ। হলা এসে নীরজার কাছে তার স্ত্রীর জন্য ঢাকাই-শাড়ি দাবি করলে। রোশনির মুখ কঠিন হল : 'না, সে হবে না। ওকে তোমার লালপেড়ে কলের-কাপড়টা দেব। দেখ্ হলা, খোঁকীকে যদি এমনি জ্বালাতন করিস বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।' কিন্তু হলা তার পায়ে পড়ে কান্না জুড়ে দিতে অগত্যা বিরস মুখে তাকেই কাপড়টা ফেলে দিতে হল।

সরলা রাজনৈতিক-সভায় যোগ দিয়ে রমেনের সঙ্গে গেল জেলে। নীরজা তার খোঁজ করায় রোশনি বললে, 'জান-না, সরকার-বাহাদুর যে তাকে পুলি-পোলাও চালান দিয়েছে?…দরোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।…মহারানীর শিলমোহর থাকে যে-বাক্সয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা।…সেটা পেলেই-তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই-মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।' রমেনের প্রসঙ্গে বললে, 'সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাকে হরিণবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর।…বাড়ি থেকে যাবার সময় সরলা-দিদি তার জাফরানী রঙের দামী শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল।…চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই-শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো?…মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোরডাকাতের বাড়া। ছি ছি।…কিন্তু খোঁকী, দিদিমণির মনখানা দরাজ।'

লক্ষ্মীমণি ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার দাদা মহিমের স্ত্রী। দশ-বছরের মেয়ে শশিমুখীর বিবাহের জন্য লক্ষ্মীমণি অত্যন্ত চিন্তিত। তিনি ঠিক লাজুক ছিলেন না, অস্বাভাবিক রকমের গোপনচারিণী ছিলেন। তাঁর ঘরের দরজা প্রায়ই বন্ধ—স্বামী ছাড়া আর-সমস্তই তাঁর তালাচাবির মধ্যে। স্ত্রীর শাসনে মহিমের গতিবিধি অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট এবং সঞ্চরণক্ষেত্রের পরিধিও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। এমন ঘের-দিয়ে নেওয়ার স্বভাববশত লক্ষ্মীমণির জগৎটি তাঁর নিজের

আয়ত্তের মধ্যে ছিল ; সেখানে বাইরের লোকের ভিতরে এবং ভিতরের লোকের বাইরে যাতায়াতের পথ অবারিত ছিল না—এমনকি গোরাও তাঁর মহলে তেমন আমল পেত না। এই রাজ্যের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে কোনো দ্বৈধ ছিল না। সেখানে নিম্ন-আদালত থেকে আপিল-আদালত সমস্তই লক্ষ্মীমণি—একজিকুটিভ-জুডিশিয়ালে ভেদ ছিল না, লেজিসলেটিভও তার সঙ্গে জোড়া ছিল। বাহিরে মহিমকে খুব শক্ত লোক বলেই মনে হত ; কিন্তু লক্ষ্মীমণির এলাকার মধ্যে তাঁর ইচ্ছা খাটাবার কোনো পথ ছিল না।

গোরার আবাল্য-বন্ধু বিনয়কে লক্ষ্মীমণি আড়াল থেকে দেখেছিলেন এবং সেদিকে উদাসীন স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাকা করেই তাকে পাত্র স্থির করলেন। এই-প্রস্তাবের মস্ত-সুবিধার কথাও তিনি স্বামীর মনে মুদ্রিত করে দিলেন যে, বিনয় তাঁদের কাছ থেকে কোনো পণ দাবি করতে পারবে না।

লছমন সর্দার ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের এক অনুচর।

লছমনিয়া ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। শৈলজার শিশুকন্যা উমির দাই। কমলা গাজিপুর থেকে অন্তর্হিত হলে সে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, সবার এই-সন্দেহ। লছমনিয়া বললে, 'সেইজন্যই খুকী কাল রাত্রে অকারণে কান্না জুড়িয়া এমন একটা অদ্ভুত কাণ্ড করিল, উহাকে ভালো করিয়া ঝাড়াইয়া লওয়া দরকার।'

লছমিয়া ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার ছেলেবেলাকার এক খ্রীষ্টান ধাত্রী। গোরার একবার বসন্ত হলে সেবা করে লছমিয়া বাঁচিয়েছিল। বুড়ো-বয়সে গোরা তাকে জমিজমা-ঘরবাড়ি দিয়ে বিদায় করতে চাইত। লছমিয়া অন্য-কিছু চাইত না—শুধু গোরার কাছে থেকে তাকে দেখেই তার সুখ ছিল।

ললিতা ॥ 'গোরা' উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর মেজো-মেয়ে। দিদি লাবণ্যের চেয়ে ললিতা মাথায় লম্বা, রোগা, রং কালো—বেশি কথাবার্তা বলত না। সে আপনার নিয়মে চলত, ইচ্ছা হলে কড়া-কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারত। মা বরদাসুন্দরী তাকে মনে-মনে ভয় করতেন এবং পরেশবাবু এই খামখেয়ালী দুর্জয় মেয়েটিকে তাঁর অন্য-দুটি মেয়ের চেয়ে বেশিই স্নেহ করতেন। ললিতার মুখে তিনি যে-সৌন্দর্য দেখতেন তা রঙের কিংবা গড়নের নয়—তা তার অন্তরের গভীর সৌন্দর্য।

পরিবারে আশ্রিতা পিতৃবন্ধুর কন্যা সুচরিতাকে ললিতা তার ঈর্ষাপরায়ণ প্রণয়ের দ্বারা বেষ্টন করে থাকত। ব্রাহ্মসমাজের হারানবাবু সুচরিতার দিকে আকৃষ্ট হওয়াতে ললিতা তাকে দেখতে পারত না। পরে বিনয়ের সঙ্গে তার

আলাপ হলে তখনও স্বস্তি পেল না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে সুচরিতাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা দিদি, বিনয়বাবু লোকটি কিন্তু বেশ। না?' সুচরিতার উত্তরে তাকে বিশেষভাবে বিনয়ের পক্ষপাতী বোধ হল না। তর্কপ্রসঙ্গে বিনয় প্রায়ই তার বন্ধু গোরার উল্লেখ করত। ললিতা বললে, 'গোরা, গোরা, গোরা, দিনরাত্রি কেবল গোরা! ওঁর বন্ধু গোরা হয়তো খুব মস্ত লোক, বেশ-তো, ভালোই তো—কিন্তু উনিও তো মানুষ।···ওঁর বন্ধু ওঁকে এমনি ঢেকে ফেলেছেন যে উনি নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন না। যেন কাঁচপোকায় তেলাপোকাকে ধরেছে···গোরমোহনবাবুকে মেনে চলা ওঁর অভ্যাস হয়ে গেছে—সেটা দাসত্ব, সে ভালোবাসা নয়।···আমার ইচ্ছা করে ওঁর বন্ধুর বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওঁকে স্বাধীন করে দিতে।' এরপরে কথায়-কথায় বিনয়কে সে বাক্যবাণে বিদ্ধ করতে লাগল। ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলোর গৃহে নাটকের অভিনয়ে বরদাসুন্দরী বিনয়কেও সঙ্গে নিতে চাইলেন। ললিতা বললে, 'মা, তুমি অভিনয়ে বিনয়বাবুকে মিথ্যা ডাকছ। আগে ওঁর বন্ধুকে যদি রাজি করাতে পার তাহলে—'। অভিনয়ে ললিতার যে উৎসাহ ছিল তা নয়, বরঞ্চ এ-সমস্ত ব্যাপার সে ভালোইবাসত না—কিন্তু কোনোমতে গোরার মতের বিরুদ্ধে বিনয়কে স্বাধীন করে তোলার জন্য তার জিদ চেপে উঠল। ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে অভিনয়ে বিনয়ের কুণ্ঠা ছিল। ললিতা বললে, 'আপনার বন্ধু গৌরবাবু বোধহয় মনে করেন ম্যাজিস্ট্রেটের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলেই খুব একটা বীরত্ব হয়, ওতেই ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার ফল হয়।' কিন্তু বিনয় অভিনয়ে রাজি হতে তার উৎসাহ গেল চলে। সহজে সে কাঁদতে জানত না, তবু জল এল চোখ ফেটে—কেন সে বিনয়কে বারবার আঘাত করছিল নিজেই বুঝতে পারছিল না।

ললিতাদের আর-এক বন্ধু সুধীর লাবণ্যকে একটা ফুলের তোড়া দিয়েছিল। ললিতা ফুলগুলোকে আলাদা করে রেখে লাবণ্যকে বললে, 'তোড়ায় অনেকগুলো বাজে ফুলপাতার মধ্যে ভালো ফুলকে বাঁধা দেখলে আমার কষ্ট হয়, ওরকম দড়ি দিয়ে সব-জিনিসকে এক-শ্রেণীতে জোর করে বাঁধা বর্বরতা।' দুটি বিকচোন্মুখ বসোরা গোলাপ সে বিনয়কে পাঠালে সুচরিতার ভাই সতীশের বেনামিতে। ঠিক করেছিল, বিনয় এলে পরাজয় স্বীকার করে তাকে অভিনয়ে যোগ দিতে নিষেধ করবে—কিন্তু সতীশের নির্বুদ্ধিতায় তার অবস্থা হল বিপরীত। বিনয়ের আবৃত্তির রিহার্সালে চমৎকৃত হয়ে তার অবস্থা আরো অদ্ভুত হল। বিনয় তাদের কারও অপেক্ষা ন্যূন নয়—সে মনে-মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করবে। বিনয়ের সম্বন্ধে সে যে কী চায়, নিজেই বুঝতে পারল না। অবশেষে সে মাকে বললে, 'আমি এতে থাকব না।' ললিতা বাবাকে কখনো অমান্য করত না—তিনি যখন ডাকলেন সে রুদ্ধরোদনকণ্ঠে বললে, 'বাবা, আমি যে পারি নে। আমার হয় না।' পরেশবাবু বললেন, 'মা, যখন তুমি ভার নিয়েছ তখন তোমাকে তো সম্পন্ন করতেই হবে।···পারবে না মা?' ললিতা মুখ তুলে

বললে, 'পারব।' সুস্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ এবং ভাবপ্রকাশের নিঃসংশয় শক্তিতে সে বিনয়কেও অভিভূত করে দিলে। এতদিন তার তীব্রতার দ্বারা সে কেবলই আঘাত করে আসছিল—নিজের আবৃত্তি অনিন্দনীয় হয়েছে বুঝে সুগঠিত নৌকা ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেমন যায়, তেমনি সুন্দর করে সে কর্তব্যের দুরূহতার উপর দিয়ে চলতে লাগল।

অভিনয়ের আগে গোরা সেখানে এসে কোনো-অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে গেল জেলে। ললিতা অভিনয়ে অনিচ্ছুক হয়ে বললে, 'বিনয়বাবু, আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাছে ভারি অপরাধ করেছি; আপনি তখন যা বলেছিলেন আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।...বিনয়বাবু, আপনি কারও অনুরোধ রাখবেন না। আজ কোনোমতেই অভিনয় হতেই পারে না।' পাশের ঘরে সুচরিতার কাছে গিয়ে মুখের কাছে মুখ রেখে সে বললে, 'দিদি, আমরা এখান থেকে কলকাতায় ফিরে যাই।...দিদি, তুই পারবি?...আমার তো জিব ফেটে গিয়ে রক্ত পড়বে, তবু কথা বের হবে না।' একে-একে সবাইকে ব্যর্থ অনুনয় করে শেষে একটা চিঠি রেখে সে চলে এল স্টিমারে। সেখানে বিনয়কে দেখে বললে, 'আজকের নিমন্ত্রণে গিয়ে অভিনয় করার চেয়ে আত্মহত্যা করা আমার পক্ষে সহজ।...গৌরমোহনবাবুর প্রতি আমি মনে-মনে বড়ো অবিচার করেছিলুম।...আমি যদি দেখি কেউ কথায় বা ব্যবহারে জোর প্রকাশ করছে, সে আমি একেবারেই সইতে পারি নে। কিন্তু গৌরমোহনবাবুর জোর কেবল পরের উপরে নয়, সে তিনি নিজের উপরেও খাটান—এ সত্যিকার জোর—এ-রকম মানুষ আমি দেখি নি।' ছেলেবেলা থেকে ললিতা কখনো রাগ করে কখনো জিদ করে অভাবনীয় কাণ্ড বাধিয়ে তুলত—কিন্তু এবারের ব্যাপারটাই গুরুতর। স্টিমারে একা বিনয়ের সামনে কুণ্ঠা ও লজ্জায়, গোরার সম্বন্ধে অনুতাপে সে অনর্গল বকে যেতে লাগল। রাত্রে ক্যাবিনে নানা-চিন্তায় তার ঘুম হল না। রাত্রিশেষে দরজা খুলে অনতিদূরে বিনয়কে ডেকের উপর নিদ্রিত দেখে এক অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে তার হৃদয় কূলে-কূলে পূর্ণ হয়ে উঠল—দেখতে-দেখতে জলে ভরে উঠল দুটি চোখ। পিতার কাছে সে যে-দেবতার উপাসনা করতে শিখেছে, পরিপূর্ণ নক্ষত্রসভার অনাহত দিব্যসংগীতে সেই দেবতা যেন তাকে দক্ষিণহাতে স্পর্শ করলেন। কলকাতায় এসে ললিতার মনে আবার উলটো হাওয়া বইতে লাগল। পিতার কাছে কোনো-কিছু সে গোপন করতে পারত না—সমস্ত-জিনিসটা সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে উপস্থিত করবার জন্যই সে বিনয়কে অপরাধীর মতো বিদায় নিতে দিলে না। পরেশবাবু বাড়িতে না-থাকায় তখনি আবার বিরক্ত হয়ে বললে, 'আপনি দেরি করছেন কার জন্যে? বাবা কখন আসবেন তার ঠিক নেই। আপনি গৌরমোহনবাবুর মার কাছে একবার যাবেন না?'

পরেশবাবু বাড়িতে এলে ললিতা সজোরে বিনয়ের সঙ্গে তার আগমন-

বৃত্তান্ত প্রকাশ করলে। বললে, 'বাবা, আমি দোষ করেছি। কিন্তু এবার আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকের এমন সম্বন্ধ যে তাঁর আতিথ্যের মধ্যে কিছুই সম্মান নেই···আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল?' হারানবাবু এই হঠকারিতায় পরেশকেই দায়ী করায় বাবাকে সরিয়ে সে দৃঢ় হয়ে বসল: 'আপনি মনে করেন সকলকেই আপনার সব কথা বলবার অধিকার আছে।···আমাদের সম্বন্ধে বাবার কী কর্তব্য, আপনি মনে করেন, বাবার চেয়ে আপনি তা ভালো বোঝেন! সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের আপনিই হচ্ছেন হেডমাস্টার।···এতদিন আপনার শ্রেষ্ঠতা আমরা অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু আপনি যদি বাবার চেয়েও বড়ো হতে চান তাহলে এ-বাড়িতে আপনাকে কেউ সহ্য করতে পারবে না—আমাদের বেয়ারাটা পর্যন্ত না।' ললিতা প্রত্যহ আশা করত, বিনয় আসবে। প্রতিদিন ব্যর্থ-প্রত্যাশায় তার বুক ফেটে কান্না আসত। বিনয় হিন্দু, তাদের বিবাহ হতে পারে না—অথচ কোনোমতেই নিজের হৃদয়কে বশ মানাতে না-পেরে লজ্জায়-ভয়ে তার প্রাণ শুকিয়ে গেল। একদিন কৌশলে সতীশের কাছে বিনয়ের সংবাদ নিয়ে পরেশবাবুকে বলে সে গোরার মার কাছে এল। আনন্দময়ীর স্নেহে-করুণায়-শান্তিতে মণ্ডিত মুখখানি দেখে তার হৃদয়ের তাপ জুড়িয়ে গেল।

সুচরিতার মাসি হরিমোহিনী তাদের আশ্রয়ে এলেন। বরদাসুন্দরীর পীড়ন থেকে ললিতা তাঁকে আড়াল করে রাখতে লাগল। তাকে নিষেধ করবার শক্তি বরদাসুন্দরীর ছিল না। সুচরিতা অবশেষে মাসির সঙ্গে নিজের বাড়িতে গেলে ললিতা অব্যক্ত বেদনায় তাদের নূতন বাড়ি সাজিয়ে দিয়ে এল। এদিকে প্রতিদিন-প্রতিরাত্রি বিনয়ের চিন্তা তার মনকে অধিকার করছিল। সেই-পরাভবের গ্লানিতে সে অধীর হয়ে উঠল—মনে-মনে পণ করলে, কিছুতেই হার মানবে না। কেমন করে সে জীবন কাটাবে সে-সম্বন্ধে নানারকম কল্পনাও করছিল। য়ুরোপের লোকহিতৈষিণী রমণীদের জীবনচরিতে যে-কীর্তিকাহিনী সে বইয়ে পড়েছিল, তা নিজের পক্ষেও সম্ভবপর মনে করে সে কোনো মেয়ে-ইস্কুলে পড়াবার ভার নিতে চাইলে। কিন্তু তখনকার দিনে তেমন মেয়ে-স্কুল না-থাকায় নিজেই সুচরিতার বাড়িতে একটা ইস্কুল-স্থাপনের উদ্যোগ করলে। প্রথমে পাঁচ-ছয়টি ছাত্রী জুটল—কিন্তু দু-তিনদিনের মধ্যেই ক্লাস শূন্য হয়ে গেল। বিনয়ের সঙ্গে তার স্টিমার-যাত্রার বিবরণটুকু এদিকে ভিন্নভাবে পল্লবিত। সুচরিতা তা সহ্য করবার উপদেশ দিতে ললিতা বললে, 'সুচিদিদি, আমার অনেক সময় মনে হয়, সহ্য করার দ্বারা অন্যায়কে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়।···আমাদের মতো মেয়েমানুষের সঙ্গে এমন নীচভাবে যারা লেগেছে তারা নিজেদের যত বড়োলোক মনে করুক তারা কাপুরুষ। কিন্তু তাদের কাছে আমি কোনোমতেই হার মানব না—কোনোমতেই না'—বলে সে মাটিতে পদাঘাত করলে। এদিকে সেই-জনশ্রুতিতে উদ্বিগ্ন এক সখীকে সে লিখেছিল,

'এমন দুই-একটি হিন্দু-যুবককে জানি যাঁহাদের সঙ্গে বিবাহ যে-কোনো ব্রাহ্মকুমারীর পক্ষে গৌরবের বিষয়।' হারানবাবু সেই চিঠিখানা তার মার কাছে নিয়ে এল। ললিতা ঝড়ের মতো সেই ঘরে উপস্থিত: 'শৈলর সঙ্গে আপনার বুঝি এই-সম্বন্ধে চিঠিপত্র চলছে?…আমি আপনাকে বলছি বিনয়-বাবুর সঙ্গে বিবাহকে আমি কিছুমাত্র অসম্ভব বা অন্যায় বলে মনে করি নে।' হারানের প্রশ্ন: বিনয় কি ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নেবে? সে বললে, 'দীক্ষাগ্রহণ করতেই হবে এমনি-বা কী কথা আছে!…যেখানে আমি কোনো অন্যায়, কোনো অধর্ম দেখছি নে, সেখানে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে কেন স্পর্শ করবে, কেন বাধা দেবে?'

বিনয় ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাগ্রহণে সম্মত হলে সেই আসক্তিও হারানের পক্ষে ক্ষমার অযোগ্য হল। মুহূর্তে প্রদীপ্ত হয়ে ললিতা দাঁড়িয়ে উঠে বললে, 'না না…আপনি ক্ষমা করবেন না।…আপনার ক্ষমা বোধ হয় সকলের পক্ষে একেবারে অসহ্য হবে।' ব্রাহ্মসমাজে বিনয়ের আবেদনপত্রটি বরদার অলক্ষ্যে সে টুকরো-টুকরো করে রাখলে। পরদিন ললিতা আনন্দময়ীর কাছে এসে প্রণাম করলে। আনন্দময়ী দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করায় বললে, 'কেন তিনি দীক্ষা নিতে যাচ্ছেন? তার কি কোনো প্রয়োজন আছে?…মা, তোমার কাছে আমি কিছুই লজ্জা করব না…মানুষের ধর্ম-বিশ্বাস-সমাজ যাই থাক-না, সে-সমস্ত লোপ করে দিয়েই তবে মানুষের পরস্পরের সঙ্গে যোগ হবে, এ কখনোই হতে পারে না। তা-হলে তো হিন্দুতে-খৃষ্টানে বন্ধুত্বও হতে পারে না।' বিনয়কে বললে, 'আপনি যে হেঁট হইয়া নিজেকে খাটো করিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে আসিবেন এ-অগৌরব আমি সহ্য করিতে পারিব না। আপনি যেখানে আছেন সেইখানেই অবিচলিত হইয়া থাকিবেন এই আমি চাই।'

অতঃপর বিনয়ের সঙ্গে এসে ললিতা পরেশের পদতলে ভূমিষ্ঠ হল। সে জানত, বিবাহ হবে হিন্দুমতে—কিন্তু অন্য-সমাজের সঙ্গে তাদের প্রথার পার্থক্য কোনোদিন প্রত্যক্ষ করে নি। বিবাহে শালগ্রাম-শিলা রাখার প্রসঙ্গে সে সংকুচিত। অবশেষে বিবাহকালে শালগ্রাম-শিলা বর্জিত হল।

লাবণ্য ॥ 'গোরা' উপন্যাস। পরেশবাবুর বড়ো-মেয়ে। লাবণ্য মোটাসোটা, হাসিখুশি, লোকের সঙ্গ এবং গল্পগুজব ভালোবাসত।' মুখটি গোলগাল, চোখদুটি বড়ো, বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম। বেশভূষার ব্যাপারে সে স্বভাবতই কিছু ঢিলা—কাজেই তাকে তার মার শাসনে চলতে হত। উঁচু-গোড়ালির জুতো পরতে অসুবিধা বোধ করলেও না-পরে তার উপায় ছিল না। বিকেলে সাজ করবার সময় মা তার মুখে পাউডার এবং দুই গালে রঙ মাখিয়ে দিতেন। মোটা বলে বরদাসুন্দরী তার জামা এমনি আঁট করে তৈরি করতেন যে, তাকে চাপ-দেওয়া বস্তার মতো মনে হত।

পরুষবন্ধু সুধীরের সঙ্গে লাবণ্যের উপদ্রব-কলহাস্যের বিরাম ছিল না।

একটি খাতায় পরিপাটি করে সে ইংরেজ কবি মুর আর লংফেলোর কবিতা কপি করেছিল—কবিতাগুলির শিরোনাম এবং আরম্ভের অক্ষর রোমান ছাঁদে লেখা। নূতন আলাপী কেউ এলে লাবণ্য মার নির্দেশে সেই খাতা দেখাতে অভ্যস্ত ছিল—মার আদেশের জন্য যেন সে অপেক্ষা করে থাকত। মেজো-বোন ললিতা একটি স্কুল-স্থাপনে ইচ্ছুক হলে সে ছাত্রী-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হল। ছাদে-ছাদে বন্ধুত্ব-বিস্তারে সে ছিল উৎসাহী। চিরুনি-হস্তে কেশ-সংস্কারকালে তার অপরাহ্ণ-সভা বসত—প্রতিবেশীদের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রধান-অপ্রধান অনেক বিষয়ই দূর থেকে বায়ুযোগে আলোচিত হত। ছাদে-ছাদে স্কুলের প্রস্তাব ঘোষিত হল। কিন্তু অবশেষে হারানের শত্রুতায় লাবণ্য ছাদে উঠে নবীনাদের পরিবর্তে প্রবীণাদের সম্ভাষণে মর্মাহত হল।

লবণ্যলতা ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যের 'তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ব ফলের মতো রমণীয়।' 'পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো।...জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকী কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।' তার গলার স্বর উৎস-জলের উচ্ছলতার মতো নিটোল—অল্পবয়সের বালকের মতো মসৃণ ও প্রশস্ত।

বাবা অবনীশ কলেজের অধ্যক্ষ। তাঁরই চেষ্টায় মাতৃহীন লাবণ্যের মনে স্বামিসেবা-আবাদের যোগ্য জমিটুকু গণিতে-ইতিহাসে সিমেণ্ট করে গাঁথা। তাঁর প্রিয় ছাত্র শোভনলালের অতিসংকোচবশত লাবণ্য তার চেয়ে নিজেকে বড়ো করে দেখতেই অভ্যস্ত ছিল। তার বিশ্বাস, শোভনের প্রতি অবনীশের বিশেষ সাহায্যেই বি. এ. পরীক্ষায় উভয়ের ফলবৈষম্য। ইতিমধ্যে লাবণ্যের প্রতি শোভনের হৃদয়াবেগ আবিষ্কার করে শোভনের পিতা ক্ষুব্ধ হওয়াতে তার যাতায়াত বন্ধ হল। এম. এ. পরীক্ষায় শোভনের ইচ্ছাতেই লাবণ্য হল প্রথম। অতঃপর অবনীশের আহ্বানে শোভন তাঁর লাইব্রেরীতে কাজ করতে এলে লাবণ্য অগ্নিমূর্তি হয়ে বললে, 'আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই?' শোভন-লালকে বরদান করবার জন্যই লাবণ্য বুঝি অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভন তেমন করে ডাক দিলে না—তাই তার প্রতিহত ভালোবাসাই অন্ধবিদ্বেষে পরিণত হল। শেষবয়সে এক বিধবার প্রতি পিতার ভালোবাসা লক্ষ করে তার মনে হল, শোভনের সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে তিনি বুঝি নিষ্কৃতি চান। তাই বারবার জিদ করে তাঁর বিবাহ ঘটিয়ে সে নিজে স্বাধীনভাবে উপার্জনের

সংকল্প করলে। মর্মাহত অবনীশকে বললে, 'আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। যে-পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই-পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।' কাজও জুটে গেল—বিধবা যোগমায়ার মেয়ে সুরমার গৃহশিক্ষয়িত্রী রূপে তাঁদেরই আশ্রয়ে তার স্থান হল।

প্রতিদিনের বাঁধা-কাজে লাবণ্যের জীবন ছিল সরল। উদ্বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি-সাহিত্যে, হালের বার্নার্ড-শ'র আমল পর্যন্ত—বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। সহসা ব্যাঘাত এসে পড়ল। গরমের সময় তারা ছিল শিলঙে। একদা যোগমায়ার গাড়িতে বন্ধুর খোঁজে বেরিয়ে সংঘাত ঘটল অমিতের গাড়ির সঙ্গে। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোকে লাবণ্যের জীবন থেকে গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা খসে পড়ল; অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড়-বর্তমান তাকে নাড়া দিয়ে বললে—'জাগো'। মুহূর্তে জেগে উঠে সে নিজেকে বাস্তবরূপে দেখতে পেল—জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে। অমিত অনেক সুন্দরীকে দেখেছিল—'তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমা রাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি।···লাবণ্যের মুখে ও এমন-একটা শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।'

লাবণ্যের যোগে যোগমায়ার গৃহে অমিতের গতি অবারিত হল। লাবণ্য কিন্তু মনে না-করে পারল না, অমিতের মনের গড়নটা সাহিত্যিক; প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় তার মুখে উচ্ছ্বাস তোলে—তাই তাকে অমিতের প্রয়োজন। একদিন সকালের রৌদ্রে লাবণ্য য়ুক্যালিপটস্ গাছে হেলান দিয়ে বসে ছিল। অমিত এসে জানালে, বিবাহে যোগমায়ার সম্মতি আছে। লাবণ্য বললে, 'আমার ভয় হয় মিতা।···এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।···মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ-চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না।···মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না।···তুমি তো সংসার-ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের, সাহিত্যে-সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ।··· বিয়েটাকে তুমি মনে-মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার।···মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁক যেন না-দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব

নিয়ো না।···আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্নকে অমর করিবার জন্যে এই-মৃত্যুর দরকার ছিল।' অমিত উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে কবি বলে অভিহিত করলে। লাবণ্য বললে, 'আমি চাই নে কবি হতে।··· জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না।···আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজ করবার জন্যেই।'

লাবণ্য বুদ্ধির আলোকে সমস্তই জানতে চাইত—মানুষ যেখানে স্বভাবতই আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে সেখানেও সে নিজেকে ভোলাতে পারত না। একদিন রাত্রে যোগমায়া দেখলেন তার কান্না। কিন্তু বিবাহ-সম্পর্কে তার মত জিজ্ঞাসা করায় বললে, 'ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।···ভালোবাসার ট্র্যাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি···বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তামা, খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক-খানিক বাদ দিয়ে-দিয়ে বেছে-বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে···আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়।···যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব।'

সেদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণে বন-বনান্তরের মাতামাতি। দুপুরবেলা লাবণ্যের মনের ইচ্ছা অশান্ত হয়ে উঠল—সব-বাধা সব-দ্বিধা ফেলে যেন অমিতের দু-হাত চেপে বলে ওঠে, 'জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার।' আমি ভালোবাসি—এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখিটির মতো যেন তার জীবনে এসে স্পর্শ করলে। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে সে বললে: সত্য, সত্য, এত সত্য আর-কিছু নয়। কিন্তু মনের কথাটি বলবার লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে গেল—তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত মাভৈঃ রব আকাশে গেল মিলিয়ে। যোগমায়া অমিতের দুর্দশা দেখে তার হৃদয়হীনতার অভিযোগ করলেন। লাবণ্য বললে, 'আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা? আমি-তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে, ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি।···আমার মধ্যে এ-যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব।' যোগমায়া তাকে অমিতের বাসায় নিয়ে এলেন; লাবণ্য সূর্যমুখী ফুল দিয়ে অমিতের পায়ে প্রণাম করলে—অমিত দিলে তাকে আংটি পরিয়ে। বিবাহের সংকল্প কলকাতায় ফিরে—উভয়ে বিবাহোত্তর দাম্পত্য-দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী রচনায় বিহ্বল। অবশেষে শিলঙ-পাহাড়কে শেষপ্রণাম জানাতে গিয়ে

অমিতের বুকের মধ্যে লাবণ্যের নিমীলিত চক্ষুতে অশ্রু বইল—এই শুভদৃষ্টির পরে কি কোথাও বাসরঘর আছে? তার বুকের ভিতর আনন্দ—সেইসঙ্গে একটা কান্নার স্তব্ধতা। অমিতের অনুরোধে নিজের শেষকথাটি সে একটি কবিতায় বললে: 'তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি / রজনীর শুভ্র অবসানে।' রবি ঠাকুরের এই অপ্রকাশিত কবিতাটি ছিল শোভনলালের ডেস্কের মধ্যে—পূর্ণ মিলনের লগ্নে সেই কবিতাটিই তার মনে পড়ল।

কিন্তু সমস্ত বিপর্যস্ত হয়ে গেল কেটি মিত্তিরের আবির্ভাবে। অক্স্‌ফোর্ডে একদিন অমিত কেটি মিত্তিরের হাতে হীরের আংটি পরিয়ে দিয়েছিল—তারই দাবি নিয়ে সে লাবণ্যের সামনে উপস্থিত। দৈবচক্রে শোভনলালও তখন শিলঙ-পাহাড়ে উপনীত—তার একটা চিঠি পেয়ে লাবণ্যর চোখে জল এল। সেদিন তার ছিল জ্ঞানের গর্ব, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ—'ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে-মনে ধিক্কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল।···মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত-ব্যথিত মূর্তি। তারপরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত-ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল। আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।' চিঠির উত্তরে সে লিখলে, 'তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ-বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে, চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।' সেদিনই অমিতের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে লাবণ্য তার হাতে হাত রেখে বললে, 'একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর-কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা-নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো-চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন; বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।' অমিতের আঙুলে আংটি ফিরিয়ে দিয়ে তার দিকে সে অন্তরশ্মি-উদ্ভাসিত মুখখানি তুলে ধরলে।

শিলঙ-পর্বের এইখানেই সমাপ্তি। কিছুকাল পরে কেটির সঙ্গে অমিতের বিবাহের সংবাদে লাবণ্য শোভনলালের সঙ্গে নিজের বিবাহের কথা প্রকাশ করলে। বিবাহ জ্যৈষ্ঠমাসে—রামগড় পর্বতে। চিঠির অপর-পাতে ছিল কবিতা, অমিতের উদ্দেশে লাবণ্যের 'শেষের কবিতা'—'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। / তারি রথ নিত্যই উধাও···ওগো বন্ধু, / সেই ধাবমান কাল / জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল···মোর লাগি করিয়ো না শোক, / আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।···শুক্লপক্ষ হতে আনি / রজনীগন্ধার বৃন্তখানি / যে পারে সাজাতে / অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ-রাতে, / যে আমারে

দেখিবারে পায় / অসীম ক্ষমায় / ভালো-মন্দ মিলায়ে সকলি, / এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।...ওগো তুমি নিরুপম, / হে ঐশ্বর্যবান, / তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান— / গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়। / হে বন্ধু, বিদায়।'

লিলি গাঙ্গুলি ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিত রায়ের বন্ধুনিদের অন্যতমা। একদিন পিকনিকে চাঁদের আলোয় অমিত তাকে মৃদুস্বরে বললে, 'গঙ্গার ওপারে ওই নতুন চাঁদ আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।' লিলি গাঙ্গুলির মন মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠেছিল—কিন্তু জানত, অমিত সোনার-রঙের দিগন্তরেখা; এই কথাটুকুর মধ্যে সত্যতা দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকেই দাবি করা হয়। তাই হেসে বললে, 'অমিট...এইমাত্র যে-ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল, এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।'

অমিত বললে, 'কিন্তু তোমাতে-আমাতে-চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে; সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক-প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।' লিলি বললে, 'ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।' অমিত বলতে লাগল, 'কিন্তু, লিলি, কোটি-কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে-আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই-জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে-উঠে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।' লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করলে: 'তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত-মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।'—বলে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে সখীদের সঙ্গে যোগ দিলে।

লিসি ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিত রায়ের ছোটোবোন। লিসি আর তার বড়োবোন সিসি 'যেন নতুন-বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচুখুরওআলা জুতো, লেসওআলা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে-

অ্যাম্বারে-মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপটানো।··· খুটখুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে-স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপী রেশমের পাখা ক্ষণে-ক্ষণে গালের কাছে ফুরফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই-পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।'

গরমের সময়ে অমিত গেল শিলঙ-পাহাড়ে। সিসি-লিসি মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।' বাঁ-হাতে হাল-কায়দায় বেঁটে ছাতা, ডান-হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল-পারসিক-শালের ক্লোক—তারা গেল দার্জিলিঙে। লিসির বাহন কুমার মুখুজ্যে—অমিত তার নাম দিয়েছিল ধূমকেতু মুখো। এই ধূমকেতুর পুচ্ছতাড়নায় লিসি ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত ছিল।

লীলা ॥ 'গোরা' উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর ছোটোমেয়ে। বয়স বছর-দশেক—দৌড়-ঝাঁপ-উপদ্রবে মজবুত। পরেশের বন্ধুপুত্র সতীশের সঙ্গে লীলার ঠেলাঠেলি-মারিমারি চলত। বিশেষত খুদে-নামধারী কুকুরটির স্বত্বাধিকার নিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনো মীমাংসা হয় নি। কুকুরের নিজের মত নিলে সতীশের প্রতিই তার পক্ষপাত দেখা যেত—লীলার আদরের বেগ সংবরণ করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। লীলার মা বরদাসুন্দরী বাইরের লোকের কাছে তাঁর মেয়েদের গুণের পরিচয় দিতেন। লীলা প্রথমে খুব-খানিকটা হেসে নিত, পরে কলটেপা আর্গিনের মতো অর্থ না-বুঝে এক-নিঃশ্বাসে আবৃত্তি করত: 'Twinkle, twinkle little star···' ইত্যাদি।

লীলানন্দ স্বামী ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশের গুরুজি। চট্টগ্রামের কাছে এক শিষ্যবাড়িতে লীলানন্দ স্বামী গানে-কীর্তনে মগ্ন ছিলেন—সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য। শচীশের খোঁজে শ্রীবিলাস সেখানে উপস্থিত হলে গুরুজি তার পরিচয় পেয়ে খুশি হলেন। শ্রীবিলাস নত হয়ে প্রণাম করলে-না দেখে শচীশকে তামাক সেজে আনতে হুকুম করে বললেন, 'বাবা, ডুবুরি মুক্তা তুলিতে সমুদ্রের তলায় গিয়া পৌঁছায়, কিন্তু সেখানেই যদি টিকিয়া যায় তবে রক্ষা নাই—মুক্তির জন্য তাকে উপরে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িতে হয়। বাঁচিতে চাও যদি বাপু, তবে এবার বিদ্যা-সমুদ্রের তলা হইতে ডাঙার উপরে উঠিতে হইবে। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের বৃত্তি তো পাইয়াছ, এবার প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের নিবৃত্তিটা একবার দেখো।' শ্রীবিলাসকে দেখাবার জন্যই তিনি শচীশের দিকে পা ছড়িয়ে দিলেন।

শচীশ-শ্রীবিলাস—এ-দুই নামজাদা ইংরেজিওয়ালাকে দলে জুটিয়ে লীলানন্দ স্বামীর নাম রটে গেল। কলকাতাবাসী ভক্তদের অনুরোধে স্বামীজি এসে উঠলেন তাঁর মুত শিষ্য শিবতোষের বাড়িতে। দিনরাত্রি রস এবং রসতত্ত্বের

আলোচনা চলল। শিবতোষের বিধবা-স্ত্রী দামিনীকে তিনি উপদেশ দিতে ডাকতেন—সে নানা-উপলক্ষে পাশ কাটিয়ে যেত। স্বামীজি হেসে বলতেন, 'যার জোর আছে ভগবান তারই সঙ্গে লড়াই করিতে ভালোবাসেন। একদিন এ যখন হার মানিবে তখন এর মুখে আর কথা থাকিবে না।' অগত্যা দামিনীকে তিনি বেশি করে ক্ষমা করতে লাগলেন। দামিনীর সঙ্গে ব্যবহারে তিনি যে অধিক মাধুর্য প্রকাশ করতেন, একদিন তার নকল করে তাকে হাসতে দেখে বললেন, 'যা অঘটন তা ঘটিবে এবং সেইটে দেখাইবার জন্যই দামিনী বিধাতার উপলক্ষ হইয়া আছে—ও-বেচারার দোষ নাই।' ক্রমে দামিনীর রূপান্তর হল শচীশের টানে। স্বামীজি এই-নিষ্ঠায় খুশি হয়ে ভাবলেন, 'এ-কী অলৌকিক কাণ্ড! ভগবানের রসের রসায়নে পাথরকেও নবনী করিয়া তোলে।'

সেবার বাধ্য হয়েই গুরুজিকে পর্যটনের পথে দামিনীকে সঙ্গে নিতে হল। কিন্তু হ্লাদিনী-যোগমায়া থেকে শচীশকে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে আবার তার মেজাজের পরিবর্তন ঘটল। গুরুজি ভয়ে-ভয়ে গান-কীর্তনে মন দিলেন। ভাবলেন, মিষ্ট-গন্ধে উড়ো-ভ্রমরটা আপনি এসে মধুকোষের উপর বসবে। একান্তই যখন তার মন পাওয়া গেল না, তখন হেসে বললেন, 'ভগবান শিকার করিতে বাহির হইয়াছেন, হরিণী পালাইয়া এই-শিকারের রস আরও জমাইয়া তুলিতেছে; কিন্তু মরিতেই হইবে।' একদিন সাহস করে তিনি মৃদুমধুর সুরে বললেন, 'দামিনী, আজ বিকালের দিকে তোমার কি সময় হইবে?' তখন দামিনী নন্দীদের বাড়ি নাড়ু কুটতে চলে গেল। আর-একদিন সন্ধ্যাবেলায় বিশেষভাবে একটা বড়োরকমের কথা পেড়েও সুবিধা করতে পারলেন না।

একদিন গুরুজির পা টিপতে-টিপতে শচীশের নালিশ: দামিনীকে দলের মধ্যে রাখা অনুচিত। স্বামীজি দামিনীকে নিয়ে অনেক ভুগেছিলেন—এই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর ভক্তদলের মধ্যে ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু কোথায় তাকে সরাবেন ভেবে পেলেন না। শচীশ এবং শ্রীবিলাস তাঁর দলের ঐরাবত আর উচ্চৈঃশ্রবা—তাদেরও ছাড়তে পারেন না। অগত্যা দামিনীকে বললেন, 'মা দামিনী, এবার কিছু দূরে ও দুর্গম জায়গায় যাইব। এখান হইতেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।' আবেদন নিষ্ফল হলে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল: 'মধুসূদন!'

অবশেষে গুরুজির এক ভক্তের ভ্রষ্টাচারের সংবাদে তাঁর প্রধান দুই শিষ্যের সঙ্গে দামিনীও দল ছেড়ে চলে গেল।

লোকটি ॥ 'গোরা' উপন্যাস। জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান। মাথায় এক-ঝাঁকা ফল-সবজি-আণ্ডা-রুটি নিয়ে লোকটি ইংরেজ-প্রভুর পাকশালার অভিমুখে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা জুড়িগাড়ির সামনে পড়ে জিনিসগুলো তো ছড়িয়ে পড়লই, তার মুখে পড়ল চাবুকের মার। বৃদ্ধ 'আল্লা' বলে নিঃশ্বাস ফেলে জিনিসগুলো বেছে ঝাঁকায় তুলতে প্রবৃত্ত হল। গোরা সেই বিকীর্ণ জিনিসগুলো

কুড়িয়ে দিতে আরম্ভ করায় সে ভদ্র-পথিকের এই-ব্যবহারে নিতান্ত সংকুচিত। গোরা বললে: এই-অপমান সহ্য করায় আল্লা তাকে মাপ করবেন না। সে বললে, 'যে দোষী আল্লা তাকেই শাস্তি দেবেন, আমাকে কেন দেবেন।'

শচীশ মল্লিক ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশকে দেখলে মনে হয় যেন জ্যোতিষ্ক—দুই চোখ ভাস্বর; তার লম্বা-সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; গায়ের রং যেন রং নয়, আভা। তাকে দেখলেই যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখতে পাওয়া যায়—তার ভিতরকার সত্যপুরুষটি যেন স্থূলতা ভেদ করে দীপ্যমান। বি. এ. ক্লাসে সে ছিল পজিটিভিস্ট উইল্‌কিন্‌সের প্রিয় ছাত্র। তাই মেসের ছেলেরা তার সম্বন্ধে নিন্দা রটাত। সহাধ্যায়ী শ্রীবিলাস সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় বলে, 'যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়। তাই যদি হইল, তবে কোনো-একটা নিন্দা যে সত্য নয় তাহা প্রমাণ করিবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিয়া লাভ কী?' তার বাবা হরিমোহন তেত্রিশকোটিতে বিশ্বাসী—আর তার জ্যাঠা জগমোহন ইংরেজি ভাষা ও নাস্তিকতায় অসামান্য। বাল্যকাল থেকে শচীশ তার জ্যাঠার অধিকারে—জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে চেহারাতেও তার আশ্চর্য মিল।

অল্পবয়সেই শচীশ ইংরেজিতে পাকা হয়ে মিল-বেন্থামের অগ্নিতে নাস্তিকতার মশালের মতো জ্বলতে লাগল। পাড়ার মুসলমান আর চামারদের নিয়ে ঘনিষ্ঠ হিতানুষ্ঠানে তার লোকনিন্দার ভয় ছিল না। অবশেষে মত ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে দেবত্র-সম্পত্তির মকদ্দমায় হরিমোহন পৃথক হলেন। শচীশ রয়ে গেল জ্যাঠার কাছে। হরিমোহনের কুৎসায় জগমোহন তাকে বিদায় জানালেন। শচীশ বুঝলে, তার উপরে কথা চলবে না। আঠারো-বছরের আজন্ম-সংস্রব থেকে বিদায় নিয়ে সে বাপের কাছে গেল না—এক বন্ধুর মেসে উঠে টিউইশানি নিলে। এমন সময়ে তার দাদা পুরন্দর-কর্তৃক অপমানিতা গর্ভিণী বালবিধবা ননিবালাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল সে জ্যাঠার কাছে। কলকাতা শহরে পুরন্দরের উৎপাত থেকে তাকে রক্ষার আর-কোনো উপায় ছিল না। তবুও মেয়েটিকে রক্ষার উপায় না-দেখে অগত্যা তাকে সিভিল মতে বিবাহে উদ্যত হল। কিন্তু শেষ-মুহূর্তে আত্মহত্যা করে মেয়েটিই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে গেল। কলকাতায় প্লেগের সময়ে সেখানে জগমোহনের সঙ্গে শচীশও ছিল শুশ্রূষাব্রতী। জগমোহন সে-রোগেই প্রাণ হারালেন। জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়ে শচীশ আপনার যা-কিছু পেয়েছিল। বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় সে বুঝতে চেষ্টা করলে যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হতে পারে না; সত্য নেই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নেই—একভাবে যা 'না' আর-একভাবে তা যদি 'হাঁ' না-হয়, তবে সেই-ছিদ্র দিয়ে সমস্ত জগৎ গলে ফুরিয়ে যাবে।

দু-বছর শচীশ দেশে-দেশে ফিরল। শেষে লীলানন্দ স্বামীর কাছে

মন্ত্র নিয়ে গ্রামে-গ্রামে কীর্তনে মেতে বেড়াতে লাগল। বন্ধুদের সমালোচনায় শ্রীবিলাস চট্টগ্রামে এসে তাকে ভর্ৎসনা করায় বললে, ‘বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো-ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো-ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। দিনের বেলাকার সে-মুক্তি তো ভোগ করিয়াছি, এখন রাতের বেলাকার এ-মুক্তিই বা ছাড়ি কেন? এ-দুটো ব্যাপারই সেই আমার এক-জ্যাঠামশায়েরই কাণ্ড এ-তুমি নিশ্চয়ই জানিয়ো।’ এদিকে তার গুরুর পা-টেপা তামাকসাজার বিরাম ছিল না। তাই বললে, ‘কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পাকে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ-যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা। তাই-তো গুরু আমাকে এমন করিয়া চারিদিক হইতে সেবার মধ্যে আটকাইয়া ধরিয়াছেন; আমি পা-টিপিয়া পার হইতেছি।···তাঁর সেবার দরকার নাই বলিয়াই এমন করিয়া পা-বাড়াইয়া দিতে পারেন, যদি দরকার থাকিত তবে লজ্জা পাইতেন। দরকার যে আমারই।’ অনতিপরে গুরুজির সঙ্গে তারা এল কলকাতায় শিবতোষের বাড়ি। শিবতোষের বিধবা দামিনী গুরুজির ধার দিয়ে যেত না। শচীশ তার ডায়েরিতে লিখেছিল, ‘ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি—অপবিত্রের কলঙ্ক যে-নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে-নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে-নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে-নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবনরসের রসিক।···সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।’

কিন্তু শচীশের প্রতি গোপন অনুরাগে দামিনীর সেবার মাধুর্য বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। শচীশ সেই স্থির-সৌদামিনীর শোভাই দেখলে—দামিনীকে নয়। সেবার দামিনীর আগ্রহে তাকে নিয়েই দুর্গম পথে যেতে হল। একটা অন্তরীপের কাছে পাহাড়ের কোলে অনেককালের পুরানো গুহা। রাত্রে সেই গুহার মধ্যে ভূমিশয্যায় দামিনীর আত্মনিবেদন ব্যর্থ হল। শচীশ লিখেছিল, ‘সেই-গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো—তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে।···সে-যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম-জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত-একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্তকাল এই-গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই—সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে—সে নিঃশব্দে কাঁদে।···মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে···কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প-অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে···এক-সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। ভয়ে আমার

১

মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রধানত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই মণিকোঠায়, যেখানে বীণায় সোনার একটি তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে সর্ব দেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।

শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত।

বড়ো বড়ো শান্ত চোখ, জলভরা মেঘের মতো নধর দেহটি স্নিগ্ধ শ্যামল; সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের রেখা, দুই হাতে মকরমুখো সোনার মোটা বালা, তার ভাষা শোভার ভাষা নয়, শুভ কামনার ভাষা।

স্বামীর চিত্তপ্রাঙ্গণে এমন প্রান্ত [illegible] নেই যা তার [illegible] নেই। স্বামী অসাবধান [illegible] নিজের ক্ষতি করাই অতি [illegible] অথচ [illegible] থেকেই [illegible] হয়ে ওঠে। স্বামীর [illegible] শর্মিলা [illegible] বলে, আর পারিনে, [illegible] তোমার কি [illegible] শিক্ষা হবে না [illegible] যদি শিক্ষা হোত তবে শর্মিলার [illegible] [illegible]

শরীর হিম হইয়া গেল।...তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো-একটা বুনো জন্তু। কিন্তু...এর রোঁয়া নাই।...সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ। ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল।...মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে...আমি পা ছুঁড়িয়া-ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।...হঠাৎ অনুভব করিলাম, আমার পায়ের উপর একরাশি কেশর আসিয়া পড়িয়াছে। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে কে চলিয়া গেল। একটা কী যেন শব্দ শুনিলাম। সে কি চাপা কান্না?'

গ্রামের মধ্যে এসে দামিনীর মেজাজ এলোমেলো বইতে দেখে শচীশ তাকে গুরুর কাছে টানতে চেয়ে ব্যর্থ হল। পরে শ্রীবিলাসের প্রতি তার পক্ষপাতিত্বে কিছুকাল জোরের সঙ্গে করতাল বাজিয়ে নেচে বেড়াল। শ্রীবিলাসকে বললে, 'দামিনীকে আমাদের মধ্যে রাখা চলিবে না।...প্রকৃতির সংসর্গ আমাদের একেবারে ছাড়িতে হইবে।...প্রকৃতির মায়া দেখিতে পাইতেছ না, কেননা সেই মায়ার ফাঁদে আপনাকে জড়াইয়াছ।...তোমরা গুরু মান না বলিয়াই জান না যে, গুরুই আমাদের...হাল।'—বলে গুরুর ঘরে গিয়ে সে প্রকৃতির নামে নালিশ রুজু করলে। কিন্তু ঘন-ঘন গুরুর পা-টিপে তামাক-সেজে কিছুতেই ভুলতে পারল না যে, প্রকৃতি তার সাধনার পথে দিব্য আড্ডা গেড়ে বসেছে। দামিনীকে অন্য-কোথাও পাঠানোর চেষ্টা করেও সে ব্যর্থ হল। তখন জপে-তপে-অর্চনায় বাইরের দিকে শচীশের কামাই রইল না—কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তার পা টলতে লাগল। দামিনী-শ্রীবিলাসের গল্পের আসরে অনাহূত সে বসতে পারত না; কিন্তু বারবার সমুখ দিয়ে যেতে লাগল। একদিন সাহস করে বসে পড়ল—কিন্তু গল্প জমল না। সেইদিনই গুরুজিকে বলে শচীশ কিছুদিনের জন্য একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলায় ফিরে এসে দামিনীর দরজায় ঘা দিলে: 'দামিনী! দামিনী!' 'প্রচণ্ড ঝড়ের-ঝাপটা খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা; চোখ-দুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।' বললে, 'তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিয়াছিলাম—আমার ভুল হইয়াছিল, আমাকে মাপ করো।...আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ দাও, অমন করিয়া তফাত হইয়া থাকিয়ো না।' দামিনী তার আদেশপালনে প্রস্তুত—কিন্তু শচীশ যা চেয়েছিল তা হল না। একবার দামিনী যখন এমনি নত হয়েছিল যে তার মধ্যে সে কেবল মাধুর্যকেই দেখেছিল, মধুরকে দেখে নি। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হয়ে উঠল যে, গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলে সে দেখা দিতে লাগল। এমনকি শচীশের ভাবের ঘোর ভেঙে যেতে লাগল—দামিনী আর ভাবরসের রূপকমাত্র রইল না। অবশেষে গুরুজির কীর্তনের দলের এক গায়কের ভ্রষ্টাচারে দামিনীর অনুরোধে তারা সেই রসচর্চার রসাতল থেকে বেরিয়ে এল।

লীলানন্দ স্বামীকে ছেড়ে শচীশ কিছুদিন একলা ফিরতে চাইলে: 'একদিন

বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব-ভার সয় না। আর-একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলে আমি শহরে ফিরিতে সাহস করি না।… একটা যেন কিনারার মতো দেখিতেছি, এখন যদি তার দিশা হারাই তবে আর খুঁজিয়া পাইব না।' দামিনীর অনুরোধে তবু তাকে শ্রীবিলাসের সঙ্গে একটা পোড়োবাড়িতে উঠতে হল। আবার কানাকানি এবং কাগজে-কাগজে গালাগালি শুরু হল—আবার তার মতের বদল হয়েছে। একদিন শচীশ উচ্চৈঃস্বরে না-মানত জাত, না-মানত ধর্ম; আর-একদিন অতি-উচ্চৈঃস্বরে সে খাওয়া-ছোঁওয়া স্নান-তর্পণ দেবদেবী কিছুই মানতে বাকি রাখল না; তার পরে আর-একদিন সমস্ত বোঝা ফেলে দিয়ে নীরবে শান্ত হয়ে বসল—কী মানল আর কী না-মানল কিছুই বোঝা গেল না। একটা উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য তার ভিতরে-ভিতরে লড়াই চলছিল। শ্রীবিলাস তার গুরুর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করায় বললে, 'চুপ করো বিশ্রী, চুপ করো…এ তোমার ভূগোল-বিবরণের সত্য নয়, আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন।…আর-সব জিনিস পরের হাত হইতে লওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম যদি নিজের না হয়, তবে তাহা মারে, বাঁচায় না। আমার ভগবান অন্যের হাতের মুষ্টিভিক্ষা নহেন, যদি তাঁকে পাই-তো আমিই তাঁকে পাইব, নহিলে নিধনং শ্রেয়ঃ।' শ্রীবিলাস বললে, 'যে কবি সে মনের ভিতর হইতে কবিতা পায়, যে কবি নয় সে অন্যের কাছ হইতে কবিতা নেয়।' শচীশ অম্লানমুখে বললে, 'আমি কবি।'

এদিকে তার খাওয়া নেই, শোওয়া নেই, শরীরটা প্রতিদিনই অতি-শাম-দেওয়া ছুরির মতো সূক্ষ্ম হতে লাগল। প্রায়ই নদী পার হয়ে সে পরপারের বালুচরে চলে যেত—সারাদিন অভুক্ত। মধ্যে-মধ্যে ব্যথিতা দামিনীকে অতিরিক্ত যত্ন দেখিয়ে সে অনুতাপের ব্রত যাপন করত। একদিন গভীর রাত্রে বাড়ির সামনে চাতালের উপর দাঁড়িয়ে শচীশ হাঁক দিলে, 'বিশ্রী! দামিনী!' তারা উঠে এলে আবেগভরে বলতে লাগল, 'যে-মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই-মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উল্টা চলিলে তবেই-তো মিলন হইবে।…তিনি রূপ ভালোবাসেন, তাই কেবল রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে; আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। এ-কথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের যত দুঃখ।…এতক্ষণ আমি অন্ধকারের এই-কোণটিতে চুপ করিয়া বসিয়া সেই-ওস্তাদের গান শুনিতেছিলাম, শুনিতে-শুনিতে হঠাৎ সমস্ত বুঝিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না, তাই তোমাদের ডাকিয়াছি।…অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার'—বলতে-বলতে সে অন্ধকারে নদীর দিকে চলল।

শচীশ আবার সেই আগের চাল ধরলে। তার খাপছাড়া-স্বভাবকে নিয়মে বাঁধবার জন্য দামিনীর সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হল। সময়মতো তাকে স্নানাহার করানোও তার পক্ষে রীতিমতো অসম্ভব হয়ে উঠল। একদিন রাত্রে মুষলধারে বৃষ্টি। দামিনী তার ঘরের মধ্যে দেখতে গেলে শচীশ অন্ধকারে বলে উঠল, 'কেও!' পরমুহূর্তে বিছানা থেকে উঠে বেগে ঝড়বৃষ্টি-বিদ্যুতের মধ্যে একেবারে নদীতীরে উপস্থিত। দামিনী কাতরস্বরে পায়ে পড়ে তার নির্দোষিতা-প্রমাণের চেষ্টা করায় সে চুপ করে রইল। অনেক অনুনয়ে শেষে ঘরে এসে বললে, 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার—আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।' দামিনী স্বীকৃত হল। বিদায়কালে তার মার্জনার আবেদনে সে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে, 'আমিও অনেক অপরাধ করিয়াছি, সমস্ত মাজিয়া ফেলিয়া ক্ষমা লইব।'

অনতিকাল পরে দামিনী-শ্রীবিলাসের বিবাহের সংবাদে শচীশ খুশি হয়ে সেখানে এসে ধুমধাম বাধিয়ে দিলে। অবশেষে জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে তাদের উঠতে বলে সে অন্তর্হিত হল।

শম্ভু ॥ 'করুণা' উপন্যাস। মহেন্দ্রের এক ভৃত্য।

শর্মিলা ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। 'মেয়েরা দুই জাতের⋯শশাঙ্কের স্ত্রী শর্মিলা মায়ের জাত। বড়ো-বড়ো শান্ত চোখ; ধীর-গভীর তার চাহনি; জলভরা-নবমেঘের মতো নধর দেহ, স্নিগ্ধ-শ্যামল; সিঁথিতে সিঁদুরের অরুণ-রেখা; শাড়ির কালো-পাড়টি প্রশস্ত; দুই-হাতে মকরমুখো মোটা দুই-বালা, সেই-ভূষণের ভাষা প্রসাধনের ভাষা নয়, শুভসাধনের ভাষা।'

'স্বামীর জীবনলোকে এমন-কোনো প্রত্যন্তদেশ নেই যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল।' স্বামীর ফাউন্টেন-কলমটা টেবিলের কোনো অনতিলক্ষ্য অংশে অগোচর হলে, কিংবা স্নানের পরে হাতঘড়িটা কোথাও অদৃশ্য হলে শর্মিলারই চোখে পড়ে। ভোরবেলায় অল্প-একটু যেন সর্দির আভাস দেখা দিয়েছে, শর্মিলার এই-কল্পনা অনুসারে তাকে কুইনিন খেতে হয় দশ গ্রেন, তা-ছাড়া তুলসীপাতার রস দিয়ে চা। লোক আসে কাজের কথায়—ক্ষণে-ক্ষণে অন্তঃপুর থেকে ছোটো-ছোটো চিরকুট আসে: 'মনে আছে কাল তোমার অসুখ করেছিল। আজ সকাল-সকাল খেতে এসো।' স্বামীর উপার্জন অখণ্ডভাবে তারই হাতে এসে পড়ত। অপ্রত্যাশিত অতিথি-সমাগমের দায় তারই। পারিবারিক দ্বৈ-রাজ্যের ব্যবস্থাবিধি শর্মিলারই অধিকারে। তার সন্তান হয় নি—হবার আশাও প্রায় ছেড়েছে।

'ঘরে আরোগ্য ও আরামের জন্যে শর্মিলার এই-যেমন সস্নেহ ব্যগ্রতা, বাইরে

সম্মানরক্ষার জন্যে তার সতর্কতা তেমনি সতেজ।' একবার বেড়াতে গিয়েছে নৈনিতালে। জংশন-স্টেশনের স্টেশনমাস্টার কোনো জেনারেলসাহেবের জন্য তাদের রিজার্ভ-করা কামরাটি বেদখলের চেষ্টা করায় শর্মিলা রুখে দাঁড়ায়। এবার কর্মস্থলে শশাঙ্কের অসম্মানের খবরটা সে-ই আবিষ্কার করলে স্বামীর ব্যবহারে। ব্যাপারটা অ্যাজিটেশনের পথে গেল না—গেল সেলফ্‌ডিটার্মিনেশনের দিকে। স্বামীকে বললে, 'আর নয়, এখনই কাজ ছেড়ে দাও।' তার জ্ঞাতি-সম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতার বড়ো কন্ট্রাক্টর। শর্মিলার নামে তার বাবার দেওয়া টাকা ছিল ব্যাংকে। পরদিনই কলকাতায় গিয়ে সে মথুরদাদার সঙ্গে ভাগে কাজ করবার ব্যবস্থা করলে।

ব্যবসা চলল বেগে। তখন স্বামীর ব্যবহারিক-জীবনের কক্ষপথ সংসারচক্রের বাইরের দিকে পড়ায় শর্মিলার বিধিবিধান পদে-পদে উপেক্ষিত হতে লাগল। শর্মিলা মিনতি করে বললে, 'বাড়াবাড় কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।' কিন্তু যুক্তিতর্ক কাকুতিমিনতির বাইরে শুধু একটিমাত্র কথা: 'কাজ আছে।' শর্মিলা এই দ্রুতলয়ের সঙ্গে তাল রাখতে চেষ্টা করে—স্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্বদাই মজুদ রাখে; মোটরগাড়িতে গুছিয়ে রাখে সোডাওয়াটার, টিনের বাক্সে শুকনো-খাবার। ঘরকন্নার পরামর্শ খাটো করে আনতে হয় জরুরি-টেলিগ্রামের ঠোকর-মারা ভাষার ধরনে—সেও চলতে-চলতে, পিছু ডাকতে-ডাকতে, বলতে-বলতে, 'ওগো, শুনে যাও কথাটা'। ব্যবসায়ের টাকায় বাড়ি হল ভবানীপুরে—সেই স্থাবর-পদার্থটার প্রতি শর্মিলার রুদ্ধ-স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেল। সুবিধা হল এই যে, ইটকাঠের ধৈর্য অটল। গোছানো-গাছানোর মহোদ্যমে দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠল, একজন দিয়ে গেল জবাব। গৃহসজ্জা চলল বৈঠকখানায়, শোবার ঘরে, আপিস ঘরে। 'শর্মিলা সেবা করছে, কিন্তু আজকাল সেই সেবার অনেকখান অগোচরে। আগে তার যে আত্ম-নিবেদন ছিল প্রত্যক্ষের কাছে এখন তার প্রয়োগটা প্রতীকে—বাড়িঘর সাজানোয়, বাগান করায়, যে চৌকিতে শশাঙ্ক বসে তারই রেশমের ঢাকায়, বালিশের ওয়াড়ের ফুলকাটা কাজে, আপিসের টেবিলের কোণে রজনীগন্ধার-গুচ্ছে-সজ্জিত নীল-স্ফটিকের ফুলদানিতে। নিজের অর্ঘ্যকে পূজাবেদীর থেকে দূরে স্থাপন করতে হল, কিন্তু 'অনেক দুঃখে।' বারবার বাধা-পেয়ে ঘা-খেয়ে গোপনে চোখের জল ফেলে-ফেলে মুছতে হল। তবু তার মন দূর থেকে প্রণিপাত করলে শশাঙ্কের সেই ধাবমান কাজের রথের ধ্বজাটিকে।

পরিবারের সমৃদ্ধি যখন ঊর্ধ্বতম কোঠায়—শর্মিলাকে ধরল দুর্বোধ্য এক রোগে। উদ্বিগ্ন স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বললে, 'তুমি মিথ্যে ভেবো না, আমি ভালোই আছি।' স্বামীর ঐশ্বর্য গড়বার কল্পনায় সে গৌরবান্বিত। এদিকে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধেও উৎকণ্ঠিত—সে আছে বিছানায়, ঠাকুর-চাকরেরা কী-কাণ্ড করে কে জানে। পিতৃগৃহে তার একমাত্র বোন ছিল ঊর্মিমালা;

তাকে ডাকিয়ে এনে বললে, 'কিছুদিন তোর কলেজ থাক, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর, বোন।' সংসারের সর্বোচ্চ শিখরে বিরাজমান পুরুষটির সেবায় ত্রুটি না হয়—দেহযাত্রানির্বাহে যে-মানুষটি একান্ত নিরুপায়। শর্মিলার হাসিও পায়, মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে, যখন দেখে চুরুটের আগুনে শশাঙ্কের আস্তিনের খানিকটা পোড়া, কিংবা ভোরবেলায় শয়নঘরের কলটা খুলে সে দৌড় দিয়েছে বাইরে। সেবাপরায়ণা ঊর্মিমালার মধ্যে সে নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ডাকাডাকি করে: 'ওর সিগারেট-কেসটা ভরে দে-না ঊর্মি।…দেখছিস-নে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই?…একবার আপিস-ঘরটা দেখে আসিস তো ঊর্মি, আমি নিশ্চয় বলছি ও'র ক্যাশবাক্‌সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে বেরিয়ে গেছেন।' ঊর্মির সঙ্গ শশাঙ্ককে আনন্দ দেয়—শুধু ঘরেই নয়, বাইরে কাজের ক্ষেত্রেও। ব্যবসায়ের সঙ্গে স্ত্রীবুদ্ধির দূরত্বকে শর্মিলা অনিবার্য বলেই মনে করত। রোগশয্যা থেকেই সে বুঝতে পারে ঊর্মির সান্নিধ্যে স্বামীর আবিষ্টতা। তাই নিজেকে বারবার করে বলে, 'মরবার আগে ওই কথাটুকু বুঝে গেলুম। আর সবই করেছি, কেবল খুশি করতে পারি নি। ভেবেছিলুম ঊর্মিমালার মধ্যে নিজেকেই দেখতে পাব, কিন্তু ও-তো আমি নয়, ও-যে সম্পূর্ণ আর-এক মেয়ে।' সেই একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প-কদিনেই এতবড়ো সাধনার আসন থেকে যে কর্মকঠিন পুরুষকে বিচলিত করে তুলল—স্বামীর এই অশ্রদ্ধেয়তা শর্মিলাকে বাজল তার রোগের চেয়ে বেশি। একদিন অনুতপ্ত ঊর্মি চলে গেল বাড়িতে—শর্মিলা নিষেধ করলে না। পরে বুঝলে, শশাঙ্কের তাকেই সন্দেহ। তাই তর্ক না করে বললে, 'আমার নাম করে তুমি তাকে ডেকে নিয়ে এস, নিশ্চয় কোনো আপত্তি করবে না।'

এদিকে শশাঙ্কের অনবধানতায় কারবারের লোকসান কানে এল। শর্মিলা ঊর্মিকে বললে, 'প্রতিদিন ওর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী-কাণ্ড করেছিস জানিস তা।' পরে তাকে কাঁদতে দেখে আস্তে-আস্তে হাত বুলিয়ে দিলে তার মাথায়: 'কিছু ভাবিস নে, যা-হয় একটা উপায় হবে।…মথুরদাদাকে বলছি, এই-নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পুষিয়ে দেব। আর তোকেও বলছি, আমি যে কিছু জানতে পেরেছি এ-কথা যেন তোর ভগ্নীপতি না টের পান।' ঊর্মি মাপ চাইতে তার চোখের জল মুছে ক্লান্তস্বরে বললে, 'কে কাকে মাপ করবে, বোন। সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।' এদিকে ঊর্মির জন্য স্বামীর ছট্‌ফটানিতে তার প্রতি করুণায়, নিজের প্রতি ধিক্কারে শর্মিলার রোগের ব্যথা বেড়ে উঠল। ঊর্মিকে আবার স্বামীর সঙ্গে পাঠালে ময়দানে, বোটানিকাল গার্ডেনে। মনে-মনে বললে, 'যার জন্যে কাজ খোওয়াতে ওর ভাবনা নেই, তাকে-সুদ্ধ খোয়ানো ওর সইবে না।' রবিবার দিন ছিল তাদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। শর্মিলার আশা ছিল, অন্যান্য বারের মতো স্বামীকে মালা

পরিয়ে কাছে বসে খাওয়াবে। কিন্তু সেদিন তার স্বামী ঊর্মিকে নিয়ে বেড়াতে গেলে সে ভেঙে পড়ল কান্নায়: 'মিথ্যে! মিথ্যে! মিথ্যে! কী হবে এই খেলায়!…ঠাকুর, তুমি মিথ্যে!' রোগের দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত বেড়ে উঠল, শর্মিলা স্বামীকে কাছে ডেকে বললে, 'জীবনে আমি যে-বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি।…ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরও অনেক বেশি পাবে যা আমার মধ্যে পাও নি।…মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হল, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।'

দৈবক্রমে এক সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় শর্মিলা বেঁচে উঠল। বিছানায় উঠে বসে সে ভাবলে, 'এ-কী আপদ! কী করি। শেষকালে বেঁচে-ওঠাই কি মরার বাড়া হয়ে দাঁড়াবে।' ঊর্মিকে বললে, 'তুই যেতে পারবি নে।…হিন্দুসমাজে বোন-সতিনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করে নি।' শশাঙ্ককে বললে, 'চলো আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজদরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল—চেষ্টা করলেই পাবে। সে-দেশে কোনো কথা উঠবে না।' ব্যবসায়ে শশাঙ্কর সমস্ত টাকা ডুবেছিল—তবুও দেনাশোধ হয় নি। শর্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না, সে জানত অভাবের দিনে তার মূল্য—দারিদ্র্যের কঠোরতাকে যথাসম্ভব মৃদু করে এনে চালাতে পারবে; বিশেষত, গয়না রয়েছে হাতে। কিন্তু দৈন্য-অপমানের সেই নিদারুণ শূন্যতায় একদিন স্বামীর মনে কি-পরিতাপ আনবে—এই ভাবনাও তার মনে ছিল। শশাঙ্ক উচ্ছ্বসিতস্বরে জানালে তার বিশ্বাসের আবেদন। শর্মিলা স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললে, 'তুমিও আমাকে বিশ্বাস করো।…তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি, সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।'

এমন সময়ে ঊর্মির এক চিঠিতে জানা গেল—সে রওনা হয়েছে বিলেতে।

শরৎ ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। অক্ষয়ের ছোটোবোন।

শশাঙ্কমৌলি মজুমদার ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। স্ত্রী শর্মিলার অতিলালনের আওতায় শশাঙ্ক দিনযাত্রায় নিতান্ত অসাবধান। স্নানের আগে সে হাতঘড়িটা কোথায় ফেলেছে, কিছুতেই মনে করতে পারে না; দুই-পায়ে ভিন্নরঙের দুই-মোজা পরে কখনো বাইরে যেতে উদ্যত হয়; বাংলা-মাসের সঙ্গে ইংরেজি-মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে সে নিমন্ত্রণ করে বসে বন্ধুদের। ত্রুটি ঘটলে স্ত্রীর হাতে তার সংশোধন হবে জেনে ত্রুটি-ঘটানোই যেন তার স্বভাব। এদিকে আহার-বিহারে স্বাস্থ্যরক্ষায় শর্মিলার প্রতিনিয়ত সতর্কতায় হার-মেনে বলত, 'দোহাই তোমার, চক্রবর্তীবাড়ির গিন্নির মতো একটা ঠাকুরদেবতা আশ্রয় করো। তোমার মনোযোগ আমার একলার পক্ষে বেশি।' সমস্ত-উপার্জন সে এনে দিত

স্ত্রীর হাতে—বিশেষ-প্রয়োজনে অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা না মেগে উপায় ছিল না।

যে-বছর শশাঙ্ক এম. এসসি. ডিগ্রির সর্বোচ্চ-শিখরে, সে-বছরেই তার বিবাহ। শ্বশুর রাজারামবাবুর অর্থে এঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে শিবপুর থেকে। ঘরে যতই তার ঢিলেমি থাক চাকরির ক্ষেত্রে সে পাকা; কারণ কর্মস্থলে তার বড়োসাহেবের নির্মম দৃষ্টি। যখন ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারি-পদে অ্যাকটিনি করছে তার আসন্ন উন্নতির মোড় ফিরে গেল উল্‌টো-দিকে—যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা-অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এক ইংরেজ-যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ও সুপারিশে। শশাঙ্কের ধ্যানদৃষ্টির সামনে ছিল বাঁধা-মাইনের অন্নক্ষেত্র, আর তার পশ্চিমদিগন্তে পেনসনের স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা। কর্তৃপক্ষের আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও ব্যাপারটা তার পক্ষে বড়ো বিস্বাদ বোধ হল—ঘরে এসে নানা ছোটোখাটো বিষয়ে খিটমিটি শুরু করলে। তবু কর্মস্থলের অসম্মানের খবরটা স্ত্রীকে জানালে না—পাছে তার চাকরির জালটাতে আরও গ্রন্থি পাকিয়ে তোলে। কিন্তু শর্মিলা সমস্তই বুঝলে এবং চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে তাকে মথুরবাবুর সঙ্গে কন্ট্রাকটরিতে নামালে নিজ পিতৃদত্ত টাকায়।

চাকরির ক্ষেত্রে শশাঙ্কের মনিব ছিল নিজের বাইরে—তার দায়িত্ব ছিল পরিমিত। ব্যবসায়ে তার নিজের প্রভুত্ব নিজেরই উপরে। সেকেন্ডহ্যান্ড ফোর্ড-গাড়ি হাঁকিয়ে সে বেরিয়ে যেত প্রত্যূষে—বাঁ-হাতে কব্জি-ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, পরনে খাঁকি প্যান্ট, চোখে রঙিন চশমা। গাড়িতে শর্মিলার দেওয়া খাবার কিংবা সোডাওয়াটার ব্যবহারেও সময় হত না—দুপুরে বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করত। শর্মিলার টাকার সুদ দিয়ে সে রসিদ নিত নিয়মমতো—স্ত্রীর ঋণ যখন শোধ হবার কিনারায় এল তখনও এঞ্জিনের দম কমল না। দিনে-দিনে শশাঙ্ক হয়ে উঠল রোদে-পোড়া খটখটে; খাটো আঁট কাপড়, খাটো অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা স্ফুলিঙ্গের মতো সংক্ষিপ্ত। লাভের টাকায় সে বাড়ি করলে—স্বাস্থ্য-আরাম-শৃঙ্খলার নূতন-নূতন প্ল্যান এল মাথায়, শর্মিলাকে আশ্চর্য করার চেষ্টায়। স্বামীর জন্মদিন উপলক্ষে শর্মিলা বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করলে; শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে বললে, 'এ-কী ব্যাপার। পুতুলের বিয়ে নাকি'...বিজনেস মর্তুদিন ছাড়া আর-কোনো দিনের কাছে মাথা হেঁট করে না।...দেখো শর্মিলা, তুমি আমাকে খেলনা বানিয়ে বিশ্বের লোক ডেকে খেলা করবার চেষ্টা কোরো না'।

শর্মিলার একমাত্র বোন ঊর্মিমালা। তার সঙ্গে শশাঙ্কের মিল ছিল স্বভাবে। শশাঙ্ক জানত, সে কোন্‌-ফুল ভালোবাসে আর কোন্‌-রঙের শাড়ি। রাজারামবাবুর অন্তিম ইচ্ছায় সে নীরদের বাগদত্তা। শশাঙ্ক বলত, 'এতবড়ো প্রিগ্‌টার হাতে পড়বে এমন মেয়ে।...রাজারামবাবু সাদা লোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট। ওর আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ যে গোপনে ডিম

পাড়ছে ঊর্মির টাকার থলির মধ্যে।' রাজারামের মৃত্যুর পরে নীরদ ছিল য়ুরোপে। শশাঙ্কের সমৃদ্ধি যখন ছয়-সংখ্যার অঙ্কের দিকে শর্মিলাকে ধরল রোগে। শশাঙ্কের বড়ো-কাজ ছিল—স্ত্রীর বিছানার কাছে সে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করত। প্রকাণ্ড-এক ঐশ্বর্য গড়বার কল্পনা তার মনে। দিদির ইচ্ছায় ঊর্মি এসে তার গৃহরাজ্যের প্রতিনিধিত্ব নিলে।

ঊর্মির ভুলত্রুটিতে শশাঙ্ক কৌতুক বোধ করে, তার খুশির হাওয়ায় গুরুভার কর্মের পীড়নও হয় লঘু—তার ভুলটাতেই যেন একটা বিশেষ রস আছে। যখন বাড়িতে আসে সেখানকার হাওয়ায় সে ছুটির হিল্লোল অনুভব করে—সে কেবল সেবায় নয়, অবকাশে নয়, তার রসময় স্বরূপে। সেই নিরন্তর চাঞ্চল্য তার চিত্তকে দোলায়িত করে তোলে। ঠিক সময়ে ঠিক-জিনিসটা হল কিনা, সেটা তার কাছে গৌণ। শশাঙ্কের মনটা এখন জোয়ারভাঁটার মাঝখানকার নদীর মতো—সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে বসা, ভোরবেলায় এরোপ্লেন-ওড়া দেখবার জন্য দমদম-পর্যন্ত যাওয়া, কিংবা নিউমার্কেটে যাওয়া তার বিরক্তি বোধ হয় না। নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও ঊর্মির কুহেলিকাচ্ছন্ন অভিমানকে সে উপেক্ষা করতে পারে না। কাজের মধ্যে ঊর্মিকে সঙ্গী পেয়ে তার সময়ের দীর্ঘতাকে মনে হয় সার্থক। শর্মিলা তিরস্কার করলে আড়াল থেকে তাকে ইশারায় আশ্বাস দেয়। কখনো-বা রান্নাঘরে পাকপ্রণালীর পরিচর্যায় নিযুক্ত ঊর্মিকে বলে, 'চলো, ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়ালের বিল্ডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন, তোমাকে বুঝিয়ে দেব।' ঊর্মি বই নিয়ে বসলে সে তাড়াতাড়ি সেগুলো বাক্সজাত করে চেপে বসে। হোলির দিনে ব্যাপারটা চরমে উঠল। অনুতপ্ত ঊর্মি চলে গেল বাড়িতে। পরদিন এক-সেট যান্ত্রিক ছবি-আঁকার সরঞ্জাম কিনে এনে তাকে না-দেখে শশাঙ্ক সেখানে ছুটল। এসে দেখলে নীরদের চিঠি—তার বিবাহের সংকল্প য়ুরোপে। আনন্দের আতিশয্যে ঊর্মিকে নিয়ে সে মোটরে উধাও হল—মোটর-যাত্রার শেষে যখন উভয়ে ভবানীপুরে ফিরল, তখনও ঘণ্টায় পঁয়তাল্লিশ-মাইলের বেগ শান্ত হল না।

শশাঙ্কের কাজ গেল—মন হল আবিল। কর্মচারীরা দু-হাত চালিয়ে চুরি করলে; কোম্পানির অখ্যাতি এবং লোকসানের দায় পড়ল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে সে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করত—কিন্তু পরদিনই স্বাধিকার-প্রমত্ত। ঊর্মির সন্ধানে শশাঙ্ক বারবার আসে রোগীর ঘরে; পুরুষমানুষের অন্ধতাবশেই বুঝতে পারে না, স্ত্রীর কাছে সেই ছটফটানির তাৎপর্য কী। একদা শশাঙ্ক নিজের সম্বন্ধে ছিল উদাসীন—ঊর্মির উচ্চহাস্যসংযুক্ত সংক্ষিপ্ত উক্তিতে তার বেশবাসের পরিবর্তন ঘটে। ইদানীং আহার ও বেশবাসের অনাদরে তার মন্তর্বেদনা ধরা পড়তে লাগল। শর্মিলা অগত্যা জোর করে ঊর্মিকে বাইরে পাঠাত। শশাঙ্ক এতে তার অব্যক্ত সমর্থন পেয়ে ভাবত, শর্মিলা অসাধারণ—সে তাদের একত্র দেখেই খুশি। কোনো-এক আর্টিস্টের রঙিন-পেন্সিলে আঁকা

একটা ছবি ছিল শর্মিলার, এতদিন ছিল তার পোর্টফোলিওর মধ্যে—সেটা বিলেতি-দোকানে দামি-ফ্যাশনে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখলে আপিসঘরের দেয়ালে। মালী তাতে ফুল দিয়ে যেত। একদিন বাগানে ঊর্মির হাত চেপে ধরে শশাংক বললে, 'তুমি নিশ্চয় জান, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর, তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে এত ভক্তি করি জীবনে আর-কাউকে তেমন করি নে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।'

শর্মিলা নিজের মৃত্যু আশংকা করে ঊর্মিকে দিতে চাইলে স্বামীর হাতে। অবশেষে দৈব-চিকিৎসায় সেরে উঠে সেই সংকল্পসাধনের জন্য যেতে চাইলে নেপালে—সেখানে শশাঙ্কের কাজের আহ্বান ছিল। এদিকে ব্যবসায়ে লোকসান এড়াতে শশাঙ্ক কয়লার হাঠে তেজিমন্দি শুরু করেছিল; কিন্তু হিসেব-নিকেশে বুঝলে শর্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে—এমনকি বাড়ি বিক্রির উপক্রম। নেপাল-যাত্রার তখনো দিন-দশেক বাকি। শশাঙ্ক বিছানা থেকে উঠে টেবিলের উপর মুষ্টিঘাত করে বললে, 'যাব না নেপাল।···আমরা দুজনে ঊর্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব—ভ্রূকুটিকুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর, এইখানেই ভাঙা-ব্যবসাকে আর-একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই বসে।' ডাক ছাড়লে, 'শর্মিলা! শর্মিলা!' শর্মিলা আসতে বললে, 'শর্মি, ভেবো না আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব আমি, এত অধঃপতন কল্পনা করতেও পার?···সেইদিনকার মতোই আজ থেকে আবার ঋণ শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা···একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকে বিশ্বাস করো।'

এমন সময়ে এক পত্রে জানা গেল, ঊর্মি সরিয়ে নিয়েছে নিজেকে।

শশিমুখী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। গোরার দাদা মহিমের দশবছরের কন্যা। গোরার বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে শশিমুখীর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল; উভয়পক্ষেই পরস্পর উপদ্রব চলত। শশিমুখী বিনয়ের জুতো লুকিয়ে রেখে তার কাছ থেকে গল্প আদায় করত। বিনয় শশিমুখীর জীবনের দু-একটি সামান্য ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট রঙ ফলিয়ে গল্প বানিয়ে রেখেছিল—তারই অবতারণা হলে শশিমুখী বড়ো জব্দ হত। বিনয়ের জীবনচরিত বিকৃত করে সেও পালটা-গল্প বানাবার চেষ্টা করত, কিন্তু রচনাশক্তিতে বিনয়ের সমকক্ষ না-হওয়াতে সফলতা লাভ করতে পারত না। বিনয় বাড়িতে এলেই সে কাজ ফেলে গোলমাল করবার জন্য ছুটে আসত—বিনয় তাকে এমনি উত্তেজিত করে তুলত যে, আত্মসংবরণ করা তার পক্ষে অসম্ভব হত।

বিনয়ের সঙ্গে অবশেষে তার সম্বন্ধ হলে শশিমুখী আত্মগোপন করত।

শাজাহান ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক মোঘলসম্রাট। সাতষট্টি-বৎসর

বয়সে অসুস্থতাহেতু শাজাহান তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ দারাকে সাম্রাজ্যের ভার দিলে তাঁর পুত্রগণের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

শিবতোষ ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। দামিনীর স্বামী। শিবতোষের একমাত্র কুল ভালো ছিল। শ্বশুর অন্নপ্রসাদ তাকে কলকাতায় বাড়ি আর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলে তার কপাল ভালো হয়। শ্বশুর তাকে আপিসে কাজ শেখাবার চেষ্টা করেন—কিন্তু সংসারে তার মন ছিল না। কোনো গনৎকারের ভবিষ্যদ্বাণীতে জীবন্মুক্তির প্রত্যাশায় সে কাঞ্চন এবং অন্যান্য রমণীয় পদার্থের লোভ ত্যাগ করেছিল।

লীলানন্দ স্বামীর কাছে মন্ত্র নেবার পরে একদিন সে দামিনীকে বললে, 'স্বামীজি তোমাকে ডাকিতেছেন, কিছু উপদেশ দিবেন।' দামিনী তার গহনার বাক্স গোছাতে ব্যস্ত ছিল। পরদিন তার গহনা খোয়া গেল। শিবতোষকে জিজ্ঞাসা করায় বললে, 'সে তো তুমি তোমার গুরুকে নিবেদন করিয়াছ। সেই জন্যই তিনি ঠিক সেই-সময়ে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন, তিনি যে অন্তর্যামী। তিনি তোমার কাঞ্চনের লোভ হরণ করিলেন।' বাবার দেওয়া গহনা দামিনী বাবাকে ফিরিয়ে দিতে চাইলে। সে বললে, 'তার চেয়ে ভালো-জায়গায় পড়িয়াছে। বিষয়ীর পেট না ভরাইয়া ভক্তের সেবায় উৎসর্গ হইয়াছে।' শিবতোষের প্রধান আনন্দ ছিল লীলানন্দ স্বামীকে তাঁর সদলবলে সেবা করা। ভাগ্য-বিপর্যয়ে দামিনীর ভাইগুলি যখন উপবাসী, সেই-সময়েও প্রত্যহ শিবতোষের বাড়িতে ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবা চলত। দামিনীর বাসনা-কামনার ভূত ঝাড়াবার কোনো-চেষ্টারই ত্রুটি ছিল না।

মৃত্যুকালে শিবতোষ তার ভক্তিহীনতার চরম-দণ্ড দিলে—গুরুকেই তার কলকাতার বাড়ি এবং সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে গেল।

শিবু ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশের এক ভৃত্য। পাড়ার পক্ষাঘাতগ্রস্ত একটি ছেলেকে শচীশ কম্বল দিলে শিবুর অসহ্য হয়; রাগে গর্‌গর্‌ করে বলে, 'ও-বেটার কাঁপুনি-টাপুনি বদমায়েসি।'

শিবু ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। বিপ্রদাসের এক অনুচর।

শীতল সর্দার ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

শৈলজা ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। গাজিপুরের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ছোটো মেয়ে। শৈলজার সবসুদ্ধ একটা সংক্ষিপ্ত-রকমের ভাব। শ্যামবর্ণ, মুখখানি ছোটোখাটো মিষ্টিমেয়, চোখদুটি উজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত—মুখে স্থির বুদ্ধি

এবং একটি শান্ত পরিতৃপ্তি চোখে পড়ে। স্বামীর সঙ্গে শৈলজা নিজ পিত্রালয়-বাসিনী; বিবাহের পর থেকে তাকে স্বামীর বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করতে হয় নি। সমস্ত গল্পহাসির অন্তরালে তার উৎকণ্ঠিত হৃদয় বিপিনের পদধ্বনির দিকে কান পেতে থাকত।

নলিনাক্ষের বধূ কমলাকে নিয়ে রমেশ গাজিপুরে এলে প্রথম দৃষ্টিতেই কমলার সঙ্গে শৈলজার সখ্য বেঁধে উঠল। কমলার হাত ধরে সে বললে, 'এস ভাই, আমার ঘরে এসো।' শৈলজার হৃদয়ের তারগুলি স্বামীপ্রেমে বাঁধা; ঘনিষ্ঠভাবে কথা আরম্ভ হতেই সে স্বামীর কথা আরম্ভ করলে। কথা কইতে-কইতে হঠাৎ একসময়ে বললে, 'তুমি একটু বসো ভাই, আমি এখনই আসিতেছি।···উনি স্নান করিয়া ভিতরে আসিয়াছেন, খাইয়া আপিসে যাইবেন।' কমলা বিস্মিত: স্বামীর আগমনবার্তা সে জানল কী করে। শৈলজা কমলার চিবুক নেড়ে বললে, 'আর ঠাট্টা করিতে হইবে না। সকলেই যেমন করিয়া জানিতে পারে আমিও তেমনি করিয়া জানি। তুমি নাকি তোমার কর্তাটির পায়ের শব্দ চেন না?' স্থানাভাবে রমেশকে থাকতে হল বাইরের ঘরে। কমলা রমেশকে তখনও তার স্বামী বলে জানত। তার এই বিচ্ছেদ-ব্যাপারে শৈলজা কেবলই দুঃখপ্রকাশ করত। কমলা বলত, কেন সে হা-হুতাশ করছে। শৈলজা হেসে বলত, 'ইস্, তাই-তো। একেবারে যে পাষাণের মতো কঠিন মন।···তোমার মনের মধ্যে যে কী হইতেছে সে-কি আর আমি বুঝি না।' কমলা জিজ্ঞাসা করত: বিপিনবাবু দু-দিন যদি দেখা না দেন? শৈলজা সগর্বে বলত, 'ইস, দুই-দিন দেখা না দিয়া তার নাকি থাকিবার জো আছে!'— বলে বিপিনবাবুর অধৈর্য সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ করত। রবিবার দিন মিলনবঞ্চিত সখীকে ফেলে শৈলজা নিজের পুরো-বরাদ্দ ভোগ করতে কুণ্ঠিত হল। স্বামীর কানে-কানে কী একটা বলে সে ঘটা করে কমলাকে সাজালে। কিন্তু নিতান্ত পীড়াপীড়িতেও কমলা বাইরে গেল না। তখন স্বামীর সাহায্যে সে ডাকিয়ে আনলে রমেশকে। তবুও তার আয়োজন ব্যর্থ হল।

শৈলজা চক্রবর্তীকে বলে একটি বাসা ঠিক করালে। সেই-বাসার ঝাড়া-মোছা শেষ হলে কমলা এক পত্রে স্বামীর পরিচয় অবগত হল। সন্ধ্যাবেলায় শৈল তাকে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, 'ভাই, আজ কি তোমার শরীর ভালো নাই?' পরদিন কমলাকে সে বিছানা থেকে উঠতে দিলে না; আলিঙ্গন করে বললে, 'রমেশবাবু এলাহাবাদে গিয়া অবধি তোমাকে একখানি চিঠি লেখেন নি, তাই রাগ হইয়াছে—অভিমানিনী। কিন্তু···তিনি সেখানে কাজে গেছেন··· ইহার মধ্যে যদি সময় করিয়া উঠিতে না পারেন···তাও বলি ভাই, তোমাকে আজ এত উপদেশ দিতেছি, আমি হইলেও ঠিক ওই-কাণ্ডটি করিয়া বসিতাম।' রমেশের উপর রাগ করে সে এলাহাবাদে বাবাকে একটা চিঠি লিখলে। রমেশের পত্র এলে শৈল বললে, 'একটা-জিনিস যদি দিই তো কী দিবি বল্?'

কমলা বললে, তার কী আছে। শৈল তার গালে মৃদু আঘাত করলে: 'ইস, তাই তো! যা-কিছু ছিল সমস্ত বুঝি একজনকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিস? এটা কী বল দেখি।'—চিঠিখানি বিছানায় ফেলে সে শিশুকন্যা উর্মিকে নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই আবার সে ফিরে এল: 'ভাই কমল, আমাকে তোর চিঠি দেখাবি নে?' কমলার কাছে তার কিছুই গোপন ছিল না—তাই এতদিন পরে সুযোগ বুঝে এই দাবি করলে। চিঠিখানি সে সমস্তটা পড়লে; মানুষ আপনার স্ত্রীকে নাকি এমনি করে চিঠি লেখে! বিস্মিত হয়ে বললে, 'আচ্ছা ভাই, তোমার স্বামী কি নভেল লেখেন?'

সন্ধ্যাবেলায় কমলা নিরুদ্দিষ্ট হল। পরদিন রমেশ তার সন্ধানে এলে শৈল ব্যস্ত হয়ে বিপিনকে বললে, 'ওগো, এ-কী সর্বনাশ হইয়াছে?…কমল কাল ও-বাংলায় গিয়াছিল, তাহাকে তো সেখানে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।… যাও-যাও, শীঘ্র যাও…খোঁজ করো গে।' কিন্তু কমলার কোথাও খোঁজ না পেয়ে তার ঘরে কান্নার রোল উঠল। কমলার সন্ধানে চক্রবর্তী কাশী যেতে চাইলে শৈলজাও তার সঙ্গ নিলে—স্বামীর সঙ্গে এমন-বিচ্ছেদের প্রস্তাব সে আগে কখনো করে নি। একদিন বালকভৃত্য উমেশের সঙ্গে কমলা কাশীতে উপস্থিত। শৈলজা চোখের জলে তার কপোল ভাসিয়ে বললে, 'মা-গো মা! আমাদের এমন করিয়াও কাঁদাইয়া যাইতে হয়।' রাত্রে কমলাকে বুকের কাছে টেনে সে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—এই কোমল স্পর্শ নীরব প্রশ্নের মতো তাকে তার গোপন বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করলে। কমলার সমস্ত শুনে চমকে সে তার গলা জড়িয়ে বললে, 'হায়-রে পোড়া কপাল,—ও, তাই বটে। এতক্ষণে সব কথা বুঝিলাম। এমন সর্বনাশও ঘটে!…বোন, তোর দুঃখের কপাল, কিন্তু আমি এই কথা ভাবিতেছি, ভাগ্যে তুই রমেশবাবুর হাতে পড়িয়াছিলি।…তুই আজ ঘুমো।…কাল সব ঠিক করা যাইবে।'

পরদিন শৈলজা নিভৃতে পিতাকে সেই চিঠিখানি দেখালে। কমলার স্বামী নলিনাক্ষ কাশীতে ডাক্তারি করত। উর্মির সর্দিকাশির উপলক্ষে তাঁকে ডাক দিয়ে কমলাকে বললে, 'দেখ পোড়ারমুখী, আমি তোকে বেশিক্ষণ সাধিব না।'—বলে তাকে জোর করে ধরে এনে দেখালে। পরে বললে, 'কমল, বিধাতা তোকে যতই দুঃখ দিন, তোর ভাগ্য ভালো। এখন দুই-একদিন বোন তোকে একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে হইবে।' দিনকয়েক পিতা-কন্যায় পরামর্শের শেষে কমলাকে ছদ্মপরিচয়ে নলিনাক্ষের মার কাছে রাখা হল। কাশীত্যাগের আগে শৈলজা কমলাকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি তোকে বলিতেছি বোন, তোর ভাগ্য তোকে এইটুকু দিয়াই ফাঁকি দিবে না, তোর যাহা পাওনা আছে তার সমস্তই শোধ হইবে।'

অনতিপরেই তার কথা সত্যে পরিণত হল।

শৈলবালা (অবলাকান্ত) ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। বিবাহযোগ্যা নৃপবালা-নীরবালার মেজদি। বিবাহের একমাসের মধ্যে শৈলবালা বিধবা; চুলগুলি ছোটো করে ছাঁটা, দেখতে ছেলের মতো। সংস্কৃত ভাষায় অনার্স নিয়ে সে বি. এ. পাস করতে উৎসুক। ভগিনীপতি অক্ষয়ের মত ও রুচির দ্বারাই তার স্বভাবটি গঠিত—উভয়ে পরস্পরের পরম বন্ধু।

অবিবাহিতা বোনেদের জন্য মাকে পাত্র সন্ধান করতে দেখে অক্ষয়ের সঙ্গে শৈলবালার কমিটি বসল। কুমারসভার এককালের সভাপতি অক্ষয়—সেখানে অবশিষ্ট দুই-সভ্য তাই তার লক্ষ্য: 'মুখুজ্যেমশায়···তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু এবং শ্রীশবাবুকে একটু বিশেষ তাড়া না দিলে চলছে না, আহা, ছেলে-দুটি চমৎকার। আমাদের নেপ আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়।' কিন্তু অসময়ে হঠাৎ তাড়া না-দিয়ে তা দেওয়াই ফলপ্রদ—তাই প্রস্তাব করলে, 'ওই তো দশ-নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তারপরে সভা কতদিন টেকে আমি দেখে নেব।'

পরামর্শ-মতো সভাটিকে সেখানেই উৎপাটিত করে আনা হল। নূতন সভ্যের মধ্যে ছিল অবলাকান্ত-পরিচয়ে বালকবেশী শৈলবালা। অবলাকান্তের প্রিয়দর্শন সুকুমার মূর্তিতে স্বভাবতই সভ্যদের হৃদয় আকৃষ্ট হল—কণ্ঠস্বরটিও অবলা-নামের উপযুক্ত। প্রথম পরিচয়েই মিষ্টান্ন পরিবেষণে আত্মগোপন করে, ক্ষীণদৃষ্টি সভাপতি চন্দ্রমাধবের হাতের কাছে সমস্ত জুগিয়ে দিয়ে এবং তাঁর উপদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সে সভাটির মন হরণ করে নিলে। ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রেই যেমন রোগে চেপে ধরে, সেখানকার রুমালে-বইয়ে চৌকিতে-টেবিলে স্পর্শমাত্রেই রোগের বীজ সভ্য-দুটির চোখে-মুখে ঢুকতে লাগল। শৈল এমনি ভাব করতে লাগল যেন সেও নিরপেক্ষ নয়। সভ্যদের এহেন অবস্থায় সভাপতির অনেক কাজ তাকেই এগিয়ে দিতে হল। অবশেষে যা হবার তা হল। কুমারদের বিবাহে সম্মতি প্রকাশ পেলে শৈল দরজা বন্ধ করে পুজোয় বসল।

শৈলবালা ॥ 'গোরা' উপন্যাস। পরেশবাবুর মেজো-মেয়ে ললিতার এক বাল্যসখী। ললিতার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের হারানবাবুর কুৎসায় শৈলবালা বাঁকিপুর থেকে সখীকে লিখলে, 'তোমাদের সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া মন বড়ো খারাপ ছিল।···যে খবর পাইলাম, শুনিয়া যেন মাথায় বজ্রাঘাত হইল।···কোনো হিন্দু-যুবকের সঙ্গে নাকি তোমার বিবাহের সম্ভাবনা রটিয়াছে। এ-কথা যদি সত্য হয়'—ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, পত্রটির কড়া উত্তর পেয়ে সে হারানের হাতেই পৌঁছে দিলে।

শোভনলাল ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যলতার এক সহাধ্যায়ী শোভনলাল ; লাবণ্যের পিতা অধ্যাপক অবনীশের প্রিয় ছাত্র। 'প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাৎ মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।'

শোভনলাল গরিবের ছেলে ; ছাত্রবৃত্তির সোপানে-সোপানে পরীক্ষার শিখরে-শিখরে উত্তীর্ণ। অধ্যাপকের গৃহে সে পড়া নিতে আসত ; লাবণ্যকে দেখলে সংকোচে নত হয়ে পড়ত। শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন বেদিতে লাবণ্যের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। সময় পেলেই সে রবি ঠাকুরের খাতা থেকে অনেক অপ্রকাশিত রচনা মুষ্টিভিক্ষা করে আনত। লাবণ্যের পায়ে দেবার সাহস ছিল না—এমন-কোথাও রাখত যাতে তার দৃষ্টিতে পড়ে। লাইব্রেরির কোণে নানা আবর্জনাস্তূপের মধ্যে লাবণ্যের একটি অযত্ন-ম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ হাতে পড়ে—কোনো আর্টিস্ট-বন্ধুর সাহায্যে তার থেকে ছবি করিয়ে সে গোলাপফুলের পাপড়িতে আচ্ছন্ন করে নিজের টিনের প্যাঁটরাতে রেখেছিল। বাপ ননিগোপালের সেটি চোখে পড়ায় তিরস্কৃত হলেন অধ্যাপক। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে চোখের জল মুছে অধ্যাপকের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। বি. এ. পরীক্ষায় সে ছিল প্রথম—এম. এ. পরীক্ষায় আপন পরীক্ষা-পাসের অনেকগুলো মোটা-মার্কা সে লাবণ্যের উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

ছাত্রদশা উত্তীর্ণ হলে শোভনলাল প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য গুপ্ত-রাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে প্রবন্ধ রচনায় মন দিলে। পত্রযোগে অধ্যাপকের গুটিকতক বই ধার চাইতে আগের মতো তাঁর লাইব্রেরিতে বসেই কাজ করবার আহ্বান এল। শোভন ভাবলে, এই-চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যের সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে সে। দৈবাৎ লাবণ্যের সঙ্গে দেখা হত। তার একান্ত ইচ্ছা করত, লাবণ্য কোনো-একটা কথা বলে—নিজের উদ্ভাবিত কয়েকটা মত সম্পর্কে তার মত জানারও ঔৎসুক্য ছিল। কিন্তু গায়ে-পড়ে কিছু বলবার সাহস ছিল না। এক রবিবার দুপুরবেলা। ঘরে কেউ ছিল না। শোভন টেবিলের উপরে খাতাপত্র সাজিয়ে নোট নিচ্ছিল। লাবণ্য হঠাৎ ঘরে ঢুকে পূর্ব-ইতিহাসের উল্লেখ করে তার অপমান ঘটানোর জন্য ভর্ৎসনা করলে। শোভন চোখ নিচু করে বললে, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।' নিজের খাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল।

প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লোভের পরে শোভনলাল ভারত-ইতিহাসের লুপ্ত পথগুলি উদ্ধারে বেরোল। আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের মধ্য দিয়ে হিউয়েনসাঙের তীর্থযাত্রা এবং আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রার পুরনো পথটি আবিষ্কারের জন্য সে পুশ্‌তু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যাস করলে। ফরাসি পণ্ডিতেরা এই-কাজে ছিলেন। অমিত রায় ফ্রান্সে থাকতে

তাঁদের কয়েকজনের কাছে পড়েছিল। শোভন তাঁদের কাছে পরিচয়পত্রের জন্য অমিতের শরণাপন্ন হল। কিন্তু সরকারের ছাড়পত্র জুটল না। অতঃপর কাশ্মীর থেকে কুমায়ুনের দুর্গম পথ খুঁজতে-খুঁজতে তার হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে বৌদ্ধধর্ম-প্রচারের রাস্তা অনুসন্ধানের বাসনা হল। একদিন অমিতের সঙ্গে সে ছিল একলা। নানাকথায় রাত্রি-দুপুর হলে ফুলন্ত জারুল গাছের আড়ালে চাঁদ উঠল। ঠিক সেই-সময়ে সে একজনের কথা বলতে গেল— কিন্তু অল্প-একটু আভাস দিতেই তার গলা ভার হয়ে এল। অমিত বুঝল, তার জীবনের মধ্যে কোনোখানে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যথা বিঁধে আছে; সেই-ব্যথাটিকেই বুঝি পথ চলতে-চলতে সে পায়ে-পায়ে ক্ষয় করে ফেলতে চায়।

অবশেষে শোভন শিলঙে পৌঁছল। লাবণ্য তখন সেখানে। ছোটো-একটি চিঠি পাঠালে: 'শিলঙে কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না-যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে-কী অপরাধ করেছি আজ-পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই-কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর-কোনো প্রার্থনা নেই।' শিলঙে অমিতের সঙ্গে আলাপের পর প্রেমের বেদনায় লাবণ্যের নারীপ্রকৃতি তখন জেগে বসেছিল; তার দু-চোখ ভরে উঠল জলে।

দীর্ঘযাত্রার শেষে লাবণ্যের হৃদয়ের দ্বারে এসে শোভনলালের পায়ে-চলা-পথের অবসান হল।

শ্যামাসুন্দরী ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। মধুসূদন ঘোষালের বিধবা বড়ো-ভাজ। শ্যামাসুন্দরী পরিণতবয়সী আঁটসাঁট গড়নের সুন্দরী—'অনুজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মোটা বললে যা বোঝায় তা নয়, কিন্তু পরিপুষ্ট শরীর নিজেকে বেশ-একটু যেন ঘোষণা করছে। একখানি সাদা শাড়ির বেশি গায়ে কাপড় নেই, কিন্তু দেখে মনে হয়, সর্বদাই পরিচ্ছন্ন। বয়স যৌবনের প্রায় প্রান্তে এসেছে, কিন্তু যেন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্নের মতো, বেলা যায়-যায় তবু গোধূলির ছায়া পড়ে নি। ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ন-কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প-একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়। তার টসটসে ঠোঁট-দুটির মধ্যে একটা ভাব আছে যেন অনেক কথাই সে চেপে রেখেছে। সংসার তাকে বেশি কিছু রস দেয় নি, তবু সে ভরা, সে নিজেকে দামী বলেই জানে, সে কৃপণও নয়, কিন্তু তার মহার্ঘ্যতা ব্যবহারে লাগল-না বলে নিজের আশপাশের উপর তার একটা অহংকৃত অশ্রদ্ধা।' মধুসূদনের ঐশ্বর্যের জোয়ারের মুখে শ্যামা এসেছিল তার সংসারে—যৌবনের যাদুমন্ত্রে সেই-সংসারের চূড়ায় স্থান করে নেবে এমনও ছিল সংকল্প। মধুসূদনের ধনসৃষ্টির তপস্যায় ক্ষণে-ক্ষণে সে তপোভঙ্গের ধাক্কা এনেছে—কিন্তু বিপর্যয় ঘটাতে পারে নি। ব্যবসায়ের

ভরা-মধ্যাহ্নে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে শ্যামার সঙ্গটুকু মধুসূদনের ক্লান্তি দূর করত। ক্রিয়াকর্মের পার্বণী-উপলক্ষে শ্যামার দিকেই যেন তার পক্ষপাতের ভারটা ছিল বেশি—কিন্তু প্রশ্রয় দেয় নি। শ্যামা মধুসূদনের মনের ঝোঁক ঠিকই বুঝেছিল, কিন্তু তার ভয় ঘোচে নি।

শেষ-বয়সে মধুসূদনের বিবাহ হল উনিশ-বছরের কুমুদিনীর সঙ্গে। শ্যামাসুন্দরী তার কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, 'আমি তোমার জা, শ্যামাসুন্দরী; তোমার স্বামী আমার দেওর, আমরা তো ভেবেছিলুম শেষ-পর্যন্ত জমাখরচের খাতাই হবে ওর বউ। তা ওই খাতার মধ্যে জাদু আছে ভাই, এত-বয়সে এমন সুন্দরী ঐ খাতার জোরেই জুটল। এখন হজম করতে পারলে হয়।···সত্যি-করে বলো ভাই, আমাদের বুড়ো-দেওরটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে তো?···বুঝেছি, তা পছন্দ না হলেই বা কি···ও আমাদের আপন বলেই কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি? বড়ো শক্ত হাতে পড়েছ বউ, বুঝেসুঝে চলো।'—এই-বলে তার পানের ডিবে থেকে একটা পান নিতে বলে এক-টিপ দোক্তা মুখে পুরে মন্দগমনে বেরিয়ে গেল। ফুলশয্যার রাত্রে কুমু হঠাৎ মূর্ছিত হল। শ্যামাসুন্দরী হাঁপাতে-হাঁপাতে ছুটে এসে মধুসূদনকে বললে, 'বউ মূর্ছা গেছে।···একবার কি দেখতে যাবে?' পরে বিগলিত করুণায় তার কাছে এসে হাত ধরলে: 'ঠাকুরপো, অমন মন খারাপ কোরো না, দেখে সইতে পারি নে।' মধুসূদনের এত কাছে এসে সান্ত্বনা দেবার সাহস ইতিপূর্বে শ্যামার ছিল না। সেদিন মেয়েদের সহজ-বুদ্ধি থেকেই বুঝেছিল, সে-মধুসূদন আজ নেই—সে দুর্বল, নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে অসতর্ক। মধুর হাতে হাত দিয়ে সে বুঝলে, সেটা তার খারাপ লাগে নি—নববধূ তার অভিমানে যে ঘা দিয়েছে, কোনো-এক জায়গায় চিকিৎসা পেয়ে ভিতরে-ভিতরে সে আরাম বোধ করছে—শ্যামা অন্তত তাকে অনাদর করে না। কুমুর চেয়ে সে কি কম সুন্দরী!

অতঃপর সহানুভূতি-প্রকাশের উপলক্ষ্যে শ্যামা নানা-ছলে মধুসূদনের কাছে-কাছে ফিরতে লাগল। সেদিন অর্ধরাত্রে মধুসূদন কুমুর সন্ধানে এল নিচের তলায়। ব্রত-উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজনে শ্যামা প্রদীপ-হাতে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল; হেসে বললে, 'আজ ঘুম থেকে উঠেই তোমার মতো ভাগ্যবান পুরুষের মুখ দেখলুম, আমার দিন ভালোই যাবে। ব্রত সফল হবে।···কাল কিন্তু আমার ঘরে খেতে এস, মাথা খাও'। মধুসূদনের আহারের সময় প্রত্যহ শ্যামাসুন্দরী উপস্থিত থাকত। পরদিন দুধের বাটিতে চিনি মেশাতে-মেশাতে বললে, 'ঠাকুরপো, বউকে কি ডেকে দেব?' সেদিনও অনেক-রাত্রে বাইরে যাবার পথে একখানি শাল-গায়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে ছিল। মধুসূদনের মেজাজ দেখে বুঝলে, অসময়ে-অজায়গায় পা পড়েছে। অত্যন্ত করুণ মুখ করে সে মধুসূদনের মুখের দিকে চাইলে; আঁচলে চোখ মুছে বললে, 'যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখে ঘুম আসে না। আমরা তো আজ আসি নি, কতকালের

সম্বন্ধ, আমরা সইব কী করে?' এদিকে কুমুর দাদা বিপ্রদাসের কলকাতা আসার কথা। শ্যামাসুন্দরী কুমুকে উস্‌কে দিয়ে বললে, 'বাড়ির জন্যে মনটা কেমন করছে। আহা, তা-তো হতেই পারে। তা তোমার দাদা তো আসছেন, দেখা হবে।...তোমার দাদার মতো মানুষ হয় না এই-কথা সবার কাছেই শুনি।' কুমুকে কখনও সে গৃহকাজে আহ্বানের, কখনও দাম্পত্য-কলহে পরামর্শ দেবার ছলে উত্ত্যক্ত করতে লাগল। কুমুর মনে হল, শ্যামাসুন্দরী আর মধুসূদন একই মাটিতে গড়া।

শ্যামা মধুসূদনের রুচির মতো পান সাজতে পারত। মধুর পদশব্দের প্রতীক্ষায় তার পথের মধ্যে পানের বাটা-হাতে অপেক্ষা করত—দু-একটি কথায় মধুর রসের আমেজ লাগত। একদিন নববধূর সম্বন্ধে নূতন-উচ্ছ্বাসে মধুসূদন তাকে উপেক্ষা করে গেল। শ্যামার বড়ো-বড়ো চোখ-দুটি বড়ো-বড়ো অশ্রুজলের ফোঁটায় গেল ভেসে। মধুসূদনকে শ্যামা সত্যই ভালোবাসত। মধুসূদন যে-পথ দিয়ে শোবার ঘরে যেত নিজের হৃদয়টিকে ব্যর্থ-বেদনায় বিদ্ধ করবার পাগলামিতেই যেন সেই পথে সে প্রতীক্ষা করে থাকত—যদি ক্ষণকালের জন্যও কিছু একটা ঘটে। অন্তঃপুরের আঙিনা-ঘেরা বারান্দায় তেতলায় যাবার পথে আর-একদিন শ্যামা ছিল বসে। মধুসূদন তাকে উপেক্ষা করে উপরে গেলে নিজের ভাগ্যের উপর রাগ করে সে রেলিঙে মাথা ঠুকতে লাগল। কুমুকে নিদ্রিত দেখে মধুসূদন আবার এল ফিরে। শ্যামা তার দু-পা বুকে জড়িয়ে গদগদস্বরে বললে, 'আমাকে মেরে ফেলো তুমি।' পরে মধুসূদনের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে নিজের ঘরে পেঁছে চুপি চুপি বললে, 'একটু বসবে না?'

একদিন সকলেই যেমন মধুসূদনকে ভয় করত, শ্যামাসুন্দরীর ভয় ছিল তেমনি। কোন্‌দিক দিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে তার কাছে যাওয়া যায় ঠাহর করতে পারত না। এই-ভয়ের আকর্ষণেই দুরু-দুরু বক্ষে আবরণের অন্তরালে সে মুগ্ধমনে মধুসূদনের কাছে-কাছে ফিরত। এক-একবার অসতর্ক হয়ে মধুসূদন তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে—পরেই এসেছে বিপরীত ধাক্কা। মধুসূদনের বিয়ের পর থেকে শ্যামা আর থাকতে পারছিল না—কোনো-মেয়েকে নিয়ে সেও অন্ধবেগে মেতে উঠতে পারে দেখে তার পক্ষে সংযম রক্ষা করা অসম্ভব হল। কয়েকদিন সাহস করে একটু-একটু সে এগিয়ে আসছিল—দেখছিল, এগিয়ে আসা চলে। সে-রাত্রে মধুসূদনের দুর্বলতা ধরা পড়তে তার ধৈর্য আর বাঁধ মানতে চাইল না। পরদিন কুমু দাদার কাছে গেলেও সে খাবার সময় মধুসূদনের কাছে এল না—পাছে আগের রাত্রের উলটো ধাক্কা লাগে। আহারের পরে মধুসূদনের ডাকে নতনেত্রে লালরঙের বিলাতি-শাল-গায়ে সংকুচিতভাবে তার কাছে গিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল তার মাথায়। রাত্রে অনাহূত উপরে এসে বললে, 'আহা, তুমি একলা।' তখন একটু স্পর্ধার সঙ্গেই শ্যামা যেন আর-কোনো আবরণ রাখতে দিল না—অসংকোচে সকলকে সাক্ষী করেই আপনার অধিকার

পাকা করে নিতে চাইলে। কুমু আসবার আগেই তার দখল সম্পূর্ণ করা চাই। দেখতে-দেখতে চাকরদাসীদের মধ্যে সমস্তই জানাজানি হল—মত্ততা স্থূলভাবেই সংসারে আত্মপ্রকাশ করলে।

মধুসূদনের সঙ্গে শ্যামার সম্পর্কে অপ্রকাশ্যতা আর রইল না—দু-জনেই অকুণ্ঠিত। সেই-সম্বন্ধের মধ্যে সূক্ষ্মতা কিছু ছিল না। শ্যামার সম্বন্ধে মধুসূদনের একটা মোটা-রকমের আসক্তি ছিল—শীতকালের বহু-ব্যবহৃত ময়লা চাদরের মতো তাতে আরাম ছিল—যত্ন-করবার, সামলে-চলবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। মধুসূদন নিজে ইচ্ছা করে যা দিত, তার বেশি দাবি করতে গেলে শ্যামা ধমক খেত, মার খেয়ে তারস্বরে কলহ করত। কিছুদিন আগে এ-বাড়িতে সে নগণ্য ছিল ; সেই স্মৃতিটুকু মুছে ফেলবার জন্য কর্ত্রীত্ব করতে গিয়ে সে বিফল হল। যখন-তখন সে চাকরদের ভর্ৎসনা করত, ফরমাস করত ; অকারণে দোষত্রুটি ধরে গালিগালাজ করত। দুর্বল অধিকারের মধ্যে তার প্রতিমুহূর্তের আশঙ্কা : কুমু পাছে তার আপন-সিংহাসনে ফিরে আসে। এই-ঈর্ষার পীড়নে তার একটুও শান্তি ছিল না। জানত, কুমুর সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা চলবে না—তারা একক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেই। কুমু মধুসূদনের আয়ত্তের অতীত, তাই তার জোর—শ্যামা এতবেশি আয়ত্তের মধ্যে যে তার মূল্য নেই। শ্যামা সেজন্য অনেক কান্না কাঁদত—এই পাওয়া আর না-পাওয়ার মধ্যে সে সামঞ্জস্য খুঁজে পাচ্ছিল না। মধুসূদন যখন তাকে গ্রহণ করে নি, তখন তার দুঃখ এমন অসহ্য ছিল না ; আপন উপবাসী ভাগ্যকে একরকম করে মেনে নিয়েছিল। এই অবস্থায় মেজো-জা নিস্তারিণীর কাছেও তার সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। শ্যামার স্থান এ-বাড়িতে তাই আগের চেয়েও সংকীর্ণ।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় মধুসূদনের শোবার ঘরে কুমুর একটা ফোটোগ্রাফ দেখে যেন শ্যামার মাথায় বজ্র ভেঙে পড়ল। ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তার মুখ বিবর্ণ, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হল। কিছু-একটা অনিষ্ট করে ফেলবার ভয়ে সে ছুটে গেল নিজের ঘরে—বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললে চাদরখানা। রাত্রে ডাক এল উপর থেকে। তার বলবার শক্তি ছিল না যে যাবে না। যথারীতি বুটিদার ঢাকাই-শাড়ি পরে গেল উপরে। ছবিটার দিকে চোখ না-পড়ে এই চেষ্টা। মধুসূদন তার জন্যও এনেছে একটা ফোটোর ফ্রেম। দেখে তার বুকের ভিতরটাতে লাগল চাবুকের ঘা : 'আমার এত সোহাগে কাজ নেই'—বলে সেটা ছুঁড়ে ফেলে মেঝেতে মাথা ঠুকতে লাগল। তারপরে ধমক খেয়ে চলে গেল নিজের ঘরে। বাইরে থেকে আওয়াজ এল : 'মহারাজ বোলায়া।' শ্যামা বললে, 'মহারাজকে বলো আমার অসুখ করেছে।' কিন্তু পরে তাকে উঠে আসতেই হল মধুসূদনের তর্জনে।

পরদিন কুমুর ছবিটা খোয়া গেল। মধুসূদনের প্রশ্নের উত্তরে শ্যামা অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান করলে : 'ছবি! কার ছবি!' মধুসূদন রুদ্ধস্বরে বললে,

'ছবিটা দেখ নি।' শ্যামা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বললে, 'না, দেখি নি তো।' মধুসূদন আবার গর্জন করে উঠল। শ্যামা বললে, 'ওমা কী আপদ। তোমার ছবি আমি কোথায় পাব-যে বের করে আনব।' তখনি কুমুকে আনিয়ে নিতে হুকুম হল। শ্যামা মুখ বাঁকিয়ে কাঠের পুতুলের মতো আড়ষ্ট হয়ে রইল।

শ্রীবিলাস ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বক্তা। শচীশের এক সহাধ্যায়ী। শ্রীবিলাস পাড়াগাঁর ছেলে, কলকাতায় এসে কলেজে প্রবেশ করে। বি. এ. ক্লাসে শচীশকে সে প্রথম দেখাতেই ভালোবেসে ফেললে। মেসের ছেলেরা শচীশের নাস্তিক্য ও অনাচারে কুৎসা রটাত। এক-একদিন রাত্রে শ্রীবিলাসের কান্না আসত। একদিন শচীশ গোলদিঘির ছায়ায় বই পড়ছিল। শ্রীবিলাস বিনা-পরিচয়ে তার কাছে এসে আবোল-তাবোল বকতে লাগল: 'এরা যে বলে আপনি নাস্তিক, সে কি সত্য?' শচীশ অকপটে স্বীকার করলে, সে নাস্তিক। শ্রীবিলাসের মাথা হেঁট হয়ে গেল। শচীশের দেবমূর্তির মতো চেহারা—কিন্তু সোনার বেনে। শ্রীবিলাসের নিষ্ঠাবান কায়স্থের ঘর—জাত-হিসেবে সোনার বেনেকে সে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করত; নাস্তিককে ঘৃণা করত নরঘাতকের চেয়ে বেশি। কিন্তু কালক্রমে নাস্তিক্যে শ্রীবিলাস তার গুরুকেও ছাড়িয়ে উঠল। গোলদিঘিতে শচীশের সঙ্গে সে দেশের কথা ভাবলে; রাষ্ট্রনৈতিক সম্মিলনীতে ভলান্টিয়ারি করলে; পুলিসের অত্যাচার নিবারণ করতে গিয়ে জেলে যাবার জো হল। শচীশের জ্যাঠা জগমোহনের ডাকে সমাজের ডাকাতি ও গোলামির জাল কেটে সে দেশের লোককে মুক্ত করবার ব্রত নিলে। অবশেষে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তি লাভ করে ধুরন্ধর নাস্তিক-হিসেবে ইংরেজি-বুলির চোঘুড়ি হাঁকিয়ে খ্যাতিলাভ করলে।

প্লেগের সময় শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাস ছিল সেবাব্রতী। প্লেগে জগমোহনের মৃত্যুর পরে শচীশ নিরুদ্দেশ। শ্রীবিলাস কিছুদিন দলটিকে নিয়ে জোরের সঙ্গে কাজ চালালে—ধর্ম নাম দিয়ে যারা কিছু মানত তাদের গায়ে পড়ে জ্বালাতে লাগল। দু-বছর পরে খোঁজ পাওয়া গেল, শচীশ চট্টগ্রামের কাছে এক স্বামীজির মন্ত্র নিয়ে কীর্তনে মেতেছে। দলের লোক শচীশের উপরে ভয়ংকর চটে গেল; শ্রীবিলাস শচীশকে এত ভালোবাসত যে, রাগ করতে পারল না। কত নদী পার হয়ে, মাঠ ভেঙে এসে অবশেষে তার নাগাল পেল। রাত্রে তাকে নিরালায় পেয়ে বললে, 'শচীশ, জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ-কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে?' কিন্তু শচীশ তখন ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতার বন্যায় ভাসমান—তর্কের কর্ম নয়। শচীশকে ছেড়ে যাওয়াও শ্রীবিলাসের সাধ্য ছিল না। দলের স্রোতে শচীশের টানে সেও ভেসে বেড়াতে লাগল। ক্রমে তাকেও নেশায় পেল—সবাইকে বুকে জড়িয়ে অশ্রুবর্ষণ করলে, গুরুর পা টিপলে, তামাক সাজালে; তারপরে হঠাৎ একদিন

কী-আবেশে শচীশের এমন একটি অলৌকিক রূপ প্রত্যক্ষ করলে, যা বিশেষ-কোনো দেবতাকেই সম্ভব। শেষে গুরুজির সঙ্গে কলকাতায় এসে তারা বিধবা দামিনীর আশ্রয়ে উঠল। গ্রামের মধ্যে শ্রীবিলাস যে-একটা রসের রাজ্যে ছিল, সেখানে বিশ্বব্যাপিনী নারীর সঙ্গে চিত্তব্যাপী পুরুষের প্রেমের লীলা চলছিল—কঠিন কলকাতায় এসে মানুষের ভিড়ে সেই নেশা জমিয়ে রাখা শক্ত হল। গুরু এবং গুরুভাইদের রস এবং রসতত্ত্বের আলোচনার মাঝখানে অন্তরাল থেকে দামিনীর উচ্চহাসি, আঁচলের চাবির ঝংকার, রান্নাঘরের রান্নার গন্ধ, ঘর-ঝাঁট দেবার শব্দ অনাবৃষ্টির মধ্যে ঝর-ঝর করে এক-পশলা বৃষ্টির মতো হঠাৎ এসে পড়ত। শ্রীবিলাসের মনে হত, রসের স্বর্গ সেইখানেই।

তখন তার চারিদিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া। দিনরাত্রি সেই রসের তরঙ্গ শ্রীবিলাসের যেন অসহ্য হল—যেন সেখান থেকে পালিয়ে সেই চামারদের ছেলেদের মধ্যে রসবর্জিত বাংলা-বর্ণমালার আলোচনাই ছিল ভালো। শীতের শেষে গুরুজির সঙ্গে তারা ভ্রমণে বেরিয়েছিল। শচীশের প্রতি গোপন অনুরাগে দামিনীর প্রকাশ্য ভাব ছিল বিপরীত। দামিনীর অনুরোধে শ্রীবিলাস তার পোষা-বেজি, দেশী-কুকুর ও চিলের পরিচর্যায় নিযুক্ত হল। এদিকে একটা গোপন ব্যথায় তার বুকের মধ্যে টন-টন করতে থাকত—মেয়েরা স্বয়ম্বরা হবার বেলায় তারই-মতো মানুষকে বর্জন করে, যার না-আছে লালসার স্থূলতা, না-আছে বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া। শ্রীবিলাস স্থূলে-সূক্ষ্মে মেশানো মাঝারি মানুষ। শুধু বেদনা বহন করে তাই সে শচীশের ঈর্ষা-উদ্রেকের হাতিয়ার-রূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। একদিন শচীশ বললে: প্রকৃতির সংস্রব পরিত্যাজ্য। শ্রীবিলাস বললে, 'তুমি যাহাকে প্রকৃতি বলিতেছ সেটা-তো একটা প্রকৃত জিনিস; তুমি বাদ দিতে গেলেও সংসার হইতে সে-তো বাদ পড়ে না। অতএব, সে যেন নাই এমন-ভাবে যদি সাধনা করিতে থাক তবে নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হইবে; একদিন সে-ফাঁকি এমন ধরা পড়িবে তখন পালাইবার পথ পাইবে না।'

দামিনী জানত, দাবি করাই শ্রীবিলাসের উপরে অনুগ্রহ করা। একদিন কিছু ভালো বাংলা-বই আনিয়ে দিতে হুকুম হল। শ্রীবিলাস কতকগুলো নির্জলা-আধুনিক বই আনালে। গুরুজি বললেন, 'কী হে শ্রীবিলাস···এর মধ্যে সাত্ত্বিকতার গন্ধ তো বড়ো পাই না।' শ্রীবিলাসেরও ভিতরে-ভিতরে বিদ্রোহ জমছিল—বলে ফেললে, 'একটু যদি মনোযোগ করিয়া দেখেন তো সত্যের গন্ধ পাইবেন।' বইগুলি তাকেই পড়ে শোনাতে হত। দামিনীর সঙ্গে তার আড়াল নেই বলে শচীশের হয়তো ঈর্ষা ছিল—দামিনীর সঙ্গে শচীশের আড়াল আছে বলেই শ্রীবিলাস তাকে ঈর্ষা করত। শচীশ কিছুকাল বাইরে গেলে তাকে আর দামিনীর প্রয়োজন রইল না। শচীশ ফিরে এলে দামিনীর ভাবান্তরে তার উপরে ফর্মাসও বন্ধ হল। শ্রীবিলাস বেকার হয়ে পুনশ্চ গুরুজির দরবারে ভর্তি হল—কিন্তু তার সমস্তই বিস্বাদ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে এক বিপর্যয় ঘটল। গুরুজির এক ভক্তের লাম্পট্যের সংবাদে লীলানন্দ স্বামীকে তারা ছেড়ে এল। শচীশের কৃচ্ছ্রতাও চরমে উঠল—আর সেই খাপছাড়া মানুষটাকে নিয়মে বাঁধবার জন্য দামিনীর চেষ্টারও ত্রুটি রইল না। শ্রীবিলাস মনে-মনে বললে, 'ওরে ও শ্রীবিলাস, জন্মান্তরে যেন সৃষ্টিছাড়ার দলে জন্ম নিতে পারিস এমন পুণ্য কর।' অবশেষে শচীশের অনুরোধে তাকে একলা একটা পোড়োবাড়িতে ছেড়ে আসতে হল।

দামিনীর অনুরোধে শ্রীবিলাস তাকে কলকাতায় রাখতে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে শহরের কাগজে-কাগজে তাদের রক্তপাতের ত্রুটি হয় নি। মাসির বাড়িতে কিংবা অন্য-কোথাও তার স্থান হল না। তখন সে যেতে চাইলে স্বামীজির কাছে। শ্রীবিলাস জানত, দামিনীর পক্ষে তা কত কঠিন। হঠাৎ সাহস করে বলে ফেললে, 'দামিনী, একটি পথ আছে, যদি অভয় দাও তো বলি।...যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে—।' দামিনী তাকে পাগল বলে অভিহিত করায় বললে, 'মনে করো-না, পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়। পাগলামি আরব্য-উপন্যাসের সেই জুতো যা পায়ে দিলে সংসারের হাজার-হাজার বাজে কথাগুলো একেবারে ডিঙাইয়া যাওয়া যায়।' দামিনী যে তার মনের ভাব ইতিপূর্বে তারে-খবর পায় নি তা বলা যায় না—কিন্তু এতদিন পরে একটা জবাবের দাবি উঠল। শ্রীবিলাসের ভবিষ্যতের জন্য সে উদ্বেগ প্রকাশ করায় বললে, 'এইটেই যদি আসল কথা হয়, তবে আমি নিশ্চিন্ত। কেননা, আমার দশা এখন যা আছে তার চেয়ে খারাপ হইবে না।...আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন—এমনকি, তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা না-করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।'

চৈত্রমাসে দিন ফেলে বিবাহ স্থির হল। অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দেবার জন্যই মনের সৃষ্টি—সৃষ্টিকর্তার সেই-আনন্দের উচ্ছ্বাস সেই-ফাল্গুনে ভাড়াটে বাড়ির দেওয়ালগুলোর মধ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠল। ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলো চারিদিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটে উঠল ; ইটকাঠগুলো গানের সুর আর শ্রীবিলাসের মতো সামান্য মানুষ যেন পরশমণির ছোঁয়ায় অসামান্য হয়ে উঠল। বিবাহান্তে জগমোহনের বাড়িটি উদ্ধার করে শ্রীবিলাস কাজে লাগল। প্রোফেসারি সহজেই জুটল ; তার উপরে এক্জামিন-পাসের মোটামোটা নোট লিখে দামিনীর ভাইঝিদুটির বিবাহ এবং ভাইপোদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা হল। বাইরে শ্রীবিলাসের কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ গংগা-যমুনার স্রোতের মতো মিলে গেল। কিন্তু এত সুখ সইল না। পরের ফাল্গুনেই শয্যা নিলে দামিনী। ডাক্তারের দেনার আগুনে সঞ্চিত স্বর্ণটুকু ছাই হয়ে গেলে হাওয়াবদলের পরামর্শ হল। দামিনীর অনুরোধে শ্রীবিলাস

তাকে সমুদ্রতীরে বয়ে আনলে। মাঘের পূর্ণিমা যেদিন ফাল্গুনে পড়ল, সেদিন বিদায় নিয়ে গেল দামিনী।

দামিনীর মৃতদেহ দাহ করে দেশে ফেরার পথে একটি ভাঙা নীলকুঠি শ্রীবিলাসের ভারি ভালো লাগল। কুঠির ফাটলে-ফাটলে ভাঁটিফুলের আর আকন্দের গাছ ফুলে-ভরা—যেন বাসরঘরের শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলে দিয়ে দক্ষিণাবাতাসে লুটোপুটি করছে। সেই-কুঠি একদিন সজীব ছিল—আপনার চারিদিকে সুখ-দুঃখের ঢেউ তুলেছিল। পৃথিবী তার সবুজ আঁচলখানি কটিতে এঁটে একটুখানি ধুলোর চিহ্নের মতো সেই বিভীষিকা একেবারে মুছে দিয়েছে। কিন্তু তার দামিনী! সন্ন্যাসী বলেন মায়া, গৃহীরাও বৈরাগ্যের কথা বলেন। কিন্তু শ্রীবিলাস তো গৃহী হবার অবকাশ পায় নি—সন্ন্যাসী হওয়াও তার ধাতে সয় না। তাই দামিনী তার গৃহিণী নয়, মায়াও নয়—সেই সম্বন্ধের চেয়ে বড়ো। সুখের আশা নিশ্চয়ই সে করেছিল, কিন্তু সুখ দাবি করবার অধিকার রাখে নি। কোনো রাঙা চেলির ঘোমটার নিচে সাহানা রাগিণীর তানে তাদের শুভদৃষ্টি হয় নি—দিনের আলোয় সব দেখে-শুনেই মিলন হয়েছিল।

শ্রীশ ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চিরকুমার-সভার জনৈক সভ্য। শ্রীশ বড়োমানুষের ছেলে। স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয় বলে তার বাপ-মা পড়াশুনার জন্য বেশি চাপ দিতেন না; সে নিজের খেয়াল নিয়ে থাকত। তখন সভাপতি চন্দ্রমাধব বাদে সভার সভ্য এসে ঠেকেছিল তিনটিতে। রুগ্নকায় উৎসাহী শ্রীশ বলত, 'সেই-তো আমাদের সভার গৌরব। এ-সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত।' সভায় অস্থির হয়ে সে মত প্রকাশ করত, 'আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আছেন এ-সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ-সভা পরিত্যাগ করে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল।'

শুক্লসন্ধ্যায় শ্রীশ তার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় একখানা হাতওয়ালা কেদারায় দুই-পা তুলে চুপচাপ সিগারেট ফুঁকছিল; পাশে টিপয়ের উপরে রেকাবিতে এক গ্লাস বরফ-দেওয়া লেমনেড এবং স্তূপীকৃত কুন্দফুলের মালা। বিপিন তার সন্ন্যাসীত্বে কটাক্ষ করায় বললে, 'তুমি কি মনে কর, ভাষায় একটা কথার একটা-বই অর্থ নেই?...আমার সন্ন্যাসীর সাজ এই-রকম—গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্ট গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না-থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি-বুদ্ধি-কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।...কুমারসভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক

কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন? তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।...ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে, তার ছাই ঝেড়ে তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে তার জটা মুড়িয়ে তাকে সৌন্দর্য এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলেপড়ানো এবং দেশালাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি।... কেবল একটি-বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রী-জাতির কোনো সংস্রব রাখব না।...যে-জন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সে-জন্যেই তাঁর পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।'

চন্দ্রমাধব তাঁর ভাগ্নী নির্মলাকে কুমারসভায় গ্রহণের প্রস্তাব করায় শ্রীশ উঠল চটে—কিন্তু ঘরের মধ্যে সহসা নির্মলার আগমনে অপ্রতিভ হল। প্রাক্তন সভাপতি অক্ষয়ের পরামর্শে সভাটি স্থানান্তরিত হল তাঁর শ্বশুরালয়ে। শ্রীশ এবং বিপিন যখন সেখানে প্রবেশ করলে তখনও সেই-ঘরের বাতাসে এসেন্স ও গন্ধতৈলের মিশ্রিত পরিমল, ত্রস্ত-পদপল্লবের শব্দ এবং চুড়ি-বালার ঝংকার সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায় নি। চন্দ্রবাবুর বাসায় সেদিন নির্মলার আবির্ভাবে শ্রীশের মনে তখনও মন্থন চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে বললে, 'নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।' অতঃপর নূতন-সভ্য অবলাকান্তের সন্ধানের অজুহাতে সন্ধ্যাবেলাতেও সেখানে শ্রীশের প্রাদুর্ভাব। অনধিকার-প্রবেশের জন্য মাপ চেয়ে নিয়ে মনে-মনে বললে, 'চক্ষের সম্মুখ দিয়ে একজোড়া মায়া-স্বর্ণমৃগী ছুটে পালাল, ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই।' অনতিপরে সেখানেই দেখা গেল একখানি রুমাল—তার একটি কোণে 'ন'-অক্ষর অঙ্কিত। রসিক ধরিয়ে দিলেন—নির্মলনবনীনিন্দিত নবীননবমল্লিকা! শ্রীশ উৎসাহিত হয়ে বললে, 'রসিকবাবু, আপনার ওই-মগজটি একটি মউচাকবিশেষ...আমাকে-সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি।'

জ্যোৎস্নারাত্রে বিপিনের সঙ্গে পথে বেরিয়ে শ্রীশ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলে: 'সংসাররক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে নারী-জাতিকে অল্পে-অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ওই-যে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বন্ধঘরের একটি জানালা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে-বিপদ নেই।...চিরকুমারের নাড়ীর উপর উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও—কোনো ভয় নেই—বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না।' বিপিন পঞ্চশরের আশঙ্কা করায় বললে, 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ-ভুলে মর ফিরে।' তখনই সে অবলাকান্তের কাছে ছুটল রুমালের খোঁজে; ফিরে এসে আবার রসিককে ধরলে: 'যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।'

চন্দ্রমাধববাবু সভ্যদের নানা-কাজের ভার দিয়েছিলেন। শ্রীশের কাজ কিছুই এগোয় নি—অথচ সে এক-ডজন রুমাল সংগ্রহ করে তার বিনিময়ে আসল রুমালটি সংগ্রহের উমেদারিতে ছিল। আশা ছিল, রুমালটা পেলেই আসল কাজে মন দিতে পারবে। এদিকে ভিতরে-ভিতরে চলছিল কঠিন আত্মধিক্কার—রসচর্চা থেকে মনকে প্রত্যাহরণ করে সংকল্প-সাধনের প্রতিজ্ঞায়। রসালাপ যখন একেবারেই বন্ধ তখন রসিকের সংবাদ: দুটি অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে নৃপবালা-নীরবালার সম্বন্ধ স্থির। সভ্যদের পক্ষে অতঃপর নিশ্চেষ্ট থাকা সম্পূর্ণই অসম্ভব। অতএব—

সতীশ মুখোপাধ্যায় ॥ 'গোরা' উপন্যাস। সুচরিতার ভাই। পিতৃমাতৃহীন সতীশ তার দিদির সঙ্গে পরেশবাবুর আশ্রিত। সে ইস্কুলে পড়ত। অবিরত সে এত বকত যে, সুচরিতা তার নাম দিয়েছিল, বক্তিয়ার। খুদে-নামধারী সাদা-কালো-রোঁওয়াওয়ালা একটা ছোটো কুকুর তার অনুচর। খুদে এক-পা তুলে সেলাম করত, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত, একখণ্ড বিস্কুট দেখলে লেজের উপর বসে দু-পা জড়ো করে ভিক্ষে চাইত। নূতন আলাপী কেউ এলে সেই কুকুরের যতরকম বিদ্যা ছিল সতীশ দেখিয়ে দিত।

প্রতিবেশী বিনয়ের সঙ্গে ঘটনাক্রমে সতীশের আলাপ। একদিন পরেশের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে সে বিনয়কে দেখে চিৎকার করে উঠল। বিনয়ের বাসার মধ্যে গিয়েই সে বললে, 'আচ্ছা বিনয়বাবু···কুকুর রাখেন নি কেন?' এই প্রগল্‌ভতায় পরেশবাবু তার বক্তিয়ার-নামকরণের অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। সতীশ গৌরবহানির ভয়ে ব্যস্ত হয়ে বললে, 'বেশ তো, ভালোই তো।···আচ্ছা বিনয়বাবু, বক্তিয়ার খিলিজি তো লড়াই করেছিল?' আর-একদিন বিনয়কে বাড়িতে বন্দী করে এনে সে একটা আর্গিন এনে উপস্থিত। তাতে চাবি দিয়ে দম দিতেই চৌকো কাচের আবরণের মধ্যে একটা খেলার জাহাজ আর্গিনের সুরে-তালে দুলতে লাগল। সতীশ একবার জাহাজের দিকে একবার বিনয়ের দিকে চেয়ে মনের অস্থিরতা সংবরণ করতে পারল না। খুদে-কুকুরটাও যে-খ্যাতি অর্জন করল সতীশ নিজেই তা আত্মসাৎ করলে।

বিনয় একদিন তাকে সার্কাস দেখতে নিয়ে গেল। অনেক রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে সতীশ তাকে তাদের বিছানায় ধরে আনতে উদ্যত হল। রাত্রে উৎসাহের আতিশয্যে পরেশবাবুর মেয়েদের কাছে বললে, 'আমি তাঁকে বলেছি তোমাদের একদিন সার্কাস দেখাতে নিয়ে যেতে।···তিনি বললেন, মেয়েরা বাঘ দেখলে ভয় করবে। আমার কিন্তু কিছু ভয় হয় নি।' পরদিন বিনয়কে পরেশবাবুর মেয়েদের নিয়ে সার্কাসে যেতে হল। বিনয় ইংরেজি-কাগজ থেকে সতীশের জন্য ছবি কেটে রাখত। সতীশ একটা খাতা করে সেই-ছবিগুলি গঁদ দিয়ে আঁটতে আরম্ভ করেছিল। এমনি করে পাতা-ভরানোর উৎসাহে সে ভালো বই

দেখলেই ছবি কেটে নিতে ব্যগ্র হত—দিদিদের কাছে সেজন্য তাকে তাড়নাও সহ্য করতে হত। একদিন পরেশবাবুর মেজো মেয়ে ললিতা বললে, 'আজ তোর বন্ধুর বাড়িতে যাবি নে?' বিনয়ের উল্লেখমাত্রে সতীশ লাফিয়ে উঠল। ললিতা বললে, 'তিনি তোকে এত ছবি দেন, তুই তাঁকে কিছু দিস নে কেন?' সংসারে প্রতিদান বলে যে একটা দায় আছে সে-কথাটা হঠাৎ উত্থাপিত হওয়াতে সতীশ অত্যন্ত চিন্তিত হল; তার ভাঙা টিনের বাক্সটির মধ্যে নিজের বিষয়-সম্পত্তি যা-কিছু ছিল, তার কোনোটি-ই আসক্তিবন্ধন ছিন্ন করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। ললিতা হেসে বললে, 'আচ্ছা, এই গোলাপফুল-দুটো তাঁকে দিস।' এত সহজে সমস্যার মীমাংসা হওয়াতে উৎফুল্ল হয়ে তখনই সে বন্ধুঋণ শোধ করতে গেল। বিনয় ফুল-দুটি চোরাই মাল বলে সন্দেহ করায় বললে, 'বাঃ, ললিতাদিদি আমাকে দিলেন যে আপনাকে দিতে।'

ললিতারা কয়েকদিন কলকাতার বাইরে গেলে সতীশের বিধবা-মাসি হরিমোহিনী উপস্থিত। পৃথিবীতে সতীশের বলবার বিষয় যে-কটি ছিল তা তার মাসির অবিদিত রইল না। বিনয়ের সঙ্গে ললিতা কলকাতায় এলে সতীশ ছুটে এসে তাদের হাত ধরে বললে, 'আমাদের বাড়ি কে এসেছেন দেখবে চলো।... আচ্ছা, বিনয়বাবু, বলুন-দেখি কে এসেছে?' বিনয় অত্যন্ত অসম্ভব ও অসংগত নাম করতে লাগল; সতীশ উচ্চৈঃস্বরে তার প্রতিবাদ করে মাসির কাছে তাকে ধরে নিয়ে গেল। সতীশ তার মাসিকে পেয়ে বিনয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বচর্চার কথা একরকম ভুলেই ছিল। একদিন ললিতা তাকে বললে, 'ভারি তো তোর বন্ধু। তুইই কেবল বিনয়বাবু-বিনয়বাবু করিস, তিনি-তো ফিরেও তাকান না।' সতীশ বললে, 'ইস। তাই তো। কক্‌খনো না।' পরিবারের মধ্যে ক্ষুদ্রতম সতীশকে নিজের গৌরব প্রমাণের জন্য প্রায়ই গলার জোর প্রকাশ করতে হত; প্রমাণকে দৃঢ়তর করবার জন্য তখনই সে বিনয়ের বাসায় ছুটল। এদিকে বিনয়-ললিতার সম্পর্কে ব্রাহ্মসমাজে কুৎসা রটেছিল। সতীশ তার ইস্কুলে 'পশুর প্রতি ব্যবহার' নামক একটি রচনা লিখে পঞ্চাশের মধ্যে বিয়াল্লিশ পেয়েছিল। বিনয় যে খুব বিদ্বান এবং সমঝদার তা সে জানত—সে যদি তার লেখার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে তাহলে অরসিক লীলা আর সম্বন্ধে অবজ্ঞা প্রকাশ করতে পারবে না। এই আশায় মাসিকে বলে সে বিনয়ের নিমন্ত্রণ ঘটিয়ে লেখাটা পকেটে নিয়ে বেরোল। বিনয় তাকে বাসায় এনে জলখাবার খাওয়ালে, লেখাটা শুনে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে—কিন্তু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে না। অগত্যা সুচরিতার কাছে এসে লেখাটা শোনাবার জন্য সে ধরে পড়ল।

বিনয়-ললিতার অবশেষে বিবাহ স্থির হল। বিনয় সতীশকে নিতবর করবার প্রলোভন দেখিয়ে সপরিজনে নিমন্ত্রণ করলে। খুদে-নামধারী কুকুরটির জন্য লাল-কাগজে-ছাপা একটা পৃথক নিমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছল: খুদের সপরিজন অর্থে সতীশ।

সন্তু ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক বিভীষিকাপন্থী দেশকর্মী। অতীনের জন্মদিনের উৎসবে ভোজপর্বের উপসংহারে সন্তু খামকা তর্ক তুলে বসল: মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে? অতীন তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করায় তার দেশাত্মবোধের ঝাঁজ চড়তে-চড়তে প্রায় বন্ধু-বিচ্ছেদের উপক্রম।

সনাতন ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। চন্দ্রমাধববাবুর এক ভৃত্য।

সন্দীপ ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের অন্যতম বক্তা। নিখিলেশের পূর্বসহাধ্যায়ী দেশনেতা। নানা-উপলক্ষে সন্দীপ. নিখিলেশের কাছে টাকা নিত—খবরের-কাগজ চালানো, স্বাদেশিকতা প্রচার, বায়ুপরিবর্তন ও নিয়মিত সংসার-খরচ। ফাস্টক্লাস ছাড়া চড়ত না, রাজভোগেও তার সংকোচ ছিল না। বলত, 'সংসারে যারা ঈশ্বর ঐশ্বর্যের সম্মোহনই হচ্ছে তাদের সব-চেয়ে বড়ো অস্ত্র।' যেমন জোর তার বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে—সব জায়গাতেই আপন আসনটি জিতে নেওয়াই তার অভ্যাস।

স্বদেশী-যুগে দেশকে মাতিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে দলবলসহ সে নিখিলেশের এলাকায় উপস্থিত: গেরুয়াবন্যার মতো গেরুয়াপরা-যুবকদলের কাঁধে চৌকিতে বসে। তার বক্তৃতায় বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে-দুলে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। চিকের আড়ালে নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার দিকে তার চোখ পড়ল কালপুরুষ নক্ষত্রের মতো। পরদিন নিমন্ত্রিত হয়ে সে প্রথম-সাক্ষাতেই আত্মীয়তা শুরু করলে: 'অন্ন তো রোজই একরকম জোটে, কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন নাহয় আড়ালেই রইল।' স্রোতের জল ঘোলা হলেও ব্যবহার চলে—সন্দীপের সমস্তই এমনি দ্রুতবেগে সচল। তর্কে ঝক্‌মক্‌ করে উঠত তার মনের উজ্জ্বলতা। বিমলার পথরোধ করে তাই সে তর্ক বাধিয়ে দিলে: 'দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে-একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মান না নিখিল?' বিমলার সমর্থন পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে ডান-হাত আকাশে আস্ফালন করলে: 'হুরা! হুরা!…বন্দেমাতরম্‌!… সত্য-জিনিসটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রঙ নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে…এইজন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে…আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই দেশকে বাঁচাবে।…এসো পাপ, এস সুন্দরী! / তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক সঞ্চারি।…যে-আগুন ঘরকে পোড়ায়, যে-আগুন বাহিরকে জ্বালায়, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই-আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদেব অন্যায়কে সুন্দর করো।'

সন্দীপের প্রকৃতি লালসায় স্থূল। সেই মাংসবহুল-আসক্তিই তাকে ধর্ম-

সম্বন্ধে মোহ রচনা ও দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করত। প্রকৃতি স্থূল, অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ম—তাই প্রবৃত্তিকেই বড়ো-নাম দিয়ে সাজিয়ে তুলত। ভোগের তৃপ্তি এবং বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার উগ্ররূপে প্রয়োজন। নিজের কাছে তার সাফাই ছিল এই: 'যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেইটুকুই আমার, এ-কথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে।…লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বভাবিক।…প্রকৃতি আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু সে দস্যুর কাছে।…আধমরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্তফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না।…লজ্জা? না, আমি লজ্জা করি নে।…একদল মানুষ বাঁচবে-না বলে প্রতিজ্ঞা করে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সূর্যাস্তকালের আকাশের মতো মুমূর্ষতার একটা সৌন্দর্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব… আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব; আমাদের দাঁত আছে, নখ আছে…অতএব এ-পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে-ব্যবস্থা আছে তোমার রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগলে থাকলে আমরা মানতে পারব না। হয় চুরি করব, নয় ডাকাতি করব।…আমি যে-চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা-যে বাস্তব পৃথিবীর জীব…ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়…সে একেবারে ভরপুর ইচ্ছা… "অ্যাফিনিটি!" জোড়া-মিলিয়ে-মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন…দরকার-মতো অনেক জায়গায় বলেছি।…অ্যাফিনিটি একটা কেন? অ্যাফিনিটি হাজারটা।…আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরও একটি পাবার পথ বন্ধ হয় নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না-পারি তা-হলে আমি কাপুরুষ।'

সন্দীপ অন্য-কোথাও গেল না। একদিন নিখিলেশের সামনেই বিমলাকে বললে, 'আমার অন্তরকে সব-সময় পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো-এক জায়গায় পাই নি। তাই কেবল দেশে-দেশে নতুন-নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী।…আপনি আমাদের মউচাকের মক্ষিরানী; আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব, কিন্তু সেই-কাজের শক্তি আপনারই, তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট আনন্দহীন হবে।' দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেকটি বিষয়ে সে বিমলার পরামর্শ নিত—বিমলা যা বলত তাতেই সে বিস্মিত। নিখিলেশের বুদ্ধি-বিবেচনা যেন ছেলেমানুষের মতো, তাই নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গে তাকে রেহাই দিয়েছিল। নিখিলের বৈঠকখানাটি সদরে-অন্দরে মিলে উভচর হয়ে উঠল। অতঃপর আমদানি হল ইংরেজি ও বৈষ্ণব কবিতা, স্ত্রী-পুরুষের মিলননীতির

বাস্তব আলোচনা। সন্দীপ তার আত্মজীবনীতে লিখেছিল: 'স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিস; ধুলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর, মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়···যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির-চেন করবার ফর্মাশ।···চোখের সামনে সত্যের এই প্রত্যক্ষ-প্রকাশ দেখতে আমার ভারি চমৎকার লাগছে।···কত লজ্জা, কত ভয়, কত দ্বিধা।···ওই-যে পর্দা উড়ে-উড়ে পড়ছে।···ওই-যে লাল ফিতেটুকু, ছোট্ট এতটুকু, রাশি-রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, ও-যে কালবৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা···আমি যে স্পষ্ট অনুভব করছি তার উত্তাপ।···আমি বস্তুতন্ত্র।···লোভী-মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে···আমি লোভী, তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে-পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে আর লজ্জার লেশমাত্র নেই।'

সত্যের দ্বারাই নিখিলেশকে ফাঁকি দেওয়া সহজ, সন্দীপ তাই কিছু গোপন রাখলে না। বিমলার দ্বিধা-সংকোচ দেখে সে লিখলে, 'ও একবার এগোবে, একবার পিছোবে।···রাগ বলো, ভয় বলো, লজ্জা বলো, ঘৃণা বলো, এ-সমস্তই জ্বালানি কাঠের মতো ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিস এ-আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্ছে আইডিয়াল। মেয়েদের সে-বালাই নেই।···ও ক্রমে-ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন্‌। "মডার্ন্‌" এই কথাটার যদি আশ্রয় পায় তা হলেই ও জোর পাবে; কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরুঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই, শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।' বৈঠকখানায় বিমলার দুদিন অনুপস্থিতি ঘটল। সন্দীপ রেগে-রেগে একটা চিঠি পাঠালে। বিমলা এসে তার প্রয়োজন জানতে চাইতে বললে, 'দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ?···আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই, সে-কথা কি আপনাকে বলি নি?···যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনই তো বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর, কত প্রিয়···আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবেন··· তবেই-তো সে-কথা স্মরণ করে লড়তে-লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব···সে-একখানা আঁচল—কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন যে-একখানি শাড়ি পরেছিলেন, লাল-মাটির মতো তার রঙ, আর তার চওড়া-পাড় একটি রক্তের ধারার মতো রাঙা, সেই শাড়ির আঁচল।'

এদিকে সন্দীপের চেলাদের আনাগোনা, হাটেবাজারে বক্তৃতা চলল। নিখিলের শুকসায়রের হাট থেকে বিলেতি অলক্ষ্মীকে ঝাঁটিয়ে ফেলবার উদ্যোগ হল। নিখিলেশের সমর্থনের অভাবে প্রতিবেশী-জমিদার হরিশ কুণ্ডুর যোগে শুরু হল ধ্বংসযজ্ঞ। গরিব পঞ্চুর কাপড়গুলো পুড়িয়ে দিয়ে বন্দেমাতরম-

ধ্বনির মধ্যে সন্দীপ একমুঠো ছাই তুলে নিয়ে বললে, 'ভাইসব, বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টিসংকারে তোমাদের গ্রামে এই-প্রথম চিতার আগুন জ্বলল। এই ছাই পবিত্র, এই ছাই গায়ে মেখে ম্যানচেস্টারের জাল কেটে-ফেলে নাগা-সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরোতে হবে।' নিখিল পঞ্চুর হয়ে তাকে সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করায় বললে, 'তোমরা যাকে মিথ্যে-সাক্ষী বল আমি সেই মিথ্যে-সাক্ষী দেব।…তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড়ো-বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে মশলাগুলো সব মিথ্যে?' বিলেতি-পণ্য নিষেধের জন্য নিখিলেশের কাছে দরবারে ব্যর্থ হল বিমলা। তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে সন্দীপ ধরলে তার হাত চেপে: 'মক্ষী, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য।' কিন্তু সেই আশ্বাসেতেই তার ইচ্ছার বেগ গেল থেমে—অন্তরা পর্যন্ত পৌঁছল না। জীবনের গভীরতম তলভাগ বহুকালের গতিবেগে তৈরি; মানুষ নিজের কাছে নিজেই এক রহস্য। হাটে যারা মাল আনত সবাই তার বশ—শুধু মিরজানের নৌকোই নায়েবের সাহায্যে ডুবিয়ে দিতে হল। একদিকে মিরজানের কান্না, অন্যদিকে নায়েবের টাকার দাবিতে সন্দীপ বললে, 'রানী, সব হয়ে এসেছে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।'

অনেকদিন সন্দীপের একটা প্ল্যান ছিল: দেশের মধ্যে আগুন জ্বালানোর জন্য দেশের একটি দেবীপ্রতিমা চাই। সে বলত, 'দেশকে চোখে দেখতে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগবে না।…ভারতবর্ষে এই-যে দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর পুজো বাঙালি উদ্ভাবন করেছে, এইটিতেই সে নিজের আশ্চর্য পরিচয় দিয়েছে।…এ-দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালি যে দেশশক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল, এ-দুই দেবী তারই দুই-রকমের মূর্তি।' বিমলার সঙ্গে দেখা হতে সে বললে, 'তোমাকে যদি না দেখতুম তা-হলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক-করে দেখতে পেতুম না।…তোমারই গলায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার; তোমারই কালো-চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীলজলের বহু-দূরপারের বনরেখার মধ্যে; আর কাঁচা ধানের খেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরে শাড়িটি লুটিয়ে-লুটিয়ে যায়; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেছি জ্যৈষ্ঠের যে-রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মতো লাল জিব বের করে দিয়ে হা-হা করে শ্বসতে থাকে। দেবী যখন তার ভক্তকে এমন আশ্চর্য-রকম করে দেখা দিয়েছেন, তখন তারই পুজো আমি আমার সমস্ত-দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে।…কিন্তু আমি যে গরিব।'

পরদিন বিমলার সঙ্গে দেখা হতেই সন্দীপ বললে, 'টাকা চাই রানী!' বিমলা টেবিলের উপরে কতকগুলি মোড়ক রাখলে তার মুখ কালো হয়ে উঠল। তখন তার বালক-ভক্ত অমূল্য মোড়কগুলি খুলতেই ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল ছ-হাজার টাকার গিনি। হঠাৎ মনের এই উল্টো-হাওয়ার উত্তেজনায় বিমলার

দিকে ছুটে এল সন্দীপ—অমূল্যের কথা ভুলে। সহসা বিমলার প্রতিঘাতে পাথরের টেবিলে আহত হয়ে গেল পড়ে। কিছুক্ষণ পরে যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে উঠে সে গিনিগুলো বাঁধতে লাগল। অমূল্য সাড়ে-তিন হাজার রেখে বাকি টাকা ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করায় বললে, 'আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে।…আমরা পুরুষরা বড়ো-জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়।…এই-দানই তো সত্য দান।' বিমলাকে বললে, 'রানী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তা-হলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড়ো জিনিস দিয়েছ।' পরে তার পায়ের কাছে বসে প্রণাম করে বললে, 'দেবী, তোমাকে এই-প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ-ধাক্কাই আমার বর। ওই-ধাক্কাই আমি মাথায় করে নিয়েছি।'

টাকা-নেওয়ার পর থেকে বিমলার উপরে সন্দীপের শক্তি ভালোরকম খেলবার জায়গা পাচ্ছিল না। বিমলা অমূল্যকে ডাকলে গহনা বিক্রির উদ্দেশ্যে। সন্দীপও তখন অনাহূত এসে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ-কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?' অমূল্য চলে যাবার পর বললে, 'অমূল্যর হাতে একটা-কী বাক্স দিলে ওটা কিসের বাক্স?…তুমি কি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না?…মায়ের পুজো-প্রতিষ্ঠার জন্যে তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে-কথা ভুললে চলবে না।…দেখো, তুমি আমার কাছ থেকে অমন করে ফসকে যাবার চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক, তারপরে তোমাদের ওই মেয়েলি ছলাকলা-বিস্তারের সময় হবে।' বিমলার দৃঢ়তায় তার দু-চোখে জ্বলে উঠল মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণা—বিমলাকে লাফ দিয়ে ধরতে গেল। এমন সময়ে নিখিলেশ উপস্থিত। কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে তখন আরম্ভ হল কাব্যচর্চা।

এদিকে কাগজে-কাগজে নিখিলেশের সম্বন্ধে মিথ্যাকথার ধারাবর্ষণ চলছিল; তার কাছে লালকালিতে লেখা বেনামি-চিঠিও পৌঁছেছিল। প্রতিবেশী-জমিদারের সহায়তায় মহিষমর্দিনী পুজো ও প্রজাদের উপর অত্যাচারও চলছিল। ফলে মুসলমান প্রজারা ক্ষেপে উঠতে নিখিলেশ তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। সন্দীপ বললে, 'মুসলমানের ভয়ে না আরও কোনো ভয় আছে?…আচ্ছা… ইতিমধ্যে মক্ষিরানী, তোমার মউচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জন গান করে নেওয়া যাক্। মধু-ঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে। / যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।'—সাহসের অন্ত ছিল না, একেবারে আগুনের মতো নগ্ন, বজ্রের মতো দুর্বার। গিনিগুলো সন্দীপ খরচ করে নি—ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে সেগুলো মেঝের উপর ঢেলে মুগ্ধবিস্ময়ে বলত, 'এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য-পারিজাতের পাপড়ি, এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মতো ঝরে পড়তে-পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে…এ-হচ্ছে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর

লাবণ্য—।' অমূল্য গিনিগুলো ফেরত দিতে চাইলে বলত, 'এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বলো বন্দেমাতরম্। ঘোর কেটে যাক্।' অমূল্যর তোরঙ্গ ভেঙে গহনাগুলোও সে আত্মসাৎ করলে। অমূল্যর হিংস্রমূর্তি দেখে অবশেষে বিদ্রূপের হাসি হেসে তাকে গহনার বাক্স ফিরিয়ে দিতে হল: 'মক্ষিরানী, এ-গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি, তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম।'

বিমলা অমূল্যকে ডেকে পাঠাতে ছল করে সন্দীপ ঘরে এসে পরাভবের সংশয়ে বকতে লাগল: 'যে-চাঁদের টানে ভাঁটা সেই চাঁদের টানেই জোয়ার।...সম্মোহনে-সম্মোহনে কাটাকাটি।...তোমার তূণে অনেক বাণ আছে রণ-রঙ্গিণী!' বিমলার বিদ্রূপে সে পরমুহূর্তে গর্জন করে উঠল: 'তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী-না আমার কাছে ধরা পড়েছে বলো তো।' নিখিল তখন আবার কলকাতা যাবার প্রস্তাব করায় বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'মক্ষিরানী...তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দেমাতরং নয়: বন্দে প্রিয়াং. বন্দে মোহিনীং, মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন, বড়ো সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণ-নৃত্যের নূপুর-ঝংকার বাজিয়ে তুলেছ আমার হৃৎপিণ্ডে।...প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া!...এবার দূরে যাবার সময় এসেছে দেবী। ভালোই হয়েছে।...পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড়ো তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্বনাশ ঘটে... অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম, ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল... আজ তোমার বড়ো-মূর্তিকে বড়ো-মন্দিরে পূজা করতে চললুম, তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব—এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব।' বিমলা আবার সেই-অভিনয়ে ভুলে গহনার বাক্স তাকে ফিরিয়ে দিলে।

এদিকে মুসলমানের দল সন্দীপকে মহামূল্য-রত্নের মতো গোরস্থানে পুঁতে রাখবার উদ্যোগ করছিল। নিখিলেশকে বাইরের ঘরে ডাকিয়ে এনে সেই রুমালে-বাঁধা গিনিগুলো সে টেবিলের উপর রাখলে: 'নিখিল ভুল কোরো না, ভেবো না হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি।...কিন্তু—'। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বিমলার দিকে চাইলে: 'মক্ষিরানী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেছে। রাত্রি-তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি, সে নিতান্ত ফাঁক নয়, তার দেনা চুকিয়ে না-দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশিনী কিন্তু-র হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম, পৃথিবীতে একমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না—তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব দেবী!'—এই বলে গহনার বাক্সটা নামিয়ে রেখে সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করলে।

সমরাদিত্য ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। ঐতিহাসিক যশোহরপতি প্রতাপাদিত্যের কনিষ্ঠ পুত্র। বয়স আট। প্রতাপাদিত্য তাঁর পিতৃব্যের প্রতি অসন্তুষ্ট—সমরাদিত্য এ-সম্বন্ধে সচেতন ছিল। বসন্ত রায় যশোহরে এলে সে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বললে, 'অ্যাঁ দিদি, দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ। আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।' বসন্ত রায় তাকে সেতার দিয়ে, কাঁধে চাড়িয়ে, চশমা পরিয়ে দু-দণ্ডের মধ্যে বশ করে নিলেন।

সরলা ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। আদিত্যের মেসোমশায়ের এক ভাইঝি। 'সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রং···তার বড়ো-বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা-খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথ-বন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।' সরলার ছ-বছর বয়সে তার মা মারা যান টাইফয়েডে—বাবার মৃত্যু দু-বছর পরে। ফুলের চাষে সরলা তার জ্যাঠামশায়ের যোগ্য শিষ্যা এবং সেখানেই সে আদিত্যের সঙ্গে মানুষ। জ্যাঠার মৃত্যুর পরে সে হল অনাথা: আদিত্যের মালঞ্চে তখন পুষ্পের সমারোহ। বিশেষ-বিশেষ ঋতুতে বৌদি নীরজার আহ্বানে সরলা আসত বাগানের সহায়তায়। নীরজা অবশেষে শয্যাশায়িনী হতে সে এল স্থায়ীভাবে। কিন্তু পদে-পদে নীরজার ঈর্ষায় পীড়িত হতে লাগল।

আদিত্যের খুড়তুত-ভাই রমেন বললে, 'মন কোনদিকে।' সরলা বললে, 'যেদিকে তপ্ত-হাওয়া শুকনো-পাতা ওড়ায় সেইদিকে।' সন্ধ্যাবেলায় ঝিলের ঘাটে আবার তার স্তব আরম্ভ হল। সরলা বললে, 'রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী-করে, পরামর্শ দাও আমাকে।' আদিত্যের সম্বন্ধে প্রকাশ করলে সে গোপন ভালোবাসা: 'আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক-মুহূর্তে।···আমার উপর বউদির রাগ দেখে প্রথম-প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল···এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে।···আমি কী করব বলো।···যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।' অনতিপরে আদিত্যের অস্থিরতা লক্ষ্য করে সে বললে, 'তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে-যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য এ-ছাড়া আর-তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।···তেইশ-বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই-শেষবেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি।···নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী।' বাল্যস্মৃতির আলোচনায় আদিত্যের বিহ্বলতায় সে ব্যথিত: 'পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।···মাপ করো আমাকে।'

সহসা নীরজা তাকে সর্বস্ব দান করতে উদ্যত হল। কিন্তু তখনও তার মন

তৈরি নয় দেখে সরলা কুণ্ঠিত : 'ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।…এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না…ভাগ্য যে-দান থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে, কাউকে বঞ্চনা করে সে আমি নেব না।…অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের, যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু-বেলা পুজো করেছি।' দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। কিন্তু তখনও আদিত্যকে তার পিছনে আসতে দেখে অসন্তুষ্ট : 'কেন এলে।…আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।' পরদিন শ্রদ্ধানন্দ-পার্কের সভায় নিশান-হাতে যোগ দিয়ে তার কারাবরণের সংকল্প। আদিত্যকে বললে, 'এই-সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু…আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে।…শুনেইছ, ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে।…আমার হয়ে এই-ব্রতটি তুমি নাও।…কথা দাও ভাই।' আদিত্য তখনই ভবিষ্যতের কথা জানতে চায়। সে বললে, 'জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা-পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।…তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।…ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।'

পরদিন সরলা গেল জেলে। কিন্তু মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছাড়া পেল। সহসা নীরজার মৃত্যুতে আদিত্যের সঙ্গে তার মিলনের বাধা অপসারিত হল।

সাতকড়ি হালদার ॥ 'গোরা' উপন্যাস। সাতকড়ি হালদার গোরার পূর্ব-সহাধ্যায়ী ; কোনো জেলা-আদালতের উকিল। নীলকর সাহেবদের সঙ্গে সংঘর্ষে আটক চর-ঘোষপুরের প্রজাদের রক্ষার জন্য গোরা তার কাছে উপস্থিত। সাতকড়ি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনের দরখাস্ত করলে—কিন্তু ফল হল না। গোরা আসামিদের হয়ে লড়তে অনুরোধ করায় বললে, 'সাক্ষী পাবে কোথায় ? যারা সাক্ষী হতে পারত তারা সবাই আসামী। তারপরে এই সাহেব-মারা মামলার তদন্তের চোটে এ-অঞ্চলের লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা হয়েছে ভিতরে-ভিতরে ভদ্রলোকের যোগ আছে ; হয়তো-বা আমাকেও সন্দেহ করে, বলা যায় না।…অত্যাচার হচ্ছে জানি, কিন্তু কিছুই করবার জো নেই।' গোরা জানতে চাইলে, জো নেই কেন ? সাতকড়ি হেসে বললে, 'তুমি ইস্কুলে যেমনটি ছিলে এখনো ঠিক তেমনটি আছ দেখছি। জো নেই মানে আমাদের ঘরে স্ত্রীপুত্র আছে—রোজ-উপার্জন না-করলে অনেকগুলো লোককে উপবাস করতে হয়।' গোরা প্রশ্ন করলে, হাইকোর্টে ফল হতে পারে কিনা ? সাতকড়ি অধীর হয়ে বললে, 'আরে, ইংরেজ মেরেছে যে—সেটা দেখছ না। প্রত্যেক ইংরেজটিই যে রাজা—একটা ছোটো-ইংরেজকে মারলেও যে সেটা-একটা ছোটরকম রাজবিদ্রোহ। যেটাতে কিছু ফল হবে না সেটার জন্যে মিথ্যে চেষ্টা

করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানলে পড়ব সে আমার দ্বারা হবে না।'

গোরা ক্রিকেটের ছেলেদের পক্ষে পাহারাওয়ালার সঙ্গে মারামারি করে নিজেই গেল হাজতে। সাতকড়ি তার সঙ্গে দেখা করলে। গোরা উকিল দিয়ে বিচার কিনতে অনিচ্ছুক। সাতকড়ি বললে, 'দেখেছ! কে বলবে গোরা ইস্কুল থেকে বেরিয়েছে। ওর বুদ্ধিসুদ্ধি ঠিক সেই রকমই আছে!…ভাই, চট কেন?… সূক্ষ্ম-বিচার করতে গেলে সূক্ষ্ম-আইন করতে হয়, সূক্ষ্ম-আইন করতে গেলেই আইনের ব্যবসায়ী না হলে কাজ চলেই না…তুমি রাজা হলে কী করতে বলো দেখি।' আদালতে ছাত্রদের পক্ষ নিয়ে সে যথাসাধ্য বন্ধুকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে। গতিক দেখে বুঝেছিল, অপরাধ স্বীকার করাই ভালো চাল। তাই সে আবেদন করলে: ছেলেরা দুরন্ত হয়েই থাকে, তারা অর্বাচীন নির্বোধ— ইত্যাদি। ছেলেদের লঘুদণ্ড হল, গোরার হল জেল।

সাধুচরণ ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। রাজলক্ষ্মীর দূরসম্পর্কের এক মামা। রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়ে থেকে তিনি তাঁর সংসারের দেখাশুনা করতেন।

সার্বভৌম ॥ 'গোরা' উপন্যাস। আনন্দময়ীর কাশীবাসী পিতামহ।

সাহেব ॥ 'গোরা' উপন্যাস। মহিমের আপিসের এক বড়োসাহেব। ডালকুত্তার মতো চেহারা। বাবুদের সে বলত, বেবুন। কারো মার মৃত্যু হলে ছুটি দিতে চাইত না; বলত, মিথ্যে-কথা। কোনো-মাসেই কোনো বাঙালি আমলার গোটা-মাইনে পাবার জো ছিল না—জরিমানায়-জরিমানায় শতছিদ্র হত। কাগজে তার নামে একটা লেখা বেরোলে সাহেব ঠাওরালে মহিমের কর্ম। মিথ্যে ঠাওরায় নি।

সাহেব ॥ 'গোরা' উপন্যাস। জনৈক ইংরেজ। ত্রিবেণীগামী কোনো স্টিমারের ফার্স্ট্‌ক্লাসের আরোহী। স্টিমারে ওঠার সময় পিছলে যাত্রীদের দুর্দশায় তিনি হাস্যোপভোগ করছিলেন। গোরা এসে সহসা তিরস্কার করায় সাহেব তার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে নভেল পড়ায় মন দিলেন। শেষে চন্দননগরে নামবার সময় গোরার কাছে এসে টুপি তুলে বললেন, 'নিজের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত—আশা করি আমাকে ক্ষমা করিবে।'

সাহেব ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। জনৈক বিশ্ববিশ্রুত জেনারেল। পশ্চিমের কোনো জংশন-স্টেশনে শশাঙ্ক-শর্মিলা আহারের সন্ধানে গেলে সাহেব স্টেশন-মাস্টারের সাহায্যে তাদের রিজার্ভ-করা কামরাটি দখল করার চেষ্টা করেন। কিন্তু রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে আহার সমাধা করে এসে চুরুট-মুখে দূর থেকে পত্নী-মূর্তির উগ্রতা দেখে তিনি হটে গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরবাবু ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। মুকুন্দলালের গাজিপুরের এক আত্মীয়।

সিসি ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। অমিত রায়ের বোন। সিসি আর তার বোন লিসি হাল-ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক মোড়ক-করা প্যাকেট-বিশেষ। সিসি তখনো শেষের ডিগ্রি পায় নি, 'কিন্তু ডবল-প্রোমোশান পেয়ে চলেছে। উচ্চ-হাসিতে, অজস্র-খুশিতে, অনর্গল আলাপে···সর্বদা একটা চলনবলন টগবগ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায়···কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা; এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক-হাতের পরিবর্তে দুই-হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্টমাসের প্লাম্-পুডিং এবং পৌষ-পার্বণের পিঠে, এই-দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালির কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।'

কেটির দাদা নরেন মিটার সিসির বাহন। বাহন-দশা বৈবাহনে পরিণতির বিষয়ে সিসি মনে-মনে রাজি—কিন্তু যেন 'রাজি নয়'-ভাব দেখিয়ে প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছিল।

সীতারাম ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের এক প্রহরী। এক রাত্রে রাজজামাতার কোনো অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বারে প্রহরী ছিল সীতারাম। যুবরাজ উদয়াদিত্য দু-বার তার প্রাণরক্ষা করেন। তাঁরই আদেশে সীতারাম দ্বার মুক্ত করে পরে মহারাজের কাছে জবাবদিহির জন্য স্বেচ্ছায় তাঁর বন্দিত্ব স্বীকার করলে। অবশেষে জামাতার অন্তর্ধানে কর্মচ্যুত হয়ে সে দুর্দশায় পতিত হল।

সীতারাম নিজে অত্যন্ত শৌখিন-প্রকৃতির—আমোদ-প্রমোদটি না-হলে চলত না। অনেকগুলো গলগ্রহও জুটেছিল। ধারের টাকায় তার শখ এবং সেই গলগ্রহগুলি পুষ্ট হচ্ছিল। উদয়াদিত্য তার বৃত্তির ব্যবস্থা করায় তাঁর পা জড়িয়ে 'ভগবান, জগদীশ্বর, দয়াময়' বলে প্রশস্তি করলে। এদিকে অবস্থা যতই মন্দ হচ্ছিল তার কথার পরিমাণ লম্বা-চাওড়ায় ততই বাড়তে লাগল। মঙ্গলা-নামে এক রমণীর রূপ এবং রূপার দিকে তার আন্তরিক টান ছিল। সীতারাম লাঠি-হাতে চাদর-উড়িয়ে তার কুটিরে এসে গান ধরলে। টাকার

আবশ্যকতা সম্বন্ধে মঙ্গলা প্রশ্ন করায় বললে, 'আবশ্যক এমনই-কী, তবে কী জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে ···আজ সকালে মা জোড়াঘাটা জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন।' বলে তার কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হল: 'তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ।' মঙ্গলা বললে, 'মরু মিনসে। সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন।' সীতারাম বুক ফুলিয়ে বললে, 'সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রা-হরণ হইল কী করিয়া?'

উদয়াদিত্যের জন্য দিল্লীশ্বরের কাছে তারা একটি আবেদন পাঠাবার চক্রান্ত করলে। ফলে যুবরাজ কারারুদ্ধ হলেন। তখন মঙ্গলাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে সীতারাম রায়গড় থেকে নিয়ে এল প্রতাপাদিত্যের খুড়া বসন্ত রায়কে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কারাগারের কাছে আগুন লাগিয়ে সে প্রহরীদের ব্যস্ততার সুযোগে যুবরাজকে মুক্ত করে আনলে। তৎপরে বসন্ত রায়ের সঙ্গে তাঁকে রায়গড়ে রওনা করে দিয়ে কতকগুলো হাড়, মড়ার মাথা আর তাঁর তলোয়ারটি নিক্ষেপ করলে কারাগারে। গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু-সংবাদ রাষ্ট্র হলে সে হৃষ্টমনে বাড়ি ফিরল এবং কালবিলম্ব না করে সপরিবারে রায়গড়ে চলে এল। অবশেষে স্বেচ্ছানির্বাসিত উদয়াদিত্যের সঙ্গে সে চলে গেল কাশীতে।

সুকুমার ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। জনৈক রাজনৈতিক কর্মী।

সুখন ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। অন্নদাবাবুর এক বেহারা।

সুচরিতা (রাধারানী) ॥ 'গোরা' উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর আশ্রিতা বন্ধুকন্যা। আসল নাম রাধারানী; পরেশের পরিবারে তার নাম সুচরিতা। তার মুখের ডৌলটি সুকুমার; বুদ্ধিদীপ্ত আলজ্জিত মুখশ্রী; দৃষ্টি স্থির-শক্তিতে পূর্ণ, সপ্রতিভ। 'ভ্রূ-যুগলের উপরে ললাটটি যেন শরতের আকাশখণ্ডের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ।' ঠোঁট-দুটির মধ্যে কোমল-একটি কুঁড়ির মতো যেন অনুচ্চারিত কথার মাধুর্য। সাত-বছর বয়সে রাধারানীর মাতৃবিয়োগ। পিতা রামশরণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে পরেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। পিতার অকাল-মৃত্যুতে ছোটোভাই সতীশের সঙ্গে রাধারানী পিতৃপ্রতিম পরেশের আশ্রিত। পরেশের আন্তরিক যত্নে তাঁর কাছে অধ্যয়ন ও বহুতর প্রসঙ্গের আলোচনা করে সে বয়স-অপেক্ষাও অনেক পরিণত এবং পরেশবাবুর মেয়েদের শ্রদ্ধার পাত্রী।

শেষবয়সে পরেশ কলকাতায় এলে ব্রাহ্মসমাজখ্যাত হারানের সঙ্গে পরিচয়ের জন্য সুচরিতা উৎসুক ছিল। অবশেষে হারানের সঙ্গে তার শুধু পরিচয়ই হল না, তাঁর চিত্ত জয় করে সুচরিতা এক ভক্তিমিশ্রিত গর্ব অনুভব করলে। ব্রাহ্মসমাজের হিতসাধনের জন্য হারানের উপযুক্ত-সঙ্গিনী হওয়াই তার আগ্রহের বিষয় হল। কিন্তু সুচরিতা পরেশের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ মনে-মনে আলোচনা

না করে পারত না। পরেশবাবু ব্রাহ্মসমাজের সত্যের কাছে অবনত। ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের অজুহাতে অহংকৃত হারানবাবু যখন তাঁকেও আঘাত করবার চেষ্টা করতেন, সুচরিতা আহত ফণিনীর মতো অসহিষ্ণু হয়ে উঠত।

ক্রমে প্রতিবেশী বিনয়ের সঙ্গে তাদের আলাপ হল। তার অভিন্নহৃদয় বন্ধু গোরার উগ্র-হিন্দুয়ানির প্রসঙ্গে তার সঙ্গে সুচরিতার তর্ক হত। একদিন মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো গোরা স্বয়ং উপস্থিত। সুচরিতার ইচ্ছা করতে লাগল, কেউ সেই উদ্ধত যুবককে একেবারে লাঞ্ছিত-পরাস্ত করে দেয়। এমন সময়ে হারানের আগমনে সুচরিতা খুশি হল—যদিও তার তার্কিকতায় এমনিতে সে বিরক্ত ছিল। হারান বাঙালিচরিত্রের নিন্দা করায় গোরা বজ্রনাদ করে উঠল। গোরার সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক পার্থক্য-সত্ত্বেও তার স্বদেশের প্রতি মমত্ব ও স্বজাতির জন্য বেদনা সুচরিতার মনে অনুকূল প্রতিধ্বনি তুলল। হারান তর্কে হেরে গাল দেবার উপক্রম করায় সে লজ্জিত-বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করলে। গোরা কথাবার্তায়-আচরণে তাকে লক্ষই করলে না—সুচরিতার মনের মধ্যে এই-বেদনা অনির্দিষ্ট একটা বোঝার মতো চেপে রইল। দ্বিতীয় দিনে গোরা এলে আবার তর্ক। সুচরিতা টেবিলের দূরপ্রান্তে বসে পাখার আড়াল থেকে তাকে দেখছিল। বিনয়ের সঙ্গে আলোচনায় এতদিন যাকে কোনো-একটি বিশেষ দলের অসামান্য লোক বলেই মনে হয়েছিল, তাকে আজ সে দেখলে সমস্ত দলের ও মতের অতিরিক্ত একটি বিশেষ মানুষ-রূপে। চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র যেমন অকারণে উদ্‌বেল হয়ে ওঠে, সুচরিতার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করে তার অন্তঃকরণ তেমনি অকারণে চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, এই প্রথম যেন সে দেখতে পেল। হারান তর্কে ভঙ্গ দিয়ে তাকে পাশের ঘরে ডাকলে সুচরিতা কর্ণপাত করলে না। গোরা অবশেষে তাকেই সম্বোধন করলে। ভারতবর্ষ বলে যে-একটা বৃহৎ-প্রাচীন সত্তা আছে, সে-সত্তা যে দূর অতীত ও সুদূর ভবিষ্যৎকে বেষ্টন করে নিভৃতে মানুষের ভাগ্যজালে এক সূক্ষ্ম-বিচিত্র সুতোয় বুনে চলেছে—গোরার প্রবল কণ্ঠের আবেদনে সুচরিতা আন্দোলিত হৃদয়ে প্রথম তা অনুভব করলে।

গোরা অনেকদিন এল না। সুচরিতার সম্মুখে একটা অপরিচিত অপূর্ব দেশ সহসা মরীচিকার মতো দেখা দিয়েছিল, জীবনের এতদিনকার জানাশোনার সঙ্গে সে-দেশের একান্ত বিচ্ছেদ। সেই অপূর্ব-অজ্ঞাত-ভয়ংকর সিংহদ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে সংশয়ে তার বুক কাঁপছিল। এই সংশয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিশেষভাবে উপাসনা ও পড়াশুনায় মন দিয়ে শিশুকালের মতো পরেশবাবুকে আবার তাঁর ছায়াটির মতো সে আশ্রয় করতে চাইলে। বললে, 'বাবা, আগে তুমি আমাকে যেরকম করে পড়াতে এখন সেই-রকম করে পড়াও না কেন?...আমি কিছু বুঝতে পারি নে, আমি আগের মতো তোমার কাছে পড়ব।' পরেশবাবু হিন্দুসমাজের যে-সমস্ত ত্রুটির উল্লেখ করলেন, সুচরিতা তার উপরে বিনয় ও

গোরার মতকে স্থান দিতে পারল না—তবু গোরার মতকে উড়িয়ে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। গোরার বুদ্ধি ও বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত মুখ কেবলই তার মনে পড়তে লাগল। গোরার শুধু কথা নয়, গোরা স্বয়ং; তার আকৃতি আছে, গতি আছে, প্রাণ আছে—তা স্বদেশপ্রেমের বেদনায় পূর্ণ। কেউ তাকে যে এতবড়ো সংশয়ের মধ্যে ফেলে অনায়াসে উদাসীনের মতো দূরে যেতে পারে, এইকথা মনে করে তার কান্না আসতে লাগল।

এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলোর আমন্ত্রণে অভিনয়ের জন্য নাটকের মহড়ায় পরেশের স্ত্রী বরদাসুন্দরী তাকে নেন নি। পরেশবাবু তাকে যোগ দিতে আদেশ করায় সুচরিতা কর্তব্যপালনে অগ্রসর হল। পরেশবাবু হারানের সঙ্গে বিবাহে তার মত জানতে চাইলেন। নিজের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনকে কোথাও চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করতে পারলে সুচরিতা বাঁচে—তাই সে অবিলম্বে নিশ্চিতভাবে সম্মতি দিলে। অভিনয়ের জন্য তারা এল কলকাতার বাইরে। ঘটনাক্রমে গোরাও সেখানে এসে কোনো অপরাধ ঘটিয়ে গেল জেলে। হারানবাবু গোরার নিন্দা করায় সুচরিতা ব্যথিতহৃদয়ে ঘরে গিয়ে দ্বার দিলে। পরেশের মেজো-মেয়ে ললিতা তাকে বাড়ি ফিরতে অনুরোধ করায় বললে, 'সে কী করে হবে ভাই?…বাবা যখন পাঠিয়ে দিয়েছেন তখন যেজন্যে এসেছি তা না-সেরে যেতে পারব না।…নরকযন্ত্রণাও সইতে হয়।…আজকের দিন জীবনে আর-কখনো ভুলতে পারব না।' ললিতা বিনয়ের সঙ্গে চলে এল কলকাতায়। সুচরিতা তার কর্তব্যটুকু কলের মতো সম্পন্ন করলে। চিরদিন নিজেকে সংযত করে রাখাই তার স্বভাব ছিল।

বাড়ি এসে সুচরিতা পরেশবাবুকে বলে গোরার মাকে সান্ত্বনা দিতে গেল। আনন্দময়ীর স্নেহের মধ্য দিয়ে সে গোরা ও বিনয়কে নূতন করে দেখলে। ইতিমধ্যে সুচরিতার বিধবা মাসি হরিমোহিনী সেখানে এলেন। তাঁর মধ্যে সুচরিতা তার হারানো-মাকে ফিরে পেল। সুচরিতা নালিশ করবার মেয়ে নয়—কিন্তু প্রতি-মুহূর্তে তাঁর প্রতি বরদাসুন্দরীর অন্যায়ে জর্জরিত হয়ে পান-আহার সম্বন্ধে সে মাসির অনুবর্তী হয়ে চলতে লাগল। হারানবাবু তার এই-পরিবর্তনে পরেশকে ভর্ৎসনা করায় সুচরিতা দ্বিধা কাটিয়ে বললে, 'বাবা…যদি আমার এই আচরণ সহ্য করে থাকেন ত-হলেই হল। আপনাদের যদি ভালো না-লাগে আপনারা যত খুশি আমার নিন্দা করুন, কিন্তু বাবাকে বিরক্ত করছেন কেন?' হারানবাবুর কাগজে পরেশবাবুর পরিবারের আলোচনার সূত্রপাত হল। সুচরিতা সেদিন এমনই একখানি কাগজ কুটিকুটি করে ছিঁড়ছিল। হারানবাবু বিবাহের বিষয়ে তার মত জিজ্ঞাসা করায় জানালে: তার মত নেই। হারানবাবু তার প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের অভিযোগ করায় বললে, 'আমি যদি একশো-বার ভুল করে থাকি তবে কি আপনি জোর করে আমার সেই-ভুলকেই অগ্রগণ্য করবেন?'

গোরা জেলে যাবার পর থেকে তার সম্বন্ধে সুচরিতার অন্তরের ভাব সুস্পষ্ট

ও দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। এদিকে হারানবাবু ও মাসির সমস্যা। এই সংকটের সময় তার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন পরেশবাবু। তাঁর কাছে এ-সমস্ত কথা সে উপস্থিত করতে পারত না, কিন্তু পরেশের জীবন ও সঙ্গমাত্র তাকে নিঃশব্দে কোন্ পিতৃক্রোড়ে কোন্ মাতৃবক্ষে আকর্ষণ করে নিত। পরেশবাবু উপাসনায় বসলে সে নিঃশব্দে কাছে এসে বসত ; সেই নিস্তব্ধ-গভীর শান্তির স্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে মনে-মনে বলত, 'বাবার পা-দুখানা মাথায় চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণের জন্য যদি মাটিতে পড়িয়া থাকিতে পারি তবে আমার মন শান্তিতে ভরিয়া উঠে।' একদিন রাত্রে হরিমোহিনী বরদাসুন্দরীর তিরস্কারে বিদায় নিতে উদ্যত। সুচরিতা পরেশবাবুকে না-বলে তাঁকে যেতে দিলে না। শুতে যাবার আগে পরেশের পড়া শুনতে এসে তাঁকে ব্যথিত করে তোলবার ভয়ে কিছু বলতেও পারল না। পরেশবাবু তার মনের কথা বুঝে মাসির সঙ্গে তাদের অন্য-বাড়িতে পাঠাতে চাইলেন। বাড়িটি সুচরিতার পিতার অর্থে কেনা। পরেশের বাসার অনতিদূরেই সে বাড়ি। পরেশের তত্ত্বাবধানেই থাকতে পারবে বলে সুচরিতা আরাম বোধ করেছিল। কিন্তু নূতন-বাড়ির গৃহসজ্জা সমাপ্ত হলে তার বুকের ভিতরে যেন টেনে ধরতে লাগল। বিদায়ের দিন উপাসনান্তে পরেশবাবু তাকে আশীর্বাদ করলেন ; তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। হারানবাবুকেও সে নম্র নমস্কার করলে। হারানবাবু সহসা ললিতা-বিনয়ের সম্বন্ধে কুৎসিত কটাক্ষ করায় সে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল : 'হারানবাবু, আপনার ঘরে গিয়ে আপনার বিচারশালা আহ্বান করুন। গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান করবেন, আপনার এ-অধিকার আমরা কোনোমতেই মানব না।'

গোরা জেল থেকে বেরোলে সুচরিতা তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। কারাবাসের দ্বারা গোরার দেহের শীর্ণতা, বিশুদ্ধ অগ্নিশিখার মতো গোরার উদ্দীপ্ত মূর্তি তাকে করুণামিশ্রিত-ভক্তির আবেগে পীড়ন করতে লাগল। গোরার অনুপস্থিতিতে তার রচনাগুলিই সুচরিতার অবলম্বন ছিল। কিন্তু গোরা একদিন নিজেই দেখা করতে এসে বিনয়-ললিতার কুৎসার প্রসঙ্গে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলে সংকোচ দূর করে সে মনের মধ্যে শক্ত হয়ে বসল। গোরা আবেগপূর্ণ হৃদয়ে হিন্দুসমাজের ক্ষমা ও বৈচিত্র্যের কথা বলতে লাগল। সুচরিতা তার চোখের মধ্যে এমন-একটি ভবিষ্যৎ-নিবদ্ধ ধ্যানদৃষ্টি দেখলে, যা জগতের বড়ো-বড়ো সংকল্পকে যোগবলে সত্য করে তোলে। সমাজের অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকের তত্ত্বালোচনা সে শুনেছিল, কিন্তু এ-যেন আলোচনা নয়, সৃষ্টি। বজ্রপাণি ইন্দ্রের মতো গোরার বাক্য প্রবলমন্দ্রে তার বক্ষঃকপাটকে স্পন্দিত করে ক্ষণে-ক্ষণে বিদ্যুতের তীব্রচ্ছটা তার রক্তের মধ্যে নৃত্য বাধিয়ে দিলে।

পরদিন [illegible] এ[illegible]দের ঠাকুরকে প্রণাম করায় তার সঙ্গে এই মূলগত বিশ্বাসের বিরোধে সু[illegible] ব্যথিত হল। ভারতবর্ষের ধর্মতত্ত্বে যে-মহত্ত্ব,

ভক্তিতত্ত্বে যে-গভীরতা, শ্রদ্ধাপ্রকাশের দ্বারা সেই দেশের হৃদয়কে জাগ্রত করার জন্য তাকে আবেগবিহ্বল কণ্ঠে আহ্বান করলে গোরা। সুচরিতার দু-চোখে শুধু জল পড়তে লাগল : হায়, কোথায় ছিল ভারতবর্ষ! কোন্ সুদূরে ছিল সুচরিতা! কোথা থেকে এল সেই ভাবে-ভোলা তাপস। সকলকে ঠেলে এল তারই পাশে ; কোনো সংশয় করলে না, বাধা মানলে না। গোরা বিদায় নেবার পরে পরেশবাবু উপস্থিত ; তাঁর উদ্বিগ্ন মুখের দিকে চেয়ে তার বুক ফেটে গেল। এতদিন যিনি পিতৃহীনার পিতা এবং গুরু ছিলেন, আশৈশবের সেই-বন্ধন ছেদন করে কে তাকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। বিনয় হিন্দুমতে ললিতাকে বিবাহের সংকল্প করেছে, এই-সংবাদে সে আকস্মিক-আবেগে বলে উঠল, 'না বাবা, সে কখনোই হতে পারবে না। কিছুতেই না।' গোরা না কি পরেশের কাছ থেকে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই হিন্দুমতে বিবাহের কথায় সে অস্বাভাবিক আক্ষেপ প্রকাশ করলে। হরিমোহিনী গোরার সঙ্গে তার সম্পর্ককে নিতান্ত সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান করে দেখলেন। সুচরিতা স্থির করলে, গোরার সম্বন্ধে কোনো সংকোচ কারো কাছে রাখবে না। পরদিন গোরা এসে তার গভীর দৃষ্টিশক্তিতে মুগ্ধতা প্রকাশ করায় বললে, 'আপনি অমন করে যখন বলেন আমার মনের মধ্যে ভারি একটা ব্যাকুলতা বোধ হয়।...আমার কেবলই ভয় হতে থাকে আমার উপরে আপনি যে বিশ্বাস রেখেছেন সে পাছে সমস্তই ভুল বলে একদিন আপনার কাছে ধরা পড়ে।' হরিমোহিনীর তিরস্কারে সুচরিতা গেল পাকশালায়। তখনি হারান এসে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তার কর্তব্য স্মরণ করাবার চেষ্টা করলেন। সুচরিতা উনোনে তেলের কড়া চাপিয়ে জানালে, সে হিন্দু এবং গোরা তার গুরু।

হরিমোহিনীর জন্য গোরার আসা বন্ধ হল। সুচরিতা বললে, 'তিনি নাই আসলেন, কিন্তু তিনিই আমার গুরু, আমার গুরু।' অপ্রত্যক্ষ গুরুকেই মনের মধ্যে বেশি করে অনুভব করে সে গোরার রচনা পড়ে তার বাক্যগুলিকে বিনা-প্রতিবাদে গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু গোরার সেই তেজস্বী-মূর্তি দেখবার ও বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য এক নিবৃত্তিহীন ঔৎসুক্য প্রতি মুহূর্তে তার শরীরকে ক্ষয় করতে লাগল। ললিতা একদিন গোরার সঙ্গে তার মিলনের ইঙ্গিত করলে। সুচরিতা তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরলে : 'না না না! পাগলের মতো কথা বলিস নে ললিতা, যে-কথা মনে করা যায় না সে-কথা মুখে আনতে নেই।' সুচরিতার মনে একটি বোধ সঞ্চার হচ্ছিল। বরদাসুন্দরীর অপ্রসন্নতা স্বীকার করেও সে পরেশের কাছে এল : 'বাবা...আমি ঠিক যেন একটা নূতন জীবন পেয়েছি, সে-একটা নূতন চেতনা।...আমার সঙ্গে একদিন আমার দেশের অতীত এবং ভবিষ্যৎকালের কোনো-সম্বন্ধই ছিল না ; কিন্তু সেই মস্তবড়ো সম্বন্ধটা যে কতবড়ো সত্য-জিনিস আজ সেই উপলব্ধি আমার হৃদয়ের মধ্যে...আশ্চর্য করে পেয়েছি...আমি কেন বলতে পারব না আমি

হিন্দু?' পরেশবাবু বোঝালেন : সে-সমাজের বহির্গমনের পথ আছে, তার ভিতরে প্রবেশের পথ বন্ধ। সুচরিতা এইকথা গোরাকে বলবার জন্য ব্যগ্র হল। গোরার ভারতবর্ষ ক্ষয়ের মুখে চলেছে—গোরার উচিত ছিল এই-সময়ে সম্মুখে এসে তাকে আদেশ করা, তাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া। গোরা কেন তার শক্তির পরীক্ষা করলে না, তাকে অসাধ্য সাধনের আহ্বান করলে না ; কেন তাকে সে লোকলজ্জার বেড়া-দেওয়া কর্মহীনতার মধ্যে ফেলে গেল। গোরা যতই শক্তিমান পুরুষ হোক, সুচরিতাকে তার অবশ্যই প্রয়োজন। সুচরিতা সতীশকে কোলের কাছে টেনে বলছে, 'তুই বড়ো হলে কী হবি বল্ দেখি।···আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে বড়ো করে তুলতে হবে। বড়ো করব কী! আমাদের দেশের মতো বড়ো আর-কী আছে। আমাদের প্রাণকেই বড়ো করে তুলতে হবে।'

পরেশবাবু হিন্দুমতে ললিতার বিবাহে সম্মতি দিলেন। আনন্দময়ী বিবাহের উপলক্ষে সুচরিতাকে নিতে এলে হরিমোহিনী বাদ সাধলেন। পরদিন সুচরিতা নিজেই বিবাহবাড়িতে গিয়ে ধোওয়ামোছা, সাজানো গোছানো, ফর্দ-তৈরির ধুম লাগিয়ে দিলে। অনেকদিন পীড়নের পরে আনন্দময়ীর কাছে সে যেমন আনন্দ পেলে তেমন কখনো পায় নি। কোনো-প্রয়োজন না থাকলেও আনন্দময়ীকে সে কেবলই মা-বলে ডাকতে লাগল। বিবাহ সম্পন্ন হবার পরে ক্লান্তদেহে বিছানায় শুয়ে সে আপনা-আপনি বলতে লাগল—মা, মা, মা! আনন্দময়ীকে ছেড়ে সে সহজে আসতে পারল না। হরিমোহিনী তাকে নিতে এলে মাসির সম্মানরক্ষার জন্য সুচরিতা অবশেষে বাড়ি এল। হরিমোহিনী তাঁর বিপত্নীক দেবরের সঙ্গে তার বিবাহের জন্য চেষ্টিত। সুচরিতা তাঁর অভিপ্রায় বুঝে তখনই আনন্দময়ীর কাছে চলে গেল। হরিমোহিনী অগত্যা গোরার কাছ থেকে সেই-বিবাহের বিধান নিয়ে উপস্থিত। সুচরিতা সে পত্র পড়ে কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে রইল : গোরার পত্রের অর্থ কি? সে কি কর্তব্যে কোনো হানি করেছে? গোরার জন্য সে-যে পথ চেয়ে ছিল। তাকে গোরার দান করবার এবং তার কাছ থেকে তার প্রত্যাশা করবার কি কিছুই নেই?

এই অসহ্য কষ্টে সুচরিতা পরেশবাবুর কাছে এল। পরেশবাবু ঘরে-বাইরে উৎপীড়িত হয়ে একলা কোথাও বেরিয়ে পড়তে উৎসুক। সুচরিতা তাঁর তোরঙ্গ গুছিয়ে দিতে-দিতে অশ্রু-উদ্‌গত-মুখে সঙ্গে যেতে চাইলে। এমন সময়ে গোরা উপস্থিত। সে আইরীশম্যানের সন্তান : এই-জন্মকথা অবগত হয়ে সে সর্বমানবের ভারতদেবতার মন্ত্রদীক্ষায় পরেশকেই গুরুত্বে বরণ করলে। গোরার আহ্বানে সুচরিতা তার হস্তধারণ করে পরেশের পদতলে ভূমিষ্ঠ হল।

সুচেত সিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার রাজবাড়ির এক প্রাচীন ভৃত্য। ভুবনেশ্বরী-মন্দিরের পরিচারক জয়সিংহের পিতা। জাতিতে রাজপুত।

সুচেত সিংহ ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। দিল্লীশ্বর শাজাহানের সৈন্যবাহিনীর জনৈক রাজপুত বীর। যুবরাজ দারার আদেশে সুলেমান ও জয়সিংহের সঙ্গে সুজার বিরুদ্ধে তিনি অভিযান করেন।

সুজা ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক সম্রাট শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। সুজা ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা; রাজমহলে তাঁর রাজধানী।

পিতার অসুস্থতার সংবাদে দিল্লি-অভিযানকালে দারার-প্রেরিত সৈন্যদলের প্রতিরোধে তিনি বিজয়গড় কেল্লা অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু দারার সৈন্যদের অতর্কিত-আক্রমণে বিজয়গড়-দুর্গে বন্দী হলেন। ত্রিপুরাপতি গোবিন্দমাণিক্য-কর্তৃক নির্বাসিত রঘুপতি তখন সেখানে আশ্রিত। তাঁরই সহায়তায় বন্দিশালা থেকে পালিয়ে সুজা এলেন রাজমহলে। সহসা ঔরংজীবের সিংহাসন-প্রাপ্তির সংবাদ পেয়ে হাতে কিছু সময় পাবার আশায় তাঁকে লিখলেন: নয়নের জ্যোতি হৃদয়ের আনন্দ পরমস্নেহের প্রিয়তম ভাই ঔরংজীব সিংহাসন-লাভে কৃতকার্য হয়েছেন এতে তিনি মৃতদেহে প্রাণ পেয়েছেন, এখন তাঁর বাংলা-শাসনভার নূতন-সম্রাট মঞ্জুর করলেই আনন্দের আর-কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সেই আর্থিক সংকটের সময়ে রঘুপতির কাছ থেকে কিছু নজরানা পেয়ে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের নির্বাসন এবং রাজভ্রাতা নক্ষত্রের রাজ্যপ্রাপ্তির নির্দেশ এবং সেইসঙ্গে তাঁকে কিছু মোগলসৈন্যও দিলেন। স্বেচ্ছায় গোবিন্দমাণিক্য অতঃপর রাজ্য ছেড়ে এলেন চট্টগ্রামে।

ঔরংজীবের সৈন্যতাড়িত সুজাকেও দীনবেশে পালাতে হল: এলাহাবাদ থেকে পাটনা, পাটনা থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে বসন্তপুর এবং সেখান থেকে তোণ্ডায়। যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বে তাঁর কন্যার সঙ্গে ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদের বিবাহ স্থির ছিল। মহম্মদ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে এলে ঘটনাক্রমে সেই বিবাহ সম্পন্ন হল। সহসা ঔরংজীবের অবশিষ্ট সৈন্যদের আক্রমণে সুজা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রকে হারিয়ে পালিয়ে এলেন ঢাকায়। বিপদের দিনে মহম্মদ ধনপ্রাণ তুচ্ছ করে তাঁর পক্ষাবলম্বন করায় তিনি প্রাণের সঙ্গে তাকে ভালোবাসতে লাগলেন। কিন্তু ছলপূর্বক পুত্রের উদ্দেশে প্রেরিত ঔরংজীবের একটি পত্র দেখে অবশেষে অবিশ্বাস করে তাকে বিদায় দিলেন।

অতঃপর যুদ্ধের আশা ত্যাগ করে সুজা মক্কা যাবার অভিপ্রায়ে চট্টগ্রামে এলেন। প্রবল চেষ্টায় সেখানে জাহাজও পেলেন না। তখন বালকবেশী তিন-কন্যার সঙ্গে ফকিরবেশে তিনি গোবিন্দমাণিক্যের আশ্রয়ে উপস্থিত। ফকিরকে চট্টগ্রামে [illegible] কুষ্ঠ-বালক সসংকোচে তাঁর কাছ ঘেঁষে বসল। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের পরিচয় জেনে রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে তিনি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন। এমন সময়ে অনুতপ্ত রঘুপতি গোবিন্দমাণিক্যের কাছে এলে সুজা আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, 'মহারাজ, আমিও

তোমার শত্রু, আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।…ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচলাম।'

কিছুকাল গোবিন্দমাণিক্যের কাছে থেকে সুজা আরাকানপতির আশ্রয়ে এলেন। অবশেষে আরাকানপতির পুত্রদের সঙ্গে নিজ কন্যাদের বিবাহে অসম্মতির ফলে যুধ্যমান অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

সুধীর ॥ 'গোরা' উপন্যাস। পরেশবাবুর মেয়েদের এক বন্ধু। সুধীর কলেজে বি. এ. পড়ত। চেহারাটি প্রিয়দর্শন, রঙ গোর, চোখে চশমা, গোঁফের রেখা উদীয়মান। ভাবখানা চঞ্চল, একদণ্ড বসে থাকতে নারাজ; সর্বদাই মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করে, বিরক্ত করে তাদের অস্থির করে রাখত। মেয়েরা কেবলই তর্জন করত, কিন্তু সুধীরকে না হলে চলত না। সার্কাস দেখাতে, জুঅলজিকাল-গার্ডেনে নিয়ে যেতে, কোনো শখের জিনিস কিনে আনতে সে সর্বদাই প্রস্তুত। পরেশবাবুর বড়োমেয়ে লাবণ্য। সুধীর কখনো তার চাবি চুরি করে, কখনো দেরাজের-মধ্যে রক্ষিত সেই কবি-যশঃপ্রার্থিনীর উপহাস্যতার উপকরণ লোকসমাজে উদ্‌ঘাটনের ভয় দেখিয়ে দৌড়াদৌড়ি-কলহাস্য বাধিয়ে তুলত; আবার তাকে সে ফুলের তোড়াও উপহার দিত।

গোরার বন্ধু বিনয়ের পরীক্ষা দিতে একটাও আর বাকি ছিল না। সুধীর মনে-মনে তার ভক্ত ছিল। বিনয়ের যে-রকম ইংরেজি-জ্ঞান, যে-রকম বিদ্যা-বুদ্ধি, তাতে তার ব্রাহ্মসমাজে যোগ না-দেওয়াই তার মনে হত অসংগত। ম্যাজিস্ট্রেটের আমন্ত্রণে নাটকের অভিনয়ে সুধীরও ছিল অন্যতম অভিনেতা। ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে গোরার শাস্তি তার মনকেও বিকল করে দিয়েছিল—কিন্তু বড়ো-বড়ো সাহেবদের সামনে নিজের বিদ্যা প্রকাশ করবার প্রলোভনে সে বাড়ি ফিরতে পারল না।

ললিতাকে বিবাহের জন্য বিনয়ের ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাবে সুধীর উৎসাহিত হয়ে উঠল। পরে হিন্দুমতে বিবাহ হলে ব্রাহ্মসমাজের কঠোরতায় তাতে যোগ দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হল। ললিতা গাড়িতে উঠে দেখলে কাগজের মোড়কে জর্মান-রুপোর একটি ফুলদান—তাতে ইংরেজি-ভাষায় লেখা: 'আনন্দিত দম্পতিকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন'—আর-একটি কার্ডে ইংরেজিতে সুধীরের নামের আদ্য-অক্ষর।

সুবোধ ॥ 'যোগাযোগ' উপন্যাস। কুমুদিনীর ছোটোদাদা। পিতার মৃত্যুর পরে বড়োভাই বিপ্রদাসের উপরে তখন মোটা-অঙ্কের দেনা। কুমুদিনীর বিবাহের জন্যও তিনি চিন্তিত। সুবোধ মাথা-ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসি, রোজগার না-করলে চলবে না।'

বিলেত থেকে তার চিঠি আসত নিয়মমতো। ক্রমে ফাঁক পড়তে লাগল।

প্রথমে সে হিসাব করেই খরচ চালাত—বাড়ির দুঃখের কথা তখনও তার মনে তাজা ছিল। ক্রমে সেটুকু হয়ে এল ছায়ার মতো, খরচও বেড়ে চলল। বড়ো চালে চলতে না-পারলে সামাজিক উচ্চশিখরের আবহাওয়ায় পৌঁছানো যায় না—তাহলে বিলেতে আসাই ব্যর্থ হয়। কয়েকবার তারযোগে অতিরিক্ত টাকা পাঠাতে হল—শেষে জরুরি দাবি এল হাজার পাউণ্ডের। বিপ্রদাস জানালেন: টাকা পাঠাতে গেলে কুমুর পণের সম্বলে হাত দিতে হয়। সুবোধ লিখলে: কুমুর পণের টাকা সে চায় না; সম্পত্তিতে তার অর্ধেক অংশ বিক্রি করে যেন টাকা-পাঠানো হয়—সঙ্গে পাঠালে তার পাওয়ার-অফ-অ্যাটর্নি।

ঋণের ফাঁসে কুমুর বিবাহ হল মহাজন মধুসূদনের সঙ্গে। তখন প্রতি-মুহূর্তে পীড়িত কুমুকে বাঁচানোর জন্য ঋণশোধের অভিপ্রায়ে বিপ্রদাস সুবোধকে আসতে লিখলেন। সুবোধ জানালে, বারের ডিনার শেষ না-করে দেশে ফিরলে আবার যেতে হবে; ডিনার সেরে মাঘ-ফাল্গুন-নাগাদ ফিরলেই সুবিধে, অনর্থক খরচও বাঁচে—বিষয়কর্মের প্রয়োজন ততদিন সবুর করা উচিত।

সুরমা ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহরের যুবরাজ উদয়াদিত্যের স্ত্রী। শ্রীপুররাজের কন্যা। রাজপরিবারে সুরমার সমাদর ছিল না। এক-একদিন উদয়াদিত্য এই-বঞ্চনার বিষয় আলোচনা করতেন। সুরমা বলত, 'প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাকো, ধৈর্য ধরিয়া থাকো। একদিন সুখের দিন আসিবে।' কখনো বলত, 'আমার মাথা খাও, ও-কথা থাক্।...আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে।...সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই-সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই-আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদয় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না।' পিতৃব্য বসন্ত রায়কে যশোহরপতি হত্যার চক্রান্ত করায় উদয়াদিত্য তাঁকে রক্ষা করতে গেলেন। উদয়াদিত্যের বোন বিভা দাদার জন্য শঙ্কিত হল। সুরমা বললে, 'ছিঃ বিভা, এখন কি তাহা ভাবিবার সময়?... আমার বিশ্বাস, সংসারে যাহার কেহই নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়।'

প্রতাপাদিত্যের খড়্গ প্রতিহত হয়ে সুরমার উপরে পড়ল। বিভা সুরমার সুখ দুঃখের অংশভাগিনী। তার স্বামী অনেকদিন যশোহরে আসেন নি। সুরমা বসন্ত রায়কে বলে তাঁকে আনালে। কিন্তু সামান্য-কারণে তাঁর উপরেও রাজরোষ উদ্যত হল। উদয়াদিত্যের সংকল্প, পিতার বিপক্ষে দাঁড়াবেন। সুরমা তাঁর পাশে এসে বললে, 'পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোনোমতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দাও।' উদয়াদিত্য রুদ্ধদ্বারে বলপ্রয়োগ করে দেখতে গেলেন। সুরমা কিছুদূর এসে স্বামীর বক্ষ আলিঙ্গন করলে। শয়নকক্ষে এসে অশ্রুচোখে

জোড়হাত করে বললে, 'মাগো, যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা করো। আমি-যে তাঁহাকে আজ এই-বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা।' মনে-মনে সেই-অন্ধকারে সুরমা মার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলে—কিন্তু তিনি যেন তা নিলেন না। সেই-অন্ধকারে সে দেখলে এক প্রলয়ের মূর্তি। সুরমাকে পিত্রালয়ে পাঠানোর আদেশ হল। উদয়াদিত্য শঙ্কিত হলেন : সুরমাকে যদি কেউ তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়? সুরমা দৃঢ়বলে স্বামীকে আলিঙ্গন করলে : 'সে যম পারে, আর কেহ পারে না।' মনে-মনে বজ্রের বল বেঁধে সে বললে, 'আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।'

সুরমা নিজেকে দিয়ে তার স্বামীকে ঢেকে রাখতে চাইত। অদৃষ্ট তার স্বামীকে অবিরত যে-কাজেই প্রবৃত্ত করছিল, সবগুলোই তাঁর পিতার বিপক্ষে। অথচ সুরমার মতো স্ত্রী তাঁকে সে-কাজে নিবৃত্ত করতে পারে না। জামাতার পলায়নে কর্মচ্যুত প্রহরীদের উদয়াদিত্য বৃত্তি দিচ্ছিলেন। স্বামীকে নিরস্ত করে বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়ে সুরমা নিজেই তাদের বৃত্তি পাঠাতে লাগল। এদিকে সে পিত্রালয়ে না গেলে উদয়াদিত্যের কারারোধের ভয়। স্বামীর পা-দুটি বুকে জড়িয়ে সুরমা কেঁদে উঠল। একটা মহাশূন্য-ভবিষ্যৎ যেন তাকে গ্রাস করতে উদ্যত—যেখানে সেই-মুখ নেই, সে-হাসি নেই, সে-আদর নেই ; বুক ফেটে মরে গেলেও এক-মুহূর্তের জন্য তাঁর দেখা আর সে পাবে না। উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে সে পড়ে থাকে—চেয়ে থাকে মুখের দিকে। বিভাকে বলে, 'বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলাম।'

একদিন মহিষী তাকে একটা ওষুধ দিলেন। সেই ওষুধ খেয়ে সন্ধ্যাবেলায় সুরমা আর দাঁড়াতে পারল না। শয়নকক্ষে এসে বিছানায় পড়ে বললে, 'বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্, আর বিলম্ব নাই।' উদয়াদিত্যকে দেখে সে দুই-বাহু বাড়িয়ে বললে, 'এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।' উদয়াদিত্য তার মুখখানি তুলে ধরতে তার দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অবশেষে শাশুড়ির পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে শেষরাত্রে তার সব শেষ হয়ে গেল।

সুরমা ॥ 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। লাবণ্যর এক ছাত্রী। যোগমায়ার কন্যা।

সুরমা ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলার ছাত্রী। তার কাকার মেয়ে।

সুরেশ ॥ 'চার অধ্যায়' উপন্যাস। এলার কাকা। এলার পিতার অর্থে পড়াশুনা করে সুরেশ বিলেত গিয়েছিলেন। দাদার মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন ডাকবিভাগের উচ্চ-পদে। এলা তাঁর আশ্রয়ে এলে ভাইঝির রূপে-গুণে-বিদ্যায় তাঁর জেগে উঠল গর্ব। উপরওয়ালা, সহকর্মী, দেশী-বিলেতি আলাপী-

পরিচিতের কাছে নানা-উপলক্ষে তিনি তাকে প্রকাশিত করতে ব্যগ্র হলেন। এলার প্রতি তাঁর স্ত্রীর বিরক্তির কারণ তিনি বুঝলেন না; কিন্তু বিবাহের প্রতি এলার বারংবার-বিমুখতায় উদ্বিগ্ন না-হয়েও পারলেন না।

একদা বহুখ্যাত দেশকর্মী ইন্দ্রনাথ সুরেশের গৃহে নিমন্ত্রিত। এলা তাঁর কাছে দেশব্রতে জীবন উৎসর্গ করায় ব্যথিত হয়ে বললেন, 'তোকে আর-কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুলতে দোষ কী।' কিন্তু স্ত্রীর প্রতিকূলতা আর এলার জিদের জন্য তাঁকে হার মানতে হল।

সুলেমান ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ঐতিহাসিক সম্রাট শাজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার ছেলে। শাজাহানের শেষ-বয়সে সুলেমান পিতার আদেশে সুজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

সুশীলা ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের এক পিতৃবন্ধু ঈশানের কন্যা। শিশুকালে পিতৃহীনা সুশীলা তার মার সঙ্গে দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত। পরে রমেশের সঙ্গে তার বিবাহ এবং বিবাহান্তেই নৌকাডুবিতে তার মৃত্যু হয়।

স্বরূপচন্দ্র ॥ 'করুণা' উপন্যাস। জনৈক সমাজ-সংস্কারক ও কবি—'কবিতা-কুসুমমঞ্জরী'-প্রণেতা। এদেশের স্ত্রীলোকদের শোচনীয় দুর্দশায় স্বরূপচন্দ্র কাতর। বিধবা মোহিনীকে অন্তঃপুরের বাইরে আনার জন্য সে ভাবিত ছিল। নরেন্দ্রের সঙ্গে তার আলাপ হতেই বললে, 'দেখ নরেন্দ্রবাবু, শরৎকালের জ্যোৎস্নারাত্রে কখনও ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢলঢল-হাসি ঢালতে-ঢালতে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন মনের মধ্যে কেমন-একটা কষ্ট উপস্থিত হয় তা কি কখনো সহ্য করেছ? তা যদি করে থাকো তবে বলো দেখি, স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখলে সেইরূপ কষ্ট হয় কি না?' বোতল এবং প্লেট-সহযোগে এই-সমস্ত আলোচনা হত; সংবাদপত্রে-মাসিকপত্রে প্রেমের কবিতাও প্রেরিত হত।

মোহিনীর ব্যাপারে মহেন্দ্রকে অন্যায়-প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে স্বরূপচন্দ্র কিছু কবিতা লিখলে এবং নিজেকে এক অলিখিত উপন্যাসের নায়ক কল্পনা করে তৃপ্ত অনুভব করলে। অবশেষে নরেন্দ্রের বাড়িতে এসে উঠল সে; তার পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রী কাত্যায়নীকে উপলক্ষ করে তার কবিতাবলীও মুদ্রিত হল। কবিত্বচিন্তায় স্বরূপ সর্বদাই মগ্ন, দৃষ্টি আকাশ-নিবদ্ধ—বড়ো-বড়ো কবিদের মতো তার অন্যমনস্কতা এবং কবিতাগুলি ইতস্তত বিকীর্ণ। চারিদিকে তার সবই ছিল, তবু কী-যেন ছিল না। কাত্যায়নী দেবী গদাধরের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্টা হলে তার দৃষ্টি পড়ল নরেন্দ্রের অন্তঃপুরে। নিধিরামের কথায়

বিশ্বাস করে একরাত্রে সে এল অভিসারে। ফলে গৃহচ্যুতা হয়ে করুণা নিরাশ্রিত হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে আশ্রয় দিলে। স্বরূপ তাকে গান শোনাত, কবিতা শোনাত, মনের দুঃখ নিবেদন করত—কিন্তু সেই ভুল ভাঙতে দেরি হল না। একদিন কাশী-স্টেশনে অগত্যা করুণাকে ফেলে সে নিরুদ্দেশ।

হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের এক প্রহরী।

হবিচাচা ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ॥ 'গোরা' উপন্যাস। কৃষ্ণদয়ালের এক বেদান্তের শিক্ষক। হরচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কেবল পণ্ডিত ছিলেন না, তাঁর মতের ঔদার্য ছিল অসাধারণ। শুধু সংস্কৃত পড়ে এমন তীক্ষ্ণ অথচ প্রশস্ত বুদ্ধি প্রায় দুর্লভ। কৃষ্ণদয়ালের কাছে যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সমাগম হত, গোরা তাদের সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিত। কিন্তু বিদ্যাবাগীশের চরিত্রে ক্ষমা ও শান্তিতে পূর্ণ এমন-একটি অবিচলিত ধৈর্য ও গভীরতা ছিল যে, গোরা সংযত না-হয়ে পারত না।

হরসুন্দর মাইতি ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। কটকের এক পিতলকাঁসার কারিগর।

হরি ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। বসন্ত রায়ের এক প্রজা।

হরিচরণবাবু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের এলাকার এক দারোগা। কিশোর-বয়সে হরিচরণ রিপন কলেজে পড়তেন। একবার স্ট্যান্ডে এক গোরুর-গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাতে গিয়ে জেলে যাবার উপক্রম করেন। নিখিলেশের এলাকায় তাঁর অবস্থানকালে সেখানে আসে দেশকর্মী অমূল্য। সে তাঁর এক পূর্বসহাধ্যায়ীর ছেলে।

এক-রাত্রে অমূল্য নিখিলেশের কাছারি লুঠ করায় পুলিসের সন্দেহ পড়ে তার নায়েব আর কাসেমের উপর। নিখিল বলে, কাসেম বিশ্বাসী। কিন্তু বিশ্বাসী-লোক যে চুরি করতে পারে না, তা প্রমাণ করা শক্ত। অমূল্য আবার কাছারিতে গেলে হরিচরণ সংবাদ পেয়ে ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে তাকে ধরলেন। নিখিলেশ ভদ্রলোকের ছেলেকে টানাটানি করতে নিষেধ করায় বললেন, 'শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে, তিনি আমার ক্লাস-ফ্রেন্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ব্যাপারখানা কী। অমূল্য জানতে পেরেছেন কে চুরি করেছে, এই বন্দেমাতরমের হুজুক-উপলক্ষে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে চান। এই-সব হচ্ছে ও'র বীরত্ব।'

হরিভাবিনী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। নলিনাক্ষের মাতামহী।

হরিভাবিনী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। গাজিপুরের ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর স্ত্রী। হরিভাবিনীর শরীর কাহিল বলে চক্রবর্তী লোকসমাজে প্রচার করতেন। কিন্তু তাঁর দৌর্বল্যের বাহ্যলক্ষণ কিছুই ছিল না। বয়স অল্প নয়, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা—সামনের কিছু-কিছু চুল পাকা, কাঁচার অংশই বেশি। জরা তাঁর সম্বন্ধে কেবল ডিক্রি পেয়েছিল, দখল পায় নি। দম্পতিটি যখন তরুণ ছিলেন, হরিভাবিনী খুব শক্ত-ম্যালেরিয়ায় পড়েন। বায়ুপরিবর্তনের জন্য অবশেষে স্থায়ীভাবে তাঁদের গাজিপুরে বাস।

রমেশ-কমলা চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপের পরে গাজিপুরে এল। তখন হরিভাবিনী প্রাচীরবেষ্টিত-প্রাঙ্গণে রামকৌলিকে দিয়ে গম ভাঙাচ্ছিলেন এবং নানাপ্রকার ভাঁড়ে ও হাঁড়িতে চাটনি রৌদ্রে দিচ্ছিলেন। কমলার চিবুক স্পর্শ করে তিনি বললেন, 'দেখিয়াছ, মুখখানি অনেকটা আমাদের বিধুর মতো।' কমলার সঙ্গে তাঁর বড়োমেয়ে বিধুর কোনো সাদৃশ্য ছিল না—কিন্তু হরিভাবিনী রূপেগুণে বাইরের মেয়ের জয় স্বীকার করতে পারেন না। ছোটোমেয়ে শৈলজা তাঁর ঘরেই থাকে; পাছে তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ-তুলনায় বিচারে হার হয়, এজন্য অনুপস্থিতকে উপমাস্থল করে তিনি জয়পতাকা অচল রাখলেন। বললেন, 'ইঁহারা আসিয়াছেন, তা বেশ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নতুন-বাড়ির তো মেরামত শেষ হয় নাই—এখানে আমরা কোনোমতে মাথা গুঁজিয়া আছি—ইঁহাদের যে কষ্ট হইবে।' বাজারে চক্রবর্তীর একটা ছোটো দোকানবাড়ি মেরামত হচ্ছিল, কিন্তু সেখানে বাস করবার কোনো সুবিধা ও সংকল্প ছিল না। চক্রবর্তী কোনো প্রতিবাদ না-করে হাসলেন। হরিভাবিনী কমলার বিস্তৃত পরিচয় নিতে লাগলেন: 'তোমার স্বামী বুঝি উকিল? তিনি কতদিন কাজ করিতেছেন? তিনি কত রোজগার করেন? এখনো বুঝি ব্যবসা আরম্ভ করেন নাই? তবে চলে কী করিয়া? তোমার শ্বশুরের বুঝি সম্পত্তি আছে? জান-না? ওমা, কেমন মেয়ে গো। শ্বশুরবাড়ির খবর রাখ না? সংসার-খরচের জন্য স্বামী তোমাকে মাসে কত করিয়া দেন? শাশুড়ি যখন নাই তখন-তো সংসারের ভার নিজের হাতেই লইতে হইবে। তুমি-তো নেহাত কাঁচ মেয়েটি নও—আমার বড়োজামাই যা-কিছু রোজগার করে সমস্তই বিধুর হাতে গনিয়া দেয়'—ইত্যাদি প্রশ্ন এবং মন্তব্যের দ্বারা তিনি কমলাকে অর্বাচীন প্রতিপন্ন করে দিলেন। পরক্ষণেই আবার শুরু করলেন: 'বউমা, দেখি তোমার বালা, এ-সোনা তো তেমন ভালো নয়। বাপের বাড়ি হইতে কিছু গহনা আন নাই? বাপ নাই? তাই বলিয়া কি এমন করিয়া গা খালি রাখে? তোমার স্বামী বুঝি কিছু দেন নাই? আমার বড়োজামাই দুই-মাস অন্তর আমার বিধুকে একখানা করিয়া গহনা গড়াইয়া দেয়।' এই সওয়াল-

জবাবের মধ্যে শৈলজা উপস্থিত। হরিভাবিনী কমলার পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ইঁহার স্বামী উকিল, নূতন রোজগার করিতে বাহির হইয়াছেন। পথে কর্তার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তিনি ইঁহাদের গাজিপুরে আনিয়াছেন।'

হরিমতি ॥ 'চোখের বালি' উপন্যাস। রাজলক্ষ্মীর বাল্যসখী। বিনোদিনীর মা।

হরিমতি ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। বিমলার এক দাসী।

হরিমোহন ॥ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস। শচীশের বাবা। শিশুকালে হরিমোহন অসুস্থ ছিলেন। তাগাতাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, সন্ন্যাসীর জটানিংড়ানো জল, পীঠস্থানের ধুলা, ঠাকুরের প্রসাদ, চরণামৃত, গুরু-পুরোহিতের আশীর্বাদে তিনি ছিলেন গড়বন্দী। বয়সকালে ব্যামো ছিল না, কিন্তু তিনি যে বড়োই কাহিল এই-সংস্কার ঘুচল না—শরীরটা গেল-গেল ভাব করে তিনি সকলকে শাসিয়ে রাখলেন। সকলের আগে তাঁর আহার, আহারের আয়োজন স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে কাজ কম, বিশ্রাম বেশি। মা-মাসি, ঠাকুর-দেবতা, যেখানে যে-পরিমাণ সুবিধা পাওয়া যায় তাকে সেই-পরিমাণেই তিনি মেনে চলতেন। গো-ব্রাহ্মণের তো কথাই ছিল না—থানার দারোগা, ধনী প্রতিবেশী, উচ্চপদের রাজপুরুষ, কাগজের সম্পাদক—সকলকেই যথোচিত ভয়-ভক্তি করতেন। যথাকালের অনেক পূর্বে হরিমোহনের বিবাহ হয়। তিন-মেয়ে তিন-ছেলের পরে শচীশের জন্ম। তাঁর বড়োভাই জগমোহন তাকে অধিকার করায় তাতে লাভের অংশটুকু খতিয়ে দেখে হরিমোহন খুশিই ছিলেন।

জগমোহনের প্রকৃতি বিপরীত। সেখানে মুসলমানদের ভোজনের আয়োজন দেখে হরিমোহনের ফোঁটাতিলক আগুনের শিখার মতো তাঁর মগজের মধ্যে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে তুলল। রাগে অস্থির হয়ে শচীশকে ডাকিয়ে বললেন, 'তুই নাকি যত তোর চামার-বাবাদের ডাকিয়া এই বাড়িতে আজ খাওয়াইবি?' জগমোহনকে বললেন, 'তুমি কি ব্রাহ্ম হইয়াছ?' পাড়ার মুসলমানদের তিনি ঘাঁটাতে সাহস করলেন না—অতঃপর দাদার বিরুদ্ধে লাগলেন। দেবত্র-সম্পত্তিতে তাঁদের সংসার চলত। হরিমোহন নালিশ রুজু করলেন: জগমোহন সেবায়েত-পদের অযোগ্য। মকদ্দমায় জয়লাভ করে তিনি ভাবলেন, শচীশ এবার নিঃস্ব জগমোহনকে ছেড়ে আহারের গন্ধে তাঁর সোনার খাঁচাকলের মধ্যে ধরা দেবে। ধর্ম-সম্বন্ধে যেমনি হোক, খাওয়া-পরা টাকা-কড়ি সম্বন্ধে মানুষের এই স্বাভাবিক সুবুদ্ধি আছে বলেই মানবজাতির প্রতি হরিমোহনের একটা শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু শচীশ নির্বিকার। হরিমোহন তখন রটাতে লাগলেন, শচীশকে আটকে জগমোহন নিজের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করবার একটা কৌশল খেলছেন। প্রায় সাশ্রুনেত্রে সবাইকে বললেন, 'দাদাকে কি আমি খাওয়াপরার

কষ্ট দিতে পারি? কিন্তু তিনি আমার ছেলেকে হাতে রাখিয়া এই যে শয়তানি চাল চালিতেছেন, ইহা আমি কোনোমতেই সহিব না। দেখি তিনি কত-বড়ো চালাক।' শচীশ তবুও বাড়ি গেল না। নিজের ছেলে এমন পর হওয়াতে হরিমোহন অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

বড়োছেলে পুরন্দরকে হরিমোহন স্নেহের রসে গলিয়ে দিয়েছিলেন। তার জন্য সর্বদাই তাঁর চোখ ছলছল করত। পুরন্দরের দ্বারা প্রলুব্ধ ও লাঞ্ছিত একটি মেয়েকে শচীশ জ্যাঠার কাছে এনেছিল। গৃহস্থঘরের দেওয়ালের অপরপাশে বাপ-পিতামহের ভিটায় একটা ভ্রষ্টা-মেয়ে বাস করছে শুনে হরিমোহনের সর্বশরীর সংকুচিত হয়ে উঠল। শচীশ এই-পাপের মধ্যে লিপ্ত আছে এবং নাস্তিক জ্যাঠা এতে প্রশ্রয় দিচ্ছে—এই-কথা সর্বত্র রটাতে লাগলেন। শচীশ যে তার দাদার হাত থেকে মেয়েটাকে ছিনিয়ে নেবে, এও তাঁর অশাস্ত্রীয় ও অস্বাভাবিক বোধ হল। মেয়েটির একটি মিথ্যা-মা খাড়া করে তিনি জগমোহনের কাছে পাঠালেন। শচীশ অগত্যা মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাব করায় আলুথালুবেশে হরিমোহন দাদার কাছে উপস্থিত: 'এ কী সর্বনাশের কথা শুনিতেছি?···শচীশ তোমার ছেলের মতো—তার সঙ্গে এই পতিতা মেয়ের তুমি বিবাহ দিবে?···দাদা, আমি তোমার কাছে হার মানিতেছি—আমার আয়ের অর্ধ-অংশ আমি তোমার নামে লিখিয়া দিতেছি; আমার উপরে এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিও না।' জগমোহনের কাছে তাড়া খেয়ে তিনি শচীশের কাছে এসে তাকে আড়ালে ডাকলেন: 'এ কী শুনি! তোর কি মরিবার আর জায়গা জুটিল না? এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিতে বসিলি?···তোর কি ধর্মজ্ঞান একটুও নাই? ওই-মেয়েটা তোর দাদার স্ত্রীর মতো, উহাকে তুই—'। বাধা পেয়ে শেষে যা মুখে এল তাই-বলে তাকে গাল পাড়তে লাগলেন।

কলকাতায় প্লেগ দেখা দিলে হরিমোহন ভাবলেন, প্রতিবেশী চামারগুলোকে আগে প্লেগে ধরবে। পালাবার সময় একবার দাদাকে বললেন, 'দাদা, কালনায় গঙ্গার ধারে বাড়ি পাইয়াছি, যদি—'। কিন্তু চামারদের প্রতিই তাঁর সহানুভূতিতে মুখ বাঁকিয়ে তিনি শচীশের কাছে গেলেন। সেখানেও হতাশ হয়ে তিনি ভরা-কলির এই দুর্লক্ষণ দেখে খুদে-অক্ষরে দুর্গানাম লিখে দিস্তে-খানেক বালির কাগজ ভরিয়ে ফেললেন।

প্লেগের সেবাব্রতে জগমোহনের মৃত্যু হল। শচীশের সঙ্গে হরিমোহনের দেখা হলে বললেন, 'নাস্তিকের মরণ এমন করিয়াই হয়।' পরে দাদার বাড়িটা দখল করে তিনি ভাড়াটে বসিয়ে দিলেন; সেখানে মুসলমান মরেছিল বলে নিজে ব্যবহার করলেন না।

হরিমোহিনী ॥ 'গোরা' উপন্যাস। সুচরিতার মাসি। বাল্যকালে কাকাদের আদরে হরিমোহিনীর মাটিতে পা-ফেলবার অবকাশ ঘটত না। পালসার বিখ্যাত

রায়চৌধুরীদের ঘরে আট-বছর বয়সে তাঁর বিবাহ। কিন্তু বিবাহের খরচপত্র নিয়ে পিতার সঙ্গে শ্বশুরকুলের বিবাদে তাঁর লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। বহু পরিবারের ঘর। তাঁকে সেই-বয়সেই রাঁধতে হত। সকলের পরিবেষণের পরে কোনোদিন শুধু ভাত, কোনোদিন শুধু ডালভাত খেয়েই কাটত। আহারান্তেই রান্না চড়িয়ে আবার আহার সমাধা হত রাত-বারোটায়। শোবার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। অন্তঃপুরে যার সঙ্গে যেদিন সুবিধা হত তার সঙ্গেই সেদিন শুয়ে পড়তেন। অনেকদিন পর্যন্ত স্বামীর অবজ্ঞাও তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল।

সতেরো-বছর বয়সে কন্যা মনোরমার জন্মের পর হরিমোহিনীর গঞ্জনা চরমে উঠল। এই-অনাদর ও লাঞ্ছনার মধ্যে মেয়েটিই তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা ছিল। তিন-বছর পরে তাঁর একটি পুত্র হলে অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়। শ্বশুরের মৃত্যুর পরে বিষয় নিয়ে আবার দেবরদের সঙ্গে মকদ্দমা বাধল। অবশেষে অনেক সম্পত্তি নষ্ট করে তাঁরা পৃথক হলেন। যথাকালে মনোরমার বিবাহ হল। শেষের দিকে হরিমোহিনীর স্বামী তাঁকে বড়োই আদর-শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু এ-সৌভাগ্য সইল না; কলেরাহয়ে চারদিনের ব্যবধানে তাঁর স্বামী এবং পুত্রের মৃত্যু হল। হরিমোহিনীর জামাই কুসঙ্গে পড়ে নেশা ধরেছিল। হরিমোহিনী কিছুই না-জেনে তাকে টাকা দিতেন। মনোরমা বাধা দিলে একদিন জামাই তাকে নিতে পাঠালে। মেয়ের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও হরিমোহিনী তাকে স্বামিগৃহে পাঠালেন এবং সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হল।

হরিমোহিনীর দেবরদের লোভ তাঁর বিষয়ের দিকে। এদিকে বিষয়কর্ম তাঁর বিষের মত ঠেকছিল। তিনি গুরুঠাকুরকে ডেকে বললেন, 'ঠাকুর, অসহ্য দুঃখের হাত হইতে কী করিয়া বাঁচিব আমাকে বলিয়া দাও।' গুরু তাঁকে বললেন, 'এই গোপীবল্লভই তোমার স্বামী-পুত্র-কন্যা সবই। ইঁহার সেবা করিয়াই তোমার সমস্ত শূন্য পূর্ণ হইবে।' হরিমোহিনী মাসে-মাসে খোরাকির বিনিময়ে তাঁর জীবনস্বত্ব দেওরদের লিখে দিতে চাইলেন এবং তাঁর বিশ্বাসী কর্মচারী নীলকান্তের অগোচরে একদিন কাগজে সই দিলেন—তাতে কী লেখা ছিল ভালো করে দেখলেন না। অনতিপরে দেবররা তাঁকে বললে, 'এখানে তোমার খাওয়াপরা চলিবে কী করিয়া?'

বিবাহের চৌত্রিশ বছর পরে হরিমোহিনী তাঁর ঠাকুরকে নিয়ে স্বামিগৃহ থেকে বেরোলেন। ঠাকুরকে প্রতিদিন ডেকে বলতেন, 'ঠাকুর, আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়ে আমার কাছে যেমন সত্য ছিল, তুমি আমার কাছে তেমনি সত্য হয়ে ওঠো।' কিন্তু ঠাকুর সেই প্রার্থনা শুনলেন না। বিবাহের পর একদিনের জন্যও হরিমোহিনী পিত্রালয়ে আসতে পারেন নি। তীর্থে-তীর্থে ঘুরে যখন দেখলেন মায়া তখনও মন ভরে আছে, তখন সুচরিতাদের খোঁজ করলেন। সুচরিতার বাবা সমাজ ছেড়ে ব্রাহ্মমত গ্রহণ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে সুচরিতা তার ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় পরেশবাবুর আশ্রিত ছিল।

হরিমোহিনী সেখানে এলেন। তখন তাঁর চোখে চশমা, সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ; চশমার একদিকের ভাঙা দণ্ডে দড়ি বাঁধা; মাথার সামনের দিকে চুল বিরল; গৌরবর্ণ মুখ পরিপক্ব ফলটির মতো নিটোল; দুই-ভ্রূর মাঝখানে একটি উল্কির দাগ—গায়ে অলংকার নেই, বিধবার বেশ; মুখে এবং কণ্ঠস্বরে তাঁর জীবনের সুগভীর শোকের অশ্রুমার্জিত পবিত্রতা। সুচরিতাকে চেহারায়-স্বভাবে তাঁর মনোরমার মতোই মনে হত। এক-এক সময় পিছন থেকে দেখে তাঁর বুকের মধ্যে চমকে উঠত। সন্ধ্যাবেলায় তাকে দু-হাতে বুকে চেপে বলতেন, 'আহা, আমার মনে হচ্ছে, যেন আমি তাকেই বুকের মধ্যে পেয়েছি।... দণ্ড যা পাবার তা পেয়েছি—এবার সে এসেছে; এই-যে ফিরে এসেছে...এই-যে আমার মা, এই-যে আমার মণি আমার ধন।'

পরেশের স্ত্রী বরদাসুন্দরী নানাভাবে তাঁর অসুবিধা ঘটাবার চেষ্টা করতেন। হরিমোহিনী সমস্ত নীরবে সহ্য করতেন। জলের অসুবিধা দেখে তিনি রান্না-করা একেবারে ছেড়ে দিলেন। শুধু ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে কিছু দুধ-ফল খেয়ে থাকতেন। সুচরিতা শুদ্ধাচারে তাঁর সাহায্য করতে চাইলে বলতেন, 'কেন মা, তুমি যে ধর্ম মান সেই-মতেই তুমি চলো...আমি তোমাকে কাছে পেয়েছি, বুকে রাখছি...এই আমার আনন্দ। পরেশবাবু তোমার গুরু, তোমার বাপের মতো, তিনি তোমাকে যে-শিক্ষা দিয়েছেন তুমি সেই মেনে চলো, তাতেই ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।' শেষে সুচরিতার কষ্ট দেখে তাঁকে রান্নায় মন দিতে হল। পরেশবাবুর বাড়ি যারা আসত তাদের অবজ্ঞার আঘাতে হরিমোহিনী সংকুচিত ছিলেন। একমাত্র বিনয়কে পেয়ে তিনি আনন্দ অনুভব করতেন। একদিন হরিমোহিনী তাকে কিছু ফল, ছানা আর কাঁসার বাটিতে কিছু দুধ দিয়েছিলেন। বরদাসুন্দরী তাঁকে তিরস্কার করায় অশ্রুচোখে বললেন, 'বাবা, আমার মতো অনাথার পক্ষে সংসার ঠিক স্থান নয়।...বাবা, তোমার কাছে বলতে আমার লজ্জা নেই, এদের দুটিকে পাওয়ার পর থেকে ঠাকুরের পুজো আমি মনের সঙ্গে করতে পেরেছি—এরা যদি যায় তবে আমার ঠাকুর তখনই কঠিন পাথর হয়ে যাবে।' অবশেষে সুচরিতার পিতার গচ্ছিত-অর্থে কেনা একটি বাড়িতে তাঁদের স্থানান্তরের উদ্যোগ হল। পরেশবাবুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে হরিমোহিনী সাশ্রুনেত্রে বললেন, 'আমার মতো এতো-বড়ো নিরুপায়ের তুমি উপায় করে দিয়েছ, এ তুমি-ভিন্ন আর কেহ করতে পারত না।...ঘুরেফিরে শেষে আজ তোমার দেখা যখন পেয়েছি তখন বুঝতে পেরেছি, ভগবান আমাকেও দয়া করেছেন।'

নূতন-বাড়িতে এসে হরিমোহিনী সুচরিতাকে আগের সমস্ত পরিবেষ্টন থেকে ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলেন। স্বতন্ত্র ঘরকন্না হবার পর থেকে বিনয়ের সঙ্গও তাঁর অরুচিকর বোধ হল। বিনয়ের বন্ধু গোরা তখন জেলে। সুচরিতা আর বিনয়ের কাছে তার কথা হরিমোহিনী শুনতেন।

সমস্ত তিনি-যে ঠিক বুঝতে পারতেন তা নয়, তবু মোটামুটি বুঝতেন যে, শাস্ত্র ও লোকাচারের পক্ষ নিয়ে সে আধুনিক আচারহীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। গোরা কারামুক্ত হয়ে দেখা করতে এলে হরিমোহিনী আশ্চর্য হলেন: 'তুমিই গৌর? গৌরই বটে। ওই-যে কীর্তনের গান শুনেছি—চাঁদের অমিয়া-সনে চন্দন বাঁটিয়া গো / কে মাজিল গোরার দেহখানি…কবে তোমার নিজের মুখ থেকে ভালো-ভালো সব কথা শুনতে পাব, মনে এই প্রত্যাশা করে এতদিন ছিলুম। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আর বড়ো দুঃখিনী…কিন্তু বাবা, তোমার কাছ থেকে কিছু জ্ঞান পাব এ আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে।' পরদিন নব্যমতাভিমানিনী সুচরিতাকে সুদৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য গোরাকে তিনি ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন। গোরা নিচে এলে সুচরিতার মুখের ভাব দেখে তিনি বিস্মিত হলেন: এ-আবার কী কাণ্ড! রাগ করে তিনি সুচরিতাকে খেতে ডাকলেন না। রাত্রে পরেশবাবু এসে সুচরিতাকে দেখলেন ছাদে। হরিমোহিনী বললেন, 'একটু ঠাণ্ডা হয়েই নিক। এখনকার মেয়েদের ঠাণ্ডায় অপকার হবে না।' গোরার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধতা তাঁর মনে মাথা তুলে উঠল। ভক্তির কথা শুনতেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা; গোরার মুখে ভক্তির কথা তেমন সরস হয়ে বাজত না। সুচরিতা আর্থিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মতে-বিশ্বাসে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—অথচ সুচরিতাই শেষ-বয়সে তাঁর অবলম্বন। হরিমোহিনীর কেবলই মনে হতে লাগল, গোরার সমস্তই কৃত্রিমতা এবং সুচরিতার বিষয়ের উপরে লুব্ধতা। পরদিন সকালে আবার গোরাকে দেখে তিনি জ্বলে উঠলেন: 'তুমি-তো বাবা ব্রাহ্ম নও?…তবে তোমার এ কী-রকম ব্যবহার?…ও যে-শিক্ষাই পেয়ে থাক্, যতদিন আমার কাছে আছে আর আমি বেঁচে আছি এ-সব চলবে না।…ওদের ঘরে আরও তো ঢের বড়ো-বড়ো মেয়ে আছে…যদি তোমার কিছু বলবার থাকে ওদের কাছে গিয়ে বলো গে, কেউ তোমাকে মানা করবে না।' সেদিন ব্রাহ্মসমাজের হারানবাবুর কাছে সুচরিতা নিজেকে হিন্দু বলে অভিহিত করায় হরিমোহিনী একেবারে ঠাকুরঘরে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন এবং সেদিন থেকে গোপীবল্লভের ভোগ বাড়িয়ে দিলেন।

হরিমোহিনী তাঁর বিপত্নীক দেওর কৈলাসকে একটি পত্র দিলেন। কিন্তু সুচরিতার গতিক তাঁর ভালো বোধ হল না—খাওয়া নেই দাওয়া নেই সর্বদাই কান্নাকাটি। একদিন তিক্ত হয়ে কঠোরস্বরে বললেন, 'এ-সমস্ত কী হচ্ছে আমি-তো কিছু বুঝতে পারছি নে।…গৌরমোহন তোমার গুরু হয়ে তোমাকে কেবল ভোলাচ্ছে।…ওর মধ্যে আদত-কথা কিছুই নেই…যখন সময় হবে আমার যিনি গুরু আছেন…তিনিই তোমাকে মন্ত্র দেবেন। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমাকে হিন্দুসমাজে ঢুকিয়ে দেব। ব্রাহ্মঘরে ছিলে, নাহয় ছিলে, কেই-বা সেই খবর জানবে। তোমার বয়স কিছু বেশি হয়েছে বটে…কেই-বা তোমার কুষ্ঠি দেখছে। আর টাকা যখন আছে তখন কিছুতেই কিছু বাধবে না…কৈবর্তের

ছেলে কায়স্থ বলে চলে গেল, সে-তো আমি নিজের চক্ষে দেখেছি।' পরেশের মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিবাহ-উপলক্ষে আনন্দময়ী সুচরিতাকে নিতে এলে হরিমোহিনীর মুখ অপ্রসন্ন হল : 'তুমি তো হিঁদুঘরের মেয়ে, তুমি-তো সব বোঝ, তুমিই-বা এমন-কথা বল কোন্ মুখে ?…আমি-তো তোমাদের ভাব কিছুই বুঝে-উঠতে পারি নে। তোমারই-তো ছেলে ওঁকে হিন্দুমতে লইয়েছেন, তুমি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লে চলবে কেন ?' পরেশবাবুর গৃহে যে-হরিমোহিনী সর্বদা অপরাধ-ভীরুর মতো ছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর মুখে-চোখে ভাবে-ভঙ্গিতে এই অভাবনীয় পরিবর্তনে আনন্দময়ী বিস্মিত হলেন। নিদারুণ শোকের আঘাতে হরিমোহিনীর যে-বৈরাগ্য জন্মেছিল, হৃদয়ক্ষতের সামান্য আরোগ্য হতেই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা অনেকদিনের ক্ষুধা নিয়ে জেগে উঠেছিল।

সুচরিতা তবু বিবাহ-বাড়িতে গেল। এদিকে কৈলাসও উপস্থিত। হরিমোহিনী বোঝালেন, সে গেছে পিসির বাড়ি নিমন্ত্রণে। সুচরিতার ফিরতে দেরি দেখে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন : গোরাকে বাড়ি আসতে বাধা দিয়েছেন বলে তার মা সুচরিতাকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করছেন। বেহারার সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে এসে তিনি আনন্দময়ীকে সম্ভাষণ না করেই সুচরিতাকে নিয়ে পালকিতে উঠলেন। পথিমধ্যে ভূমিকা ফাঁদবার চেষ্টা করলেন : ঘরের মধ্যে অবিবাহিত মেয়ে যে কতবড়ো দায়, অভিভাবকদের পক্ষে তা কী-যে দুঃসহ উৎকণ্ঠার বিষয় এবং মুক্তিপথের বিঘ্নস্বরূপ—সুচরিতার মতো মেয়ের পক্ষে হিন্দুসমাজে প্রবেশের মতো দুরূহ ব্যাপারকে তিনি কেমন করে নিতান্ত সহজ করে এনেছেন, ইত্যাদি। সুচরিতা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় হতবুদ্ধি-অনন্যোপায় হরিমোহিনী অবশেষে গোরার কাছে গেলেন : গোরার শিক্ষাদীক্ষায় সুচরিতার অশেষ উপকার হয়েছে—ভগবান তাকে রাজরাজেশ্বর করুন। সুচরিতার বিবাহ-সমস্যায় অনেককাল অসহ্য-উদ্‌বেগ ভোগ করে বহু সাধ্য-সাধনা অনুনয়-বিনয়ে তিনি তাঁর ছোটো-দেওরকে রাজি করিয়েছেন—এমন সময়ে, লোকে শুনলে আশ্চর্য হবে, সুচরিতা একেবারে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। গোরাকে সে গুরু বলে মানে—সে একবার সঙ্গে গিয়ে আদেশ করলেই সুচরিতা আপত্তি করবে না। গোরা সুচরিতার সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক হলে তিনি খুশি হলেন : 'তবে এক কাজ করো বাবা…তুমি আমাকেই দু-লাইন লিখে দাও।…হিন্দুঘরের মেয়ের উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করে গৃহধর্ম পালন করাই সকলের চেয়ে বড়ো ধর্ম কি না।' গোরার তাতেও অনিচ্ছা দেখে তীব্রস্বরে বললেন, 'তোমার মনের ভিতরকার ইচ্ছাটা তা-হলে খুলেই বলো-না। গোড়াতে ফাঁস জড়িয়েছ তুমিই, এখন খোলবার বেলায়…আসল কথা, ইচ্ছেটা তোমার নয়-যে ওর মন পরিষ্কার হয়ে যায়।' গোরা বাধ্য হয়ে বিধান দিলে। তিনি সেই-কাগজখানি আঁচলে বেঁধে বাড়ি ফিরলেন এবং বিনয়ের বাসা থেকে সুচরিতাকে আনিয়ে যথোচিত ভূমিকার পর তাকে তার গুরুর আদেশ পাঠ করালেন।

সুচরিতা কোনো সদুত্তর না-দিয়ে পরেশবাবুর কাছে গেল। ঘটনাক্রমে গোরার সঙ্গে সেখানেই তার মিলন হল।

হরিশ কুণ্ডু ॥ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস। নিখিলেশের এক প্রতিবেশী-জমিদার। নিখিলেশের মতের বিরুদ্ধে বিলেতি-পণ্যের ধ্বংস-উপলক্ষে হরিশ কুণ্ডু ছিল সন্দীপের দলে। তারই গরিব প্রজা পঞ্চু ধারের টাকায় কিছু কাপড় কিনে বেচত। কুণ্ডু তার একশো-টাকা জরিমানা করলে। পঞ্চু পায়ে পড়ল: সেগুলো বিক্রি হলে আর কিনবে না। হরিশ বললে, 'সে হচ্ছে না, আমার সামনে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্, তবে ছাড়া পাবি।' শেষে কথা-কাটাকাটিতে কুণ্ডু লাল হয়ে উঠল: 'হারামজাদা, কথা কইতে শিখেছ বটে—লাগাও জুতি।' জুতোর পরে তার জরিমানাও বহাল রইল।

পঞ্চুর বাস্তুভিটাতে তার স্বত্ব হরিশ কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। পঞ্চু তার মাতামহের ওয়ারিশ। নিখিলেশ তার পক্ষ নেওয়াতে উচ্ছেদের অসুবিধা ঘটল। হঠাৎ এক প্রাপ্তবয়স্ক ভাইঝিকে নিয়ে পঞ্চুর এক জাল-মামী উপস্থিত। পঞ্চুর মামার সে নাকি প্রথম পক্ষের, সতিনের ভয়ে প্রথমে বাপের বাড়ি পরে বৃন্দাবনে ছিল—কুণ্ডু-জমিদারের আমলারা জানে। যে-ঘটনা আদৌ ঘটে নি, তার সাক্ষ্যের অভাব হয় না। নিখিলেশের মাস্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবু অনেক চেষ্টায় বুড়িকে বিদায় করলেন। হরিশ একেবারে খাপ্পা: 'আমি ওর একটা জাল-মামী জুটিয়ে দিলুম, ও-বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল-বাবার যোগাড় করেছে। দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী করে।'

এদিকে কাগজে-কাগজে হরিশের গুণগান চলল—হরিশ কুণ্ডুর মতো মায়ের সেবক বেশি থাকলে নাকি ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানাঘরের চিমনিগুলো পর্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙা ফুঁকত। ধুম করে মহিষমর্দিনীর পুজো হল—খরচ উঠল প্রজাদের কাছ থেকে। শেষে মুসলমান-প্রজারা ক্ষেপে উঠতে বিপর্যয় ঘটল।

হরিশংকর ॥ 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রামচন্দ্র রায়ের এক মন্ত্রী। রাজার দৃষ্টান্তে হরিশংকর বিদূষক রমাইয়ের রসিকতায় অবশ্যই হাসা কর্তব্য বিবেচনা করতেন। রাজশ্বশুর প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে পরিহাস-প্রসঙ্গে বলতেন, 'আর মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত-পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নিচু করা, এত-পুণ্য এখনো তোমরা কর নাই। কেমন হে ঠাকুর।' একদিন সভায় তিনি প্রস্তাব করলেন, 'মহারাজ, আপনি আর-একটি বিবাহ করুন।' দেওয়ানজির সমর্থনে তখনই সে-প্রস্তাব গৃহীত হল।

হলধর (হলা) ॥ 'মালঞ্চ' উপন্যাস। আদিত্যের এক পুরনো মালী। ডাকনাম হলা। বিশেষ-বিশেষ ঋতুতে গাছের চারা-তৈরি, কলম-বাঁধা, অর্কিড ভাগ-করা, নিয়ুমার্কেটে ফুলের চালান দেওয়া—সমস্ত কাজেই হলধর আদিত্যের সহায়ক এবং তার স্ত্রী নীরজার প্রধান পারিকর।

নীরজা শয্যাশায়িনী হ'লে বাগানের পরিচর্যায় এল সরলা। বাগানের কাজে তার প্রভুত্ব নীরজার অসহ্য হল। হলধর বুঝে নিলে, সরলার আদেশমতো কাজ না-করলেই নীরজা হয় খুশি। আদিত্যকে সে গ্রাহ্য করত না। একদিন বাগানের কাজে শৈথিল্য দেখে নীরজা তাকে ভর্ৎসনা করলে। হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরিয়ে বললে, 'বউদিদি, এই-একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ-জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।' নীরজা দাম জিজ্ঞাসা করায় সে জিভ কাটলে: 'এমন-কথা বোলো না। এ-ঘটির আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা-বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-পরে মানুষ।' ঘটিতে ফুল সাজিয়ে বিদায় নেবার সময় সে বললে, 'তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগনীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না, বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এত-বড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।'

হারান ॥ 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাস। নৃপবালা-নীরবালাদের এক পরিচিত।

হারানচন্দ্র নাগ (পানুবাবু) ॥ 'গোরা' উপন্যাস। ব্রাহ্মসমাজের জনৈক উৎসাহী কর্মী। হারানচন্দ্র নাগ ওরফে পানুবাবু নৈশস্কুলের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী—কিছুতেই তাঁর শ্রান্তি ছিল না। একদিন তিনিই ব্রাহ্মসমাজে অত্যুচ্চ-স্থান অধিকার করবেন, সকলেরই এই-আশা ছিল। ইংরেজি-ভাষায় তাঁর অধিকার ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার খ্যাতি ছাত্রদের যোগে ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। কলকাতায় নবাগত পরেশবাবুর আশ্রিতা-বন্ধুকন্যা সুচরিতার প্রতি হারানবাবু আকৃষ্ট হলেন এবং তার সর্বপ্রকার অসম্পূর্ণতা-পূরণ, ত্রুটি-সংশোধন, উৎসাহ-বর্ধন ও উন্নতি-সাধনের জন্য মনোযোগী হয়ে উঠলেন। তাকে তিনি যে বিশেষ-ভাবে আপনার উপযুক্ত সঙ্গিনী করে তুলতে ইচ্ছা করেছেন, তা সকলের কাছেই সুগোচর হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি তাঁর উৎসৃষ্ট মহৎ-জীবনের দায়িত্বকে এতই বড়ো করে দেখতেন যে, কেবলমাত্র ভালো-লাগার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বিবাহ করাকে নিজের অযোগ্য জ্ঞান করতেন। এই-বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কী-পরিমাণে লাভবান হবে তা বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি সুচরিতাকে নানাভাবে পরীক্ষা করতে লাগলেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যা-কিছু সত্য, মঙ্গল ও সুন্দর আছে, তিনি স্বয়ং তার অভিভাবকস্বরূপ হয়ে রক্ষকতার ভার নিয়েছিলেন। ধর্মসাধনার ফলে নিজের

দৃষ্টিশক্তি এমনি আশ্চর্য স্বচ্ছ হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন যে, অন্য-সকলের ভালোমন্দ সত্যাসত্য যেন তিনি সহজেই বুঝতে পারেন। তাঁর সত্যানুরাগের মধ্যে বিনয়ের স্থান ছিল না। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র বাইবেলই তাঁর অবলম্বন ছিল। পরেশের বন্ধুপুত্র গোরা একদিন সেখানে এলে তার সঙ্গে তর্কে হেরে হারানবাবু পরেশকে বললেন, 'দেখুন, সকলের সঙ্গেই মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেওয়া আমি ভালো মনে করি নে।' অতঃপর আর কালবিলম্ব না করে একদিন সকলকে ডেকে ঈশ্বরের নাম নিয়ে তিনি সুচরিতার সঙ্গে তাঁর বিবাহের সম্বন্ধটা পাকা করে নিতে চাইলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট ব্রাউনলোর আমন্ত্রণে পরেশের মেয়েদের একটি ইংরেজি কাব্যনাট্য অভিনয়ের কথা হল। হারানবাবু 'প্যারাডাইস লস্ট' থেকে কতক অংশ আবৃত্তি করবার এবং ড্রাইডেনের কাব্য-আবৃত্তির ভূমিকা-হিসাবে সংগীতের মোহিনী-শক্তি সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র-বক্তৃতা দেবার প্রস্তাব ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পাকা করে এলেন। পরেশের স্ত্রী বরদাসুন্দরী এতে বিরক্ত হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক পত্র বের করে দেখালেন। অভিনয়ের দুই-একদিন আগে দিবাবসানে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে হারানবাবু পদব্রজে নদীতীরে বেড়াচ্ছিলেন। অতি-অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী ও হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন-সম্বন্ধে উচ্চভাবের আলাপে তাঁকে চমৎকৃত করছিলেন। এমন সময়ে গোরা এসে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটকে ভর্ৎসনা করায় হারানবাবু দুঃখ প্রকাশ করলেন : এদেশে লেখাপড়া তেমন গভীরভাবে হচ্ছে না, বিশেষত দেশে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রনৈতিক শিক্ষা একেবারে নেই বলেই এমন ঘটছে; ইংরেজি-বিদ্যার যেটা শ্রেষ্ঠ-অংশ সেটা গ্রহণ করার অধিকার এদের হয় নি; ভারতবর্ষে ইংরেজের রাজত্ব যে ঈশ্বরের বিধান এ-অকৃতজ্ঞেরা এখনও তা স্বীকার করতে নারাজ— কারণ এরা কেবল পড়া মুখস্থ কর ছ, কিন্তু ধর্মবোধ নিতান্তই অপরিণত। অনতিপরেই গোরার কারারোধ ঘটল। পরেশের মেজোমেয়ে ললিতা এই অপমানে বিনয়ের সঙ্গে ফিরে এল কলকাতায়। আধুনিক-কালের ছেলেমেয়েদের বিকার ও ডিসিপ্লিনের অভাবের জন্য হারানবাবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কলকাতায় ফিরেই তিনি পরেশবাবুকে বললেন, 'ললিতা আজ যে-কাজটি করেছে তা কখনোই সম্ভব হত-না যদি আপনার কাছে বরাবর প্রশ্রয় পেয়ে না আসত'। ললিতা হঠাৎ উত্তেজিত হওয়াতে হারানবাবু অপ্রতিভ : 'সুচরিতা!···তোমার সামনে ললিতা আমাকে অপমান করবে!' মনে হল, তিনি তখনই উঠে যাবেন, কিন্তু উঠলেন না—পরেশবাবুর গৃহে ক্রমে-ক্রমে নিজের সম্ভ্রম নষ্ট হতে দেখে তিনি আরও দৃঢ় হয়ে বসলেন। পরেশবাবুকে বললেন, 'সুচরিতার সম্বন্ধে সেই-যে প্রস্তাবটা ছিল···আমার ইচ্ছা, আসছে রবিবারেই সে-কাজটা হয়ে যায়।'

বরদাসুন্দরীর সঙ্গে হারানের ভিতরে-ভিতরে বিরোধের ভাবই ছিল। কিন্তু সুচরিতার বিধবা মাসি সেখানে এলে বরদা তাঁর আচাররক্ষার বিরুদ্ধতা

করায় তিনি সেই ব্রাহ্মপরিবারকে নিষ্কলঙ্ক রাখার চেষ্টাকে সদৃষ্টান্ত বলে কীর্তন করলেন। হারানবাবুর ধারণা ছিল তিনি অসাড়-হৃদয়েও উৎসাহ সঞ্চার করতে পারেন; জড়চিত্তকে কর্তব্যের পথে ঠেলে দেওয়া এবং স্খলিত-জীবনকে অনুতাপে বিগলিত করা তাঁর একটা স্বাভাবিক ক্ষমতা। তাঁর সমাজের লোকেরও ব্যক্তিগত চরিত্রে যে-সমস্ত ভালো পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি নিজেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে তার প্রধান কারণ বলে স্থির করতেন। সুচরিতাকে কেউ প্রশংসা করলে তিনি এমন-ভাব ধারণ করতেন যেন সে প্রশংসা সম্পূর্ণ তাঁরই প্রাপ্য। হারানের মত লোক আর-সমস্তই সহ্য করতে পারেন, কিন্তু যাদের বিশেষভাবে হিত-পথে চালাতে চেষ্টা করেন, তারা নিজের বুদ্ধি অনুসারে স্বতন্ত্র-পথ অবলম্বন করলে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। সুচরিতা মাসির পক্ষাবলম্বন করায় তিনি নিজের কাগজে পরেশবাবুর পরিবারের সম্বন্ধে কটাক্ষ আরম্ভ করলেন। অতঃপর বিবাহের প্রসঙ্গে সুচরিতা বেঁকে দাঁড়াল। হারান কাঠের মতো শক্ত হয়ে বসে মনে-মনে বললেন, 'অন্ প্রিন্সিপ্‌ল্ এ-দাবি ছাড়া চলিবে না।' প্রকাশ্যে বললেন, 'সুচরিতা… ব্রাহ্মসমাজের কাছে যে আমাদের জবাবদিহি আছে।' পরেশকে বললেন, 'আপনি সুচরিতাকে সৎ-পরামর্শ দেবেন না?…এ-সমস্তই আপনার অবিবেচনার ফল, এ-কথা আমি আপনাকে মুখের সামনেই বলছি।…এ-জন্যে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে—সে আমি বলে রাখছি।'

সুচরিতা তার মাসির সঙ্গে অন্য-বাড়িতে গেল। বিদায়ের দিন হারানবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, 'সুচরিতা, এতদিন তুমি যে-সত্যকে আশ্রয় করে ছিলে আজ তার থেকে পিছিয়ে পড়তে যাচ্ছ, আজ আমাদের শোকের দিন।' পরেশবাবু এই আশঙ্কাকে মনে স্থান দিতে নিষেধ করায় বললেন, 'আপনার মনে কোনো আশঙ্কা নেই?…এই-যে আপনার কন্যা ললিতা একলা বিনয়বাবুর সঙ্গে স্টিমারে করে চলে এলেন এটাও কি কাল্পনিক?…আপনাকে যা বলছি সে আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলছি নে, আমি ব্রাহ্মসমাজের তরফ থেকে বলছি—না-বলা অন্যায় বলেই বলছি।…ললিতার সঙ্গে বিনয়ের যে-সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে সে কি শুধু বাইরের সম্বন্ধ? তাদের অন্তরকে কোনোখানেই স্পর্শ করে নি?' সুচরিতা-ললিতা তখনি রুখে দাঁড়াল। হারান থমকে গেলেন। সুচরিতা অন্যত্র গেলে তাঁর শক্তি প্রতিহত হবে—এই-জন্য তিনি ব্রহ্মাস্ত্রগুলি শান দিয়ে এনেছিলেন। নৈতিক অগ্নিবাণ যখন তিনি একে-একে মহাতেজে নিক্ষেপ করতে থাকবেন, অপরপক্ষ একেবারে হেঁট হয়ে যাবে, এই তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ঠিক তেমনটি হল না। তবু হার মানবার লোক তিনি নন। মনে-মনে বললেন, সত্যের জয় হবেই, অর্থাৎ তাঁর জয় হবেই। জয় তো শুধু-শুধু হয় না—লড়াই করতে হবে।

হারানবাবু কোমর বেঁধে রণক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। বিনয়-ললিতার স্টিমার

যাত্রার বিবরণ ও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনৈতিক জীবনের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি এই-প্রকারের কদাচারকে যে দমন করা কর্তব্য তা অনেককেই বোঝালেন। ব্রাহ্ম-সমাজের হিতৈষী লোকেরা গাড়ি-পালকি ভাড়া করে পরস্পরের বাড়ি গিয়ে বলে এলেন, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই-সঙ্গে সুচরিতা যে হিন্দু-মাসির ঘরে আশ্রয় নিয়ে যাগযজ্ঞ-জপতপ ও ঠাকুরসেবায় দিন যাপন করছে, তাও যথারীতি পল্লবিত হয়ে উঠতে লাগল। ব্রাহ্মসমাজের নিন্দাসূচক ললিতার একটি পত্র তিনি বরদার কাছে উপস্থিত করলেন। বিনয়ের কাছেও একটা বেনামী চিঠি পৌঁছল : ললিতাকে বিবাহ করলে যে কোনোমতেই সুখের হবে-না, সে-সম্বন্ধে বিস্তারিত উপদেশ দিয়ে শেষে ছিল—ললিতার ফুসফুস দুর্বল, ডাক্তাররা যক্ষ্মা আশংকা করেন। অনতিপরে হারান তার বাসায় উপস্থিত : 'বিনয়বাবু, আপনি তো হিন্দু ?···আপনারা পরেশবাবুর পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে কেবল একটা অশান্তি সৃষ্টি করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে কী অনিষ্ট বিস্তার করেছেন তা আপনারা জানেন না।' বিনয় অগত্যা ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা নিয়ে ললিতাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হল। বরদাসুন্দরীর আহ্বানে বিনয়ের দীক্ষার জন্য এসে হারান ললিতাকে ডেকে পাঠালেন। হারানবাবু জানতেন, তাঁর ন্যায়াগ্নিদীপ্ত দৃষ্টির সামনে ভীরুতা কম্পিত হয়, কপটতা ভস্মীভূত হয়—তাঁর এই তেজোময়-আধ্যাত্মিক দৃষ্টি ব্রাহ্মসমাজের মূল্যবান সম্পত্তি। গাম্ভীর্যের মাত্রা শেষ-সপ্তক পর্যন্ত চড়িয়ে বললেন, 'দীক্ষা ! দীক্ষা যে জীবনের কী-পবিত্র মুহূর্ত সে-কি আজ আমাকে বলতে হবে ? সেই-দীক্ষাকে কলুষিত করবে !···আসক্তির ছিদ্র দিয়ে দুর্বলতা যে মানুষকে কিরকম দুর্নিবার-ভাবে আক্রমণ করে তা অনেক দেখেছি···কিন্তু যে-দুর্বলতা কেবল নিজের জীবনকে নয়, শত-সহস্র লোকের জীবনের আশ্রয়কে একেবারে ভিত্তিতে গিয়ে আঘাত করে, তুমিই বলো ললিতা···তাকে ক্ষমা করবার অধিকার কি ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন ?'

গোরার মুক্তির পরে হারানবাবু একদিন সুচরিতার বাড়িতে তাকে দেখলেন। বিনয়কে দীক্ষা-গ্রহণের সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে তাকে অনুরোধ করলেন। গোরা কর্ণপাত করলে না। সুচরিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। আর-একদিন সুচরিতার বাড়ি এসে তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই আরম্ভ করলেন, 'সুচরিতা, তোমরা কোন্‌দিকে চলেছ বলো-দেখি। কোথায় গিয়ে পৌঁছবে ? বোধহয় শুনেছ ললিতার সঙ্গে বিনয়বাবুর হিন্দুমতে বিয়ে হবে ? তুমি জান এ-জন্যে কে দায়ী ?···দায়ী তুমি !' সুচরিতা নিরুত্তরে কাজ করতে লাগল। হারানবাবু তর্জনী প্রসারিত ও কম্পিত করে বললেন, 'সুচরিতা···তুমিই বিনয়বাবুকে এবং গৌরমোহনবাবুকে তোমাদের ঘরে এনেছ এবং তাদের এতদূর পর্যন্ত প্রশ্রয় দিয়েছ যে, আজ তোমাদের ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত মান্য-বন্ধুদের চেয়ে এরা-দুজনেই তোমাদের কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে।···

কিন্তু সুচরিতা, এখনো ফেরবার সময় আছে। একবার ভেবে দেখো, একদিন···আমাদের সামনে জীবনের কর্তব্য কী-উজ্জ্বল ছিল, ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কী উদারভাবেই প্রসারিত হয়েছিল'। সুচরিতা বললে, গোরা তার গুরু। হারানবাবু যদি শুনতেন, গোরাকে সুচরিতা ভালোবাসে, তাতে তেমন কষ্ট পেতেন না—কিন্তু তাঁর গুরুত্বের অধিকার গোরা কেড়ে নিয়েছে শুনে তাঁকে শেলের মতো বাজল। তিনি বলতে লাগলেন, 'হিন্দুসমাজ তোমাকে গ্রহণ করবে?···তোমার গৌরমোহনবাবুকে বিনয়বাবু পাও নি··· গৌরবাবু যে তোমাকে গ্রহণ করবেন এমন আশাও কোরো না।' সুচরিতা আর তাঁর সামনে বেরোতে অনিচ্ছুক। হারানবাবু বললেন, 'বার হবে কী করে বলো। এখন-যে তুমি জেনানা। হিন্দু রমণী। অসূর্যম্পশ্যরূপা। পরেশবাবুর পাপের ভরা এইবার পূর্ণ হল। এই বুড়োবয়সে তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে থাকুন, আমরা বিদায় হলুম।'

পরেশবাবু অতঃপর ব্রাহ্মসমাজের কমিটি থেকে এক পত্র পেলেন। তার মর্ম এই যে: অব্রাহ্ম-মতে কন্যার বিবাহে সম্মতি দিয়ে তিনি আর কোনোমতেই সমাজের সভাশ্রেণীভুক্ত থাকতে পারেন না।

হারু ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। ত্রিপুরার জনৈক প্রজা। ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে জীববলি নিষিদ্ধ হলে প্রজারা তাকেই সমস্ত ক্ষতির কারণ নির্দেশ করলে। হারু বললে, 'এই দেখো-না কেন, মোধো আজ দেড়-বছর ধরে ব্যামো-ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, যেই বলি বন্ধ হল অমনি সে মারা গেল।'

হাসি ॥ 'রাজর্ষি' উপন্যাস। একটি পিতৃমাতৃহীনা মেয়ে। ছোটোভাই তাতার সঙ্গে সে তার কাকার আশ্রিত ছিল। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একদা গোমতীতীরে স্নান করতে এসেছেন। হাসি তাঁর কাপড় টেনে বললে, 'তুমি কে?···আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও-না।' রাজা মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন: সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে যেন তার সাদৃশ্য ছিল। তিনি তার ছোটো-ভাইটির নাম জিজ্ঞাসা করলেন। হাসি তার গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'বল-না ভাই, আমার নাম তাতা।' রাজাকে বললে, 'ও-কিনা ছেলেমানুষ, তাই ওকে সকলে তাতা বলে।' তাতা যে তার চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ তা সে হেসে-হেসে বিস্তর উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে।

এরপর প্রত্যহ তারা রাজার স্নান দেখত। প্রতিদিন গোমতীতীরে নাগকেশর গাছের তলায় হাসি পা-ছড়িয়ে গল্প করত। সে-গল্পের কোনো মাথামুণ্ড ছিল না—তাতা তাই-ই অবাক্ হয়ে শুনত। একদিন আষাঢ়ের সকালে গোমতীনদীর জলে ঘনমেঘের ছায়া পড়েছে—পূর্বরাত্রের পূজার বলির রক্ত মন্দিরের শ্বেতপ্রস্তরের সোপান বেয়ে শেষ হয়েছে জলের মধ্যে এসে। হাসি

সংকোচে হঠাৎ সরে গেল : 'এ-কিসের দাগ বাবা।' রাজা বললেন, রক্তের। সে বললে 'এত রক্ত কেন।'—বলে জলে আঁচল-ভিজিয়ে সে রক্তের দাগ মুছতে লাগল ; মুছতে-মুছতে তার ছোটো-আঁচলটি রক্তে লাল হয়ে গেল। রাজার স্নান শেষ হল ; তখন তারা ভাইবোনে সেই রক্তের রেখা মুছে ফেলেছে। বাড়ি ফিরে হাসির জ্বর হল। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজা যখন তাকে দেখতে এলেন, তখন সে প্রলাপ বকছে : 'মাগো, এত রক্ত কেন ?···আর ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ-রক্ত মুছে ফেলি।' সন্ধ্যার পরে সে একবার চোখ খুলেছিল ; একবার চারিদিকে চেয়ে যেন কাকে খুঁজল। তাতা তখন অন্য-ঘরে ঘুমিয়ে। হাসির চোখ আর খুলল না।

হেমনলিনী ॥ 'নৌকাডুবি' উপন্যাস। রমেশের এক ব্রাহ্ম-সহপাঠী যোগেনের বোন। হেমনলিনী এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। কলুটোলায় তাদের পাশের বাসায় নির্জন ছাদে রমেশ বই নিয়ে বসত, তখন ছাতে বেড়িয়ে সেও পড়া মুখস্ত করত। তাদের চায়ের টেবিলেও রমেশের যাতায়াত ছিল। সেখানে আর-একজনের প্রাদুর্ভাব ছিল—সে যোগেনের অন্য বন্ধু অক্ষয়।

আইন-পরীক্ষার পরে রমেশের অনেকদিন সংবাদ নেই। একদিন আলিপুর পশুশালা থেকে হেমনলিনী তার পিতা অন্নদাবাবুর সঙ্গে ফিরছিল। পথিমধ্যে রমেশকে দেখে অন্নদাবাবু গাড়িতে তুলে নিলেন। অন্নদাবাবু রমেশের নীরবতার অনুযোগ করায় হেমনলিনী কৌতূহলের সঙ্গে তার মুখের দিকে চাইলে। রমেশের বাবার মৃত্যুসংবাদ শুনে সে মনে-মনে অনুতপ্ত হল : 'রমেশবাবুকে ভুল বুঝিয়াছিলাম···উঁহার সাংসারিক কী সংকট ঘটিয়াছে···কিছুই না-জানিয়াই আমরা উঁহাকে দোষী করিতেছিলাম।' এই-শোকের সংবাদে তার মনের মেঘ মুহূর্তে কেটে গেল। উভয়ের মধ্যে আর দূরভাব রইল না। অনেককাল পড়া মুখস্থ করে হেমনলিনীর চেহারা ক্ষণভঙ্গুর ছিল। বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে সে চাপল্য মনে করত। অচিরে তার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মসৃণতা এবং দুই-চোখে হাস্যচ্ছটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সীবনপটু এক সখীর কাছে সেলাই শিখে সে রমেশকে পদ্মআঁকা ব্লটিং-বই উপহার দিলে। ইতিমধ্যে বর্ষাকাল এল। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জন, বর্ষণের কলশব্দে দুজনে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অতঃপর রমেশের আগ্রহে তার সংগীতশিক্ষায় সহায়তা এবং সর্দির আশঙ্কায় তার শুশ্রূষায় হেমনলিনীর দিন কাটতে লাগল।

সেবার পুজোর সময় জব্বলপুরে বেড়াতে যাবার কথা হল। হেমনলিনী স্বাস্থ্যের অজুহাতে রমেশকেও সঙ্গে নিতে চাইলে। ইতিমধ্যে উভয়ের ঘনিষ্ঠতায় সমাজে নিন্দার কথা শুনে রমেশের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হল। সেদিন দ্বিপ্রহরে হেমনলিনী তার সেলাইটি নিয়ে বসেছিল—এক পরিপূর্ণ শান্তি ও সর্বাঙ্গীণ সার্থকতায় আবিষ্ট। ঘটনাক্রমে রমেশের আগ্রহে ছিল

নলিনাক্ষের স্ত্রী কমলা। অক্ষয় সে সম্বন্ধে রমেশকে কটাক্ষ করায় হেমনলিনী কে'দে উঠে বললে, 'বাবা, অক্ষয়বাবুর ভারি অন্যায়। কেন উনি আমাদের বাড়িতে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপমান করেন?' অপমানিত রমেশকে সে একটি সান্ত্বনার পত্র পাঠালে। কিন্তু অনতিপরে রমেশই বিবাহ পিছিয়ে দিতে এল। হেমনলিনী বিবর্ণমুখে তার মুখের দিকে চাইলে; পরক্ষণে সূর্যাস্তের আভাটুকুর মতো সে ঘরের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হল। রমেশ বসবার ঘরে গিয়ে দেখলে, সে জানালার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে—তার সুকুমার কপোলের প্রান্ত, সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গি, গ্রীবায় কোমলবিরল কেশগুলিতে সোনার হারের আভাস। রমেশের ক্ষমা ও বিশ্বাসের আবেদনে তার স্নিগ্ধকরুণ দু-চোখের বিগলিত অশ্রুধারা কপোল বেয়ে ঝরতে লাগল। রমেশ দিন-পরিবর্তনের কারণ বলতে চাইলে সে মাথা নেড়ে জানালে: সে জানতে চায় না। অনতিপরে যোগেন এসে দিন-পরিবর্তনের কারণ বার করতে উদ্যত হল। হেমনলিনী তার হাত চেপে বললে, 'না দাদা···তুমি প্রতিজ্ঞা করো যে, তাঁহার কাছে এ-সব কথা একেবারে উত্থাপনমাত্র করিবে না।'

অতঃপর অবিশ্রাম প্রশ্নোত্তর চলল। হেমনলিনী জানত, তার একটা পরীক্ষার সময় আসছে। যোগেন অক্ষয়ের সঙ্গে ফিরে এসে জানালে, রমেশের বিবাহিতা স্ত্রী আছে। হেমনলিনী চৌকি থেকে সহসা মূর্ছিত হয়ে পড়ল। পরে সংজ্ঞালাভ করে সে অক্ষয়কে দেখে বললে, 'বাবা, অক্ষয়বাবুকে এখান হইতে যাইতে বলো।'—বলে তাঁর কোলের উপর পড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল। অবশেষে অন্নদাবাবুর সান্ত্বনায় উঠে বসে বললে, 'যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোনোমতেই বিশ্বাস করিব না।' দাদার সামনে হেমনলিনী নিজের এই বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখালে—কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে একাকী শয়নকক্ষে এসে সমস্ত সন্দেহের কারণগুলি তাকে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু মা যেমন তার ছেলেকে সমস্ত আঘাত থেকে বুকের মধ্যে চেপে রাখতে চেষ্টা করে, সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেমনই সে রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রইল। যোগেনের ভর্ৎসনায় রমেশ আর এল না। পরদিন ছাদে উঠে হেমনলিনী দেখলে, পাশের বাসা বন্ধ; দেখে তার সমস্ত আরও শুষ্ক ও শূন্য বোধ হল। পিতার সস্নেহ-আহ্বানে নিচে গিয়ে সে চা তৈরি করলে। যোগেন তখনও রমেশের অপরাধের কথা উত্থাপন করায় সে কাঁপতে-কাঁপতে বললে, 'দাদা, আমি প্রমাণের কোনো-অপেক্ষা রাখি না। তোমরা তাঁহার বিচার করিতে চাও করো, আমি তাঁহার বিচারক নই।' যোগেন বললে, তার সঙ্গে যে বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছে। সে বললে, 'তোমরা ভাঙিয়া দিতে চাও ভাঙিয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন-ভাঙাইবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ।'

একদিন অপরাহ্নে হেমনলিনী ছাদের উপরে চুপ করে বসে ছিল। অন্নদাবাবু কাছে এসে তার মার অভাবের কথা উল্লেখ করলেন। বৃদ্ধের এই করুণ

উক্তিতে হেমনলিনী যেন মূর্ছার ভিতর থেকে জেগে উঠল ; পিতার কল্যাণবর্ষী কম্পিত হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে যেন এক ধিক্কারের আঘাতে সে শোকের পরিবেষ্টন থেকে বেরিয়ে এল। মার মৃত্যুকালে সে ছিল তিন-বছরের। এই আলোচনায় পিতা ও কন্যার চিরন্তন স্নিগ্ধ-সম্বন্ধটি সন্ধ্যাকাশের ছায়ায় যেন মূর্ত হয়ে উঠল। অন্নদাবাবুর সঙ্গে সে এল চায়ের টেবিলে ; অন্যদিনের মতো অক্ষয়কে দেখে বেরিয়ে গেল না। সেদিন সহজ হাস্যপরিহাসে অনেকদিনের বিষাদের ভার যেন নেমে গেল। সন্ধ্যাবেলায় যোগেন পিতার স্বাস্থ্য এবং তার বিবাহ-ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে : বলা বাহুল্য, তার মনোনীত পাত্র অক্ষয়। ক্রমাগত বিদ্রূপে বিদ্ধ হয়ে হেমনলিনী বললে, 'দাদা, আমি কি বলিতেছি···বিবাহ করিব না ?···বাবা আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন···আমি পালন করিব।' কিছুক্ষণ পরে অন্নদাবাবু এসে দেখলেন তার ঘর অন্ধকার। হেমনলিনী অশ্রুআর্দ্রকণ্ঠে আলো আনতে চেয়ে বললে, 'বাবা, তোমার শরীরের তুমি যত্ন করিতেছ না।···বাবা, আমাকে কি তোমার কাছে রাখিবে না ?··· যতদিন-না দাদার বউ আসে···আমি না-থাকিলে তোমাকে কে দেখিবে ?' পরদিন সকালে সে পাকাচুল তোলার ছলে পিতার মস্তকে হাত-বুলিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁকে চা খেতে নিয়ে গেল। মনে ছিল, বেলা হলে হয়ত অন্য-কেউ এসে পড়বে। তবুও সহসা অক্ষয়ের আগমনে শান্তভাবে সে চা পরিবেশন করলে। অক্ষয়ের হাতে ছিল তারই জন্য একখানি বাঁধানো বই : সেটি সেই টেনিসন, যা তাকে উপহার দিয়েছিল রমেশ। বইটি তার হাত থেকে খসে পড়ল।

পরদিন দাদার অনুরোধে হেমনলিনী নলিনাক্ষের বক্তৃতা শুনতে গেল। মিটিঙের ভিড়ের মধ্যে যেতে চিরদিন সে অনিচ্ছা অনুভব করত। সেদিন নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়েও প্রমাণ করতে চাইলে যে মনের মধ্যে সে শোক চেপে নেই। নলিনাক্ষ বলছিল : ত্যাগ করেই বেশি করে পাবার ক্ষমতা মানবচিত্তের আছে। সেদিন সভা থেকে ফিরে সমস্ত জগৎসংসার হেমনলিনীর কাছে পরিপূর্ণ বোধ হল। অচিরে যোগেনের মধ্যস্থতায় নলিনাক্ষের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। পরম-দুঃখের দিনে হেমনলিনী কোনো অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছিল না ; তাই তার অন্তরের শোক বাইরেও একটা কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে নিজেকে সত্য করে তুলতে চাইছিল। নলিনাক্ষের অনুসরণে সে শুচি-আচার ও নিরামিষ-আহার গ্রহণ করতে লাগল। প্রত্যহ স্বহস্তে জল দিয়ে শয়নগৃহের মেঝেটি মার্জনা করত ; স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্রে রেকাবিতে ফুল নিয়ে সে মুক্ত-বাতায়নের আলোকে নিজের অন্তঃকরণকেও অভিষিক্ত করে নিত। এক-একদিন সেই-ঘরের মেঝেতে বসেই নলিনাক্ষের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা হত। অবশেষে মার অসুখের সংবাদে নলিনাক্ষ বিদায় নিতে এলে হেমনলিনী ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে তাঁর কুশল প্রত্যাশা করলে। নলিনাক্ষের অবর্তমানে নিজের সাধন-সম্বন্ধে সে মনে-মনে দুর্বলতা অনুভব করছিল। তাই অতঃপর কাশীতে

অন্নদাবাবুর বায়ু-পরিবর্তনের প্রস্তাবে সে সোৎসাহে সম্মত হল।

কাশীতে এসে নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরীকে সেবা করে হেমনলিনী আরোগ্য করে তুলল। ক্ষেমংকরী একদা নলিনাক্ষের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করায় অন্নদাবাবু উৎফুল্ল হলেন। হেমনলিনী সে-কথা শুনে সংকুচিত: 'বাবা, তুমি কী বল! না-না, এ-কখনো হইতেই পারে না।···নলিনাক্ষবাবু! এও কি কখনো হয়!' সুদৃঢ় অবলম্বনের জন্য নলিনাক্ষকে সে গুরুর পদে বসিয়েছিল—তাই রমেশের কথা ভেবে নিজের মনকে পীড়িত হতে দিত না। কিন্তু এই-বিবাহের প্রস্তাবে যেন তার হৃদয়ের আশ্রয়সূত্রে টান পড়ল; মনে-মনে বুঝলে সে-বন্ধন কী কঠিন। রাত্রে অন্নদাবাবুর পেটের বেদনা আবার বেড়ে উঠল। নিজের অসম্মতিই তার কারণ বুঝে হেমনলিনীর বেদনার সীমা রইল না। নলিনাক্ষের মুখে এবং কণ্ঠস্বরের অবিচলিত শান্তিতে সে একটা আশ্রয় পেত, কিন্তু তার মধ্যে ভালোবাসার বিদ্যুৎসঞ্চারী-বেদনা ছিল না। এমন সময়ে সেখানে অক্ষয়ের আগমনে রমেশের জীবনবৃত্তের একাংশ শুনে সহসা আত্মরক্ষার জন্য তার সমস্ত শক্তি উদ্যত হয়ে উঠল। রমেশের জন্য বেদনা বোধ করাকেও যেন তার মনে হল লজ্জাকর। মনে ভাবলে, আত্মপ্রতিষ্ঠ নলিনাক্ষের হয়তো ভালোবাসার প্রয়োজন নেই—কিন্তু সেবার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। রাত্রে আবার রমেশের কথা উঠতে সে কাতর হয়ে বললে, 'বাবা, ও-সকল কথার আলোচনা থাক্।···সুখদুঃখের গ্রন্থি অমন করিয়া যেখানে-সেখানে কেন জড়িত হইতে দিব। বাবা, আমি বেশ আছি, আমার জন্য বৃথা উদ্বিগ্ন হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না।'

ক্ষেমংকরী অতঃপর বিবাহে তার মত জানতে চাইলে হেমনলিনী সম্মতি দিয়ে এল। শ্মশানে দাহকৃত্যের পরে সংসার যেমন লঘু হয়ে যায়, তার মনের ভাব তেমনই হল। বাড়ি ফিরে এসে সে নিজের মনকেও বোঝালে: 'মা যদি থাকিতেন, তবে তাঁহাকে আজ আমার এই আনন্দের কথা বলিয়া আনন্দিত করিতাম, বাবাকে কেমন করিয়া সব-কথা বলিব।' রাত্রে নির্জন শয়নগৃহে একখানি খাতা বের করে সে লিখলে, 'আমি মৃত্যুজালে জড়াইয়া পড়িয়া সমস্ত সংসার হইতে বিযুক্ত হইয়াছিলাম। তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া ঈশ্বর··· আমাকে নূতন-জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবেন···আজ তাঁহার চরণে সহস্রবার প্রণাম করিয়া নূতন কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হইলাম।' ক্ষেমংকরী যেদিন তাকে আশীর্বাদ করে গেলেন তার পরের দিনই সহসা রমেশ উপস্থিত। হেমনলিনী যেন প্রেতমূর্তির অনুসরণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ক্ষেমংকরীর নিমন্ত্রণে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু নলিনাক্ষের বাড়িতে এসেই সেই ক্ষণিক উত্তেজনা যেন এক গভীর অবসাদের মধ্যে বিপর্যস্ত হল। মনে হল, যে-নূতন জীবনপথে সে পদক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছে, তা যেন অতিদূর-বিসর্পিত শৈলপথের মতো দুরারোহ-দুর্গম। কমলা তখন ছদ্মপরিচয়ে

ক্ষেমংকরীর কাছে আশ্রিত। তাকে বললে, 'তুমি আমাকে তোমার বোনের মতো দেখিয়ো ভাই।...আমার বোন কেহ নাই। আমি যখন ছোটো ছিলাম তখন আমার মা মারা গেছেন।...ছেলেবেলা হইতে সব-কথা কেবল মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, শেষকালে এমন অভ্যাস হইয়া গেছে যে, আজ মন-খুলিয়া কোনো কথা বলিতেই পারি না। লোকে মনে করে আমার ভারি দেমাক—কিন্তু তুমি ভাই, এমন কথা কখনো মনে করিয়ো না। আমার মন যে বোবা হইয়া গেছে।'

কিন্তু বাড়ি ফিরে এসে রমেশের চিঠিতে সে কমলার পরিচয় অবগত হল। কাশী ত্যাগের আগে বিদায় নিতে এসে হেমনলিনী কমলার গলা জড়িয়ে বললে, 'কমলা।...তোমার স্বামীকে তোমার পরিচয় হইতে বঞ্চিত করিবে কী বলিয়া।...আমি তবে আসি ভাই। বোনকে মনে রাখিয়ো।'

হেমন্ত ॥ 'দুই বোন' উপন্যাস। শর্মিলার ভাই। হেমন্তকে তার 'অধ্যাপকবর্গ বলতেন দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়াণ্ট। চেহারা ছিল পিছন ফিরে চেয়ে-দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে বিদ্যা না চড়েছে পরীক্ষামানের ঊর্ধ্বতম মার্কা পর্যন্ত।...ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে এমন লক্ষণ প্রবল। বলা বাহুল্য, তার চারিদিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষ-প্রদক্ষিণ সবেগে চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন তখনও উদাসীন। উপস্থিত-লক্ষ্য ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সংগ্রহের দিকে। সেই-উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি-জর্মন শেখা শুরু করেছিল।' সে ছিল প্রাণপরিপূর্ণ। গম্ভীর-প্রকৃতি সহাধ্যায়ী নীরদকে বলত, আউল অর্থাৎ প্যাঁচা। নিজের ভবিষ্যতের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলত, 'আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই-তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত-সহজে তেত্রিশ-কোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে।...আমার যখন সময় আসবে তখন এই সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরোব।'

কিন্তু, সময় হল না। হাতে আর-কিছু কাজ না-থাকায় অনাবশ্যক সে যখন আইন পড়তে শুরু করেছে, তখন তার অন্ত্রে কিংবা শরীরে একটা বিকার প্রকাশ পেতে সহসা মৃত্যু হল অস্ত্রপ্রয়োগে। নিজের প্রাণ-প্রাচুর্যটুকু রেখে গেল সে ছোটোবোন ঊর্মির মধ্যে।

হোসেন খাঁ ॥ 'বউ ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস। যশোহরপতি প্রতাপাদিত্যের জনৈক পাঠান প্রজা। হোসেন খাঁ আর তার ভাই রাজাদেশে বসন্ত রায়কে হত্যা করতে গিয়েছিল। বসন্ত রায় শিমুলতলির কাছে এলে হোসেনের ভাই তাঁর অনুচরদের নিকটবর্তী এক-গ্রামে ডাকাত-পড়ার ছলে স রয়ে নিয়ে গেল।

হোসেন খাঁর সহসা ভাবান্তর হল। সে মনে-মনে ভাবলে, 'তোবা, তোবা,

এমন-কাজও করে। কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে, কিন্তু সে-পুণ্য এত উপার্জন করিয়াছি যে পরকালের বিষয়ে আর-বড়ো ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে-প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই-কাফেরটাকে না-মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।' কয়েকটি বয়েত তার জানা ছিল। বসন্ত রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'খাঁ সাহেব, তুমি-যে গেলে না?' হোসেন খাঁ বললে, 'হুজুর, কী করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচরগুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই-পথের ধারে রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এত-বড়ো অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী; পরকালে সে-ঋণ তাহাকে শোধ করিতে হইবে; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোনোকালে তাহার সে-ঋণ শোধ করিতে পারিব না।' বসন্ত রায় বললেন, 'তোমাকে বড়ো-ঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।' হোসেন খাঁ দীর্ঘ সেলাম করলে: 'কেয়া তাজ্জব, এখন চাষবাস করিয়া গুজরান চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন, হে অদৃষ্ট, তুমি-যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে অশ্বত্থগাছকে অশ্বত্থগাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া।'

বসন্ত রায়ের মনে হল: সে-তো অনায়াসে তাঁর সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হতে পারে। হোসেন বললে, 'হুজুর, পারি বৈকি। সেই-তো আমাদের কাজ। আমার পিতা-পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারও সেই একমাত্র সাধ আছে।' বসন্ত রায় জানালেন, তিনি তলোয়ার ছেড়ে সেতারকে অঙ্কশায়িনী করেছেন। হোসেন খাঁ ঘাড় নেড়ে চোখ বুজে বললে, 'আহা, বাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।'

বলা বাহুল্য, তার ইহকালের ব্যবস্থা হতে আর দেরি হল না।